মধুসূদন : সাহিত্যপ্রতিভা ও শিল্পী-ব্যক্তিত্ব

এই লেখকের ঃ

আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য
সাহিত্য ও শিল্পলোক
দ্বারকানাথ ঠাকুর (অনুবাদ)
মোহিতলালের কাব্য পরিক্রমা
সমবায় (অনুবাদ)
রবীন্দ্র-মন ও রবীন্দ্রসাহিত্য
সাহিত্যের আকাশ
শিল্পের স্বরূপ (টলস্টয়ের What is Art ?-এর অনুবাদ)
মোহিতলাল মজুমদার ঃ ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যপ্রতিভা (সম্পাদনা)
বিবেকানন্দের সাধনা

প্রকাশের প্রতীক্ষায় ঃ

বাঙালীর রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম পর্যায়
জীবনশিল্পী টলস্টয়

সম্পাদনা ঃ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

প্রাক্তন অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা, হুগলী কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ। প্রাক্তন সম্পাদক, রাসন্তিকা একতমা। সাধারণ সম্পাদক, কবি মধুসূদন পরিষদ, কলিকাতা

---

৯ এ্যান্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মধুসূদন : সাহিত্যপ্রতিভা ও শিল্পী-ব্যক্তিত্ব

Madhusudan : Sahitya-Pratibha-o-Silpi-Byaktittwa

—A Collection of Essays exploring the genius and creative personality of Michael Madhusudan Dutt.

প্রথম প্রকাশ, ৫ অক্টোবর, ১৯৫৬

প্রকাশক :

অচ্যুতানন্দ সাহা

পুঁথিপত্র

৯ এ্যান্টনী বাগান লেন,

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর :

শ্রীশংকরনারায়ণ হাজরা

মিতালী প্রিন্টার্স

৩৫ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০০৫

উৎসর্গ

যাঁর সস্নেহ ও সযত্ন নির্দেশে
সাহিত্যজগতে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলাম,
সেই শক্তিমান কবি এবং সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক
আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু—
মোহিতলাল মজুমদারের
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে—

"উৎপস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বী ॥"
ভবভূতিঃ ।

-"Neque to ut tubra mireture, loberes,
Contentus "pancis lectoribus"—
—Horace—

"Fit audience find—tho' few"
—Milton—

সম্পাদকের নিবেদন

মধুসূদনের সমকাল থেকে একাল পর্যন্ত তাঁর অনন্যসাধারণ সাহিত্যপ্রতিভা এবং শিল্পী-ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বহু কথা বলা হলেও অনেক কথা এখনও অনুচ্চারিত। সেই কথা মনে রেখে ওই বিষয়ে একখানি গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়ে অনুভব করেছিলাম, আমার মত সীমিত-জ্ঞান সাহিত্য-প্রয়াসীর পক্ষে মধুসূদনের মত Scholar-Poet-এর সামগ্রিক মূল্যায়ন অসম্ভব। এ কারণে মধুসূদন-অনুরাগী কৃতবিদ্য লেখকদের সহযোগিতায় একখানি সংকলন গ্রন্থ সম্পাদনার পরিকল্পনা করি। এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে দীর্ঘ চার বৎসর অতিক্রান্ত হলো।

গ্রন্থ পরিকল্পনায় সর্বক্ষেত্রে সম্ভব না হলেও মধুসূদন-প্রতিভা নির্ণয়ে একটি ঐতিহাসিক ক্রম অনুসরণ করা হয়েছে। এজন্য মধুসূদনের সমকালের এবং পরবর্তী কালের কোন কোন প্রয়াত লেখকের রচনাও গ্রন্থভুক্ত করেছি। কালের দূরত্বে বসে মধুসূদন সমালোচনায় পুরাতন রচনাগুলির তাৎপর্য খুব গভীর মনে না হলেও সেগুলির মধ্যে একটি যুগের দ্বিধা, সংশয়, মুগ্ধতা ও বিরূপতা একই সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করেছে দেখা যাবে। প্রথম যুগের মধুসূদন সমালোচনায় তাঁর নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে বিশেষ কোন আলোচনা-সমালোচনা দেখা যায় না। এ বিষয়ে সূক্ষ্মদর্শী বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা উল্লেখযোগ্য হলেও মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভা নির্ণয়ে যথাযথ সত্যদৃষ্টি-প্রভাবিত কিনা তা সন্দেহস্থল। মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে অন্তর্দর্শী সমালোচনা শুরু হয়েছে এ যুগে। এই গ্রন্থে আমি মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভা, নাট্যচিন্তা এবং নাট্যাদর্শ সম্পর্কে বিখ্যাত সমালোচক ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং তরুণ অধ্যাপক ডক্টর দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের দুইটি রচনা সন্নিবিষ্ট করেছি। ডক্টর সেনগুপ্তের রচনাটি তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ 'মধুসূদন : কবি ও নাট্যকার' থেকে অংশত পুনর্মুদ্রিত বলে অসম্পূর্ণ। ডঃ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে মধুসূদনের নাট্যচিন্তা এবং নাট্যাদর্শ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। মধুসূদন-প্রতিভা যে মূলত নাট্যপ্রতিভা সে বিষয়ে ডক্টর অশ্রুকুমার সিকদারের মূল্যবান আলোচনাটি মধুসূদন-গবেষকদের মনে নতুন চিন্তা জাগ্রত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

কাব্যদেহ এবং অন্তর্নিহিত ভাববস্তু পরিকল্পনায় মধুসূদনের নবসৃষ্টি তাঁর সমকালীন পাঠক-সমাজের নিকট এতই অপ্রত্যাশিত ছিলো যে, তাঁরা ঐতিহ্যবিরোধী সে অভিনব সৃষ্টিকর্মকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ অথবা সরাসরি বর্জন করতে পারছিলেন না। এ দ্বিধা শুধু সে যুগের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের নয়, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমেরও ছিলো। মধুসূদনের জীবিতাবস্থায় স্ব-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন-এ তিনি মধুসূদন-প্রতিভা সম্পর্কে বিশেষ কোন আলোচনা করেন নি। ক্যালকাটা রিভ্যুতে বাংলা সাহিত্য বিষয়ক আলোচনায় আধুনিক কবিদের মধ্যে মধুসূদনের সর্বোচ্চ স্থান নির্দেশ করলেও কোন অভিনবত্বের জন্য তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্ব পরিষ্কারভাবে তা ব্যাখ্যা করেন নি। এমন কি তিনি মধুসূদনের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্ত্য কাব্যবস্তু আত্মসাতের অভিযোগ পর্যন্ত আনয়ন

করেছিলেন—যদিও সে যুগেই তাঁর এই অভিমতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদবাক্য উত্থিত হয়েছিলো।

মধুসূদন-সমালোচনার প্রথম যুগে রাজনারায়ণ বসুই সর্বপ্রথম মধুসূদন-প্রতিভার স্বরূপ নির্ণয়ে বিচক্ষণতার পরিচয় দেন—যদিও কবির শিল্পী-মানসিকতা বিচারে তিনি রক্ষণশীল হিন্দু-সংস্কার অতিক্রম করতে পারেন নি। মধুসূদনের মহাকাব্য রচনা-প্রয়াসকে পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্য বিচারের মানদণ্ডে পরীক্ষা করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নতুন দৃষ্টির পরিচয় দেন। তবে রবীন্দ্রনাথই বোধ হয় মধুসূদনের প্রথম সমালোচক যিনি তাঁর কবিদৃষ্টির আধুনিকতার দিকে বিচারশীল পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

রবীন্দ্রনাথের পর কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন মধুসূদনের অন্তর্জীবন এবং সাহিত্য-প্রতিভা উন্মোচনে যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ থেকে সে বিষয়ে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতির আশ্রয় নিতে হয়েছে। শক্তিমান কবি-সমালোচক মোহিতলালের বিস্তৃত মধুসূদন-গবেষণাকর্ম থেকে একটি মাত্র ক্ষুদ্র অংশ সংকলিত হলো—যা একই সঙ্গে মৌলিক চিন্তায় দ্যুতিমান এবং উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগে হৃদয়স্পর্শী। বিশিষ্ট মধুসূদন-সমালোচক অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর কোন রচনা সংগ্রহে অসমর্থ হওয়ায় মেঘনাদবধ-এর কাব্যসৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁর একটি উজ্জ্বল মন্তব্য সংযোজিত হলো। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-পারঙ্গম ডক্টর সুশীলকুমার দে এ-গ্রন্থে সংকলিত তাঁর প্রবন্ধটিতে মধুসূদনের মহাকাব্য-বিচারে নতুন চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। মনস্বী সমালোচক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মধুসূদন-প্রতিভার স্বরূপ সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে সে মহান প্রতিভার জাগরণে কার্যকারণের কোন সম্পর্ক আবিষ্কারে অসমর্থ হওয়ায় প্রবল বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছেন।

মধুসূদনের Magnum opus মেঘনাদ বধ কাব্য সম্পর্কে তাঁর সমকাল থেকে এ কাল পর্যন্ত পাঠকেরা যে সমান আগ্রহী তার অভ্রান্ত প্রমাণ এ কাব্যের সাহিত্যমূল্য নির্ণয়ে বিভিন্ন সময়ে লেখকদের ক্লান্তিহীন বিচার-বিবেচনা। এই গ্রন্থধৃত প্রবন্ধগুলিতে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এ কাব্যখানির নিপুণ বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন তাঁরা হলেন,—রাজনারায়ণ বসু, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহিতলাল মজুমদার, প্রমথনাথ বিশী, ডঃ সুশীলকুমার দে, ডঃ অশ্রুকুমার সিকদার, ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার প্রভৃতি। এ ছাড়াও এ গ্রন্থে মধুসূদন-প্রতিভা ও শিল্পী-ব্যক্তিত্ব বিষয়ে অপর যে সমস্ত লেখক মূল্যবান আলোচনা করেছেন, তাঁদের আলোচনায়ও মেঘনাদবধ প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে এসে গেছে। বিভিন্ন দিক থেকে আলোচিত এ সমস্ত প্রবন্ধে দেখা যাবে, মেঘনাদবধ সমালোচনা কিভাবে ক্রমশ সূক্ষ্মদর্শী, সূচিমুখ হয়ে উঠেছে।

এই গ্রন্থে সংকলিত তিনটি প্রবন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের

অন্তর্নিহিত শক্তি ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন তিনজন ছন্দোবিদ্—ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন এবং ডঃ নীলরতন সেন। আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যের নিপুণ বিশ্লেষণ ছাড়াও এই নবাবিষ্কৃত ছন্দে মধুসূদনের শিল্পী-মানসের পরিচয়কেও স্পষ্ট করে তুলেছেন।

মধুসূদনের আধুনিকতা বিচারে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধটি মননশীলতাদীপ্ত। ভাষাশিল্পী মধুসূদন সম্পর্কে ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের এবং ডঃ জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়ের মূল্যবান আলোচনার ভেতর সচেতন পাঠক নতুন চিন্তার ইঙ্গিত পাবেন বলে আমার বিশ্বাস।

অধ্যক্ষ মোবাশ্বের আলী তথ্যপূর্ণ আলোচনার সাহায্যে রেনেসাঁস-প্রভাবিত মধুসূদন-প্রতিভার জাগরণের চিত্রটি সামর্থ্যের সঙ্গে তুলে ধরেছেন তাঁর প্রবন্ধে। অপরপক্ষে ডঃ শীতাংশু মৈত্র তাঁর প্রবন্ধে মননশীল যুক্তিতর্কের সাহায্যে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন, যুগচেতনা-উদ্ভূত স্পর্ধিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে নয়, কোন অদৃশ্য মহাশক্তির নিকট আত্মসমর্পণেই মধুসূদনের দুর্লভ কবি-প্রতিভা অনাকাঙ্ক্ষিত কাব্যরস সৃষ্টিতে পরিণতি লাভ করেছিলো।

মধুসূদনের বিস্ময়কর প্রতিভার উন্মেষে শুধুমাত্র পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও জীবন-চিন্তার প্রভাব নয়, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, শাস্ত্র, পুরাণ, এবং লোকপুরাণও যে অনিবার্য প্রভাব বিস্তার করেছিলো ডঃ গার্গী দত্ত এবং ডঃ মানস মজুমদার তাঁদের গবেষণাত্মক প্রবন্ধে তা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন। অধ্যবসায়ী প্রয়াসের সাহায্যে বঙ্গেতর ভারতীয় সাহিত্যে মধুসূদনের প্রভাব সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন ডঃ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। 'প্রমীলার উৎস' সন্ধানে ডঃ বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিশ্রমী গবেষণা মধুসূদন-গবেষকদের সামনে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করবে। মধুসূদনের নীতিধর্মী কবিতার ওপর লা ফঁতেনের প্রভাব আলোচনায় একজন রসজ্ঞ বিচারকের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন ফরাসী ভাষাবিদ্ প্রয়াত ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী। মধুসূদনের লিরিক প্রবণতা আলোচনায় ডঃ গোপীকানাথ রায়চৌধুরী কবির বিচিত্র সৃষ্টিচৈতন্যের অন্তর্লোকে প্রবেশ করেছেন। কবি এবং গবেষক ডঃ শিশিরকুমার দাশ মধুসূদন-ব্যবহৃত একটি মাত্র চিত্রকল্পের সাহায্যে কবিচিত্তের অন্তস্তলশায়ী একটি স্থায়ী অনুভূতিকে পাঠকের মানসলোকে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। সনেটের আঙ্গিক এবং ভাববস্তু বিচারে মধুসূদনের কবি-মানসের ওপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের পরিমাণ নির্ণয়ে শ্রীমতী বাণী রায়ের তথ্যপূর্ণ আলোচনা নতুন চিন্তার পরিচয়বাহী।

মধুসূদনের শিল্পী-ব্যক্তিত্ব বিচারে প্রবীণ সাহিত্যিক নারায়ণ চৌধুরী কিয়ৎ-পরিমাণে নীতিবাদী মনোভাবের পরিচয় দিলেও তাঁর অনুপুঙ্খ এবং বিচক্ষণ বিশ্লেষণ সে অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বকে আলোকিত করেছে। বিশিষ্ট মধুসূদন-গবেষক ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের সংকট পর্যালোচনায় পরম সহানুভূতিশীল এবং সত্যসন্ধানী দৃষ্টির সাহায্যে কবির মর্মলোকের পরিচয়কে স্পষ্ট করে তুলেছেন।

মধুসূদনের অলৌকিক সৃষ্টিচেতনার গোপনলোকে যে একজন সদাজাগ্রত সাহিত্য তাত্ত্বিকের অস্তিত্বও ছিলো, কবির রচনা থেকে আহৃত উদাহরণের সাহায্যে নিঃসংশয়ে তা প্রমাণ করেছেন ডঃ বিমল মুখোপাধ্যায়। স্বচ্ছ সরল আন্তরিকতা এবং সজীবতার উচ্ছল পত্রগুচ্ছে মধুসূদনের প্রাণ-প্রাচুর্যময় ব্যক্তিত্ব এবং সৃষ্টিপ্রতিভার পরিচয় কি পরিমাণে প্রতিফলিত হয়েছে, সরস মন্তব্য এবং সুনিপুণ বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে তা স্পষ্ট করে তুলেছেন অধ্যাপক-সম্পাদক ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষাল।

গ্রন্থের সূচনায় মহাকবি মধুসূদনের উদ্দেশে শ্রীঅরবিন্দ-নিবেদিত ভাবগম্ভীর একটি ইংরেজী কবিতা সংকলিত হলো। প্রবীণ সাহিত্যিক সাংবাদিক শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত-কৃত ঐ কবিতার একটি সক্ষম অনুবাদও একসঙ্গে মুদ্রিত হলো।

গ্রন্থের প্রকাশ-মুহূর্তে এ গ্রন্থের লেখক এবং বিশিষ্ট মধুসূদন-গবেষক ডঃ শীতাংশু মৈত্র-র অকালবিয়োগে বেদনা বোধ করছি। এই গ্রন্থ সম্পাদনায় আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনের উৎসাহ-উদ্দীপনার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। জীবিতাবস্থায় গ্রন্থখানি তাঁকে দেখাতে পারলাম না বলে মর্মান্তিক বেদনাবোধ করছি।

যে-সমস্ত লেখক-লেখিকা এই সংকলন গ্রন্থের জন্য আয়াস স্বীকার করে লিখেছেন কিংবা তাঁদের মুদ্রিত রচনা পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দিয়ে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থের বিদগ্ধ প্রকাশক বন্ধুবর অচ্যুতানন্দ সাহা খুব সম্ভব মধুসূদনের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা বশত বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে এই অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন গ্রন্থ প্রকাশের ঝুঁকি নিয়েছেন। তাঁর এই দুঃসাহসী প্রয়াস মধুসূদন-অনুরাগী মাত্রেরই দ্বারা নিঃসন্দেহে অভিনন্দিত হবে। এই গ্রন্থ সংকলন-কর্মে দীর্ঘ চার বৎসর কাল ব্যাপৃত থাকার সময় আমার কর্মোদ্যমকে সদা-জাগ্রত রেখেছেন বন্ধুবর নারায়ণ চৌধুরী। এই সংকলন কর্মে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ নীলরতন সেন, ডঃ অরুণ বসু, অধ্যক্ষ কল্যাণকুমার দত্ত, বন্ধুবর শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষাল এবং নচিকেতা ভরদ্বাজ-এর মূল্যবান পরামর্শ এবং সহৃদয় সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। প্রেসিডেন্সি কলেজ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের যে-সমস্ত কর্মী প্রয়োজনীয় বই সরবরাহ করে আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। পুঁথিপত্রের শ্রীমান তাপস সাহা এবং শ্রীমান স্বদেশ ঘোষের কর্মতৎপরতায় খুবই অল্প সময়ে এই গ্রন্থপ্রকাশ সম্ভব হলো। এইজন্য তারা ধন্যবাদভাজন। সক্রিয় সহযোগিতার জন্য মিতালি প্রেসের কর্মবৃন্দকেও আন্তরিক ধন্যবাদ। যথেষ্ট প্রয়াস সত্ত্বেও গ্রন্থ মধ্যে কিছু কিছু মুদ্রণ প্রমাদ ঘটায় আন্তরিক দুঃখিত।

দীর্ঘকাল অক্লান্ত পরিশ্রমজাত এই সংকলন গ্রন্থটি উভয় বঙ্গের মধুসূদন-অনুরাগীদের হাতে তুলে দিতে পেরে দায়মুক্ত অনুভব করছি। নমস্কার।

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ।

মধুসূদন : সাহিত্যপ্রতিভা ও শিল্পী-ব্যক্তিত্ব

Madhusudan Dutt—Sri Aurobindo

অনুবাদ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

Madhusudan Dutt

Shri Aurobindo

Poet, who first with skill inspired did teach
Greatness to our divine Bengali speech,—
Divine, but rather with delightful moan
Spring's golden mother makes when twin-alone
She lies with golden Love and heaven's birds
Call hymeneal with enchanting words
Over their passionate faces, rather these
Than with the calm and grandoise melodies
(Such calm as conscienceness of godhead owns)
The high gods speak upon thier ivory thrones
Sitting in Council high,—till taught by thee
Fragrance and noise of the world-shaking sea. •
Thus do they praise thee who amazed espy
The winged epic and hear the arrows cry
And journeyings of alarmed Gods ; and due
The praise since with great verse and numbers new
Thou mad'st her godlike who was only fair.
And yet my heart more perfectly ensnare
Thy soft impassioned flutes and more thy Muse
To wander in the honied months doth choose
Than courts of Kings, with Sita in the grove
Of happy blossoms, (O musical voice of love
Murmuring sweet words with sweeter sobs between !)
With shoorpa in the Vindhyan forests green
Laying her wonderful heart upon the sod
Made holy by the well-loved feet that trod
Its vocal shades ; and more unearthly bright
Thy jewelled songs made of relucent light
Wherein the birds of spring and summer and all flowers

And murmuring waters flow, her widowed hours
Making melodius who divinely loved.
No human hands such notes ambrosial moved ;
These accents are not of the imperfect earth ;
Rather the God was voiceful in their birth,
The God himself of the enchanting flute,
The God himself took up thy pen and wrote.*

* Reprinted from Sri Aurobindo Collected poems, Vol V, Short poems, p 27, Sri Aurobindo Birth Centenary Library, popular edition, 1972, with kind permission of Sri Aurobindo Ashram Trust, Pondicherry, 605002.—Editor.

মধুসূদন দত্ত

শ্রীঅরবিন্দ

তুমিই প্রথম কবি জন্মলব্ধ প্রতিভা সৌরভে
বঙ্গভাষা ভারতীকে জাগিয়েছ অম্লান গৌরবে।
সে গৌরবে বীর্য ছিল, আর ছিল সানন্দ আকৃতি,
যে আকৃতি বুকে নিয়ে স্বর্ণবর্ণা বাসন্তী যুবতী
অনঙ্গের সঙ্গে মাতে রাগরঙ্গে, স্বর্গ বিভবের
মাঙ্গলিক স্পর্শ করে প্রেমদীপ্ত দুটি মুখ, অথবা এদের
চেয়েও শান্ত, প্রাণবন্ত পরিপূর্ণ অপার্থিব সুর,
দ্যুলোক বাঞ্ছিত এক প্রসন্নতা সুন্দর মধুর,
নিত্য যা সংগীত হয় দেবকণ্ঠে, বৈকুণ্ঠের গজদন্তাসনে
সপার্ষদ দেবতারা হৃষ্ট চিত্ত, প্রফুল্ল আননে
যখন বসেন এসে, সেই গানে তুমি এনে দিলে
পৃথিবী দোলানো এক সমুদ্রের ছন্দ, গন্ধ মিলে।
সবিস্ময়ে চেয়ে দেখে বিহ্বল বিভ্রান্ত ত্রিভুবন,
উড়েছে তোমার কাব্য পাখা মেলে, বাণ অগণন
উড়ে চলে, দলে দলে ত্রস্ত দেবতারা যেন ছোটে,
ছন্দে ছন্দে মহানন্দ তোমার সঙ্গীত হয়ে ফোটে।
তোমার সঙ্গীত স্পর্শে, ছিল যে গো কিশোরী সুন্দরী
আজ সে হয়েছে দেবী, মনোলোভা, রাজ-রাজেশ্বরী।
রাগমুগ্ধ এ হৃদয় মুহুর্মুহু বাঁধা পড়ে জালে,
তোমার সুস্নিগ্ধ ঐ কাব্যময়ী মুরলীর তালে,
চলে যায় মধুমাসে পায়ে পায়ে মঞ্জু কুঞ্জবনে,
রাজসভা পিছে ফেলে, যেথা সীতা অশোক কাননে
একা বসে ফুল মাঝে। কি সুরেলা মমতার্দ্র গান,
অস্ফুট মধুর কণ্ঠে, কান্নার মধুরতর তান!
চলে যায় শ্যামশোভা বিন্ধ্যবনে, শূর্পণখা সাথে,
যেখানে দিল সে মেলে নিজ প্রাণ নগ্ন মৃত্তিকাতে,
হল যা পবিত্র শুভ মহানের পাদস্পর্শ পেয়ে,
অরণ্য, পর্বত, নদী, লতাগুল্ম ওঠে গান গেয়ে

যার গীতি গুঞ্জরিত ছায়ালোকে। অপার্থিব দ্যুতি
উদ্ভাসিত ঐ গানে, ঝলমলে দীপ্ত অনুভূতি,
যা হতে বসন্তে গ্রীষ্মে ফোটে ফুল, পাখী গান গায়,
ছোটে জল কলগানে···বিড়ম্বিত বিধবা বেলায়
ভরে দেয় প্রাণ-মন দিব্য প্রেমে পূর্ণ এক স্বর,
যে সুধা নিস্যন্দী বাণী স্বহস্তে রচেনি কোন নর।
এ সঙ্গীত নয় কভু মৃত্যুময় এই পৃথিবীর,
জন্মলগ্নে দেবতারা দিল এতে ধ্বনি সুগম্ভীর।
প্রাণ-কাড়া বাঁশীখানি যে দেবতা নেন নিজ হাতে,
তিনিই লেখনী নিয়ে রূপায়িত তোমার লেখাতে।*

অনুবাদঃ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

* 'ভোবের নক্ষত্র' (বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত)/মাইকেল মধুসূদন দত্তকে নিবেদিত কবিতার সংকলন, আশ্বিন, ১৩৬৯ থেকে অনুবাদক এবং সংকলকের সহৃদয় অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।—সম্পাদক।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য প্রসঙ্গে
পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮১৯-১৮৮৬)

শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত নূতনবিধ পদ্যে এক নূতন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য।

আমরা ইহার অধিকাংশ স্থল অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি। দেখিলাম, গ্রন্থকার আপনার পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থ নূতনবিধ পদ্যে নিবন্ধ এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কঠিন করা হইয়াছে। এই দুই কারণবশতঃ পাঠ মাত্র ভাল লাগে না, কিন্তু কিঞ্চিৎ অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে চিত্ত গ্রন্থকারের প্রশংসার দিকে ধাবিত হয়।

বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর পদ্য নাই। কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য ব্যতিরেকে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভাবিত নহে। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি যে সমস্ত পদ্য আছে, তাহা মিত্রাক্ষর। কোন প্রগাঢ় বিষয়ের আলোচনায় তাহা উপযোগী নহে। দেশের দোষে হউক, অথবা অভ্যাসের দোষে হউক, আমাদিগের দেশের লোকেরা আদিরস-প্রিয়। পয়ারাদি ছন্দ সেই আদিরসাশ্লিষ্ট রচনারই প্রকৃত উপযোগী। এতদ্দ্বারা প্রগাঢ় রচনা হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রগাঢ় রচনা বিষয়ে সংযুক্ত ও প্রযুক্তাচ্চারিত বর্ণাবলী আবশ্যক। কিন্তু পয়ারাদি ছন্দে তাদৃশ বর্ণাবলী বিন্যাস করিলে উহার শোভা এককালে দূরে প্রস্থান করে। কোমল মধুর ও অসংযুক্ত অক্ষর দ্বারা বিরচিত হইলেই উহার শোভা হয়। অতএব প্রগাঢ় রচনায় ভিন্নবিধ পদ্য সৃষ্টি নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচয়িতা তাহার নবাবতার করিলেন। এখন যদি অন্য কোন লোকে তাঁহার প্রদর্শিত পথের পথিক হন অবিলম্বে অমিত্রাক্ষর পদ্যের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিবে, এবং ঐ পদ্যে নিঃসন্দেহে নানাবিধছন্দ আবির্ভাবিত হইবে। এখন প্রগাঢ় রচনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর লোকের মন সুখময় আদিরস সাগরে মগ্ন হইতে তাদৃশ উৎসুক নহে। এখন দিন দিন যেমন লোকের মন উন্নত হইতেছে, তেমনি উন্নত পদ্যসৃষ্টিও আবশ্যক হইয়াছে। অতএব মাইকেল মধুসূদন দত্তের চেষ্টা যথোচিত সময়েই হইয়াছে সন্দেহ নাই।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের অনেক স্থলই উন্নত হইয়াছে, গ্রন্থকারও উহাকে উন্নত করার নিমিত্ত সমুচিত যত্ন পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যত্ন সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই। আমাদিগের দেশের গ্রন্থকারেরা সচরাচর যে দোষে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, তিনি সম্যকরূপে তাহার হস্ত পরিহার করিতে পারেন নাই। ফলতঃ তিনি যেরূপ নূতনবিধ উন্নত পদ্যের সৃষ্টিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তদনুরূপ বিষয়টি মনোনীত করিতে সমর্থ হন নাই।*

---

* সোমপ্রকাশ, ২৩ শ্রাবণ, ১২৬৭ (১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ) পৃঃ ৪৪৮-৪৯ থেকে পুনর্মুদ্রিত। —সম্পাদক।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১)

···সাহিত্যকারেরা রসাত্মক বাক্যকেই* কাব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন ; সেই রসের বিশেষ উদ্দীপনার্থে কবিরা তাঁহাদের রসাত্মক বাক্য সকল নানাবিধ মিতাক্ষরে অর্থাৎ ছন্দে নিবন্ধিত করিয়া থাকেন, এবং ছন্দের লক্ষণ এই যে, রচনাকে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পদ বা চরণে বিভক্ত করিয়া ঐ চরণে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রা বা বর্ণ বা যতি বা বিরাম রাখিতে হয়। দেশ, ভাষা ও পাঠকদিগের রুচিভেদে ঐ ছন্দের বিবিধ রূপান্তর হইয়া থাকে। সংস্কৃতে ঐ রূপান্তর করণার্থে বর্ণ, মাত্রা ও যতির পরিবর্তন করা হয় ; সুতরাং বর্ণ, যতি ও মাত্রাই ছন্দের আত্মা, তদভাবে ছন্দ হয় না। ছন্দের অলংকার-স্বরূপে কোন কোন ছন্দের এক চরণের শেষ অক্ষরের সহিত অপর চরণের শেষ অক্ষরের অনুপ্রাস করা হয়, কিন্তু তাহা ছন্দের অঙ্গ নহে। এই বাক্যের প্রমাণার্থে আমরা সমস্ত সংস্কৃত কাব্যের উদ্দেশ করিতে পারি। ঐ সকল কাব্য ছন্দে রচিত, অথচ তাহাতে অন্ত্যানুপ্রাস প্রায়ই নাই। কবিকুল পিতামহ বাল্মীকি স্বীয় রামায়ণে ঐ অনুপ্রাসের প্রয়োগ একবার মাত্রও করেন নাই। বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারতেও তাহার অনুসরণ করিতে বিরত হন। কালিদাস, ভবভূতি শ্রীহর্ষাদি নব্য কবিরাও তাহার অনুরাগী নহেন। এই সকল দৃষ্টান্তে স্পষ্টই অনুভূত হইবে যে, অন্ত্যানুপ্রাস কবিতার সামান্য অলংকার মাত্র, তাহা কোন মতে অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে। ইহা স্বীকর্ত্তব্য বটে যে, বঙ্গ ভাষায় অদ্যাপি যে সকল কবিতা প্রকটিত হইয়াছে, তৎ-সমুদয়ই অন্ত্যানুপ্রাস-বিশিষ্ট ; কিন্তু তাহাতে অন্ত্যানুপ্রাসের অবশ্য প্রয়োজনীয়তার সাব্যস্ত হইতে পারে না ; যেহেতু বাঙ্গালীর ছন্দোমালা পরিপূর্ণ নহে , তাহার সম্পূরণার্থে সর্ব্বদা নূতন ছন্দঃ প্রস্তুত করা ও সংস্কৃত ছন্দঃ সকল গ্রহণ করা হইতেছে, অতএব দত্তবাবু বাঙ্গালী কাব্যের পদ হইতে মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগড় ভগ্ন করায় বোধ হয় সহৃদয় ব্যক্তিরা অসন্তুষ্ট হইবেন না। কেহ ইহা প্রশ্ন করিতে পারেন যে, অন্ত্যানুপ্রাস অলংকার মাত্র, কবির স্বেচ্ছায় তাহার ত্যাগ হইতে পারে, পরন্তু সে ত্যাগ করিবার কারণ কি ? অপর, অন্ত্যানুপ্রাস সুখশ্রাব্য, তাহাতে সত্বরে অর্থের বিকাশ হয়, অধিক দূর অবধি বাক্যের আসক্তির নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে হয় না। যাহারা গদ্য রচনা অত্যল্প মাত্র বুঝিতে পারে তাহাদিগের পক্ষে অনুপ্রাসের

* বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং। সাহিত্যে দর্পণ। ১ প্র, ৩ সূত্র।

সাহায্যে পয়ারাদি ছন্দোগত ভাব অনায়াসে বোধগম্য হয়, তাহার পরিত্যাগের প্রয়োজন কি ? এই প্রশ্ন সকল আশু উৎকট বোধ হইতে পারে ; পরন্তু তাহার উত্তর নিতান্ত অসাধ্য নহে। কবির স্বেচ্ছানুসারে অন্ত্যানুপ্রাসের পরিত্যাগ হইতে পারে। এই স্বীকারে প্রথম প্রশ্নের সদুত্তর অনায়াসে উপলব্ধ হইবেক। অপর অনেক সহৃদয় ব্যক্তিরা দীর্ঘ-কাব্য পাঠে প্রতি চতুর্দ্দশ অক্ষরের পর অনুপ্রাসকে শ্রবণ-সুখকর না বলিয়া নিরত স্বর-সমানতা-প্রযুক্ত অপ্রিয় জ্ঞান করেন, কোন কোন বাঙ্গালী কবি ঐ স্বর-সাম্যত্বের নিবারণার্থে এক বাক্যে নানা ছন্দ ব্যবহার করেন, তদন্যথায় সংস্কৃত, ইংরাজী, লাটিন ও গ্রীক মহাকবিদিগের অনুকরণে অনুপ্রাসের ত্যাগ শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে। অধিকন্তু, পয়ার ছন্দে প্রতি চতুর্দ্দশ অক্ষরের শেষে অর্থের সমাপ্তি করিতে হয়। তাহার অনুরোধে মনোগত ভাবের সংকোচ হইয়া উঠে, কল্পনাশক্তি শব্দাভাবে বহুদূর ব্যাপন করিতে পারেন না, উজ্জ্বল ভাব খর্ব্ব হয়, কাব্যের গৌরব লাঘব হয়, এবং ওজোগুণের হানি হয়। অনুপ্রাসের প্রতিবন্ধক না থাকিলে এক বাক্যকে যতদূর ইচ্ছা দীর্ঘ করিতে পারেন ; যেই স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানে বাক্য শেষ করিতে পারেন ; ও যে পরিমিত শব্দে আপনার ভাব সুপরিব্যক্ত হয়, তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন , কদাপি পাদ পূরণের নিমিত্ত বৃথা শব্দের প্রয়োগ বা প্রয়োজনীয় শব্দের পরিত্যাগ করিতে প্রণোদিত হয়েন না। ফলত দত্তজ যথার্থ লিখিয়াছেন যে, মিত্রাক্ষর কবিতার নিগড়। তাহার পরিত্যাগে কবিতা কামাবচর হইতে পারেন।

অপর, ঐ নিগড় সত্ত্বে কবিতার ওজোগুণের সংবৃদ্ধি হইতে পারে না। ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, বাঙ্গালী কবির মধ্যে ভারতচন্দ্র যেমত কবিতার লালিত্য অনুভব করিতে পারিতেন, এমত আর কোন কবিই পারেন নাই। তিনি শব্দের গৌরব ও অর্থের গৌরব অতি চমৎকৃত রূপে সমাহিত করিয়া রাগ-দ্বেষাদি প্রকাশ-করণ-সময়ে তদুপযুক্ত গম্ভীর, কর্কশ, ভয়ানক শব্দ ও কোমল ভাবের জ্ঞাপনার্থে সুমধুর, কোমল, মৃদু শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অতি অল্প বাঙ্গালী কবি এই বিষয়ে তাঁহার সহিত তুলনীয় হইতে পারেন। শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা-সময়ে বিবরণের মধ্যে শব্দার্থের সমন্বয় বিষয়ক একটি অপরূপ উদাহরণ আছে ; তাহার পাঠে আমাদের অভিপ্রেত অনায়াসে পাঠকদিগের বোধগম্য হইবে। ঐ বর্ণনায় সতীর দেহত্যাগ-সংবাদে মহাদেব ভয়ঙ্কর কোপে ভুত-প্রেত-পরিচারক সমভিব্যাহারে দক্ষালয়ে আগমন করিয়া কি করিতেছেন তদ্বিষয়ে লিখিত আছে।—

> "অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
> অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে॥"

এই ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে ভয়ানক কোপজ্ঞাপক অর্থের সহিত শব্দের সাম্যত্ব সকলেই স্বীকার করিবেন , কিন্তু পয়ার কি অন্য কোন বাঙালী ছন্দে তাহার সমাধা হয় না ; ভারত-সদৃশ কবিও তাহার চেষ্টা করিয়া পরাস্ত হইয়াছেন। দেখুন, বিদ্যা কোপান্বিতা তিরস্কার-করণ সময়ে ছন্দের অনুরোধে—

'শুনে লো মালিনী কি তোর রীতি।
কিঞ্চিৎ হৃদয়ে না হয় ভীতি ॥
এত বেলা হৈল পূজা না করি।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি ॥'

ইত্যাদি শব্দে কি প্রকার শব্দ ও ভাবের বিরোধ করিয়াছেন। বিদ্যা "মায়ের আগে" ক্রন্দন করিয়া মালিনীর নামে অভিযোগ করণ সময়ে এরূপ কহিলে হানি ছিল না; তিরস্কারের নিমিত্ত ইহা নিতান্ত অপ্রযোগ্য—মধুরভাষিণী কামিনীর উক্তি বলিলেও ইহার দোষ খণ্ডিত হয় না। পরন্তু ইহা যে কেবল ছন্দ ও অনুপ্রাসের অনুরোধে ঘটিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ভারতচন্দ্র যদ্যপি অন্ত্যানুপ্রাস ত্যাগ করিয়া এই কবিতা লিখিতেন তাহা হইলে এ দোষ কদাপি হইত না। এই অনুরোধেও অমিত্রাক্ষর কবিতার উপযোগিতা উপলব্ধ হইতেছে, এবং দত্তজ বাঙালীতে তাহার প্রচার করাতে এতদ্দেশীয় সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন বলিয়া মানিতে হইবে।

ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য যে, অন্ত্য যমক থাকিলে কবিতা যেরূপ অনায়াসে বোধগম্য হয়, অন্ত্য যমক বিরহে সেরূপ সুখবোধ্য হইতে পারে না। সুতরাং অন্ত্যানুপ্রাস-বিশিষ্ট কবিতা যেরূপ অনভিজ্ঞ পাঠকের নিকট সমাদৃত হয়, অন্ত্যানুপ্রাসবিহীন কাব্য তাদৃশ হইবেক না। পরন্তু, ইহা স্মর্ত্তব্য যে, সকল কবিতাই অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিমিত্ত প্রস্তুত হয় না; এবং ধীমান ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত তদ্যোগ্য কবিতা প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। বালকের দুগ্ধফেন ভীমের উপযুক্ত খাদ্য নহে। বোধ হয় এতদ্দেশীয় পণ্ডিত মহাশয়েরা বাঙ্গালী কবিতার নাম শুনিলেই "ভাষা" বলিয়া পরিত্যাগ করেন, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাঁহারা কালিদাস, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির কবিতা পাঠ করণান্তর অর্থের গৌরবহীন পয়ার নিতান্ত ইতরবৃত্তি মনে করেন।

কথিত হইয়াছে যে, অন্ত্যানুপ্রাস ত্যাগ করিলে কবি যে স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানে বাক্যের সমাপ্তি করিতে পারেন, ইহাতে আশুবোধ হইতে পারে, এবং কোন কোন সম্পাদকের বোধ হইয়াছে যে, অমিত্রাক্ষর কবিতার যতির ভেদ নাই; কিন্তু তাহা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। কাব্যের প্রধান অঙ্গ অক্ষর বা মাত্রা, বৃত্তি ও যতি; আমরা তাহা অবশ্য-প্রয়োজনীয় বোধ করি; এবং আমাদের আধুনিক কবি দত্তজও তাহার বিরুদ্ধ মতাবলম্বী নহেন। পরন্তু, যতির অনুরোধে যে অন্যত্র বাক্যশেষে যতিভঙ্গ হয়, ইহা আমরা বোধ করি না। নিয়মিত স্থানে যতি রাখিয়া, পরে তথায় বা অন্যত্র পদের শেষ হইবার পূর্ব্বেই বাক্য শেষ করিলে যতিভঙ্গ হয় না, ইহাই আমাদিগের বক্তব্য। তাহার উদাহরণার্থে আমরা এক চরণান্তর্গত প্রশ্নোত্তর-বিশিষ্ট কবিতার উদ্দেশ করিতে পারি, তাহাতে আমাদিগের বাক্য সপ্রমাণ হইবে। তদ্ভিন্ন সামান্য কবিতায়ও তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। দেখুন, কুমারসম্ভবের ৪র্থ সর্গের ৫ম শ্লোক, যথা,—

"উপমানম ভূদ্বিলাসিনাং
করণং যত্তব কান্তিমত্তয়া।
তদিদং গতমীদৃশীং দশাং
ন বিদীর্যে—কঠিনা খলু স্ত্রিয়ঃ॥"

এখানে চতুর্থ পাদের "ন বিদীর্যে" পদের পরই অর্থের শেষ হইয়াছে। 'কঠিনা খলু স্ত্রিয়ঃ' বাক্যের সহিত পূর্ব্ব বাক্যের বৈয়াকরণীয় কোন আসক্তি নাই, অথচ ঐ স্থান ছন্দের যতিস্থান নহে। রঘুবংশে যথা,—

"সোহনুমাজন্ম শুদ্ধানামা ফলোদয়কর্ম্মণাম,
আসমুদ্র ক্ষিতীশাশমানা কয়থবর্ত্মনাম্,
যথাবিধি হুতাগ্নীনাং যথাকামার্চ্চিতার্থিনাম,
যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকাল প্রবোধিনাম্,
ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্,
যশসে বিজিগীষূনাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্,
শৈশবেহভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্,
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তিনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্,
রঘূণামন্বয়ং বক্ষ্যে।" প্রথম সর্গ, ৫-১০ শ্লোক।

এই বাক্যেও ইহার দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইবে। ইহাতে "বক্ষ্যে" পদেই অর্থের শেষ হইয়াছে, শ্লোকপাদের শেষ কথায় অন্য প্রসঙ্গ; তাহার সহিত পূর্ব্ব কথার সমন্বয় নাই। রঘুবংশের অন্যত্র—

"সমনেব সমাক্রান্তং দ্বয়ং দ্বিরদগামিনা।
তেন—সিংহাসনং পিত্র্যমখিলং চারিমণ্ডলং॥—চতুর্থ সর্গ, ৪ শ্লোক।

এই শ্লোকেও "তেন" পদে অর্থের শেষ হইয়াছে, অথচ সেই স্থান যতির নহে। কীরাতার্জ্জুনীয়ে যথা,—

"কৃতপ্রণামস্য মহীং মহীভুজে
জিতাং সপত্নেন নিবেদয়িষ্যতঃ।
ন বিব্যথে তস্য মনঃ—নহি প্রিয়ং,
প্রবক্তুমিচ্ছন্তি মৃষা হিতৈষিণঃ॥"

এই শ্লোকের তৃতীয় পাদের "মনঃ" পদে অর্থের শেষ হইয়াছে। তৎপরের "নহি প্রিয়ং" ইত্যাদি বাক্যের সহিত তাহার কোন সমন্বয় নাই। এতাদৃশ অপর দৃষ্টান্ত অনেক সংগ্রহ করা যাইতে পারে; পরন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। প্রদত্ত উদাহরণেই পাঠকবৃন্দ নিশ্চিন্ত হইবেন যে, পদমধ্যে অর্থের শেষ করায় হানি হয় না, এবং তিলোত্তমায় যে পদের প্রারম্ভ বা মধ্যে যে সকল বিরাম আছে, তাহা কোন মতে প্রকৃত যতির হানিকর নহে। দত্তজ লেখেন—

"এ হেন নির্জ্জন স্থানে দেব পুরন্দর,
কেন গো বসিয়া আজি কহ পদ্মাসনা,
বীণাপাণি! কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে,
নমিয়া জিজ্ঞাসে তোমা, কহ দয়াময়ি!"

এই পদচতুষ্টয়ের তৃতীয় পাদের 'বীণাপাণি' পদে অর্থ শেষ হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে যতির ভঙ্গ হয় নাই; যেহেতু তিলোত্তমার ছন্দঃ অমিত্রাক্ষর পয়ার, তাহার লক্ষণ চতুর্দ্দশাক্ষর বৃত্তি, অষ্টমাক্ষরে যতি, এবং এই লক্ষণ রক্ষা পাইলেই ছন্দের রক্ষা মানিতে হইবে। সেই লক্ষণানুসারে "স্থানে" "আজি" "দেবি" ও "তোমা" পদের পর যতি আছে; সেই যতিতেই ছন্দের অনুরোধ রক্ষা পায়। বীণাপাণি শব্দের পর পৃথক যতি থাকায় তাহার হানি হয় না। যদ্যপি এই নিয়মের অন্যথায় অষ্টমাক্ষরের পর যতি না থাকে তাহা হইলে কাব্যকর্ত্তাকে যতি-ভঙ্গদোষ স্বীকার করিতে হইবে। এক পদে চতুর্দ্দশাক্ষরের অধিক বা অল্প থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে ছন্দোভঙ্গ অঙ্গীকার করিতে হয়।

প্রস্তাবিত ছন্দের পাঠ করিবার নিয়ম স্বতন্ত্র। সামান্য পয়ারের ন্যায় ইহা পাঠ করিলে অর্থেরও অনুভব হইবে না, এবং কাব্যও পদ্য বলিয়া বোধ হইবেক না। যাঁহারা ইংরেজী ভাষা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা যে প্রকারে মিল্টন কবি-কৃত "প্যারাডাইস লস্ট্" নামক কাব্য পাঠ করেন তদ্রূপে ইহার পাঠ করলে সিদ্ধকাম হইবেন। অন্যের প্রতি বক্তব্য যে, তাঁহারা পয়ারের অষ্টম ও চতুর্দ্দশাক্ষরের যতি রাখিয়া, বাক্যার্থের শেষ হইলে পৃথক যতি রাখিলেই তিলোত্তমা-পাঠে সুখী হইতে পারিবেন। ফলত, যে প্রকারে বিরাম চিহ্নানুসারে গদ্য পাঠ করা যায়, সেই প্রকার অমিত্রাক্ষর পয়ার পাঠ করিতে হয়; কেবল ইহার বিরাম চিহ্ন ব্যতীত ছন্দের দুই যতি আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

তিলোত্তমার ছন্দ ও যতি বিষয়ে এতাবন্মাত্র লিখিয়া তাহার রচনাকৌশল ও কবিত্ব সম্পর্কে আমাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য।......এই স্থলে এই মাত্র বলিলে হয় যে, দত্তজ-র কবিত্ব-শক্তি সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যে প্রশংসাবাদ করিয়াছিলাম, তাহা সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হইয়াছে। তিলোত্তমার যে কোন স্থানে নয়ন নিক্ষেপ করা যায়, তাহাতেই প্রকৃত কবির লক্ষণ বিলক্ষণ প্রতীত হয়। সর্ব্বত্রই সুচারু রসাত্মক ভাব অতি প্রোজ্জ্বল বাক্যে বিভূষিত হইয়াছে। ঐ ভাব সকল দত্তজ ভুবনবিখ্যাত কালিদাস, ভবভূতি, হোমর্, মিল্টন প্রভৃতি কবিকুলকেশরীদের রচনা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন; কিন্তু বঙ্গভাষায় তাহার বিভাষণে দত্তজ কেবল অনুবাদ করিয়া নিরস্ত হয়েন নাই; তাহার মন হইতে অন্যের যে কোন ভাব নিসৃত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার স্বাভাবিক কল্পনাবৃত্তির কৌশলে নূতন অবয়ব ধারণ করিয়াছে; কিছুই প্রাচীন বলিয়া অনাদরণীয় বোধ হয় না; প্রত্যুত, সকলই হৃদ্য, দীপ্তিময় ও প্রীতিকর অনুভূত হয়।

লালিত্য বিষয়ে বোধ হয়, তিলোত্তমা অতিপ্রসিদ্ধ হইবেক না। তথাপি পৌলোমীর খেদ-উক্তির সহিত তুলনা করিলে অতি অল্প বাঙ্গালী কাব্য পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারে। দত্তজ পৌরাণিক ভূগোল ও খগোল পরিত্যাগ করিয়া, বিশ্বকর্ম্মাকে ভূমণ্ডলের প্রান্তভাগে প্রেরণ করায় কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, এবং পৌলোমীর সহচরীর মধ্যে ষষ্ঠী, মনসা, সুবচনীর উল্লেখ সহৃদয়ের কার্য্য হয় নাই। অপর অনেক স্থানে তুলনা ও বিশেষণ, তথা স্বয়ম্বর্শ্যা তিলোত্তমাকে "সতী" বলিয়া বর্ণনা দূষিত মানিতে হয়। পরন্তু, ঐ সকল আপত্তি সত্ত্বেও আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে, বর্ত্তমান কাব্য বঙ্গভাষার প্রধান কাব্যমধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই, এবং সহৃদয় কাব্যানুরাগীরা ইহার পাঠে অবশ্যই বিশেষ সন্তুপ্ত হইবেন।*......

* ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র-র এই প্রবন্ধটি 'বিবিধার্থ' সংগ্রহ' শকাব্দ ১৭৮২, অগ্রহায়ণ, (১৮৬০ খ্রীঃ) ৬ষ্ঠ পর্ব, ৬৮ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁর "মধুস্মৃতি" গ্রন্থের ১৪৪ থেকে ১৪৭ পৃষ্ঠায় প্রবন্ধটির পুনর্মুদ্রণ করেন। এই উভয় উৎস থেকে প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হলো—সম্পাদক।

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর সমালোচনা

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

যে সকল ব্যক্তি "ওলো লো মালিনী"র রুনুঝুনু শব্দঝংকারে মুগ্ধ হন ও অনুপ্রাসই কবিতার সার বলিয়া কৃতনিশ্চয় আছেন, তাঁহাদের নিকট এই নূতন গ্রন্থখানি কোন মতে সমাদৃত হইবে না। পরন্তু যাঁহারা উৎকৃষ্ট প্রসঙ্গ, অলৌকিক কল্পনাশক্তি, চমৎকার লক্ষণা, প্রাঞ্জল রচনা ও প্রকৃষ্ট ওজোগুণ বিশিষ্ট বাক্যে মনের আনন্দ সাধন করিতে পারেন, যাঁহারা জ্ঞাত আছেন যে কবিতার মূলই সম্ভাব, এবং তদভাবে সহস্র অনুপ্রাসও চিত্তের প্রকৃত অনুমোদন করিতে পারে না, যাঁহারা রচনার অলংকারকে অলংকার বলিয়া জানেন, তাহাই প্রধান পদার্থ মনে করেন না, তাঁহাদিগের নিকট দত্তজার এই গ্রন্থ অবশ্যই উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হইবে।······শ্রীযুক্ত দত্তজ ইউরোপীয় নানা ভাষায় প্রবীণ। ইংরাজী, লাটিন ও গ্রীক ভাষায় তেঁই পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তদ্ভিন্ন ফরাসী, ইতালীয় ও জর্ম্মন ভাষা প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ।··· ইউরোপীয় ব্যবহার শাস্ত্রের প্রকৃষ্টরূপে অধ্যয়নার্থে কয়েক বৎসরাবধি স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিভিন্ন বর্ষে দিনপাত করিতেছেন, তত্রাপি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি মাতৃভাষা বিস্মৃত হন নাই। বস্তুত ফ্রান্স দেশের বার্সেলস্ নগরে মাতৃভাষাতেই আপন গূঢ় ভাবসকল সংকীর্ত্তিত করিতেছেন, এবং বর্ত্তমান গ্রন্থে তাঁহারই কএকটি গীত সমাহৃত হইয়াছে। মাতৃভাষার বলবত্তা বিষয়ে এতদপেক্ষায় প্রবল দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া ভার। পরন্তু ইহাও স্মর্ত্তব্য যে, দত্তজ বাল্যকালে বাঙ্গালী ভাষা শিক্ষায় তাদৃশ বিশেষ অনুধাবন করেন নাই, ও কার্য্যরোধে যৌবনের মুখ্যাংশ ইংরাজীর অনুশীলনে বিনিয়োগ করেন, তথা প্রবাসে বাস, তথাকার প্রচলিত ভাষা বাঙ্গালী নহে, ও গৃহমধ্যে ইংরাজী সহধর্ম্মিণী থাকায় পুত্র কলত্রের সহিতও বাঙ্গালী ভাষায় কথোপকথন করিতে হয় না, তথাপি বাঙ্গালী কবিতা রচনে তাঁহার যে প্রকার ক্ষমতা তাদৃশ আর কাহারও দৃষ্ট হয় নাই; এ ঘটনা প্রকৃত আধিদৈবিক শক্তি না থাকিলে কদাপি সম্ভবে না। ফলে অধুনা বাঙ্গালী কবির মধ্যে দত্তজ শ্রেষ্ঠ এ কথা বলিলে, বোধ হয়, কেহই আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন না। যাঁহারা দত্তজার মেঘনাদবধ, তিলোত্তমা-সম্ভব, শর্ম্মিষ্ঠা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, ও তদ্গ্রন্থের রসানুভব করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট এ প্রশ্নের প্রমাণ প্রয়োগ করিবার আবশ্যক রাখে না। অন্যের নিমিত্ত আমরা প্রস্তাবিত কবিতাবলীর উল্লেখ করিলাম, তৎপাঠে অনেকে আমাদিগের সহিত একমত হইবেন সন্দেহ নাই।*

* রহস্য সন্দর্ভ, ৩য় পর্ব্ব, ৩৪ খণ্ড (পৃঃ ১৩০) থেকে পুনর্মুদ্রিত।—সম্পাদক।

মেঘনাদবধ সমালোচনা

রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯)

প্রথম ঃ

আরবদিগের মধ্যে এইরূপ প্রথা আছে যে, তাহাদিগের দেশে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর ঘোটক বা উষ্ট্র জন্মিলে অথবা তাহাদিগের বংশে একজন উৎকৃষ্ট কবির উদয় হইলে, তাহারা আনন্দোৎসব করিয়া থাকে। একজন কবিকে ঘোটক বা উষ্ট্রের ন্যায় পশু বলিয়া গণ্য করা আমাদের অভিপ্রায় নহে, কিন্তু আমাদের স্বদেশে একটি মহাকবির উদয় জাতি-সাধারণের আনন্দের কারণ বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই শ্রেণীর কবি। তিনি একখানি খণ্ডকাব্যে যে জন্মভূমিকে 'শ্যামা জন্মদে' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, সেই বঙ্গভূমি তাহাকে প্রসব করিয়া প্রকৃত গৌরবাস্পদই হইয়াছেন। বর্ণনার ছটা, ভাবের মাধুরী, করুণ রসের গাঢ়তা, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার নির্বাচন-শক্তি ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য অনুধাবন করিলে তাঁহার 'মেঘনাদবধ' বাঙ্গালা ভাষায় অদ্বিতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। মিল্টন ও বাল্মীকিতে এবং তাঁহাতে যদিও অনেক অন্তর, কিন্তু তিনি এই মহাকবিদিগের দৃষ্টান্তানুসরণে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিতে হইবে। তাঁহার কাব্যে ইউরোপ ও আসিয়ার মহাকবিদিগের অনুকরণের প্রাচুর্য্য দেখা যায় সত্য বটে, কিন্তু তিনি যাহা অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা নূতন বেশে সুশোভিত করিয়াছেন। এই প্রকার অনুকরণ দূষণীয় মনে হইলে মিল্টনের ন্যায় কবিও নিন্দার্হ হয়েন। দত্তজ মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছেন, কেবল ইহার দ্বারাই তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই কাব্যের প্রধান গৌরব এই যে, ইহার হিন্দু-আকার প্রায় সকল স্থানে রক্ষিত হইয়াছে, অথচ সকল স্থানে ইউরোপীয় বিশুদ্ধ রুচি প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুত এই কাব্যটি এশিয়া রূপ জনিতা ও ইউরোপ রূপ জনয়িত্রীর সন্তান স্বরূপ। বঙ্গভাষায় এই কাব্যের দোষ গুণ সমালোচনা বঙ্গভাষার একটি প্রধান অভাব। পশ্চাদ্বর্ত্তী কয়েক পংক্তি দ্বারা এই অভাব পূরণার্থ যথাকিঞ্চিৎ চেষ্টা করা যাইতেছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের আরম্ভ সৌন্দর্য্যসম্পূর্ণ। কবি স্বদেশীয়দিগকে যে অমৃত পরিবেশন করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন* ইহা হইতে তাহার পূর্ব্বস্বাদপ্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরে রাবণের সভা বর্ণনা অতি সুশোভন। বীরবাহু শোকে রাবণের বিলাপ

* গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

অকৃত্রিম করুণ-রসার্দ্র এবং সরল উৎপ্রেক্ষায় পরিপূর্ণ। মকরাক্ষ, বীরবাহু ও রামের যে যুদ্ধ বর্ণন করিয়াছেন তাহা বস্তুত বীররসাত্মক এবং তাহা পাঠ করিয়া আমরা কবির স্ব-বাক্যে তাহাকে সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না—'ধন্য শিক্ষা তব কবিবর!' আর্য্য ও সেমিটিক* ভাবগর্ভ পশ্চাল্লিখিত বর্ণনাটি কেমন গম্ভীর ঃ

"—নাদিল কম্বু অম্বুরাশি রবে!—"

অনুপ্রাস গুণে এই পংক্তিটির সৌন্দর্য্য অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা যথোপযুক্ত ভয়ংকর হইয়াছে এবং অনল্প কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া রাবণ যে শ্লেষোক্তি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা যথেষ্ট প্রশংসার্হ।

ক্ষোভে, রোষে দৌবারিক নিষ্কোষিলা অসি
ভীমরূপী—

কেমন স্বভাব-সঙ্গত চরিত্র! কবি যে করুণ রসে বিশেষ সুনিপুণ, রাবণের প্রতি চিত্রাঙ্গদার উক্তি তাহার আর এক উদাহরণ—

বরজে শজারু পশি বারুইর যথা—

ইত্যাদি উপমাটি পাইলে হোমরও সৌভাগ্য জ্ঞান করিতেন। রাক্ষসগণের রণসজ্জার বর্ণনা দেখিলে কবির প্রগাঢ় বীররসবর্ণনাশক্তি বিলক্ষণ অনুভূত হয়। বারুণীর মুক্তালংকৃত কেশপাশ হোমরকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দেয়। মেঘনাদের প্রমোদ উদ্যানের বর্ণনা ঃ

"—কুহরিছে ডালে
.........ঝরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর!"—

কয়েকটি অনুপম চিত্রচ্ছটায় রঞ্জিত হইয়া কি সুন্দর হইয়াছে ঃ

"—নয়নে তব, হে রাক্ষসপুরি,
অশ্রুবিন্দু, মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি," ইত্যাদি—

এই হিব্রু চিত্রপূর্ণ রাক্ষস বন্দীদের গান যে কতদূর প্রশংসনীয় বলিতে পারি না।

"বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল রাক্ষস ;—
পূরিল কণকলংকা জয় জয় রবে।"

এই দুই পংক্তি অত্যুৎকৃষ্ট রচনাশক্তির একটি উদাহরণ। শব্দবিন্যাসের যদি কিঞ্চিন্মাত্র অন্যথা হয়, ইহার সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রথম সর্গ এইরূপ প্রভূত অলংকাররাজিতে সুসজ্জিত।

দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে সন্ধ্যা বর্ণনাটি যারপরনাই মনোহর। অমরবৃন্দের আমোদ-প্রমোদ ইহা অপেক্ষা ন্যূনতর নহে। ইহা পাঠকালে হোমরকে স্মরণ হয়। শিব দুর্গা কামদেব ও রতির উপন্যাসে হোমরপম সৌন্দর্য্য লক্ষিত হয়। কামদেব ও

---

* আর্য্য = হিন্দু। সেমিটিক = ইহুদীয়।

রতি হোমরের গ্রন্থার ও আফ্রোডিটীর অনুরূপ। শিব ও দুর্গার চতুর্দ্দিকস্থ স্বর্ণ-রঞ্জিত মেঘ এবং পুষ্পমাল্য পাঠে হোমরের পশ্চাল্লিখিত বর্ণনাটি স্মৃতিপথারূঢ় হয়।

"হেন ভাবি যোভ, দুই বাহু পশারিয়া
আলিঙ্গিলেন ধর্ম্মপত্নী,—স্বর্দেবমাতা।
যুগল মূরতি উর্দ্ধে নিম্নে বসুন্ধরা,
প্রসবে নবীন শষ্প নয়ন-রঞ্জন,
শিশির মুক্তাফলে সজ্জিত কমল,
প্রফুল্ল রজনীগন্ধা, জাফরান দল ;
কোমল কুসুমগুচ্ছ হয়ে শয্যাধান,
কঠিন পৃথিবী হতে ব্যবধিল দোঁহে,
বিরমে দম্পতি তথা, সুবর্ণমণ্ডিত
সাজিলা জলদ এক, জ্যোতির্ময় প্রভা,
দরদর ঝরে তাহে শিশিরের ধারা।" হোমর, ১২শ সর্গ,
৩৪৬-৫৭ পং

কামদেব দগ্ধ শরীরে শিবের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলে রতি তাঁহার প্রতি যে কথা বলেন তাহা দাম্পত্য প্রণয় পূর্ণ। এই সর্গে ঝটিকা বর্ণনা যারপরনাই প্রশংসনীয়। বায়ু কর্ত্তৃক গুহা হইতে ঝঞ্ঝা সকলের উম্মোচন পাঠে ভর্জ্জিলের ইওনসের কথা মনে হয়।

তৃতীয় সর্গে প্রমীলার উদারচিত্ততা দেখিলে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহার যুদ্ধসজ্জা ও যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা চমৎকার।

চতুর্থ সর্গে প্রথমেই বাল্মীকির প্রতি সম্বোধন যথার্থই অতি মনোহর—

"—রাজেন্দ্র সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূরে তীর্থ দরশনে।"

এবং বাল্মীকির 'রত্নাকর' নামোল্লেখও মনোহর হইয়াছে। এই সর্গে সীতার শোচনীয় দুরবস্থা যেরূপ করুণ রসের সহিত চিত্রিত সেইরূপ ভাবের সৌন্দর্য্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। তাহার উপযুক্ত রূপ প্রশংসা কি প্রকারে করিব ভাবিয়া পাই না। ইহা যতবার পাঠ করিয়াছি অশ্রুপাত সম্বরণ করিতে পারি নাই। করুণ ও শোক-রস রচনাশক্তি আমাদিগের কবির বিশেষ গুণ। এতদ্ভিন্ন তিনি তাঁহার কাব্যের অনেক স্থলে বীররসের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেও বঙ্গীয় সকল কবি অপেক্ষা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। যে কুঞ্চিকার দ্বারা সহানুভূতির অশ্রুদ্বার উম্মুক্ত করা যায়, প্রকৃতিদেবী তাহা ভারতীয় অনেক কবি অপেক্ষা তাঁহাকে বিশেষরূপে দান করিয়াছেন। পঞ্চবটী বনে স্বামীর সহিত সীতার সুখভোগ বর্ণনায় যেরূপ বন্য সরলতা এবং আনন্দকর বিজনবাস বিবৃত হইয়াছে তাহার প্রশংসা বাক্যাতীত। সীতার এই অবস্থা ও তাঁহার ভাবী দুরবস্থা পরস্পর কেমন বিভিন্ন। এই সমুদায়

বর্ণনা প্রসঙ্গে কাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারি—

"—শুনিয়াছে বীণাধ্বনি, দাস,
পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে।"

পঞ্চম সর্গের প্রারম্ভে অপ্সরাদিগের নিদ্রাকর্ষণ বর্ণনা অতি চমৎকার। স্বর্গীয় অপ্সরাগণের সরোবর-স্নান বর্ণনাতে যেরূপ অত্যুজ্জ্বল অপরিমেয় কল্পনা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা সর্বোৎকৃষ্ট ইতালীয় কবিদিগের লেখনী-যোগ্য এবং আরবীয় উপন্যাসের ন্যায় অদ্ভুতভাবে চিত্রিত। প্রমীলাকে জাগ্রত করিবার সময় মেঘনাদের সম্বোধনটি মাধুরী ও লালিত্যে মিল্টনের ইভের প্রতি আদমের উক্তির সমতুল্য।

ষষ্ঠ সর্গে লঙ্কার নাগরিকদিগের প্রবোধন এবং নগরের ক্রমোত্থিত কোলাহল ও ব্যস্ততা অসামান্য কবিত্বের পরিচায়ক। বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের ভর্ৎসনা বাক্য-সকল ভয়ঙ্কর হৃদয়ভেদী এবং সম্পূর্ণরূপে অখণ্ডনীয়। মেঘনাদের পতনে বিভীষণের বিলাপ অত্যন্ত শোকোদ্দীপক।

সপ্তম সর্গ প্রাতঃকালের রমণীয় বর্ণনার সহিত আরব্ধ। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি পাঠে আমি বিমোহিত হইয়াছি ঃ—

"কুসুমকুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।"

কবির প্রভাত ও সন্ধ্যার বর্ণনা মনোহর। প্রমীলার বক্ষঃস্থ মুক্তামালার সহিত শরৎকালীন মেঘে চন্দ্রের রজতচ্ছটার তুলনা অতিশয় সুন্দর হইয়াছে। এই স্থানের অনেকগুলি উপমা সর্বোচ্চ শ্রেণীর উপমার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। আমি এই সমালোচনায় রাশি রাশি নিরুপম উপমার মধ্যে কয়েকটি মাত্র উপমা সংকলন করিয়াছি। রাক্ষসদিগের রণসজ্জা যার পর নাই উৎসাহকর এবং হোমরোপম। যুদ্ধ বর্ণনাও ন্যূন নহে ; ইহা পাঠ করিলে হোমরের যে সর্গে গ্রীক ও ট্রোজানদিগের যুদ্ধে দেবগণের পরস্পরের পক্ষাবলম্বন বর্ণিত আছে, তাহা স্মরণ হয়। কিন্তু আমাদিগের কবির দেবগণ প্রকাণ্ড দেহ ও অসুন্দরাকৃতি হইলেও হোমরের দেবতাদের ন্যায় বালকবৎ সম্ভাষণ ও আচরণ করেন নাই ; তিনি বানরদিগের কার্য মানব বীরদিগের ন্যায় বর্ণনা করিয়া সভ্য রুচির পরিচয় দিয়াছেন।

অষ্টম সর্গে লক্ষ্মণের মৃত্যুতে রামের বিলাপ বর্ণনা অতিশয় করুণ-রসার্দ্র, এবং বাল্মীকি-রচিত তদ্বিষয়ক একটি বর্ণনার অনুরূপ। এই সর্গের নরক বর্ণনা অনেক স্থলে প্রথম শ্রেণীর কবিত্বশক্তির পরিচয় দেয়। ইহাতে হোমর, ভার্জিল, দান্তে, মিল্টন এবং ব্যাসের কবিতার অনেক অনুকরণ আছে, কিন্তু আমি অনেকবার বলিয়াছি যে, আমাদিগের কবি নিরবচ্ছিন্ন অনুকরণকারী নহেন। মিল্টন যেরূপ অন্যান্য কবির অনুকরণ করিয়াছেন, তিনিও সেইরূপ করিয়াছেন।

নবম সর্গে প্রমীলা তাঁহার মৃত পতির জন্য আর্তনাদ করিতেছেন এরূপ বর্ণনা

না করিয়া কবি নিজের বিশুদ্ধ রুচি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার গভীর শোক কি বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যায়? যে মায়াবী পুরুষের কুহকে সংসারারণ্য তাঁহার নিকট কুসুমোদ্যানবৎ প্রতীত হইতেছিল, তাঁহার বিয়োগে সকলই ঘোরতর শূন্য বোধ হইল; বিলাপ ও অশ্রুপাত এ প্রকার শোকের অতি সামান্য নিদর্শন। এই সর্গে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সজীব বর্ণনা অতি শোভন ও হৃদয়গ্রাহী।

দোষ ঃ এক্ষণে কাব্যের দোষ সকলের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথমতঃ, ভাবের পরস্পর অনৈক্য। (১) কবি স্বদেশীয় লোকের মনোরঞ্জনার্থ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রতি যতদূর সাধ্য মমতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু রাক্ষসদিগের প্রতি তাঁহার আন্তরিক পক্ষপাতও গোপন রাখিতে পারেন নাই। মিল্টনের ক্রাইস্টু অপেক্ষা সেটান্ নায়ক নামের অধিক উপযুক্ত, কিন্তু আমাদের কবিতে ও তাঁহাতে প্রভেদ এই যে, মিল্টন অজ্ঞাতসারে এই প্রমাদে পড়িয়াছিলেন; আমাদের কবি জানিয়া শুনিয়া ঐ প্রমাদে পড়িয়াছেন। ইন্দ্রজিতের অন্যায় হত্যা সাধনান্তে লক্ষ্মণের প্রতি রামের পশ্চাল্লিখিত উক্তিটি শ্লেষোক্তি-প্রায় বোধ হয় ঃ

"লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে
হে বাহুবলেন্দ্র! ধন্য বীরকুলে তুমি!" ইত্যাদি।

লক্ষ্মণ কি বাহুবলই প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রজিতকে হত্যা করিয়াছিলেন? ইহার অব্যবহিত পূর্বে কবি,—

"—বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে
শাৰ্দ্দুলী অবৰ্ত্তমানে, নাশি শিশু যথা
নিষাদ—" ইত্যাদি।

এই উক্তির দ্বারা রাক্ষসদিগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কাব্যের সর্বাংশে কবির মত স্পষ্ট এবং অবিসম্বাদিত হওয়া উচিত ছিল। (২) কোন কোন স্থলে সরল এবং অসরল বর্ণনা একত্র মিশ্রিত হইয়াছে, যথা, ১ম সর্গ ৩২৯—৩৪২ পংক্তি; এবং সপ্তম সর্গ ১৫৮—১৯১ পংক্তি। প্রথমোক্ত স্থলে চিত্রাঙ্গদা ও তাঁহার সহচরী রাক্ষস সুন্দরীগণের মুক্ত কেশ-পাশ ও নিশ্বাস প্রলয় মেঘমালা ও প্রলয় ঝড়ের সহিত তুলনা এবং শেষোক্ত স্থলে রাবণের স্ত্রী-সেনানীগণের দন্তের সহিত তোমর, ভোমর, শূল ইত্যাদির তুলনা এবং অঞ্চলের সহিত পতাকা ইত্যাদির তুলনা দ্বারা উক্ত স্থল সকলের হোমরোপম সরলতা বিনষ্ট হইয়াছে। প্রকৃত সুকল্পনা এবং মিথ্যা আড়ম্বরের পরস্পরের এ প্রকার সংমিশ্রণ পরিত্যাগ করা উচিত। (৩) এক স্থানে বিপরীত ভাবোদ্দীপক অভিপ্রায় সকলও মিশ্রিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সর্গের উপসংহারে কবি,

"—তরল সলিলে
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ
রজোময়,—".

ইত্যাদি বাক্য দ্বারা শান্তির সুন্দর বর্ণনা করিয়া হঠাৎ,

"আইল ধাইয়া পুনঃ রণক্ষেত্রে শিবা
শবাহারী ; পালে পালে গৃধিনী শকুনি ;
পিশাচ।—"

এই বীভৎস বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার দ্বারা বর্ণনার মাধুর্য্য এককালে নষ্ট হইয়াছে। তৃতীয় সর্গে কবি পাঠকগণের ভয় ও আশ্চর্য্যভাব উদ্দীপনার্থ লংকাবাসিনী বীর রমণীদিগের রণসজ্জা ও যুদ্ধযাত্রা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু পশ্চাদ্‌বর্ত্তী বর্ণনায় সে ভাবের ব্যাঘাত হইতেছে।

"অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি
ধরিয়া কুসুম ধনুঃ, মুহুর্মুহু হানি
অব্যর্থ কুসুম শরে !—"

এই বর্ণনাতে সমুদায় বিষয়টি লঘু হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চাদ্বর্তী কয়েকটি পংক্তি হাস্যকর।

"অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা ; নাহি কি বল এ ভুজ মৃণালে ?
*   *   *   *
দেখিব যে রূপ দেখি সুর্পনখা পিসী
মাতিল, মদন-মদে পঞ্চবটী বনে" ;

এরূপ ভাষা স্ত্রীশোভন বটে, কিন্তু ক্রোধপ্রজ্বলিত সমরোৎসাহিত বীরাঙ্গনার যোগ্য নহে। বর্ণনার কোন কোন স্থল বিরুদ্ধ ভাবের উদ্দীপন করিয়া দেয়। এই কাব্যে অতি সাধ্বী রমণীও বিলাসিতার কলঙ্কে দূষিত হইয়াছে। এক স্থলে সীতা লঘুচিত্ত, আমোদপ্রিয় চপল বালিকার ন্যায় হরিণীদিগের সহিত নৃত্য করিতেছেন, কোকিলের সহিত গীতালাপ করিতেছেন, এবং রসিক মধুমক্ষিকা ও ভ্রমরকে 'নাতিনী জামাই' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। সীতার নম্রতা, অসাধারণ সতীত্ব এবং গম্ভীর প্রকৃতি বিষয়ে আমাদিগের যে চিরন্তন সংস্কার আছে, তাহার সহিত উপরোক্ত বর্ণনার ঐক্য হয় না। সত্য বটে, সংস্কৃত কাব্যে স্বামীর সম্মুখে রমণীগণের নৃত্যগীতের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু আমাদিগের কবি সীতার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কেবল চতুরা রসিকাদিগের পক্ষে সম্ভব। অর্দ্ধবাতুল রমণীরাই হরিণীর সঙ্গে নৃত্য করিতে পারে।

—চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,—
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে !

(৫ম সর্গ ৩৮৭-৮৮ পং)

এই স্থলে অবিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম অকস্মাৎ আসিয়া কবি-বর্ণিত নিষ্কলঙ্ক দাম্পত্য প্রেমের বিশুদ্ধতা এক কালে বিনষ্ট করিয়াছে। এটা অমার্জ্জনীয় দোষ। নিশ্চয়ই মিল্টন কখনও এইরূপ লিখিতেন না। শেষ সর্গে:

"বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে"

(নবম সর্গ—২৯৫ পংক্তি)

এই হাস্যকর পংক্তিটি আমাদের অতি-প্রাচীন সাম্প্রদায়িক এবং প্রাচীন পদার্থের পক্ষপাতী ব্যক্তিদিগেরও প্রীতিপ্রদ হইবে না। এইরূপ বর্ণনা মহাকাব্যের অনুপযোগী। বিশেষত যে প্রকার উন্নত ও মহদ্ভাবপূর্ণ কবিতার সহিত সংযোজিত হইয়াছে তাহাতে ইহা নিতান্ত অসংলগ্ন হইয়াছে। (৫) এই প্রসঙ্গে হিন্দুভাব বিরুদ্ধ কতগুলি বর্ণনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সজ্জা প্রকৃত হিন্দু ব্যবহার-সঙ্গত নহে। ইহাতে ইউরোপীয় সামরিক সজ্জা, বর্ত্তমান বঙ্গীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সজ্জা এবং সহমরণ ক্রিয়ার সজ্জা একত্র বিমিশ্রিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, বর্ণনার অতি-দীর্ঘতা। এই দোষের একটি মাত্র দৃষ্টান্ত আছে। নরক বর্ণনায় এই দোষটি উপলক্ষিত হয়। নরক রাজ্যে ভ্রমণ গ্রীস রোম ও ভারতবর্ষীয় প্রাচীন কবিদিগের একটি প্রিয় বর্ণনীয় বিষয়। আমাদিগের কবির পক্ষেও তাহা অল্প প্রলোভনকর নহে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উহাকে তিনি অতিরিক্ত স্থান দান করিয়াছেন। বর্ণনাটি কাব্যের পরিমাণাধিক। বস্তুত মেঘনাদবধ কাব্যের অবয়বোচিত হয় নাই।

তৃতীয়তঃ, নীতিগর্ভ মহাবাক্যের অভাব। মেঘনাদে এমন নীতিগর্ভ মহাবাক্য অল্প আছে যে, তাহা দেশীয় লোকদিগের দ্বারা সামান্য কথোপকথনে উদ্ধৃত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে ভারতচন্দ্র আমাদের কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

যে সকল দোষের কথা উল্লেখ করা গেল, তাহার সকলগুলি ঠিক দোষ নাও হইতে পারে। যাহা হউক উল্লিখিত দোষ সত্ত্বেও 'মেঘনাদবধ' বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। অধিকন্তু দোষ ধরিলে 'প্যারাডাইস লস্ট' কাব্যেও তাহা অল্প নাই। গোল্ডস্মিথ বলেন, 'লেখকের গুণের আধিক্য স্থায়ী কীর্তির যেমন নিদান, দোষের অল্পতা সেইরূপ নহে। আমাদের অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ-সকলও দোষগুণ উভয়েরই আশ্রয়, তাহাতে যেমন বিলক্ষণ গুণ আছে, তেমনি বিলক্ষণ দোষও আছে। "মেঘনাদবধ কাব্যে" নায়ক মেঘের আড়ালে দণ্ডায়মান থাকিয়া ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধের সময় যেমন বীর রস পরিপূর্ণ হইতেন, কাব্যটিও সেইরূপ স্থানে স্থানে বীররস পরিপূর্ণ এবং সময়ান্তরে তিনি তাঁহার প্রমীলাকে জাগ্রত করিবার জন্য যেরূপ কোমল স্বর ধারণ করিতেন, কাব্যটিও স্থানে স্থানে সেইরূপ কোমল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা কবিতা যেরূপ অসংস্কৃত অবস্থায় ছিল, তাহা দেখিয়া সে সময়ে কে বলিতে

পারিত যে এত অল্প কালের মধ্যে স্থল বিশেষে ভাবের উচ্চতায় প্রায় হোমরের ইলিয়ড ও মিল্টনের প্যারাডাইস লস্টের ন্যায় এবং স্থল বিশেষে করুণ রসে বাল্মীকির রামায়ণের সমকক্ষ একখানি অমিত্রাক্ষর বাংলা কাব্য প্রচারিত হইবে ? ফলতঃ সময় মানুষের সৃষ্টিকর্ত্তা নহে, কিন্তু মনুষ্যই সময়ের সৃষ্টিকর্ত্তা। কাল মানুষকে উচ্চ করিয়া তুলে না। মনুষ্য কালকে উচ্চ করিয়া তুলে। আমাদিগের কবি বঙ্গ ভাষাতে নূতন কবিতা রচনাপ্রণালী ও অনেক নূতন শব্দ ও নূতন প্রয়োগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, অথচ অতি অল্প স্থলে তাহার কষ্ট-কল্পিত্ব দোষ উপলক্ষিত হয়। তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের গেটে আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। গেটে যেমন অসম্পূর্ণ জর্ম্মন ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ বাঙ্গালা ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। মেঘনাদের রচনাপ্রণালী 'তিলোত্তমা' অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার ভাষা অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল, মসৃণ, তরল ও শ্রুতি-সুখকর। ইহার শব্দবিন্যাস অপেক্ষাকৃত সুপ্রশস্ত ও সুসংহত। আমরা যখনই ইহা পাঠ করি, তখনই ইহা নূতন বোধ হয়। অসাধারণ কবির রচনার প্রকৃত লক্ষণ এই যে, তাহা কখনই পুরাতন বা অরুচিকর হয় না। বহু শতাব্দী পরে যখন গ্রন্থকার এবং তাঁহার সমালোচক উভয়ই অন্তর্হিত হইবেন, তখনও মনুষ্যগণ অক্লান্ত অনুরাগের সহিত মেঘনাদ পাঠ করিবে। অসাধারণ প্রতিভার কি রমণীয়—কি অক্ষয় প্রভাব। কত বংশপরম্পরা গত হইবে, তথাপি আমরা মেঘনাদবধ কাব্যের যে সকল স্থল পাঠ করিয়া অশ্রুপাত করিতেছি, লোকে সেই সকল স্থল পাঠ করিয়া অশ্রুপাত করিবে ; তুরীধ্বনির ন্যায় যে সকল ভাব বীরভাব উদ্দীপন করিয়া আমাদিগের হৃদয় প্রোৎসাহিত করিতেছে, তাহাদিগেরও করিবে ; এবং যে সকল স্থান আমাদের অন্তঃকরণকে প্রীতি ও কোমলতায় বিচলিত করিতেছে তাহাদিগকেও তাহা সেইরূপ করিবে। আমাদিগের জাতীয় মানসিক প্রকৃতি সংগঠন পক্ষে 'মেঘনাদ বধ' যথেষ্ট সাহায্য করিবে। শাসনকর্ত্তা বা বীরের ন্যায় কবির জয় সাড়ম্বর নয় বটে, কিন্তু তাহা সুনিশ্চয় ও সুদূরব্যাপ্ত। কবির ভাবসকল স্বজাতির মনোহর বৃত্তির উপাদান হয়, এবং জাতীয় শিক্ষা ও মহত্ত্ব সাধনের পক্ষে প্রভুত সহকারিতা করিয়া থাকে।*

* এই সমালোচনা ৺রাজনারায়ণ বসু প্রণীত 'বিবিধ প্রবন্ধে'র প্রথম খণ্ডে ১২৮৯ সালে (১৮৮২ খ্রী) প্রকাশিত হয়। সমালোচনাটি 'মেঘনাদ বধ' প্রকাশিত হবার অব্যবহিত পরে কবিকে ইংরেজীতে লিখে পত্রাকারে পাঠান হয়। যখন মেঘনাদ বধ কাব্য প্রথম প্রকাশিত হয় তখন এই প্রস্তাবটি লিখিত হয়েছিল। উহাতে যে মত প্রকাশিত হয়েছে তার পরে অল্প পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছিল। মধুস্মৃতি (২য় সংস্করণ, ১৩৬১), নগেন্দ্রনাথ সোম। পৃঃ ১৪৪। মধুস্মৃতি-তে নগেন্দ্রনাথ সোম ৺রাজনারায়ণ বসুকে 'মেঘনাদ বধ'-এর প্রথম সমালোচক বলে উল্লেখ করেছেন।—সম্পাদক।

দুই ঃ

'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য' বিষয়ক বক্তৃতায় মধুসূদন-সমালোচনায় রাজনারায়ণ বসু লিখেছিলেন ঃ

'এক্ষণে আমরা মাইকেল মধুসূদনের নিকট আগমন করিতেছি। এই বারেই ঠকাঠকি! মাইকেল মধুসূদনের যেমন গোঁড়াও অনেক, তেমনি শত্রুও অনেক।...ভাবের উচ্চতা, বর্ণনার সৌন্দর্য্য, করুণ রসের উদ্দীপনা, তাঁহার এই সকল গুণ যখন বিবেচনা করা যায়, তখন তাঁহাকে বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রধান কবি বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যখন তাঁহার দোষ বিবেচনা করা যায়, তখন তাঁহাকে ঐ উচ্চ আসন দিতে মন সংকুচিত হয়। জাতীয় ভাব বোধ হয় মাইকেল মধুসূদনেতে যেমন অল্প পরিলক্ষিত হয়, অন্য কোন বাঙালী কবিতে সেইরূপ হয় না। তিনি তাঁহার কবিতাকে হিন্দু পরিচ্ছদ দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই পরিচ্ছদের নিম্ন হইতে কোট পেণ্টালুন দেখা দেয়। আর্য্যকুল-সূর্য্য রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ না করিয়া রাক্ষসদিগের প্রতি অনুরাগ ও পক্ষপাত প্রকাশ করা, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে হিন্দু-জাতির শ্রদ্ধাস্পদ বীর লক্ষ্মণকে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় আচরণ করানো, খর ও দূষণের মৃত্যু ভবতারণ রামচন্দ্রের হাতে হইলেও তাহাদিগকে প্রেতপুরে স্থাপন, বিজাতীয় ভাবের অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে এই তিনটির এখানে উল্লিখিত হইতেছে।

বাঙ্গালা কবিদিগের মধ্যে কবিকঙ্কণ যেমন জাতীয় ভাবাপন্ন, তেমন অন্য কোন কবি নহেন। মাইকেল মধুসূদনের রচনাতে প্রাঞ্জলতার অত্যন্ত অভাব। কবির রচনাতে প্রাঞ্জলতা না থাকিলে তাহা মধুর ও মনোহর হয় না। সকল শ্রেষ্ঠতম কবির রচনা অত্যন্ত প্রাঞ্জল, যথা হোমর ও বাল্মীকি। শ্রেষ্ঠতম কবিদিগের মধ্যে মিল্টনের রচনা তত প্রাঞ্জল নহে ; কিন্তু তাঁহার অন্যান্য গুণ যেরূপ আছে তাহাতে মাইকেল কখনও তাঁহার সমতুল্য হইতে পারেন না। মিল্টনে যেরূপ ভাবের গভীরতা, শব্দ বিন্যাসের রাজগাম্ভীর্য্য এবং রচনার জমজমাট দৃষ্ট হয়, মাইকেলের কবিতাতে ততটা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মিল্টনের প্রাঞ্জলতার অভাব মাইকেলে বিলক্ষণই দৃষ্ট হয়। "যাদঃপতি রোধ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে," "নাদিল দম্ভোলি কড়, কড় রবে" ইত্যাদি বিকট প্রয়োগ দ্বারা মাইকেল মধুসূদনের কাব্য পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত রসভঙ্গ দোষ মেঘনাদবধ কাব্যের স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। গম্ভীর বিষয় বর্ণনা কালে মাইকেল মধুসূদন 'খেদাইনু' 'নাদিলা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে হাস্যের উদ্রেক হয়। দশরথের প্রেতাত্মা রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিবার সময় তিনি 'রামভদ্র' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাতে ঐ প্রকার ভাবেরই উদ্রেক হয়। দ্বিতীয় সর্গের শেষে ঝড় থামিবার পর শান্তির অবস্থার বর্ণনার মধ্যে গৃধিনী, শকুনি ও পিশাচের পালে পালে আগমনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে বীভৎস রসের প্রবর্ত্তনার দ্বারা শান্তিরসের ভঙ্গ করা হইল। কিন্তু এই সকল এবং

বহুবিধ দোষ সত্ত্বেও কে না স্বীকার করিবে যে, মাইকেল মধুসূদন একজন অসাধারণ কবি। মেঘনাদবধ ব্যতীত বীরাঙ্গনা, চতুর্দশপদী কবিতা প্রভৃতি তাঁহার অন্য সকল কবিতাও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি বাঙ্গালা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি না হউন, তিনি একজন অসাধারণ কবি, তাহার আর সন্দেহ নাই। যখন মাইকেল মধুসূদনের কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার সৃষ্ট অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির অন্যান্য প্রমাণে নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া আমি তাঁহার অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে নব-প্রেমের মুগ্ধতা কমিয়াছে, এক্ষণে তাহার দোষ সকল স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছি।* কয়েকবৎসর হইল অমৃতবাজার পত্রিকায় 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য' নামে মাইকেল মধুসূদনের রচনার একটি হাস্যকর অনুকরণ প্রকাশিত হয়। আমি ইংরেজীতে হোমর প্রভৃতি কবির হাস্যকর অনুকরণ পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এই হাস্যকর অনুকরণটি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অনেকে এরূপ মনে করেন, যে ব্যক্তি এইরূপ হাস্যকর অনুকরণ রচনা করেন, তিনি কবির অমর্যাদা করেন। বাস্তবিক তাহা নহে। শুনিতে পাই কবিশ্রেষ্ঠ মাইকেল মধুসূদন উল্লিখিত হাস্যকর অনুকরণে বিরক্ত না হইয়া তাহা পাঠ করিয়া তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।…

তিন ঃ

মেঘনাদবধ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ তাঁর 'আত্মচরিতে' পরবর্তী কালে যা লিখেছিলেন তার প্রাসঙ্গিক অংশ ঃ

…আমি যেদিন কলিকাতায় তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি সেদিন দেখিলাম তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের প্রুফ দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে বলিলেন, 'My dear Raj, this will surely make me immortal'; আমি বলিলাম, 'তাহাতে আর সন্দেহ নাই।'…মধুর আত্মশ্লাঘা কিছু অধিক পরিমাণে ছিল। তিনি আমাকে বলিলেন যে, "ভাবিবংশীয় হিন্দুরা বলিবে যে, নারায়ণ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া মধুসূদন দত্ত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্বেতদ্বীপে গিয়া যবনী বিবাহ করিয়াছিলেন।" তাহার পরে অনেক কথা হইল। আমি এই দীর্ঘ কথোপকথন সময়ে বলিয়াছিলাম যে, "আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে, তোমার পরিচ্ছদ ও আহার ইংরেজের মত হইলেও তোমার হৃদয়টা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু।" তিনি বলিলেন, "তুমি ঠিক আন্দাজ করিয়াছ; আমি হিন্দু; কিন্তু একটা সমাজ ঘেঁষিয়া না থাকিলে চলে না। এইজন্য খৃষ্টীয় সমাজ ঘেঁষিয়া আছি। বিশেষতঃ যখন খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি তখন ঐ সমাজ ঘেঁষিয়া থাকা কর্তব্য।"…মধুর যাহা দোষ থাকুক না কেন, কিন্তু হৃদয় একেবারে প্রেম ও স্নেহে পরিপূর্ণ ছিল।

* 'এই বক্তৃতা করিবার সময় আমি অবগত হইলাম যে, আমি উপরে যাহা বলিয়াছি, তজ্জন্য মাইকেল মধুসূদনের পক্ষ এবং বিপক্ষ উভয় পক্ষীয় লোকেরা আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন। ইহাতে কেবল এইমাত্র প্রমাণিত হইতেছে যে, আমি যাহা বলিয়াছি তাহা ঠিক বলিয়াছি।' —লেখক

মেঘনাদবধ কাব্য সমালোচনা

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-৯৪)

মেঘনাদবধের প্রতিপাদ্য নামের দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে। এই কাব্য বীররসাশ্রিত এবং ইহা নয় সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থকার বীরবাহুর পতন হইতে গ্রন্থারম্ভ করিয়াও উপাখ্যানের সম্পূর্ণতা সম্পাদনার্থ প্রসঙ্গক্রমে রামায়ণের বহু অংশ ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বর্ণিত বিষয়গুলি যে সমুদয়ই বাল্মীকি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও নহে, কবিতাজননীর অসাধারণী কল্পনা শক্তি বলে কবি, কত কত নূতন বিষয়েরও সৃষ্টি করিয়াছেন। মেঘনাদবধ বিষয়ে বাক্‌প্রয়োগ করা বড় সহজ কথা নহে। বাঙ্গালা বিনোদীদিগের এক্ষণে দুইটি বিশেষ দল হইয়াছে—একদলের লোকে মেঘনাদের অতি-প্রশংসাকারী,—ইংরেজীতে কৃতবিদ্যগণ এই দলে অধিক। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে এরূপ আছেন যে, তাঁহারা মাইকেলের লেখা 'ম' বলিলেই ঘুসী উচাইয়া আসেন, 'ন্দ' পর্য্যন্ত বলিবার অপেক্ষা রাখেন না। আর একদল না বুঝিয়াও অনর্থক নিন্দা করেন। আমরা এই দুই দলের নাম 'গোঁড়া' ও 'নিন্দক' রাখিলাম—আমরা স্বয়ং কপাটি খেলার ঘোলষাঁড়ের ন্যায় উভয় দলেই থাকিব। সুতরাং দুই দলের নিকটই আমাদের অপরাধ মার্জ্জনীয় হইবে।

মেঘনাদবধ মাইকেল সাগরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন। ইহাতে কবি কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, সহৃদয়তা ও কল্পনাশক্তির একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা যে কবির তিলোত্তমা পাঠ করিতে বিরক্ত হইয়াছিলাম, সেই কবির সেই ছন্দোগ্রথিত মেঘনাদই যে কত আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। সেতুদ্বারা বদ্ধ মহাসমুদ্র দর্শনে রাবণের উক্তি, পুত্রশোকাতুরা চিত্রাঙ্গদার রাবণ-সমীপে খেদ, ইন্দ্রজিতের রণসজ্জা, পতি দর্শনার্থ মেঘনাদ-প্রিয় প্রমীলার বহির্গমন, অশোক বনে সরমার নিকট সীতার পূর্ব্ব পরিচয় দান, শ্রীরামের যমপুরী দর্শন প্রভৃতি বর্ণনাগুলি পাঠ করিলে মনোমধ্যে দুঃখ, শোক, উৎসাহ, বিস্ময় প্রভৃতি ভাবের কিরূপ আবির্ভাব হয়, তাহা বর্ণনীয় নহে। বাঙ্গালায় বীর রসাশ্রিত কাব্যের উচিতরূপ সম্ভাবিবরহ এই এক মেঘনাদবধ দ্বারা অনেকাংশে পূরিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক কবি পৃথিবীর বস্তুর বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন, ইনি সেইরূপ হন নাই। ইনি কল্পনাদেবীর অক্লান্ত পক্ষের উপর আরোহন করিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—কোথাও বিচরণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইনি এই কাব্যের আত্মস্বরূপ রসটিকে যেরূপ বীরপুরুষ করিয়াছেন তাহার পরিচ্ছদ রচনাটিকেও সেইরূপ ওজস্বিনী করিয়া

দিয়াছেন। এই সকল গুণগ্রাম থাকায় মেঘনাদবধ একটি উৎকৃষ্ট কাব্যমধ্যে গণ্য হইয়াছে। একজন কৃতবিদ্য কবি মেঘনাদবধের টীকা করিয়াছেন এবং আর একজন ইহার একখানি সমালোচনা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন সংবাদপত্রে ইহার গুণদোষ ব্যাখ্যা লইয়া যে কত বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে, ইহার ইয়ত্তা নাই। ইহা কবি ও কাব্যের পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নহে।

মেঘনাদ এইরূপ গুণশালী ও সৌভাগ্যসম্পন্ন হইলেও নির্দোষ নহে। তিলোত্তমা-সম্ভবের কবিতায় দুরাম্বয় ও ব্যাকরণ-দোষ যত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে তত দেখা যায়না সত্য বটে, কিন্তু দানিলু, চেতানিলা, অশ্রুরিলা প্রভৃতি চক্ষুঃশূলস্বরূপ নূতন ক্রিয়াপদের কিছুমাত্র ন্যূনতা নাই। তাহা ছাড়া, 'দ্বিরদরদ-নিৰ্ম্মিত', 'মরি কিবা', 'হায়রে যেমতি' ইত্যাদি কতকগুলি কথার এত শ্রাদ্ধ হইয়াছে, সেগুলি দেখিলে হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যায় না। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, নিদর্শনা প্রভৃতি অনেক অলঙ্কার অনেক স্থলে উৎকৃষ্টরূপে সম্বন্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু এমত অনেক স্থলও আছে, সেখানে সেই সেই অলঙ্কারগুলি অতিকষ্টে বুঝিয়া লইতে হয়। ২।৩ কথার দ্বারা উৎকৃষ্ট কবিরা যে সকল অলঙ্কার নিৰ্ম্মিত করিয়া থাকেন, মেঘনাদে সেগুলি প্রস্তুত করিতে কখন কখন দুই তিন পঙ্‌ক্তিও লাগিয়াছে। মাইকেলের আর একটি দোষ এই, তিনি বোধ হয় অভিধান দেখিয়া অপ্রচলিত কঠিন শব্দ বাহির করিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহার রচনাও দুৰ্ব্বোধ্য হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কবির রচনায় যেরূপ কোমল ও সৰ্ব্বদা-প্রচলিত শব্দের প্রয়োগ দ্বারা প্রাঞ্জলতা, মনোহারিতা, চিত্তাকর্ষকতা ও মধুরতা জন্মিয়া থাকে, ইহাতে তাহার কিছুই হয় নাই।

এই স্থলে আর একটি বিষয়ের বিচার করা আবশ্যক হইতেছে। কেহ কেহ কহেন যে, 'মেঘনাদবধ যে এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে অমিত্রাক্ষর ছন্দই তাহার প্রধান কারণ; মিত্রাক্ষর ছন্দে দুই পঙ্‌ক্তিতেই সমুদয় ভাব শেষ করিতে হয়, সুতরাং বীররসের অনুরূপ ওজস্বিনী রচনা ইহাতে স্থান পায় না—এদিকে অমিত্রাক্ষরে ভাবপ্রকাশার্থে যতদূর ইচ্ছা, ততদূর যাওয়া যাইতে পারে, সুতরাং আয়তনের স্বল্পতাবশতঃ ক্ষোভ পাইতে হয় না।'—ইত্যাদি। একথা আমরা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি না, কিন্তু ইহাও বলি যে, যখন কাশীরাম, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, রঙ্গলাল, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি কবিগণ মিত্রাক্ষরতা রক্ষা করিয়াও বীররস বর্ণনে অসমর্থ হন নাই, তখন ইনিও চেষ্টা করিলে যে অসমর্থ হইতেন, তাহা বোধ হয় না। আমাদের বোধ হয়, ইনি একটি নূতনরূপ কাণ্ড করিয়া "উৎপস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধৰ্ম্ম, কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলাচ পৃথ্বী" ভবভূতির এই গৰ্ব্ববাক্য [illegible] করিবার বাসনারই বশবর্ত্তী হইয়া এই অমিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং ইংরেজীর অনুকরণপ্রিয় আমাদের কৃতবিদ্য দর্শক মিল্টনের ছন্দের [illegible] বাঙ্গালায়

প্রবর্ত্তিত হইল দেখিয়া আহ্লাদে ঐ প্রণালীর গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু কবি যতই গর্ব্ব করুন, এবং কৃতবিদ্যদল যতই তাঁহার সমর্থন করুন, অসঙ্কুচিত মনে বলিতে হইলে আমরা অবশ্যই বলিব যে, অমিত্রচ্ছন্দ আমাদের অথবা একটি বিশেষ দল ভিন্ন দেশের কাহারও প্রিয় হয় নাই। আমরা মেঘনাদবধের যে ওরূপ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিলাম, তাহা ছন্দের গুণে নহে, কবিত্বের গুণে। ওরূপ অসাধারণ কবিত্বের প্রশংসা না করিয়া কে থাকিতে পারে?"*

* পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' নামক গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত। এই গ্রন্থটি মধুসূদনের জীবিতাবস্থায় ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অনভ্যস্ত নূতন ছন্দ, দুরূহশব্দ, নূতন ধরনের ক্রিয়াপদ, ব্যাকরণদোষ প্রভৃতির জন্য প্রথমে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মধুসূদন-কাব্যের প্রশংসা করতে পারেন নি। পরবর্তী কালে মধুসূদনের কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে তাঁর মত পরিবর্তিত হয় যার পরিচয় বর্তমান রচনাটিতে স্পষ্ট। এই রচনায় মধুসূদনের সাহিত্য-কীর্তি সম্পর্কে অভিব্যক্ত মতামত সে যুগের পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিমতের প্রতিনিধিস্থানীয় বলা চলে।—সম্পাদক।

মধুসূদন দত্ত

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮—৯৪)

[১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে Calcutta Review পত্রের ১০৪ সংখ্যায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত Bengali Literature নামক প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশের বঙ্গানুবাদ। এই অনুবাদকর্মটি করেছেন শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ। ১৩২৩ ও ১৩২৪ সালের 'সাহিত্য' পত্রিকায় এই অনুবাদটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে ইহা গ্রন্থবদ্ধ হয়।– সম্পাদক।]

গ্রন্থকারগণের মধ্যে অতঃপর মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথাই প্রথম বিবেচ্য। তিনি বিস্তর কবিতা ও নাটকের প্রণেতা। বোধ হয়, আর কোন লেখকের দোষগুণ সম্বন্ধে এত মতভেদ দৃষ্ট হয় না। কোন কোন ভাববিহ্বল সমালোচক তাঁহাকে কালিদাসের সহিত তুলনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন, আবার কেহ কেহ তাঁহাকে অতি নিকৃষ্ট লেখক বলিয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। আমরা উক্ত দুই শ্রেণীর সমালোচকগণের মধ্যে কোন শ্রেণীর সমালোচকের সহিত এক মত হইতে পারি না। তাঁহার রচনায় বিশিষ্ট গুণ আছে, স্বীকার করি : কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা মহাকবিদিগের মধ্যে তাঁহাকে আসন প্রদান করিতে প্রস্তুত নহি। বাঙ্গালা ভাষায় কতগুলি নূতন পরিবর্ত্তন ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে অনেক কটু সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার ন্যায্য স্থান বোধ হয় সকলের উপরে।

তাঁহার কাব্যগ্রন্থ 'মেঘনাদ বধ,' 'তিলোত্তমাসম্ভব', 'বীরাঙ্গনা', এবং 'ব্রজাঙ্গনা'। প্রথমোক্ত দুইখানি যেই শ্রেণীর কাব্য তাহা য়ুরোপে 'এপিক' নামে এবং ভারতবর্ষে 'মহাকাব্য' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দুইখানিই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত ; কিন্তু 'মেঘনাদ বধ'ই দত্ত সাহেবের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যে রামায়ণ হইতে ভারতীয় বহু কবি রসসঞ্চয় করিয়া কৃতী হইয়াছেন, গ্রন্থের বিষয়টি সেই রামায়ণ হইতে গৃহীত—রাবণের সহিত রামের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে রাবণের পুত্রদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর ও যোদ্ধা মেঘনাদ রামানুজ লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক নিহত হন। আখ্যান বস্তুটি এই। কিন্তু দত্ত সাহেব বাল্মীকির নিকট গল্পটি অপেক্ষা অন্যান্য বিষয়ে বেশী ঋণী আছেন। তথাপি কাব্যখানি প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার নিজস্ব। দৃশ্যাবলী, পাত্র-পাত্রীগণের চরিত্র-চিত্র, ঘটনা-সংস্থাপন এবং অবান্তর ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি অনেক অংশে দত্ত সাহেবের নিজস্ব সৃষ্টি। উহাদের উদ্ভাবনে ও ক্রম পরিণতিতে দত্ত সাহেব উচ্চ অঙ্গের কলা-কুশলতা প্রদর্শিত করিয়াছেন। আমাদের যেটুকু স্থান আছে তাহাতে বিস্তারিতভাবে কাব্যখানি সমালোচনা করা অসম্ভব। সুতরাং আমরা কবির কলাকুশলতার যথাযোগ্য বর্ণনা করিতে বা পাঠকগণকে তাহার পরিচয় প্রদান করিতে অক্ষম। কেবল বাল্মীকি নহে, হোমর ও মিল্টনের নিকটও তিনি অনেক বেশী

ঋণী। কিন্তু যে সকল ভাব তিনি উক্ত কবিগণের নিকট সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পরিপাক করিয়া তিনি নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন, এবং সমগ্রভাবে বিবেচনা করিলে, এই কাব্যগ্রন্থখানি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান গ্রন্থ, সন্দেহ নাই। পাত্র-পাত্রীগণের কল্পনা অতি সুপরিস্ফুট, এবং পাঠকের চিত্ত-মুগ্ধকর। ঘটনা পরম্পরা যদিও অনেক স্থলে অতিলৌকিক, তথাপি অতি-নিপুণ ও সহজভাবে সমাবিষ্ট হইয়াছে। রূপকাদি অলংকারগুলি কোথাও মধুর, কোথাও করুণ, কোথাও বা রুদ্র রসাশ্রিত। কল্পনার ক্রীড়া অনুক্ষণ পরিবর্ত্তনশীল। ভাষা অত্যন্ত কবিত্বসম্পন্ন এবং শব্দচয়ন এরূপ সুন্দর যে, পরিস্ফুট ভাবগুলির সঙ্গে সঙ্গে তদনুকূল অন্যান্য ভাবও অনুরণিত হইতে থাকে। কবিতার চরণগুলি প্রচলিত সংস্কৃত প্রথা অনুসারে সকল স্থানে দুইটি পঙ্‌ক্তিতে সমাপ্ত হয় নাই বটে, কিন্তু মিল্টনের কবিতার ন্যায় যতি ও বিরামের স্থানগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সন্নিবিষ্ট হওয়ায়, আমাদের মতে পদগুলি অতি সুললিত ও সুখশ্রাব্য হইয়াছে এবং আবেগময় ভাব-প্রকাশের অধিকতর উপযোগী হইয়াছে।

কিন্তু দত্ত সাহেবের রচনা একেবারে নির্দ্দোষ নহে। উহাতে বিশ্রামের অভাব পরিলক্ষিত হয়। যেখানে ফুৎকার অনাবশ্যক, সেখানে প্রবল ঝটিকা ভীষণ নিনাদে গর্জ্জন করে। যেখানে কোন প্রয়োজন নাই, সেই স্থানে মেঘাড়ম্বর ও অজস্র পরিপাতের বন্যা সৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্র অকারণ ক্রোধে স্ফীত হইয়া ভয়ংকর আকার ধারণ করে, এবং সকলের অনর্থক বিরক্তির উৎপাদন করে। দত্ত সাহেবের ন্যায় মার্জ্জিত-রুচি ও প্রতিভাবান লেখকের এরূপ বাগাড়ম্বর শোভা পায় না। একই রূপক ও শব্দ-ঘটার বারংবার পুনরাবৃত্তিও তাঁহার একটি প্রধান দোষ, এবং পাঠকের পক্ষে বড়ই বিরক্তিজনক। অপরের ভাব আত্মসাৎ করা দোষটিও যে একেবারে নাই, তাহা বলা যায় না। হোমর ও ভার্জ্জিল হইতে স্থানে স্থানে চুরি আছে, এবং মিল্টন ও কালিদাস হইতেও এইরূপ চুরি লক্ষিত হয়।

তাহার পর ব্যাকরণের মর্য্যাদাও সকল স্থানে রক্ষিত হয় নাই। ইংরেজী পদ্ধতির অনুকরণে 'স্তুতিলা', 'স্বনিলা', 'নির্ঘোষিলা' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের ঘন ঘন প্রয়োগেও আমাদের ঘোরতর আপত্তি আছে। আমরা 'মেঘনাদবধ' হইতে কোন অংশ উদ্ধৃত করিলাম না, কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পৃথকভাবে দেখিলে কাব্যখানির দোষগুণ সম্যক-রূপে উপলব্ধি হইবে না, সমগ্র কাব্যখানি সুন্দর, কিন্তু যেমন একখানি ইষ্টক দেখিয়া অট্টালিকার ধারণা হয় না, সেইরূপ এক একটি ক্ষুদ্র অংশ পাঠ দ্বারা কাব্যখানির সৌন্দর্য্য বিচার করা অসম্ভব।

দত্ত সাহেবের অপর গ্রন্থাবলীর মধ্যে তিলোত্তমাসম্ভব সর্ব্বপ্রথমে লিখিত। ইহাও মেঘনাদবধ কাব্যের ন্যায় এপিক বা মহাকাব্য হইলেও, উহা অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। বিষয়টি তিলোত্তমার জন্ম। তিলোত্তমা ব্রহ্মার সুন্দরতম সৃষ্টি। আর্য্য দেবতাগণকে সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দুই প্রবল পরাক্রান্ত অসুর ভ্রাতা স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করায় উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটাইবার জন্যই তিলোত্তমার সৃষ্টি।

তিলোত্তমার পর আমরা সানন্দে 'বীরাঙ্গনা' নামক আর একখানি কাব্যের বিষয় উল্লেখ করিব। কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবার স্পর্ধা না থাকিলেও, এই কাব্যখানি 'তিলোত্তমা' অপেক্ষা অধিকতর পরিপক্কতার পরিচায়ক। কতিপয় বীরাঙ্গনার স্বামীর প্রতি পদ্যে লিখিত পত্রের আকারে ইহা পর্যায়ক্রমে রচিত। 'মেঘনাদবধে'র পরেই ইহা রচিত হয়, এবং ইহাতেও 'মেঘনাদবধে'র ন্যায় সুন্দর রূপকাদি অলংকার, ভাষার চমৎকারিত্ব, পদের লালিত্য ও শ্রুতিমধুরতা আছে। 'ব্রজাঙ্গনা' একখানি ক্ষুদ্র অসমাপ্ত কাব্য। ইহা মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ইহাতে রাধার বিরহবেদনা বর্ণিত আছে। এ বিষয়ে পূর্বে এত কবিতা রচিত হইয়াছে যে, নূতনত্ব সৃষ্টি একপ্রকার অসম্ভব। কিন্তু দত্ত সাহেব ইহাতেও অনেক নূতন ও সুন্দর ভাব সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন এবং অমিত্রাক্ষরের ন্যায় মিত্রাক্ষর ছন্দেও অনুরূপ সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার মিত্রাক্ষর ছন্দের রচনা বাংলা ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট। তাঁহার সনেটগুলির আমরা বিশেষ প্রশংসা করি না, কিন্তু সেগুলিও অপ্রসিদ্ধতর গ্রন্থকারের যশোলাভের কারণ হইতে পারিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সনেটগুলি য়ুরোপে রচিত হয়। একটি ভার্সেলে লিখিত হয়। কতগুলি দান্তে, আচার্য্য গোল্ডস্টুকার, টেনিসন, ভিক্টর হুগো, ও ইতালিকে সম্বোধন করিয়া লিখিত। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, সনেটগুলি বহু ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রক্ষিপ্তভাবে রচিত।

নাট্যকার রূপে দত্ত সাহেব তেমন কৃতিত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার লিখিত নাট্যগ্রন্থ 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', ও 'কৃষ্ণকুমারী'। প্রথমোক্ত নাটকখানি জনসাধারণের বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। আমাদের বিবেচনায় উহার মধ্যে কোনখানিই তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। এ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী লেখক নাটক প্রণয়নে যথার্থ ক্ষমতা দেখাইতে পারেন নাই। এমনকি আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট নাট্যকার বাবু দীনবন্ধু মিত্রও মনুষ্যহৃদয়ের উচ্চতর ভাবগুল চিত্রিত করিতে গিয়া একেবারে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। দত্ত সাহেব যখনই নাটক লিখিতে বসেন, তখনই তাঁহার অবিসংবাদিত কবি-প্রতিভা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। তাঁহার প্রহসনগুলি কিন্তু ভাল। তন্মধ্যে একখানি 'একেই কি বলে সভ্যতা?' বাঙ্গালা ভাষায় অদ্বিতীয় গ্রন্থ। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখা ন নিজগুণ প্রাচুর্য্য ব্যতীত অন্য কারণেও সমালোচনার যোগ্য।

আজি কালি বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র বহু পুস্তক প্রসব করিতেছে বটে, কিন্তু তন্মধ্যে অধিকাংশই কোন খ্যাতনামা লেখকের অনুকরণ মাত্র। বিদ্যাসাগর, টেকচাঁদ ঠাকুর, হুতোম, দীনবন্ধু এবং দুর্গেশনন্দিনী প্রণেতার অনুকারী অনেক হইয়াছে। কিন্তু বোধ হয়, 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অনুকরণে যত পুস্তক রচিত হইয়াছে, তত আর কোন গ্রন্থের আদর্শে রচিত হয় নাই। উক্ত গ্রন্থখানি একটি বিশেষ অভিপ্রায়ে লিখিত প্রহসন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য, অতিরিক্ত মদ্যপান ও তদানুষঙ্গিক দোষগুলি ব্যঙ্গ সহকারে প্রকটিত করা। বটতলার ছাপাখানা ও পুস্তকের দোকানগুলিতে মদ্যপানের দোষ সম্পর্কে এক আনা বা দুই আনা মূল্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকের রীতিমত বন্যা উপস্থিত হইয়াছে। একটু বৃহৎ আকারের প্রহসনও বিস্তর প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে

'বুঝলে কিনা' নামক গ্রন্থখানি জনসাধারণ কর্তৃক যথেষ্ট আদৃত হইয়াছে, এবং অনেকবার ভদ্রলোকের বাটীতে অভিনীত হইয়াছে। উক্ত সমুদয় গ্রন্থই 'একেই কি বলে সভ্যতা'র নকল মাত্র। সুতরাং এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি কেবল বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত সর্বোৎকৃষ্ট দুইখানি প্রহসনের অন্যতম বলিয়াই নহে, উহার অনুকরণে এতগুলি পুস্তক রচিত হইয়াছে বলিয়াও, উহার গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে।

এই প্রশংসনীয় পুস্তকখানির অংশ বিশেষ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত করিলে ইহার সৌন্দর্য্য সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে না। কারণ, ইংরেজী শব্দসংকুল উদ্ভট ভাষা এবং তর্ক সভাদিতে ব্যবহৃত কৃত্রিম বাগাড়ম্বরেই ইহার অর্দ্ধেক রস নিহিত আছে। নর্ত্তকী ও সুরাপানের আমোদে মত্ত 'জ্ঞান তরঙ্গিনী' নামক এক তর্কসভার গৃহে ইহার প্রধান দৃশ্য স্থাপিত। ইহাতে যেরূপ চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা অতীব ঘৃণার্হ। প্রধান কথা এই যে, অঙ্কিত চরিত্রগুলি সত্যের অনুরূপ কিনা। বাঙ্গালার লজ্জার কথা হইলেও, আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, চিত্রগুলি বাস্তবানুরূপ। সুরাপানে উত্তেজিত যে সমাজ-সংস্কারকের চেষ্টা ইংরেজী-বচন-সম্বলিত দীর্ঘ বক্তৃতামাত্রেই পর্য্যবসিত হয়, তাঁহাদিগকে য়ুরোপীয়গণ প্রায়ই যথার্থ সভ্য ও শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে গণ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু তাহা করা উচিত নহে। সুরাপান, নিম্নশ্রেণীর ফিরিঙ্গীর বেশভূষা পরিধান ও বর্ব্বরোচিত ইংরেজী-ভাষার ব্যবহার যাঁহারা সভ্যতার চিহ্ন বলিয়া বিবেচনা করেন, ইঁহারাই যে সে সকল অর্দ্ধশিক্ষিত বাবুদের প্রতিনিধি স্বরূপ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহারাই দলে দলে সরকারী অফিসসমূহে বিচরণ করেন, এবং উচ্চ কর্ম্মচারীদিগকে চাকুরীর আবেদন দ্বারা উদ্বাস্ত করিয়া থাকেন, সন্ধ্যাকালে কলিকাতার রাজপথসমূহে জনতা-বৃদ্ধি করেন, মদ্যের বিপণীগুলি শোষণ করেন। এবং যখন টাউনহলে বাবু কেশবচন্দ্র সেন বক্তৃতা করেন, তখন তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীর অধিকাংশ আসন অধিকৃত করেন। যথার্থ শিক্ষালাভ তাঁহাদের কিছুমাত্র হয় নাই। ইঁহারা কোন ইংরেজী স্কুলে কয়েক বৎসর মাত্র যৎসামান্য ইংরেজী শিক্ষা করেন এবং হীনাবস্থা হইলে অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে উমেদারী আরম্ভ করেন। ধনবান হইলে ইঁহারা অসঙ্কোচে উক্ত বয়সেই গর্হিত আমোদ প্রমোদে ব্যাপৃত হন। এই শ্রেণীর লোকে দেশ প্লাবিত হইয়াছে, এবং দত্ত সাহেবের চিত্রটি বাস্তবানুরূপ বটে, কিন্তু যথার্থ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সহিত ইঁহাদের একশ্রেণীভুক্ত করা উচিত নহে—তাঁহাদের সংখ্যা (ইংরেজী শিক্ষার সম্বন্ধে যাহাই বলা হউক না কেন) তুলনায় অতি অল্প।*

---

* Calcutta Review ত্রৈমাসিকে লেখকদের নাম মুদ্রিত হত না বলে উক্ত প্রবন্ধের লেখক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম ছিল না। বহু বৎসর পরে (১৮৮১) 'কলিকাতা রিভ্যু' পত্রের প্রকাশকগণ "Selections from Calcutta Review" নাম দিয়ে ঐ পত্রিকার পুরাতন ফাইল থেকে নির্বাচিত কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণের আয়োজন করেন। সেই সময় পুরানো কাগজপত্র ঘেঁটে তাঁরা যে 'অনুষ্ঠানপত্র' (Prospectus) প্রকাশ করেন তার থেকে উক্ত প্রবন্ধের লেখক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের কয়েক মাস পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা যখন তুঙ্গস্পর্শী সে সময় এই প্রবন্ধ রচিত হয়। এই তথ্যগুলির উৎস মন্মথনাথ ঘোষ অনূদিত 'বাঙ্গালা সাহিত্য'-এর 'বিজ্ঞাপন' অংশ।—সম্পাদক।

মেঘনাদবধ কাব্যের ভূমিকা

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)

মেঘনাদবধ কাব্য-রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের আজ কি আনন্দ ! এবং কোন সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহার সেই আনন্দে আনন্দিত না হইবেন ? অমিত্রচ্ছন্দে কাব্য রচনা করিয়া কেহ এত অল্পকালের মধ্যে এই পয়ারপ্লাবিত দেশে এরূপ যশোলাভ করিবেন, একথা কাহার মনে ছিল ? কিন্তু বোধ হয়, এক্ষণে সকলে স্বীকার করিবেন যে, মাইকেল মধুসূদনের নাম সেই দুর্লভ যশঃপ্রভায় বঙ্গমণ্ডলীতে প্রদীপ্ত হইয়াছে।

ইহার কারণ কি ? বাগ্‌দেবীর বীণাযন্ত্রে নূতন ধ্বনি বলিয়া কি লোকে ইহার এত আদর করেন, না সুমধুর কবিতা রসপানে মত্ত হইয়া ছন্দাছন্দের বিচার করেন না। এ কথা মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে কবিতা কি এবং কেনই বা কাব্যপাঠে লোকের মনোরঞ্জন হয়, ইহা স্থির করা আবশ্যক।

যে প্রণালীতেই পদ্য রচনা হউক, কবিতার প্রকৃত লক্ষণাক্রান্ত না হইলে কোন গ্রন্থই কাব্যের শ্রেণীতে পরিগণিত অথবা লোকের মনোরম হয় না। ফলতঃ ছন্দ ও পদ কবিতার পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার স্বরূপ, কারণ গদ্য রচনার স্থানে স্থানেও সম্পূর্ণ কবিতালক্ষণ দৃষ্ট এবং কবিতা রসাস্বাদনের সম্যক সুখ অনুভূত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত-স্থল কাদম্বরী। সুতরাং অমিলিত পদবিশিষ্ট বলিয়াই উপস্থিত কাব্যখানির এত গৌরব ও সমাদর হওয়া সম্ভাবিত নহে। ইহার অন্য কোন কারণ আছে। সে কারণ কি ?

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রসের উদ্দীপন করাই কাব্য রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ;—ভয়, ক্রোধ, আহ্লাদ, করুণা, খেদ, ভক্তি, সাহস, শান্তি প্রভৃতি ভাবের উদ্রেক এবং উৎকর্ষণ করাই কবিদিগের চেষ্টা। যে গ্রন্থ এই সকল, কিম্বা ইহার মধ্যে কোন বিশেষ রসে পরিপূর্ণ থাকে, তাহাকেই কাব্য কহে, এবং তাহাতে কবিতারূপ পীযূষ পান করিয়াই লোকের চিত্তাকর্ষণ ও মনোরঞ্জন হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থখানিতে সেই সুধার প্রাচুর্য্য থাকাতেই এত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকর্ত্তা যে অসামান্য কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন ও চমৎকৃত হইতে হয়—সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে বঙ্গভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কীর্ত্তি (কৃত্তি)-বাস ও কাশীদাস সংকলিত রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ ছাড়া একত্রে এত রসের সমাবেশ অন্য কোন বাংলা পুস্তকেই নাই। ইত্যগ্রে যত কিছু পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই করুণা কিম্বা আদিরসে পরিপূর্ণ—বীর অথবা রৌদ্র রসের লেশমাত্রও পাওয়া সুকঠিন। কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে যিনি মেঘনাদের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ

করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন যে, বাংলা ভাষার কতদূর শক্তি এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত কি অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন কবি।

ইন্দ্রজিত বধ এবং লক্ষ্মণের শক্তিশেল উপাখ্যান বারম্বার পাঠ ও শ্রবণ না করিয়াছেন, বোধ করি হিন্দু সন্তানের মধ্যে এমত কেহই নাই। কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারি যে, অভিনবকায়া সেই উপাখ্যানটিকে এই গ্রন্থে পাঠ করিতে করিতে চমৎকৃত ও রোমাঞ্চিত না হন, এ দেশে এমন হিন্দু সন্তানও কেহ নাই।

সত্য বটে, কবিগুরু বাল্মীকির পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া নানা দেশীয় মহাকবিদিগের কাব্যোদ্যান হইতে পুষ্পচয়ন পূর্ব্বক এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সমস্ত কুসুমরাজিতে যে অপূর্ব্ব মাল্য গ্রথিত হইয়াছে, তাহা বঙ্গবাসীরা যত্ন সহকারে কণ্ঠে ধারণ করিবেন।

যে গ্রন্থে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবনের রমণীয় এবং ভয়াবহ প্রাণ। এবং পদার্থ-সমূহ একত্রিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয় লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে—যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ভুতকাল, বর্ত্তমান এবং অদৃশ্য বিদ্যমানের ন্যায় জ্ঞান হয়, —যাহাতে দেব, দানব, মানবমণ্ডলীর বীর্য্যশালী, প্রতাপশালী, সৌন্দর্য্যশালী জীবগণের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ দর্শনে মোহিত এবং রোমাঞ্চিত হইতে হয়,—যে গ্রন্থপাঠ করিতে করিতে কখন বা বিস্ময়, কখনও বা ক্রোধ এবং কখন বা করুণ রসে আর্দ্র হইতে হয়, এবং বাষ্পাকুল লোচনে যে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তাহা যে বঙ্গবাসীরা চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিবেন, ইহার বিচিত্রতা কি!

অত্যুক্তি জ্ঞানে এ কথায় যদি কাহার অনাস্থা, হতশ্রদ্ধা হয়, তবে তিনি অনুগ্রহ করিয়া একবার গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিবেন; তখন বুঝিতে পারিবেন, মাইকেল মধুসূদনের কি কুহকিনী শক্তি,—তাঁহার কাব্যোদ্যানে কল্পনা-দেবীর কিরূপ লীলাতরঙ্গ, কখন তিনি ধীরে ধীরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাল্মীকির পদতল হইতে পুষ্প হরণ করিতেছেন এবং কখন বা নবনিকুঞ্জ সৃজন করিয়া অভিনব কুসুমাবলী বিস্তৃত করিতেছেন। ইন্দ্রজিত-জায়া প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ, শ্রীরামচন্দ্রের যমপুরী দর্শন, পঞ্চবটী স্মরণ করিয়া সরমার নিকট সীতার আক্ষেপ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, এবং প্রমীলার সহমরণ কিরূপ আশ্চর্য্য কতই চমৎকার, বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। আমরা এতদিন কবিকুলের চক্রবর্ত্তী ভাবিয়া ভারতচন্দ্রকে মাল্যচন্দনে পূজা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু বোধ হয়, এতদিন পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় কবিকে সিংহাসনচ্যুত হইতে হইল। এই কথায় পাঠক মহাশয়েরা মনে করিবেন না যে, আমি ভারতচন্দ্রের কবিত্বশক্তি অস্বীকার করিতেছি। তিনি যে প্রকৃত কবি ছিলেন, তৎপক্ষে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু কবিদিগের মধ্যেও প্রধান অপ্রধান আছেন। কেহ বা ভাবের চমৎকারিত্বে লোকের চিত্ত হরণ করেন। ভারতচন্দ্র যে শেষোক্ত কবিদিগের অগ্রগণ্য, তৎসম্পর্কে দ্বিরুক্তি করিবার কাহার সাধ্য নাই। পরিপাটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শব্দবিন্যাস করিয়া কর্ণকুহরে অমৃতবর্ষণ করিবার দক্ষতা তিনি

যেরূপ দেখাইয়া গিয়াছেন, বঙ্গ কবিকুলের মধ্যে তেমন আর কেহই পারেন নাই এবং সেই গুণেই বিদ্যাসুন্দর এতদিন সজীব রহিয়াছে। কিন্তু গুণীগণ যে সমস্ত গুণকে কবিকৌলিন্যের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ গণনা করেন, ভারতচন্দ্রের সে সকল গুণ অতি সামান্যই ছিল। বিদ্যাসুন্দর এবং অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্র-রচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য। কিন্তু যাহাতে অন্তর্দ্দাহ হয়, হৃৎকম্প হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বাহ্যেন্দ্রিয় স্তব্ধ হয়, তাদৃশ ভাব তাহাতে কই? কল্পনারূপ সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গবেগ কই, বিদ্যুৎছটাকৃতি বিশ্বোজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা কোথায়? তাঁহার কবিতাস্রোতঃ কুঞ্জবন-মধ্যস্থিত অপ্রশস্ত, মৃদুগতি প্রবাহের ন্যায়, বেগ নাই গভীরতা নাই, তরঙ্গগর্জ্জন নাই; মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে গমন করিতেছে অথচ নয়ন ও শ্রবণ তৃপ্তিকর।

মালিনীর প্রতি বিদ্যার লাঞ্ছনা উক্তি, বকুলবিহারী সুন্দর দর্শনে নাগরীয় কামিনীগণের রসালাপ, বিদ্যাসুন্দরের প্রথম মিলন, কোটালের প্রতি মালিনীর ভর্ৎসনার ন্যায় সরল সুকোমল বাক্যলহরী মেঘনাদবধে নাই; কিন্তু উহার শব্দ প্রতিঘাতে দুন্দুভিনিনাদ এবং ঘনঘটা গর্জ্জনের গম্ভীর প্রতিধ্বনি শ্রবণগোচর হয়। বোধ হয়, এ কথায় পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে বিরক্ত হইবেন এবং আমাকে মাইকেল মধুসূদনের স্তাবক জ্ঞান করিবেন। তাঁহাদিগের ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, পূর্ব্বে আমারও তাঁহাদিগের ন্যায় সংস্কার ছিল যে, মেঘনাদবধের শব্দ-বিন্যাস অতিশয় কুটিল ও কদর্য্য, এবং সে কথা ব্যক্ত করিতেও পূর্ব্বে আমি ক্ষান্ত হই নাই; কিন্তু এই গ্রন্থখানি বারম্বার আলোচনা করিয়া আমার সেই সংস্কার দূর হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, বিদ্যাসুন্দরের শব্দাবলীতে মেঘনাদবধ রচিত হইলে অতিশয় জঘন্য হইত। মৃদঙ্গ ও তবলার রাজ্যে নটীদিগেরই নৃত্য হয়। কিন্তু রণতরঙ্গবিলাসী প্রমত্ত যোধগণের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য তুরী, ভেরী এবং দুন্দুভির ধ্বনি আবশ্যক; —ধনুষ্টঙ্কারের সঙ্গে শঙ্খনাদ ব্যতিরেকে সুশ্রাব্য হয় না। পাঠক মহাশয়েরা ইহাতে মনে করিবেন না যে, মাইকেলের রচনাকে আমি নির্দ্দোষ ব্যাখ্যা করিতেছি। তাঁহার রচনার কতগুলি দোষ আছে, কিন্তু সে দোষ শব্দের অশ্রাব্যতা বা কর্কশতাজনিত দোষ নহে। বাক্যের জটিলতা দোষই তাঁহার রচনার প্রধান দোষ; অর্থাৎ যে বাক্যের সহিত যাহার অন্বয়—বিশেষ্য, বিশেষণ, সংজ্ঞা সর্ব্বনাম এবং কর্ত্তা ক্রিয়া সম্বন্ধ—তৎপরস্পরের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান, সুতরাং অনেক স্থলে অস্পষ্টার্থ দোষ জন্মিয়াছে,—অনেক পরিশ্রম না করিলে ভাবার্থ উপলব্ধ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ,—তিনি উপর্য্যুপরি রাশি রাশি উপমা একত্রিত করিয়া স্তূপাকার করিয়া থাকেন, এবং সর্ব্বত্রে উপমাগুলি উপমিত বিষয়ের উপযোগী হয় না।

তৃতীয় দোষ, প্রথা বহির্ভূত নিয়মে ক্রিয়াপদ নিষ্পাদন ও ব্যবহার করা; যথা, স্তুতিলা, শান্তিলা, ধ্বনিলা, মর্ম্মরিছে, দ্বন্দ্বিয়া, সুবর্ণি ইত্যাদি।

চতুর্থতঃ, বিরাম যতি সংস্থাপনের দোষে স্থানে স্থানে শ্রুতিদুষ্ট হইয়াছে। যথা,—

"কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে !—"
"নাচিছে নর্ত্তকীবৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক ,—"
"হেনকালে হনু সহ উত্তরিলা দূতী
শিবিরে ।—"
"রক্ষোবধূ মাগে রণ, দেহ রণ তারে
বীরেন্দ্র !—"
"দেবদত্ত অস্ত্রপুঞ্জ শোভে পিঠোপরি
রঞ্জিত নয়নরাগে, কুসুম অঞ্জলি—
আবৃত ,—" ইত্যাদি

এই সকল স্থলে 'গায়ক' 'শিবিরে' 'বীরেন্দ্র' 'আবৃত' শব্দের পর বাক্য সমাপ্ত হওয়ায় পদাবলীর স্রোতোভঙ্গ হেতু শ্রবণকঠোর হইয়াছে।

এ সমস্ত দোষ না থাকিলে মেঘনাদবধ গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। কিন্তু এইরূপ দোষাশ্রিত হইয়াও কাব্যখানি এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, বঙ্গভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দৃষ্টিগোচর হয় না।

ফলতঃ "গাঁথিব নূতন মালা···
···রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

বলিয়া গ্রন্থকার যে সদর্প উক্তি করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ সফলতা হইয়াছে এবং এই 'নূতন মালা' চিরকালের জন্য তাঁহার কণ্ঠদেশে শোভা সম্পাদন করিবে, ইহার আর সন্দেহ নাই।

অতঃপর ছন্দপ্রণালী সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলা আবশ্যক। ভাষার প্রকৃতি অনুসারে পদ্য-রচনা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় হ্রস্ব-দীর্ঘ বর্ণ এবং ইংরেজী ভাষায় লঘু-গুরু উচ্চারণ আশ্রয় করিয়া পদ্য রচিত হয়; কিন্তু বাংলা ভাষার প্রকৃতি সেরূপ নয়। ইহাতে যদিও হ্রস্ব দীর্ঘ বর্ণ ব্যবহার করিবার নিয়ম প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু উচ্চারণ কালে তাহার ভেদাভেদ থাকে না। সুতরাং সংস্কৃত এবং ইংরেজী ভাষার প্রথানুসারে বঙ্গ ভাষায় পদ্য রচনা করিবার নিয়ম প্রচলিত নাই। তাহার প্রণালী স্বতন্ত্র, অর্থাৎ মাত্রা গণনা করিয়া তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, একাদশ, দ্বাদশ এবং চতুর্দশ অক্ষরের পর বিরাম-যতি থাকে এবং আবৃত্তির সময় সেই সেই স্থানে, ছন্দ অনুসারে শ্বাসপতন করিতে হয়, এবং যে সকল স্থানে শব্দের মিল থাকে, আপাতত বোধ হয়, যেন শব্দের মিলনই এ প্রণালীর প্রধান অঙ্গ; কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই বুঝা যায় যে, শব্দের মিল ইহার আনুষঙ্গিক এবং

শ্বাস নিক্ষেপের নিয়মই প্রধান কৌশল। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত মিলিত শব্দপূর্ণ পদ্যাবলীতেও পাওয়া যায়। যথা,—

—"হেরিলাম সরোবরে
কমলিনী বান্ধিয়াছে করী।"—১
আর কি কাঁদে, লো নদি, তোর তীরে বসি
মথুরার তীরে বসে ব্রজের সুন্দরী"—২
"কি কাজ বাজায়ে বীণা ; কি কাজ জাগায়ে
সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে" ?—৩
"শুনি গুণ্ গুণ্ ধ্বনি তোর এ কাননে
মধুকর, এ পরাণ কাঁদে রে বিষাদে।"—৪
"এস সখি, তুমি আমি বসি এ বিরলে
দুজনের মনোজ্বালা জুড়াই দুজনে ;"—৫

ইত্যাদি

মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনারও এই প্রণালী, অতএব অমিত্রচ্ছন্দ বলিয়া কাহারও কাহারও তৎ-প্রণীত গ্রন্থের প্রতি বিরাগের কারণ কি? এবং সেই বিষয় লইয়া এত বাগ্ বিতণ্ডার আড়ম্বর কেন, বুঝিতে পারি না। তিনি কিছু রচনা বিষয়ে নূতন প্রণালী অবলম্বন করেন নাই, প্রচলিত নিয়মানুসারেই লিখিয়াছেন ; কারণ, বিরাম, যতি অনুসারে পদবিন্যাস করা তাঁহারও রচনার নিয়ম, কেবল এই মাত্র প্রভেদ যে, পয়ারাদি ছন্দে যেমন শব্দের মিল থাকে এবং পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী প্রভৃতি যখন যে ছন্দ আরম্ভ হয়, তাহার শেষ পর্যন্ত সমসংখ্যক মাত্রার পরে সর্বত্রেই একরূপ নিয়ম-যতি থাকে, মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দে তদ্রূপ না হইয়া সকল ছন্দ ভাঙ্গিয়া সকলের বিরাম-যতির নিয়ম একত্রে নিহিত এবং গ্রথিত হইয়াছে এবং যতি স্থলে শব্দের মিল নাই। সুতরাং কোন পঙ্ক্তিতে পয়ার ছন্দের নিয়মে আট এবং চতুর্দশ মাত্রার পরে, কোনটিতে ত্রিপদী ছন্দের ন্যায় ছয় এবং আট এবং কখন বা এক পঙ্ক্তিতেই দুই তিন প্রকার ছন্দের যতি বিভাগ নিয়ম গৃহীত হইযাছে। নিম্নোধৃত উদাহরণ দৃষ্টে প্রতিপন্ন হইবে। যথা—

যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী—১
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি উত্তরিলা—২
নারী দেশে ; দেবদত্ত শঙ্খনাদে রুষি—৩
রণরঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে,—৪
উথলিত চারিদিকে দুন্দুভির ধ্বনি,—৫
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,—৬
উলঙ্গিয়া অসিরাশি কার্মুক টঙ্কারি,—৭
আস্ফালি ফলকপুঞ্জ ঝক ঝক ঝকি—৮

কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরী !—৯
মন্দুরায় হ্রেষে অশ্ব, উর্দ্ধকর্ণে শুনি—১০
নূপুরের ঝনঝনি, কিঙ্কিনীর বোলী—১১
ডমরুর রবে যথা নাচে কাল ফণী—১২
বারী মাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি,—১৩
গম্ভীর নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি—১৪
দূরে !—রঙ্গে গিরিশৃঙ্গে, কাননে কন্দরে—১৫
নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি—১৬
সহসা পূরিল দেশ ঘোর কোলাহলে,—১৭

উদ্ধৃত পদাবলী পাঠে বিদিত হইবে যে, ১, ৪, ৫, ৬, ৭, [৮,] ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭ পঙ্ক্তির পদবিন্যাস পয়ারের ন্যায় এবং বিরামস্থল আট ও চতুর্দশ মাত্রার পর ২য় ও ৩য় পঙ্ক্তিতে 'আসি' 'উত্তরিলা' 'নারীদেশে, এবং 'রুষি' শব্দের পর দশম অথবা চতুর্থ মাত্রার পর, এবং পঞ্চদশ পঙ্ক্তিতে "দূরে" "শৃঙ্গে" ও "কন্দরে" শব্দের পর বিশ্রাম-যতি স্থাপিত হইয়াছে।

পাঠক মহাশয়েরা ইহা দ্বারাই মাইকেল-প্রণীত অমিত্রচ্ছন্দ রচনার স্থান বুঝিতে পারিবেন এবং ঐ সমস্ত বিরাম স্থলে শ্বাস পতন করাই এই ছন্দ-আবৃত্তি করার কৌশল।

প্রকারান্তরে অমিত্রচ্ছন্দ বিরচিত হইতে পারে কিনা, সে একটি স্ব-তন্ত্র কথা, কিন্তু বঙ্গভাষার যেরূপ প্রকৃতি এবং অদ্যাবধি তাহাতে যে নিয়মে পদ্য রচনা হইয়া আসিয়াছে তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে, এই প্রণালী অতি সহজ ও শুদ্ধ প্রণালী, হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ অনুসারেও বঙ্গভাষার ছন্দ রচনা হইতে পারে এবং ভুবনচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত ছন্দকুসুম গ্রন্থেও সেই প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে ; কিন্তু বোধ হয় যে, যতদিন সচরাচর কথোপকথনে আমাদের দেশে বর্ণ অনুসারে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের প্রথা প্রচলিত না হয়, ততদিন সে প্রণালীতে পদ্য রচনা করা পণ্ডশ্রম মাত্র—ইহা ছন্দকুসুম পাঠ করিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে। পরন্তু যদি কখন বঙ্গভাষার প্রকৃতির ততদূরে বৈলক্ষণ্য ঘটে এবং লোকে সামান্য কথোপকথনে হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণের অনুবর্ত্তী হন, তবে সে প্রণালী যে উৎকৃষ্টতর এবং তাহাতেই পদ্য বিরচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তৎপক্ষেও সংশয় নাই।

[এই ভুমিকা লেখার তারিখ, ১৩ই আশ্বিন, বঙ্গাব্দ, ১২৭৪ (১৮৬৭)]

* হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত এবং পরবর্তীকালে সংশোধিত এই ভূমিকাটি মেঘনাদবধ কাব্যের ষষ্ঠ সংস্করণে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত এবং সাহিত্য পরিষদ্-প্রকাশিত মধুসূদন গ্রন্থাবলী থেকে পুনর্মুদ্রিত।—সম্পাদক।

বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদন প্রতিভা

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯)

বঙ্গসাহিত্যের আকাশে মধুসূদন যখন উদিত হইলেন, তখনও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রতিভার স্নিগ্ধ জ্যোতি তাহা হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। কোথায় আমরা গুপ্ত কবির রসিকতা ও চিত্তরঞ্জক ভাবসকলের মধ্যে নিমগ্ন ছিলাম, আর কোথায় আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধক্ ধক্ করিয়া কি প্রচণ্ড দীপ্তি উদিত হইল। বাংলা সাহিত্যে সেই অপূর্ব প্রদোষকালের কথা আমরা কখনই বিস্মৃত হইব না। সংস্কৃত কবি এক স্থানে বলিয়াছেন ঃ

যাত্যেকতোস্তশিখরং পতিরোষধীনাং
আবিষ্কৃতারুণ পুরঃসর একতোর্কঃ।

একদিকে ওষধিপতি চন্দ্র অস্ত যাইতেছেন, অপরদিকে অরুণকে অগ্রসর করিয়া দিবাকর দেখা দিতেছেন।

বঙ্গসাহিত্যজগতে যেন সেই প্রকার দশা ঘটিল! ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভার কমনীয় কান্তির মধ্যে মধুসূদনের প্রদীপ্ত রশ্মি আসিয়া পড়িল। বঙ্গসাহিত্যের পাঠকগণ আনন্দের সহিত এক নূতন জগতে প্রবেশ করিলেন। মধুসূদনের গ্রন্থাবলী যখন প্রকাশিত হইল, তখন বঙ্গসমাজে মহা আলোচনা উপস্থিত হইল। বঙ্গীয় পাঠকগণ মধুসূদনের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ দুই দলে বিভক্ত হইলেন। একদল 'প্রদানিয়া' 'সান্ত্বনিয়া' প্রভৃতি পদকে বাঙ্গালা ভাষায় যথেচ্ছাচার বলিয়া উপহাস ও বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন; এবং মধুসূদনের অনুসরণে কাব্য রচনা করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার প্রমাণ স্বরূপ 'ছুছুন্দরী বধ' কাব্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যাঁহারা ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইতে চান, তাঁহারা পণ্ডিতপ্রবর রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের রচিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে' উক্ত কাব্য হইতে উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিয়া দেখিবেন। এক পক্ষ একদিকে যেমন এরূপ বিরোধী, অপর পক্ষ অপর দিকে তেমন গোঁড়া। স্কুল ও কলেজের উচ্চশ্রেণীর অধিকাংশ বালক এই গোঁড়ার দলে প্রবেশ করিল। নব-প্রণীত অমিত্রাক্ষর ছন্দ কিরূপে ছন্দ ও গতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পড়িতে হইবে, তাহা সকলে বুঝিতে পারিত না; দুই একজন অগ্রসর চালাক ছেলে মধুসূদনের নিজের মুখে শুনিয়া আসিয়াছে বলিয়া আমাদিগকে পড়িয়া শুনাইত। এক জন পড়িত বিশজন শুনিত। আমরা ঐ চালাক ছেলেদিগকে খুব বাহাদুর মনে করিতাম। এইরূপে ইংরাজ কবি কাউপার যেমন পোপ ও ড্রাইডেনের ছন্দ-নিগড়ে

দৃঢ়বন্ধ ইংরাজী কাব্যে স্বাধীনতা ও ওজস্বিতা প্রবিষ্ট করিয়া নবজীবন আনয়ন পক্ষে উপায় স্বরূপ হইয়াছিলেন, তেমনি মধুসূদনের অলৌকিক প্রতিভা ভারতচন্দ্র ও গুপ্ত কবির রচিত ছন্দ-নিগড় হইতে বঙ্গীয় কাব্যকে উদ্ধার করিয়া তাহাতে ওজস্বিতা ঢালিয়া নবজীবনের সঞ্চার করিল ! মধুসূদন প্রধানতঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দে নিজ প্রতিভাকে প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া এইরূপ মনে করিতে হইবে না যে, মিত্রাক্ষর ছন্দে তিনি কম নিপুণ ছিলেন। তাঁহার রচিত ব্রজাঙ্গনা কাব্য তাহার প্রমাণ। ইহাতে তিনি মিত্রাক্ষরে সরল সুমিষ্ট কবিতাতে মধু ঢালিয়া রাখিয়াছেন।*

---

* দ্রষ্টব্য ঃ শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৯০৪)। নিউ এজ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৭/পৃঃ ২০৪-২০৫। রচনার শিরোনাম সম্পাদকের দেওয়া। —সম্পাদক।

মধুসূদন দত্ত

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং বাংলা দেশে আবির্ভূত সকল কবির যশ সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া গেল একজন সত্যকারের মহান কবির কাব্য সৃষ্টিতে। সেই মহান কবি বলিতে আমরা অবশ্য মধুসূদন দত্তকে বুঝাইতেছি। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ পরিধিতে এমন কোন কাব্য নাই যা মেঘনাদবধের সমুন্নতির (Sublimity) নিকটবর্তী হইবার যোগ্য—মহাকাব্যের মধ্যে এই কাব্যখানি সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। সাহিত্যে সমুন্নতি সম্বন্ধে যাঁহাদের বোধ আছে, যাঁহারা তাহার মর্মগ্রহণে সমর্থ, তাঁহারা এই মহান গ্রন্থ পড়িয়া শ্রদ্ধা এবং বিস্ময়ের অনুভূতিতে জাগ্রত হইবেন—যে ধরনের অনুভূতির সাহায্যে খুব কম কবিই পাঠককে উদ্দীপ্ত করিতে পারেন। এই দৃঢ়চিত্ত লেখককে অকপটে নিঃসন্দিগ্ধভাবে তিনি খুবই উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়া অভিহিত করিবেন। ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, হোমার, দান্তে, শেক্সপীয়র প্রভৃতি সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম কবিদের পরবর্তী স্তরে তাঁহারা তাঁহার স্থান নির্দিষ্ট করিবেন।

মধুসূদনের সৃষ্টির সর্বাধিক গণনীয় বৈশিষ্ট্য হইল ভাবচিন্তার সমুন্নতি এবং পরিকল্পনার ঐশ্বর্য। তাঁহার কল্পনাও ঐশ্বর্যময়, আড়ম্বরপূর্ণ এবং বলা চলে প্রায় অফুরন্ত। কোমলতায়, বিষাদে, চিত্রকল্পের প্রাচুর্যে, ঔজ্জ্বল্যে এবং বর্ণনার বৈচিত্র্যে মধুসূদনের স্থান বাঙালী কবিদের সর্বাগ্রে। মেঘনাদবধ ব্যতীত অমিত্রচ্ছন্দে তিনি আরও দুইটি কাব্য লিখিয়াছিলেন—যে ছন্দের তিনি ছিলেন আবিষ্কারক। তিলোত্তমাসম্ভব-এ দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ বিবৃত ; এই কাব্যে পূর্বোক্ত দেবতারা অপূর্বসুন্দরী একটি নারীর সাহায্যে অসুরদের পরাজিত করিয়াছিলেন। সেই নারী দুই অসুর ভ্রাতার মধ্যে ঘৃণা এবং ঈর্ষা জাগ্রত করিয়াছিল—যাহার পরিণতি দুই অসুর ভ্রাতার মৃত্যুতে। প্রেমিকদের উদ্দেশে নয়জন নায়িকার পত্রসমষ্টি বীরাঙ্গনা কাব্যের বিষয়বস্তু। আমাদের নির্দেশিত মেঘনাদবধ-এর কাব্যসৌন্দর্যের সমপর্যায়ভুক্ত না হইলেও এই দুইখানি কাব্যও প্রায় সমান সৌন্দর্যমণ্ডিত। মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী নাটকগুলিও কোন কোন অংশে গভীর অনুভূতিপূর্ণ এবং বঙ্গভাষার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী।

অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্তনে মধুসূদনের দৃঢ়চিত্ততাকে মনস্বী রমেশচন্দ্র দত্ত অভিনন্দিত করিয়াছিলেন এইভাবে ঃ

বিরোধী শিবিরের তীব্র আক্রমণ এবং ব্যঙ্গের মধ্যে মধুসূদন অবিচলিত ছিলেন। তাঁর এই দৃঢ়চিত্ততার মধ্যে প্রতিভার যে মহত্ত্ব, লক্ষ্যের যে সমুন্নতি এবং এষণার অনমনীয় শৌর্য প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। মহত্তর প্রয়াস এবং উচ্চতর লক্ষ্য অর্জনের দ্বারা তিনি ইহা প্রমাণ করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন যে, তিনিই সঠিক পথের নির্দেশ দিয়াছেন, বৃহত্তর বিরোধী পক্ষ ভ্রান্ত পথে চালিত। মধুসূদন মহৎ উপায়ে বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহার সমালোচকদের প্রতি কাদা ছুঁড়িলেন না, মহত্তর প্রয়াসে কৃতকার্যতা লাভ করিয়া তিনি তাঁহার কাজের মূল্য তাঁহাদের বুঝাইয়া দিলেন, এবং তাঁহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। সমস্ত বাঙালী অনুভব করিলেন, জাতির সাহিত্যাকাশে নতুন আলোর রেখা দেখা দিয়াছে, একটি প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা আবির্ভূত হইয়াছে।*

* মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিত এবং Stanhope Press, 249, Bowbazar Street, Calcutta (সনের উল্লেখ নেই) থেকে প্রকাশিত The Literature of Bengal নামক ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থের অংশ বিশেষ সম্পাদক কর্তৃক অনূদিত।--সম্পাদক।

মেঘনাদবধ কাব্য সমালোচনা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)

আমাদের সমালোচকগণ প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত 'মেঘনাদবধ কাব্য' একটি এপিক বা মহাকাব্য।

এক্ষণে দেখা যাউক, ইউরোপীয় এপিক ও আমাদের মহাকাব্যের মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কিনা, উহাদের মুখ্য তাৎপর্য্য একই কিনা এবং 'এপিক কাব্যে'র স্থলে আমরা 'মহাকাব্য' প্রয়োগ করিতে পারি কিনা।

প্রসিদ্ধ ইংরাজি আলংকারিক Hugh Blair বলেন : "এপিক কবিতার প্রকৃতি সহজভাবে এইরূপ বর্ণনা করা যাইতে পারে যে, কবিতার আকারে কোন প্রসিদ্ধ অনুষ্ঠানের আবৃত্তি করা।" তিনি আরও বলেন :

"মনুষ্যের পূর্ণতা সম্বন্ধে আমাদিগের কল্পনার পরিসর বৃদ্ধি করা, আর এক কথায়, আমাদিগের বিস্ময় ও ভক্তিরসের (Admiration) উদ্রেক করাই এপিক কবিতার উদ্দেশ্য। বীরোচিত ক্রিয়াকলাপ এবং উন্নত চরিত্রের বর্ণনা ভিন্ন এই উদ্দেশ্য কখনও সাধিত হইতে পারে না। কারণ মনুষ্য মাত্রই উন্নত চরিত্রের ভক্ত ও পক্ষপাতী। এই সকল রচনায় বীরত্ব, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়, বিশ্বস্ততা, বন্ধুত্ব, ধর্ম্ম, ঈশ্বরভক্তি, উদারতা প্রভৃতি উন্নত ভাব সকল অতি উজ্জ্বলবর্ণে বর্ণিত হইয়া আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে আনীত হয় এবং এইরূপে সাধু লোকদিগের প্রীতি আকৃষ্ট হয়, তাঁহাদিগের সংকল্পে ও দুঃখ দুর্দ্দশায় আমাদিগের ঔৎসুক্য ও মমতা জন্মে, আমাদিগের হৃদয়ে উদার জনহিতকর ভাব সকল জাগরিত হয়, ইন্দ্রিয়-কলুষিত হীন কার্য্যের চিন্তা সকল অপসারিত হইয়া আমাদিগের মন নির্ম্মল হয় এবং উন্নত ও বীরোচিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমাদিগের হৃদয় অভ্যস্ত হয়। "বিশেষরূপে আলোচনা করিতে গেলে এপিক কাব্যকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া দেখা যাইতে পারে—প্রথমতঃ, কাব্যগত বিষয় কিম্বা কার্য্য সম্বন্ধে, দ্বিতীয়তঃ, কর্ত্তা কিম্বা পাত্রদিগের সম্বন্ধে—তৃতীয়তঃ, কবির আখ্যান ও বর্ণনা সম্বন্ধে।

এপিক কবিতাগত কার্য্যের তিনটি লক্ষণ থাকা আবশ্যক। কার্য্যটি এক হইবে, মহান হইবে ও উপাদেয় হইবে। এই তো গেল য়ুরোপীয় এপিকের সারমর্ম্ম। এক্ষণে আমাদিগের আলংকারিকগণ মহাকাব্যের কিরূপ লক্ষণ দিয়াছেন দেখা যাউক।

'সাহিত্য দর্পণে' আছে : 'কাণ্ড-বিভক্ত কাব্যশাস্ত্র বিশেষকে মহাকাব্য বলে। উহার একটি নায়ক হয় দেবতা হইবে, নয় ধীরোদাত্ত গুণান্বিত কোন সদ্বংশজাত

ক্ষত্রিয় হইবে। সৎকুলোদ্ভব একবংশজাত কতগুলি রাজাও উহার নায়ক হইতে পারে। শৃঙ্গার, বীর ও শান্ত—এই কয়টি রসের মধ্যে একটি রস উহার অঙ্গী এবং অন্য রসগুলি উহার অঙ্গ হইবে। উহাতে সমস্ত নাটকীয় সন্ধিগুলি থাকিবে। কখন কখন খলাদির নিন্দাবাদ ও সাধুদিগের গুণকীর্ত্তনে উহার আরম্ভ হয়। সমস্ত পদ্যে একটি ছন্দ থাকিবে, কেবল অবসানে অন্য ছন্দ হইবে। কখন কখন উহাতে নানা ছন্দময় সর্গ দৃষ্ট হয়। উহা নাতিস্বল্প ও নাতিদীর্ঘ হইবে, উহাতে অষ্টাধিক সর্গ থাকিবে। সর্গান্তে ভাবী সর্গের কথা সূচনা থাকিবে। সন্ধ্যা, সূর্য্য, চন্দ্র, রজনী প্রদোষ, অন্ধকার, ঋতু, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, মৃগয়া, শৈল, বন, সাগর, সম্ভোগ, বিচ্ছেদ, মুক্তি, স্বর্গ, নগর, যজ্ঞ, রণপ্রয়াণ, বিবাহ, মন্ত্র, পুত্রজন্ম ইত্যাদি বিষয় যথাযোগে ও সাঙ্গোপাঙ্গরূপে উহাতে বর্ণিত হইবে। কবির নামে অথবা বৃত্তান্তের নামে কিম্বা নায়কের নামে কাব্যের নাম হইবে। সর্গের মধ্যে যে কথা সর্বাপেক্ষা বেশী উপাদেয়, তাহারই নামে সর্গের নাম হইবে। মহাকাব্যের দৃষ্টান্ত যথা, রঘুবংশ, শিশুপাল বধ, নৈষধ ইত্যাদি। আর্য্য মহাকাব্যকে আখ্যান বলে। যথা, 'মহাভারত'।

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহাতে মহাকাব্যের প্রকৃত লক্ষণ কি, তাহার মর্ম্মগত তাৎপর্য্য কি তাহার প্রাণগত ভাব কি—সে বিষয়ে কোন কথা প্রাপ্ত হওয়া যায় না—উহাতে কেবল বাহ্য আকার ও বাহ্য উপকরণের কথাই আছে।

এপিক কাব্যের যে সমস্ত লক্ষণ ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় এপিক কাব্যগত বিষয়টি এক হইবে, মহান হইবে ও উপাদেয় হইবে। যদিও সাহিত্য দর্পণকার ঠিক এইরূপ মহাকাব্যের লক্ষণ দেন নাই, তথাপি তাঁহার বিবৃত লক্ষণগুলি হইতে য়ুরোপীয় এপিকের সারমর্ম্মটি কোন প্রকারে উদ্ধার করা যাইতে পারে। তিনি নায়ক ও বৃত্তান্ত বিষয়ের যেরূপ লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে মহৎ অনুষ্ঠান ও মহৎ চরিত্রের বিকাশ আপনা হইতেই সূচিত হইতেছে। তিনি যে বলিয়াছেন, মহাকাব্যে নাটকীয় সন্ধিগুলি থাকা চাই, উহাতে য়ুরোপীয় এপিক কাব্যের কাব্যগত একত্বও সূচিত হইতেছে। তাহার পর সাহিত্য দর্পণে যে আছে: সন্ধ্যা, চন্দ্র, সূর্য্য, রণপ্রয়াণ প্রভৃতি বিষয় মহাকাব্যে বর্ণনীয়,—তাহার তাৎপর্য্য এই, একটি মহৎ ব্যাপারের বর্ণনা করিতে গেলে এবং সেই বর্ণনা উপাদেয় করিতে হইলে কাব্যমধ্যে বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা করা আবশ্যক। উক্ত লক্ষণগুলি এপিক কাব্যের লক্ষণের সহিত সাধারণ একরূপ মিলাইয়া লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সাহিত্য দর্পণ যে বলিয়াছেন, শৃঙ্গার রসও মহাকাব্যের অঙ্গী হইতে পারে—এই কথাটিতে একটু গোল বাধে। কারণ শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য থাকিলে এপিক কাব্যের গাম্ভীর্য্য রক্ষিত হইতে পারে কিনা এবং তাহাতে মহৎ ও উচ্চ ভাবের তেমন স্ফূর্ত্তি পায় কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। সে যাহা হউক,—এপিক কাব্য ও মহাকাব্যের মধ্যে ঐক্য থাকুক বা না থাকুক—ইহা নিঃসংশয়রূপে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত য়ুরোপীয় এপিকের আদর্শেই তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্য

রচনা করিয়াছেন। অতএব য়ুরোপীয় এপিকের লক্ষণ অনুসারেই আমরা তাঁহার কাব্যের সমালোচনা করিব।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, মেঘনাদবধ কাব্যের কার্য্যটি এক কিনা। অ্যারিস্টটল বলেন, কাব্যের একত্ব এপিক কবিতার পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজনীয়। কারণ, ইহা নিশ্চিত, যে উপন্যাস এক ও অখণ্ড, যাহাতে ঘটনাগুলি পরস্পরের উপর পরস্পর লম্বমান, এবং একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকল ঘটনাই উন্মুখ,—তাহাতে পাঠকের যতদূর মনোরঞ্জন হইতে পারে, তাহার হৃদয় যতদূর আকৃষ্ট হইতে পারে, এরূপ, ইতস্ততবিক্ষিপ্ত ও পরস্পরনিরপেক্ষ ঘটনার বর্ণনায় কখনো হইতে পারে না। অ্যারিস্টটল আরও বলিয়াছেন, এই একত্ব একজন মনুষ্যেরকার্য্যকলাপে বদ্ধ থাকিলেই হইবে না, কিম্বা কোন নির্দ্দিষ্ট কালের ঘটনা বর্ণনা করিলেই যথেষ্ট হইবে না। কিন্তু রচনার বিষয়টির মধ্যেই একত্ব থাকা আবশ্যক। বড় বড় এপিক কাব্য মাত্রেই কার্য্যের একত্ব উপলব্ধ হয়। ইটালি দেশে ঈনিয়সের বাস স্থাপন—এই বিষয়টি বার্জ্জিলের কাব্যগত বিষয়। ঐ কাব্যের আদ্যোপান্তে ঐ উদ্দেশ্যটি জাজ্বল্যমান। ওডিসর একত্বও এই একই প্রকৃতির। অর্থাৎ স্বদেশে য়ুলিসিসের প্রত্যাগমন ও পুনর্বসতিই উহার উদ্দেশ্য। এখিলিসের ক্রোধ ও তদুদ্ভূত ফলাফল ইলিয়াড্‌ কাব্যের বিষয়। অখৃষ্টান্‌দিগের নিকট হইতে জেরুসালেম উদ্ধার করা ট্যাসোর এবং স্বর্গ হইতে আদমের বহিষ্করণ মিল্টনের রচনাগত বিষয়। ঐ সকল কাব্যেই উপন্যাসের একত্ব অক্ষুণ্নভাবে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদের বধ সাধন কিংবা শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের পুনর্জীবন লাভ—উহার কোনটি কাব্যগত বিষয় উহা বুঝা নাও যাইতে পারে। কারণ কবি মেঘনাদের বধ সাধন করিয়াই কাব্যের উপসংহার করেন নাই ; তাহার পরেও লক্ষ্মণের শক্তিশেলের ঘটনা আনিয়া এবং রামকে নরক পরিভ্রমণ করাইয়া অনেকটা নিরর্থক বাড়াইয়াছেন। অ্যারিস্টটলের নিয়মানুসারে ইহাতে কাব্যগত একত্বের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইয়াছে বলিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, দেখা যাউক, মেঘনাদবধের বর্ণিত কার্য্যটি মহৎ ও বৃহৎ কিনা। কার্য্যটি মহৎ ও বৃহৎ হইলে সেই সঙ্গে সেই কার্য্যের কর্তাকে অর্থাৎ নায়ককেও মহাশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া অনুমান করা যায়। যদিও সমস্ত রামায়ণের মধ্যে সীতা উদ্ধারই সর্বাপেক্ষা মুখ্য ও বৃহৎ অনুষ্ঠান, তথাপি মেঘনাদের বধ-সাধনরূপ কার্য্যকে কবিবর মধুসূদন তাঁহার নিজ কাব্যে প্রাধান্য দেওয়ায় বিশেষ যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা বলা যায় না। যেহেতু সীতা উদ্ধারের পক্ষে মেঘনাদবধ একটি প্রকৃষ্ট ও প্রধান উপায় ; যে মেঘনাদের প্রতাপে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু সর্ব্বদাই সশঙ্কিত, তাহাকে বধ না করিতে পারিলে সীতা উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব হইত। কিন্তু কবি লক্ষ্মণ বা রামকে নায়ক না করিয়া রাবণ ও ইন্দ্রজিতকে নায়করূপে নির্বাচন করায় তাঁহার কাব্যগত মহত্ত্ব ও গৌরবের বিশেষ হানি হইয়াছে সন্দেহ নাই। রাবণ কিম্বা ইন্দ্রজিত

পাশব বীরত্বেরই আদর্শস্থল। কিন্তু যে বীরত্বের সহিত ক্ষমা দয়া ন্যায় বাৎসল্য ভক্তি মিশ্রিত, সেই বীরগুণে ভূষিত উন্নত চরিত্রের মহাপুরুষই মহাকাব্যের উপযুক্ত নায়ক হইতে পারেন। মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক যে কে তাহা আমরা কাব্যের নাম মাত্র পাঠেই অবগত হইতে পারি না। কারণ, কাব্যখানির নাম মেঘনাদবধ, উহাতে মেঘনাদকেও নায়ক বুঝাইতে পারে এবং মেঘনাদ বধের কর্ত্তা লক্ষ্মণকেও নায়ক মনে হইতে পারে। তবে, আসল নায়ক ধরা পড়ে কোথায়? না, যেখানে কবি লক্ষ্মণ ও মেঘনাদকে একত্রে আনিয়াছেন। লক্ষ্মণকে তস্কর ও সর্পের ন্যায় অলক্ষিতভাবে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করাইয়া কাপুরুষের ন্যায় অন্যায় যুদ্ধে নিরস্ত্র অথচ বীরদর্পে দর্পিত মেঘনাদকে বধ করাইয়া লক্ষ্মণের চরিত্র যারপর নাই হীনবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন এবং মেঘনাদকে বীরত্ব ও উদারতাগুণে ভূষিত করিয়া নায়ক স্থানীয় করিয়া তুলিয়াছেন। মেঘনাদের পরাজয়েও জয় হইয়াছে এবং লক্ষ্মণের জয়েতেও বাস্তবিক পরাজয় হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এ বিষয়ে কবির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত—তিনি যাঁহাকে ইচ্ছা তাঁহার কাব্যের নায়ক করিতে পারেন, এবং তাঁহার পাত্রদিগকে যেরূপ করিয়া ইচ্ছা আঁকিতে পারেন। এই বিষয়ে Blair যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি যথার্থ কথা। তিনি বলেন, সকল চরিত্রকেই যে সৎ-চরিত্র হইতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই—স্থল বিশেষে অসম্পূর্ণ চরিত্র—এমনকি পাপিষ্ঠ চরিত্রেরও অবতারণা করা যাইতে পারে—কিন্তু কাব্যের যাহারা কেন্দ্র স্থল, সেই নায়কদিগের চরিত্র পাঠ করিয়া যাহাতে পাঠকের মনে ঘৃণা ও অবজ্ঞার উদ্রেক না হইয়া প্রত্যুত বিস্ময় প্রীতি ও ভক্তিরসের উদয় হয়, এরূপ রচনা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ মাইকেল মধুসূদনের পক্ষে এ দোষটি নিতান্ত অমার্জ্জনীয়। আপনার ছাগকে কেউ মুণ্ডের দিক দিয়াই কাটুক, কিম্বা লেজের দিক দিয়াই কাটুক, সে বিষয়ে কাহারও আপত্তি না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু যাহা কবির একমাত্র নিজের ধন নহে, যাহা সমস্ত ভারতবর্ষের সম্পত্তি, তাহা লইয়া এরূপ লণ্ডভণ্ড করিলে চলিবে কেন? মূল গ্রন্থে যে সমস্ত চরিত্র উন্নত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে কবি আরও উন্নত করিয়া চিত্রিত করুন,—তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু সেই মূল গ্রন্থের বর্ণিত উন্নত চরিত্রদিগকে হীন করিয়া আঁকিবার তাঁহার কি অধিকার আছে? বিশেষতঃ যাঁহারা প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ের সামগ্রী—চির আরাধ্য দেবতা—সেই রাম-লক্ষ্মণকে এরূপ হীনবর্ণে চিত্রিত করা কি সহৃদয় জাতীয় কবির উচিত? রাম-লক্ষ্মণ থাকিতে মেঘনাদকে কিছুতেই নায়ক করা যাইতে পারে না—মহাকাব্যের উপযুক্ত অত বড় মহান চরিত্র রামায়ণে কেন, মহাভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোন কাব্যে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তাঁহাদিগকে ছাঁটিয়া রাবণ কিম্বা মেঘনাদকে নায়ক করিবার তো কোন অর্থই পাওয়া যায় না।

সাধারণতঃ, চরিত্র চিত্রে কবিবর মধুসূদনের ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই। মেঘনাদ-বধ কাব্যের নায়ক মেঘনাদকে আমরা অতি অল্পই দেখিতে পাই। যাহা কিছু

তাঁহার চরিত্রে স্ফূর্তি পাইয়াছে সে সেই যজ্ঞাগারের দৃশ্যে। তাঁহার পাত্রদিগের চরিত্রে সূক্ষ্ম প্রভেদ সকল উপলব্ধি হয় না। রাবণও বীর, মেঘনাদও বীর—রাবণও বিলাসী, মেঘনাদও বিলাসী। প্রভেদের মধ্যে একজন পিতা, আর একজন পুত্র। যেমন এক জাতীয় হইলেও প্রত্যেক লোকের মুখশ্রী বিভিন্ন—সেইরূপ সাধারণত এক প্রকৃতির হইলেও প্রত্যেক লোকের চরিত্রে সূক্ষ্ম তারতম্য ও বৈষম্য লক্ষিত হয়। এই বৈষম্যগুলি পরিস্ফুটরূপে চিত্রিত করিতে পারিলে কবির বিশেষ প্রতিভা প্রকাশ পায়। এ বিষয়ে ব্যাস অদ্বিতীয়। য়ুরোপীয় কবিদিগের মধ্যে এই অংশে হোমর সর্বাপেক্ষা ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার নীচে ট্যাসো। মেঘনাদবধ কাব্যে যতগুলি পুরুষ চরিত্র আছে, তন্মধ্যে রাবণের চরিত্রই সর্বাপেক্ষা প্রস্ফুটিত ও আত্মসঙ্গত হইয়াছে। কিন্তু মূল রামায়ণে যেরূপ রাবণের দুর্ধর্ষ প্রচণ্ড ভাব উপলব্ধি হয়, মেঘনাদবধ কাব্যে সেরূপ কিছুই পাওয়া যায় না। মূল রামায়ণেও তাঁহার বিলাপ আছে বটে, কিন্তু তাঁহার শোক ও রোষের ভাব এমন নিপুণভাবে মিশ্রিত করিয়া দেখানো হইয়াছে যে, তাঁহাতে তাহার চরিত্রগত ভীষণ গাম্ভীর্যের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। মূল রামায়ণে রাবণের বিলাপ বর্ণনা করিতে করিতে এক স্থলে আছে যে, রাবণের নেত্র হইতে কিরূপ অশ্রু পতিত হইতেছিল? না, যেমন জ্বলন্ত দীপশিখা হইতে তপ্ত তৈল বিন্দু বিন্দু স্খলিত হয়। এই একটি উপমা দ্বারা রাবণের রোষদীপ্ত শোক কেমন জ্বলন্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাঁহার চরিত্র কেমন সুন্দর রূপে চিত্রিত হইয়াছে। সমস্ত বাধাবিঘ্ন বিপদকে তুচ্ছ করিয়া দানব-বালা প্রমীলা যে সময়ে পতি দর্শনে যাত্রা করিতেছেন সে দৃশ্যটি অতি চমৎকার—তাহা পাঠকের মনকে বীরভাবে উত্তেজিত করিয়া তোলে। সমস্ত মেঘনাদবধ কাব্যে প্রমীলার চরিত্র বেশ নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। দেবদেবীগণের চরিত্র বর্ণনা করিতে গিয়া মেঘনাদবধ কাব্যে অনেক সময় দেবোচিত গাম্ভীর্য রক্ষিত হয় নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, মেঘনাদবধ কাব্যের কার্যটি মহান হইলেও তৎসম্পর্কীয় পাত্রদিগের চরিত্রের মহত্ত্ব তেমন সুন্দর রূপে বিকশিত হয় নাই। ঐ বৃহৎ কার্যটি সাধন করিবার জন্য যে সকল সরঞ্জামের আবশ্যক, তাহা খুব জমকালো হইয়াছে সন্দেহ নাই, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল হইতে তাহার বিস্তৃত আয়োজন অত্যন্ত ঘটা করিয়া আহরণ করা হইয়াছে। বলিতে কি মেঘনাদবধ কাব্যে সরঞ্জাম ও কৌশলের অভাব নাই। কিন্তু আসল কথা চরিত্রের মহত্ত্ব বিকাশ—যাহা মহাকাব্যের প্রাণ তাহা মেঘনাদ-বধ কাব্যে কোথায়?

অবশেষে দেখা যাক্, মেঘনাদবধ কাব্য আখ্যান ও বর্ণনা অংশে উপাদেয় হইয়াছে কিনা। কাব্যগত কার্যটি বৃহৎ ও মহৎ হইলেই যে উপাদেয় হইবে এরূপ কোন কথা নাই। কারণ, কেবলমাত্র সাহসের কার্যগুলি, যতই কেন বীরোচিত হোক না, —নীরস ও বিরক্তিকর হইতে পারে। কিন্তু কবিবর মাইকেল মধুসূদন তাঁহার কাব্য

মধ্যে বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা করিয়া, দেবদেবী প্রভৃতি অলৌকিক সরঞ্জাম (machinery) আনয়ন করিয়া, দুই একটি সুন্দরী প্রকরী (Episode) প্রবর্ত্তিত করিয়া এবং যাহাকে এপিক কবিতার পাকচক্র বলে (Intrigue) সেই নায়কদিগের বাধাবিঘ্ন সকল যথোপযুক্ত রূপে কাব্য মধ্যে বিন্যাস করিয়া তাঁহার কাব্যটিকে একরূপ বেশ উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছেন।

এপিক কাব্যগত আখ্যান-বিন্যাসের দুইপ্রকার পদ্ধতি আছে। কবি আপনার মুখেই সমস্ত উপন্যাসটি বর্ণনা করুন কিম্বা তাঁহার কাব্যগত বিষয়ের পূর্ব্ব ঘটনাগুলি তাঁহার পাত্রদিগের মুখেই বর্ণনা করুন,—তাহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কবিবর হোমর তাঁহার ইলিয়াডে প্রথমোক্ত প্রথাটি ও তাঁহার ওডিসিতে দ্বিতীয়োক্ত প্রথাটি অবলম্বন করিয়াছেন। মাইকেল মধুসূদনও তাঁহার কাব্যগত মূল বিষয়ের পূর্ব্ববর্তী আনুষঙ্গিক ঘটনাগুলি সীতা ও সরমার কথোপকথনে ব্যক্ত করিয়া সুকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই। যদিও মাইকেল মধুসূদন চরিত্র চিত্রে বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন নাই কিন্তু বাহ্য দৃশ্যগুলি একরূপ মন্দ চিত্রিত করেন নাই; তাঁহার অনেকগুলি ছবি বেশ সজীব ও জীবন্ত। আমার বোধ হয়, প্রাকৃতিক দৃশ্য অপেক্ষা তিনি লৌকিক দৃশ্যগুলি চিত্রিত করিতে অধিক সফল হইয়াছেন। তাঁহার চিত্রকর্মের প্রণালী এই যে, তিনি প্রত্যেক খুঁটিনাটি ধরিয়া চিত্র করেন—দুই একটি পোঁচ দিয়া চরিত্রটিকে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন না—তাঁহার রাবণের সভা বর্ণনা—লংকাপুরী বর্ণনা—রণপ্রয়াণের বর্ণনা পাঠ করিলেই ইহা উপলব্ধ হইবে। তাঁহার ভাষায় এপিক্ কবিতাসুলভ তেজস্বিতা ও বেগবত্তা আছে সন্দেহ নাই,—কিন্তু তাঁহার পাত্রদিগের কথাবার্ত্তায় হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস নাই—অকৃত্রিম আবেগ নাই—যেমন সকলেই অভিনয় করিতেছেন বলিয়া বোধ হয়। উত্তর প্রত্যুত্তরগুলি বেশ কাটাকাটা, সাজানো-গোছানো, কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের অভাব উপলব্ধি হয়। উহাতে প্রেমের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের স্থলে নাগরিক রসিকতা, প্রকৃত শোকের স্থলে আড়ম্বরময় বিলাপ, এবং প্রকৃত বীরত্বের স্থলে বীরত্বের আস্ফালনই অধিক প্রকাশ পায়। প্রকৃতির বর্ণনায় আমাদের কবি অধিকাংশ স্থলে পুরাতন কবিদিগেরই অনুসরণ করিয়াছেন—নূতন ভাব অতি অল্পই আছে। সেই কোকিল, সেই ভ্রমর, সেই পদ্মিনী, সেই চকোর। তাহার উপমাগুলি অনেক সময় কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয়, অনেক সময় মনে হয় উপমা দিবার জন্যই উপমা দেওয়া হইয়াছে। অনেক সময় তিনি অযথা স্থলে 'যথা' প্রয়োগ করিয়া রসভঙ্গ করেন। সাধারণতঃ বলিতে গেলে অলংকারের আড়ম্বরে তাঁহার কবিতায় সরল সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি পায় না। যে সর্গে সীতা সরমার নিকট তাঁহার পূর্ব্ব কাহিনী বলিতেছেন,—সেই সর্গটি অতি চমৎকার—উহার অনেক অংশে স্বাভাবিক কবিত্বের স্ফূর্ত্তি আছে। স্থানে স্থানে তাঁহার রচনায় কুরুচি প্রকাশ পায়। তাঁহার নরক বর্ণনা অত্যন্ত বীভৎসজনক। যদিও ইলিয়াড্ ও মিল্টনেও কোন কোন স্থলে

ঐরূপ বীভৎসজনক বর্ণনা আছে, তাই বলিয়া উহা অনুকরণীয় নহে। কোন ইংরাজ সমালোচক বলেন, ইলিয়াডের তৃতীয় সর্গান্তর্গত হার্পিদিগের উপন্যাস, এবং প্যারাডাইস লস্টের দ্বিতীয় 'বুকের' অন্তর্ভূত পাপ ও মৃত্যুর রূপকটি উক্ত দুইটি প্রসিদ্ধ কাব্য হইতে পরিত্যক্ত হইলেই ভাল হইত।

কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যের যতই দোষ থাকুক না কেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ইহা সুখপাঠ্য। বিচিত্র ঘটনা ও ভাবের সমাবেশ এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের গুণে অত বড় গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের ক্লেশ বা ক্লান্তি বোধ হয় না, প্রত্যুত আমোদ পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে আমরা উহা হইতে যে আমোদ পাই—সাধারণ মানবপ্রকৃতিসুলভ আড়ম্বরপ্রিয়তাই তাহার কারণ। রাজপথে ঘোরঘটা করিয়া, বাদ্য বাজাইয়া, নিশান উড়াইয়া, লোকের কোলাহলে আকাশ পূর্ণ করিয়া, যখন চাকচিক্যময় গিল্টির সাজে সুসজ্জিত কোন প্রতিমাকে বাহির করা হয়—তখন যেরূপ সেই দৃশ্য সাধারণ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও তাহাতে তাহারা আমোদ পায়—মেঘনাদবধ কাব্য পড়িয়া অনেক সময় আমরা যে আমোদ পাই, সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ঐ প্রকারের আমোদ বলিয়া উপলব্ধি হইবে। উহাতে সহজ কবিত্বের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস অতি বিরল, কৃত্রিম আড়ম্বরপূর্ণ অলংকারে উহা পরিপূর্ণ। কাব্যখানি পাঠ করিয়া আমোদ পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না।

কিন্তু একটি কথা শেষে বলা আবশ্যক। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাঙ্গালা পদ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করিয়া আমাদের সাহিত্যরাজ্যে একটি শুভ বিপ্লব সংসাধিত করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার রচনার স্থানে স্থানে বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ হাস্যাস্পদ প্রয়োগ থাকিলেও শিথিল বঙ্গীয় পদ্যের সংশ্লিষ্টতা সাধন করিয়া সাধারণতঃ তিনি বঙ্গ সাহিত্যের উপকার করিয়া গিয়াছেন বলিতে হইবে। অতএব আর যদি কিছুরই জন্য না হয়, অন্তত এই উপকারটির জন্য তাঁহার নিকট আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।*

— শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই প্রবন্ধটি ১৮০৪ শকের (আশ্বিন, ১২৮৯ বঙ্গাব্দ, ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দ 'ভারতী' পত্রিকার ষষ্ঠ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত সংখ্যা থেকে এখানে পুনর্মুদ্রিত হলো।—সম্পাদক।

মধুসূদন-প্রতিভা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)

আমাদিগের প্রথম লেখক মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইঁহার জীবনে ও ইঁহার পদ্যে অনেক সৌসাদৃশ্য। জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বাধীনতা, সমাজের প্রতি সমূহ অবজ্ঞা, গ্রন্থেও তেমনি সমস্ত কল্পনার বন্ধনচ্ছেদ। কবি আমাদিগকে তাহার প্রথম দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে (তিলোত্তমা ও মেঘনাদবধ) স্বর্গ, নরক, ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক সব দেখাইয়াছেন। উন্মত্ত কল্পনা উদ্দামভাবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। ইনি সকল ভাষায় ব্যুৎপন্ন কেশরী ছিলেন; ইঁহার মনোমধ্যে নানাজাতীয় ভাবরাশি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। ইনি তাহারই মধ্যে কতগুলি ধরিয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ বহুকাল কেহ অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিবে না। তাঁহার 'তিলোত্তমা' কি মহাকাব্য, না খণ্ডকাব্য? আমি বলি উহা স্বর্গীয় কাব্য। তাঁহার পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী অত্যুৎকৃষ্ট নাটক। তাঁহার ব্রজাঙ্গনা গীতিকাব্যে জয়দেবের সমস্থানীয়। তাঁহার 'বীরাঙ্গনা' বীরাঙ্গনাগণের সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র। পূর্বেই বলিয়াছি, দেশ-দেশান্তরাহৃত ভাবরাশি তাঁহার অন্তরাকাশে ঘুরিয়া বেড়াইত: তিনি তাহাদিগের কয়েকটি একত্র করিয়াছিলেন মাত্র। সেটি সত্য, কারণ তিনি সাত দুই বৎসরের মধ্যে লিখিয়াছিলেন; আর কত কত ভাবমালা যে তাঁহার মনে ছিল, কত ভাব যে তাঁহার সাংসারিক অবস্থার জন্য মনেই মিলাইয়া গিয়াছে। কতই যে তাঁহার অকাল মৃত্যু হেতু বিকাশ পায় নাই, তাহা কে বলিতে পারে? তাঁহার জীবন শোকান্ত মহাকাব্য: তাঁহার গ্রন্থগুলিও সেরূপ শোকান্ত মহাকাব্য; তাঁহার এক এক একখানি গ্রন্থ—এক একখানি রত্ন বা রত্নখনি। কত কবিই যে উহা হইতে রত্ন সঞ্চয় করিয়াছেন, করিতেছেন এবং করিবেন তাহার সীমা নাই। তাঁহার প্রহসন দুইখানি আজিও প্রহসনের অগ্রগণ্য। তাঁহার ন্যায় সর্বতোমুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তি অতি বিরল; যখন যে দেশে এ প্রকার প্রতিভার বিকাশ হয়, তখন সেই দেশ ধন্য এবং পৃথিবীস্থ জাতিসমূহের মধ্যে মহামান্য হয়।*

* 'সাবিত্রী লাইব্রেরীর' প্রথম অধিবেশনে 'বাঙ্গালা সাহিত্য' বিষয়ক প্রস্তাবে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীপ্রদত্ত ভাষণ-এর অংশ বিশেষ, (১২৮৭ বঙ্গাব্দ, ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দ)।—সম্পাদক।

মেঘনাদবধ কাব্য সমালোচনা

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০-১৯০৮)

"মেঘনাদবধ কাব্যের যোগ্য সমালোচনা এখনও হইল না। অথচ এই রূপকপ্রিয় দেশে কোন লেখক যদি অধুনাতন বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া "ভগবান মরীচিমালীর" সহিত ইহার উপমা দিবার লোভটুকু সম্বরণ করিতে না পারেন, তবে তাঁহাকে মনে করিতে হইবে যে 'মেঘনাদই' বঙ্গের 'প্রদীপ্ত প্রভাত তারা'। যিনি বাঙ্গালীকে 'মেঘনাদবধ কাব্য' বুঝাইতে সক্ষম তিনি বুঝাইলেন না। ভরসা ছিল, বঙ্কিমবাবু একবার সে প্রয়াস পাইবেন! কিন্তু তিনি বুঝি আর তাহা করিলেন না। কে তবে এই গুরুতর ব্রত বহন করিবে? প্রবন্ধ লেখকের সে উদ্যম বুঝি কেবল ধৃষ্টতা মাত্র। তবে কথা এই যে, 'মেঘনাদবধ'-এর রীতিমত সমালোচনার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিতেছি না।

হিন্দুসন্তান মাত্রই রামায়ণের উপাখ্যান ভাগের সহিত সুপরিচিত। রামের মহত্ত্ব, তাঁহার চরিত্রের বীরদর্প, জগতে অতুলনীয়া দোষমাত্র পরিশূন্যা সীতার কমনীয়তা, তাঁহার পতিভক্তি, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, সেই বীর পুরুষের চিরোজ্জ্বল নিঃস্বার্থপর বীরভাব;—সংক্ষেপত রামায়ণের সেই স্বর্গীয় ভাব, বালকাবধি হিন্দু সন্তান হৃদয়ে ধারণ করেন। আর সেই সঙ্গে রাবণের বংশাবলীর উপর আমাদের কেমন একটা বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিয়া যায়। কবির 'সৌধকিরীটিনী' লঙ্কা পাঠকের চক্ষে ভাসিতে থাকে। কিন্তু হৃদয়ে স্থান পায় না। লঙ্কার কথা মনে আসিলে নরভুক্ রাক্ষসদের ভীষণ পাপাচার সর্বাগ্রে তাহার মনে পড়ে, আর সেই অশোক বনে চেড়ীদল-বেষ্টিতা, চিরলোকমোহিনী, জনকনন্দিনীর চিত্র মনে করিয়া তিনি ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় অশ্রু বর্ষণ করেন। ইহাই রামায়ণ। অন্ততঃ প্রথম দৃষ্টিতে রামায়ণ ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। "মেঘনাদবধ" কাব্য রামায়ণ মহাকাব্যের পল্লবমাত্র লইয়া রচিত। কিন্তু যেমন কেন পাঠক হউক না, মেঘনাদবধ পাঠকালে তাঁহার মনে হইবে যাহা রামায়ণে নাই 'মেঘনাদে' তাহা পড়িতেছি। 'মেঘনাদে'র রাক্ষসকে ঘৃণা করিতে ইচ্ছা হয় না; —সে ভাবই মনে আসে না। প্রতিবাদে যেন 'জগতের অলঙ্কার' লঙ্কার প্রতি সহানুভূতি হয়, কবি নিজেই বন্ধুকে পত্রে লিখিয়াছিলেন, "People here grumble and say that the heart of the poet in মেঘনাদ is with the Rakshasas! And that is the real truth." অর্থাৎ "এ দেশের লোকেরা অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া থাকে যে, মেঘনাদবধ কাব্যের কবির মনের টান রাক্ষসদের প্রতি, বাস্তবিকই তাহাই

বটে।" জানিয়া শুনিয়া কবি হিন্দুসন্তানের চিরাচরিত সংস্কার স্রোতের বিপরীতে কাব্যতরণী ভাসাইয়াছেন! আপাতত ইহা বড় বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ভাবুক দেখিবেন, এই প্রভেদই মেঘনাদবধ কাব্যের বীজ।

আবার রামায়ণের সেই রাবণকে মনে কর।—যেন প্রলয়ের স্থানচ্যুত গ্রহ, মিল্টনের সেই শয়তানতুল্য!—নরকে রাজ্য করিবে সেও ভাল; তথাপি স্বর্গের দ্বিতীয় অধীশ্বর হইতে চাহেনা। এই দৃশ্য অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যময় বটে, কিন্তু কেমন ভয়ানক! আর মেঘনাদবধের রাবণ! কতকটা ভক্তিপ্রীতির আধার। তিনি নিজ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে, সেতুনিগড়বন্ধ, চিরকল্লোলময়, চিরস্বাধীনতাময় সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া তীব্র ব্যঙ্গের লহরী তুলিয়া বলেন—

'কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর?

যখন পুত্রশোকাতুরা, অভিমানিনী, সাধ্বী চিত্রাঙ্গদা দৃপ্ত বাক্যে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

হায় নাথ, নিজ কর্ম্মফলে
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলে আপনি!

তখন 'মহামন্ত্রবলে' নম্রমুখ ফণীর মত রাবণ নতমুখে তাহা শুনিয়াছিলেন।—যেন নিরুত্তরে নিজের দোষ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। রামায়ণের রাবণ পারিতেন কি? অসভ্যাবস্থায় দুর্বৃত্ত নর যেমন নারীমাত্রকে জঘন্য ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির নিদান মাত্র মনে করে, রামায়ণের রাবণ সেই প্রকৃতির। মেঘনাদবধের রাবণ কতকটা ভক্তি ও প্রীতির আধার। যখন ইন্দ্রজিতের মৃত্যুসংবাদ দিয়া রক্ষোদূতবেশী বিরূপাক্ষ চর অদৃশ্য হইলেন, স্বর্গীয় সৌরভে সভা পূর্ণ হইল,—

দেখিলা রাক্ষসনাথ দীর্ঘজটাবলী
ভীষণ ত্রিশূল ছায়া।

তখন মর্ম্মপীড়িত লঙ্কেশ্বর প্রণাম করিয়া ভক্তি গদ্গদ স্বরে বলিয়াছিলেন,

"এতোদিনে প্রভু
ভাগ্যহীন ভৃত্যে এবে পড়িল কি মনে
তোমার? এ মায়া, হায়, কেমনে বুঝিব
মূঢ় আমি, মায়াময়? কিন্তু অগ্রে পালি
আজ্ঞা তব, হে সর্ব্বজ্ঞ, পরে নিবেদিব
যা কিছু আছে এ মনে ও রাজীবপদে।"

ফলতঃ মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণকে দেখিলে, রামায়ণের রাবণ বলিয়া বড় একটা

না যায় না। 'মেঘনাদের' রাবণ, যেন মানুষ অনেক শোক পাইয়া স্থৈর্য্যলাভ করিয়াছে ;—দুর্বৃত্ত যুবক যেন কতকটা ঠেকিয়া, কতক বুঝিয়া শান্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, অলৌকিক চরিত্র কল্পনা স্থলেও কবি কিয়ৎপরিমাণে মানবচরিত্রের অনুকরণ করিতে বাধ্য। আর অবস্থা বৈষম্যেও একই চরিত্রের যে উত্থান-পতন হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, একথা মনে রাখিলে, ভরসা করি, কেহ কেহ রাবণকে কেবল মাত্র 'কোমল সে ফুলসম' বলিয়া উড়াইয়া দিবেন না।

আমরা যাহা বুঝাইতে চাহি, তাহাতে রাবণ চরিত্রের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে সে চরিত্রকে রামায়ণেতর চরিত্র করিয়া গড়িবার যে তাৎপর্য্য আছে তাহা বুঝাইবার জন্যই এ প্রয়াস পাইলাম। ভাবুক দেখিতে পাইবেন যে, কাব্য মধ্যে এই চরিত্রের বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে। আমাদের মুখ্য প্রয়োজন ইন্দ্রজিতের চরিত্র লইয়া। একবার তাহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম করিয়া দেখি।

প্রথম সর্গে ধাত্রীর মুখে লঙ্কার বিপদ্‌বার্ত্তা শুনিয়া মেঘনাদ বীরের যোগ্যভাবে বলাসশয্যা ত্যাগ করিলেন। ক্রোধে কুসুমদাম ছিঁড়িলেন! বলিলেন,

"ধিক্ মোরে" কহিলা গম্ভীরে
"হা ধিক্ মোরে! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ, আন রথ ত্বরা করি,
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।" ১।৬৮০

মেঘনাদের পিতৃভক্তি বড় সুন্দর। তাঁহার বীরভাব যেমন সঙ্গত, তেমনি সরল। এতদিন তিনি নিশ্চিন্ত মনে, প্রমোদ উদ্যানে পত্নী-সহবাসে আমোদ-নিরত ছিলেন। পিতার আকস্মিক বিপদ্‌বার্ত্তায় অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু বিপদ তিনি তৃণজ্ঞান করেন। সে কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন,—

"হে রক্ষঃকুল পতি,
শুনেছি, মরিয়া নাকি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব? এ মায়া, পিতঃ বুঝিতে না পারি!
কিন্তু অনুমতি দেহ : সমূলে নির্ম্মূল
করিব পামরে আজি! ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু অস্ত্রে উড়াইব তারে :
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।" ১।৭৩০

ইন্দ্রজিতের তেজস্বিতা তড়িৎ-তরঙ্গের মত হৃদয়ে প্রবেশ করে। এই দেখুন,—

কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি
রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে

তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ ঘুষিবে জগতে।

... ...

আর একবার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে ;
দেখিব এবার বীর বাঁচে কি ঔষধে!" ১।৭৫০

ইন্দ্রজিতের মাতৃভক্তি হৃদয়কে স্নিগ্ধ করে। পুত্র-বৎসলা মন্দোদরী কিছুতেই যুদ্ধার্থ মেঘনাদকে বিদায় দিবেন না। রামের দৈববল এবং সৈন্যবলের উল্লেখ করিয়া যুদ্ধযাত্রার অবৈধতা প্রতিপন্ন করিলেন, বিপদ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া বিদায়ার্থী পুত্রের সম্মুখে অশ্রু বিসর্জন করিলেন। এ সংসারে বীর যিনি, তিনি বুঝি সকলই সহিতে পারেন, কিন্তু মাতৃভুমির রোদন সহিতে পারেন না। এ সংসারে ক্ষণজন্মা বীরবর সেকন্দর সাকে কখনও মাতৃভুমির রোদন শুনিতে হয় নাই। কিন্তু তিনি মাতার অশ্রু সহিতে পারেন নাই। কুমার কাতর হইলেন কিন্তু যুদ্ধে না গেলে নহে। বলিলেন,—

কি সুখ ভুঞ্জিব,
যতদিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে।

... ...

পাইয়াছি পিতৃআজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি!—
কে আঁটিবে দাসে, দোব, তুমি আশীসিলে? ৬।৫১০-৫২০

এই বীরত্ব এই পিতৃমাতৃভক্তি পত্নীর প্রণয়ে আরও মধুময় হইয়াছে। মেঘনাদের পত্নীবাৎসল্য প্রেমের আদর্শস্থল। তাহার মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্যে হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হয়। ঊষা সমাগমে কুঞ্জবনগীতে কুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। প্রমীলা তখনও নিদ্রিতা।

"প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায়রে যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা,...............
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম!" ৫।৩৮০

আবার,—তখন প্রমীলার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে —

"পোহাইল এতক্ষণে তিমির শর্ব্বরী,
তা না হলে ফুটিতে কি তুমি, কমলিনি,
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয়? ৫।৫৯০

প্রমীলাকে রাণী মহিষী ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যজ্ঞাগারে যাইতে দিলেন না। পুত্রের বিরহে পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া তপ্তপ্রাণ শীতল করিবেন। তবে প্রমীলা একবার স্বামীকে নির্জ্জনে না দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না। মেঘনাদ ধীরে ধীরে কুসুম

বিবৃত পথে যজ্ঞশালা মুখে যাইতেছিলেন। ধীরে ধীরে, কেননা তখন প্রমীলার চারুমূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে জাগিতেছিল। এমন সময়,

সহসা নূপুরধ্বনি ধ্বনিল পশ্চাতে

...   .

প্রমীল রে।   ৬।৫৪০

ইন্দ্রজিতের দেবভক্তি,—তাহাও বড় উন্নত। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে তিনি ধ্যানে মগ্ন!—দেব বৈশ্বানর সশরীরে আবির্ভূত হইয়া বর দিবেন কথা আছে। এমন সময় লক্ষ্মণ মায়াবলে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিলেন। কুমার নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলেন মূর্ত্তি চিরশত্রু লক্ষ্মণের। কিন্তু দেবতায় তাঁহার অটল ভক্তি,—

সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর কৃতাঞ্জলিপুটে

কহিলা।

আবার যখন মূর্ত্তিমান অন্যায় যুদ্ধের ফলে মেঘনাদ অন্তিম শয্যায় শয়ান, প্রাণ দেহবিচ্যুত হইতে আর বড় দেরী নাই, তখন তাহাকে দেখ! তখনও দেবতায় তাঁর ভক্তি অটল! নিজের পাপের ফলে এ শাস্তি হইল, ইহাই তাঁহারে ধারণা হইল, তথাপি বিধাতার ন্যায় শাসনে সন্দেহ জাগিল না।

দৈত্যকুল দল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে

মরিতে কি তোর হাতে? কি পাপে বিধাতা

দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে?   ৬।৬৫০

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারের সেই অমূল্য দৃশ্য আমূল উদ্ধৃত করিতে পারিলে তবে মেঘনাদবধের পূর্ণতা বুঝাইতে পারি।

সংসারে যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু উন্নত, যাহা কিছু সুন্দর, সেই উপকরণেই ইন্দ্রজিতের দেবোপম চরিত্র সৃষ্টি হইয়াছে। সৌন্দর্য্য লইয়াই কাব্য; ইন্দ্রজিতের চরিত্র অনন্ত সৌন্দর্য্যময়। সে হৃদয় যাহার সে যদি মানুষের সহানুভূতি আকর্ষণ না করিবে, তবে মানব-হৃদয়ের মহত্ত্ব কি? তাই যখন নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে আত্মাভিমান মাত্র সহায় করিয়া অসহায়, নির্ভীক ইন্দ্রজিত আত্মচরিত্রের সর্ব্বাধিক বীর দর্প দেখাইয়া আসন্ন মৃত্যুকে উপহাস করে, তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। দেবতাদিগকেও ভালো লাগে না; তাঁহাদের কার্য্য কাপুরুষের ন্যায় বোধ হয়। সকল ভুলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা হয়;—মেঘনাদের বীরদর্প সে চরিত্রের অতুলিত সৌন্দর্য্য!

রামায়ণের মেঘনাদ বধে পাঠকের মনে আনন্দ হয়।—মনে হয় জন্মদুঃখিনী সীতার উদ্ধারের তবে আর বড় বিলম্ব নাই! কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যের মেঘনাদের অন্যায় মৃত্যুতে কে চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারে?

'অন্যায় মৃত্যু?' সে আবার কি? রামায়ণ পাঠ কালে সে কথা ত মনেই হয় না। সে অন্যায়বোধ, সে দুঃখে সহানুভূতি কেবল 'মেঘনাদবধ' পাঠ কালেই হয়।

ইহার অর্থ কি ?

এতক্ষণে বোধ হয় আলোক দেখিতে পাইলাম। যে মহাবিষবৃক্ষ শেষে বিপুল রাক্ষসকুল ধ্বংস করিয়াছিল, তাহার বীজ উপ্ত করিয়াছিল কে? রাবণ। তাহার দণ্ড হউক, সেই তো ন্যায়ানুগত। কিন্তু একের দোষে অন্যে মরে কেন? সর্ব্ব-গুণাধার মেঘনাদ পিতৃদোষে অকালে, অপঘাতে মরিল কেন ?

"প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে
প্রবাসী, আসন্নকালে না হেরি সম্মুখে
স্নেহপাত্র তার যত—পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
দয়িতা—মরিল আজি স্বর্ণ লংকাপুরে,
স্বর্ণলংকা অলংকার !" ৭।৩৬০

তাই বলিতেছিলাম যে, এতক্ষণে বুঝি আলোক দেখিতে পাইলাম। পিতার দোষে পুত্র নষ্ট হয়, ইহা পুরাণ কথা। কিন্তু ইহাই মেঘনাদবধ কাব্যের বীজ, নহিলে মেঘনাদকে সকল গুণের আধার বলিয়া গড়িবার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। চিরাচরিত সংস্কার স্রোতের বিপরীতে কাব্যতরণী ভাসাইবার নহিলে কোন অর্থ নাই।

এক কথায় বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু কথাটা বোধ হয় পরিষ্কার হইল না। আমাদের বাহ্য ও অন্তর্জগতের জ্ঞান বড়ই সংকীর্ণ, তাই আমরা কাব্যে যে নীতি উপদেশ দিতে চাই তাহাও অত্যন্ত সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। কাব্যের ন্যায়পরতা বা poetic justice এইরূপ সংকীর্ণতার ফল। উন্নত জ্ঞানে মনুষ্য দিন দিন বুঝিতে পারিতেছে যে, যে সকল নিয়মে জড়জগৎ শাসিত, নিয়মিত, সংযমিত হয়, অন্তর্জগৎ অবিকল তাহারই অনুবর্তন করে। মনের মাধ্যাকর্ষণ কি, আজি জানিনা, ঠিক করিয়া বলিতে পারি না বটে, কিন্তু এমন দিন আসিবে যখন তাহা আর হাসির কথা থাকিবে না। প্রকৃত প্রতিভাশালী কবি এমন অনেক কথা মানেন, এমন অনেক তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করেন যাহা তোমার আমার ধারণায় আইসে নাই—কাজেই না হাসিলে চলিবে কেন ? পিতার দোষে পুত্র নষ্ট হয়। ইহা আমাদের দেশের চির প্রচলিত কিম্বদন্তী, কিন্তু এটা কি কেবল কথার কথা মাত্র, না কিছু সত্য ইহাতে আছে? এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে নিয়ম ভিন্ন কথা নাই। সামান্য নীহারকণা, যে শষ্পোপরি ভানুরশ্মি মাখিয়া মুহূর্ত্তে মিশিয়া যায়, সে যেমন নিয়মের অধীন, অনন্ত শূন্যে অনন্ত সৌরজগৎমণ্ডলী তেমনি নিয়মের অধীন,—সর্বত্র নিয়ম !······বিজ্ঞান নিত্য এই কথা বলে, ইতিহাসও অনুদিন এই মহাতত্ত্ব কীর্ত্তন করে, 'মেঘনাদবধ' কাব্যেরও বীজ এই তত্ত্ব। সৌন্দর্য্যসার মেঘনাদ দেবদুর্ল্লভ গুণে তোমার আমার আরাধ্য ! সর্বজ্ঞ কবির অতুল মোহময় সৃষ্টি। সত্য বটে,—কিন্তু যে অজেয় শক্তি রক্ষোবংশ ধ্বংস করিতে আসিয়াছিল, তিনি সেই চক্রে মথিত হইলেন, এ জগতে ইহাই নিয়ম, ইহাই সত্য ! এই সত্যের ব্যভিচার নাই।

স্বতঃ না হউক পরতঃ 'মেঘনাদবধ কাব্য' অদৃষ্টবাদের দৃঢ় ভিত্তিতে প্রণীত হইয়াছে। জগতের অধিকাংশ অমর কাব্যের এই তত্ত্বই মেরুদন্ড।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র জ্ঞানময় কবি প্রমীলা চরিত্রে কয়েকটি গুরুতর নৈতিক তত্ত্ব নিহিত রাখিয়াছেন। সেগুলি স্বতঃসুন্দর ও লোকহিতকর। এখানে আমরা যথাসাধ্য তাহা পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পাইব।

যে বলিয়াছিল যে ভারতীয় সমাজ পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত, সে বাস্তবিক ভাবিতে শিখিয়াছে। আমাদের সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সাম্য কখনও ছিল কিনা ঠিক বলা যায় না। থাকিলেও তাহা যে বহুকাল হইতে লোপ পাইয়াছে, তাহাতে বড় সন্দেহ নাই।... ...সীতা চরিত্র আমাদের জাতীয় গৌরব কিন্তু তাহার পরিণাম, গৌরব বিধ্বংসকর।

সীতা-চরিত্র সমাজে যে অশুভ উৎপাদন করিয়াছে, লোকহিতৈষী কবিগণ মধ্যে মধ্যে তেজস্বিনী চিত্তময়ী রমণী চরিত্র সৃষ্টি করিয়া তাহার নিরাকরণের চেষ্টা পাইয়াছেন, এই আর্য্য সমাজে দুই তিনবার সেই চেষ্টা হইয়াছে, —তবে ফল বড় হয় নাই। কেননা সে সকল চরিত্রের কার্য্যকারিতা সমাজ গণ্য করে না। একবার দ্রৌপদী চরিত্রে সে চেষ্টা হইয়াছে, দ্রৌপদী পবিত্রা আর্য্য রমণী, কিন্তু দ্রৌপদী প্রখর বুদ্ধিশালিনী, প্রতিভাময়ী, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী। তিনি পুরুষের যোগ্য সহধর্ম্মিণী ;—সখী কিন্তু দাসী নহেন। যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কাজ করেন না। আর একবার সে চেষ্টা হইয়াছিল তন্ত্রশাস্ত্রে। যিনি মন দিয়া তন্ত্র শাস্ত্রালোচনা করিয়াছেন তিনি প্রতিপদে ইহা স্বীকার করিবেন। তন্ত্র প্রচারের সময় দেশ বোধ হয় বড় বৈষম্যময় হইয়াছিল। পুরুষ সর্ব্বেসর্ব্বা, স্ত্রী বলিতে গেলে কেহ নহে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত অধঃপতিত সমাজ আর চলে না।... তখন স্থিতিশীল ফলবাদী ব্রাহ্মণকুলের চিরোর্বর মস্তিষ্ক আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার ফলে তন্ত্র শাস্ত্রের কুহক বিস্তৃত হইল।... তন্ত্রশাস্ত্রে নারী চরিত্র অনেক সময় পুরুষ অপেক্ষা প্রবলতর, কখনও বা পুরুষের সমান, পুরুষাপেক্ষা কখন হীন নহে।...বঙ্গভূমে তন্ত্রশাস্ত্র সামাজিক সাম্য প্রচারের জন্য প্রণীত হইয়াছিল।

'মেঘনাদবধ কাব্য' যখন লিখিত হয়, তখন বঙ্গসমাজে সবে মাত্র পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান চর্চ্চার উন্নতি আরম্ভ হইয়াছিল। সুশিক্ষিত বাঙালী যুবক হৃদয়ে যে সাম্যভাব ধারণ করিলেন, গৃহে তাহার পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই অবগুণ্ঠনবতী ব্রীড়াসংকুচিতা বঙ্গনারীকে প্রমীলার বেশে দেখিয়া কৃতবিদ্য যুবক তখন মোহিত হইয়াছিলেন,

অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা, নাহি কি বল এ ভুজ মৃণালে ?

বড় মধুর, বড় ভাবব্যঞ্জক আর বড় সাম্য সংস্থাপক। যখন পড়ি, যতবার পড়ি

মিষ্ট লাগে। প্রথমে বুঝি আরও মিষ্ট লাগিয়াছিল। দার্শনিকপ্রবর জন ষ্টুয়ার্ট মিল স্ত্রীজাতির সাম্য প্রতিপাদন করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন—আর আমাদের মধুসূদন প্রমীলা চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। উদ্দেশ্য এক।

প্রমীলা চরিত্রের আর একটি ভঙ্গী দেখ। ইহা ইন্দ্রজিতের মত বীরত্বময়। এই প্রবন্ধে আমরা ইন্দ্রজিতের চরিত্র সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি,—প্রমীলা চরিত্র সন্ধান করিয়া প্রবন্ধ বিস্তৃত করিতে চাহি না। তবে সে চরিত্র যে ইন্দ্রজিতের মত বীরত্বময় তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। এই চরিত্রসাম্য, এই রাক্ষস দম্পতির অতুল মোহময় প্রেমের কারণ। যাহারা সাম্যকে প্রেমের কারণ বলিতে প্রস্তুত নহেন, এ কথাটি তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন।*

* ১২৮৮ সালে 'বঙ্গ দর্শনে' প্রকাশিত লেখকের "মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" শীর্ষক প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ।—সম্পাদক।

মেঘনাদবধ–এর তাৎপর্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

য়ুরোপ হইতে একটা ভাবের প্রবাহ আসিয়াছে এবং স্বভাবতই তাহা আমাদের মনকে আঘাত করিতেছে। এইরূপ ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিলে নিজের চিত্তবৃত্তির প্রতি অন্যায় অপবাদ দেওয়া হইবে। এইরূপে ভাবের মিলনে যে একটা ব্যাপার উৎপন্ন হইয়া উঠিতেছে কিছুকাল পরে তাহার মূর্তিটা স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইবার সময় আসিবে।

য়ুরোপ হইতে নূতন ভাবের সংঘাত আমাদেয় হৃদয়কে চেতাইয়া তুলিযাছে। একথা যেমন সত্য, তখন আমরা হাজার খাঁটি হইবার চেষ্টা করিনা কেন, আমাদের সাহিত্য কিছু-না কিছু নূতন মূর্তি ধরিয়া এই সত্যকে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিবে না, ঠিক সেই সাবেক জিনিসের পুনরাবৃত্তি আর কোন মতেই হইতে পারে না, যদি হয় তবে এ সাহিত্যকে মিথ্যা ও কৃত্রিম বলিব।

মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে বা রচনা প্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম রাবণের সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহার শাসনও ভাঙিয়াছেন। এ কাব্যে রাম-লক্ষণের চেয়ে রাবণ ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোনটা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দ বোধ করিয়াছেন। এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য ; ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে ; ইহার রথ-রথি-অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান ; ইহা স্পর্ধাদ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু-অগ্নি ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে ; যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের যে কোনো-কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য চারিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে। সামান্য ভিখারি রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্রপৌত্র-আত্মীয় স্বজনেরা এক একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে, তাহাদের জননীরা ধিক্কার দিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে। তবু যে অটল শক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনোমতেই হার মানিতে

চাহিতেছে না, কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।

য়ুরোপের শক্তি তাহার বিচিত্র প্রহরণ ও অপূর্ব ঐশ্বর্যে পার্থিব মহিমার চূড়ার উপর দাঁড়াইয়া আজ আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার বিদ্যুৎখচিত বজ্র আমাদের নত মস্তকের উপর দিয়া ঘনঘন গর্জন করিতে করিতে চলিয়াছে ; এই শক্তির স্তবগানের সঙ্গে আধুনিক কালের রামায়ণকথার একটি নূতন-বাঁধা তার ভিতরে ভিতরে সুর মিলাইয়া দিল। এ কি কোন ব্যক্তি বিশেষের খেয়ালে হইল ? দেশ জুড়িয়া ইহার আয়োজন চলিয়াছে, দুর্বলের অভিমানবশত ইহাকে আমরা স্বীকার করিব না বলিয়াও পদে পদে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি—তাই রামায়ণের গান করিতে গিয়াও ইহার সুর আমরাও ঠেকাইতে পারি নাই।*

---

* বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলী (১৩৬০ চৈত্র) ৮ম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধ থেকে বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে অংশত পুনর্মুদ্রিত।

—সম্পাদক।

মধুসূদন ও বাংলা সাহিত্য

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)

মাইকেলের সময় হইতেই বঙ্গভাষার নবযুগ। ইংরেজী সাহিত্য যেমন বিদেশী সাহিত্যের 'সঞ্জীবনোষধি রসে' সঞ্জীবিত হইয়াছিল—যেন একটি উত্তাল ভাবসমুদ্রের বিরাট বন্যা আসিয়া জীর্ণ পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসাইয়া নূতনের জন্য ভূমি প্রস্তুত করিয়া গেল, বঙ্গসাহিত্যও সেইরূপ সেই সময়ে ইংরেজী সাহিত্য দ্বারা গভীরভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল। বঙ্গীয় লেখকের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে এক গৌরবময় নূতন ভাবরাজ্যের মানচিত্র খুলিয়া গেল, বঙ্গভাষা নবযৌবন লাভ করিল। মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করিলেন, 'সনেট' সৃষ্টি করিলেন, মহাকাব্য সৃষ্টি করিলেন, খণ্ডকাব্য সৃষ্টি করিলেন, নাটক সৃষ্টি করিলেন, নূতন বৈষ্ণব কবিতা সৃষ্টি করিলেন। বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ও মাইকেল আধুনিক পদ্য সাহিত্যের সৃষ্টিকর্তা। তাঁহাদের স্মৃতি অমর হউক।···
···বঙ্গভাষা পরাধীন দেশের ভাষা বলিয়া হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। পরাধীন ইটালী দান্তে ও পেট্রার্কের জন্ম দিয়াছিল। এই পরাধীন বঙ্গই চণ্ডীদাস ও মাইকেলের জননী। হতাশার কারণ নাই।*

"আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্য শুরু হয়েছে মধুসূদন দত্ত থেকে। তিনিই প্রথমে ভাঙনের এবং সেই ভাঙনের ভূমিকার উপরে গড়নের কাজে লেগেছিলেন খুব সাহসের সঙ্গে। ক্রমে ক্রমে নয়, ধীরে ধীরে নয়। পূর্বেকার ধারাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে তিনি এক মুহূর্তেই নূতন পন্থা নিয়েছিলেন। এ যেন এক ভূমিকম্পে একটা ডাঙা উঠে পড়ল জলের ভিতর থেকে।'

—সাহিত্যরূপ। সাহিত্যের পথে। রবীন্দ্রনাথ।

---

* 'ভারতবর্ষ' সাহিত্যপত্রের প্রথম বর্ষের সূচনায় (আষাঢ়, ১৩২০, ১৯১৩ খ্রীঃ অঃ) সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মন্তব্য।—সম্পাদক।

মধুসূদন

শশাঙ্কমোহন সেন

ভাবুকতার সংযমশীল পৌরুষ এবং বীরধর্মী সৌন্দর্যদৃষ্টিই মধুসূদনের শিল্পী-আত্মার প্রধান লক্ষণ।…ইয়োরোপীয় সাহিত্যের পূর্বসূরীগণের বিশেষ বিশেষ মাহাত্ম্যে তিনি যেমন জাগ্রত আছেন, তেমনি ভারতবর্ষের বা বঙ্গদেশের সমাজ-সাহিত্য নিসর্গের কোন সৌন্দর্যে অথবা মাহাত্ম্যেই তাঁহার হৃদয়দ্বার কোন দিকে অর্গলিত নহে! [পৃঃ ১৫৯]

…কবি-আত্মার ঐ সৌন্দর্যবিহ্বল আনন্দের সুসংযত এবং সমশীর্ষ প্রকাশ—যাহা মধুসূদনে পাই তাহা যে অন্যত্র দুর্লভ! [পৃঃ ১৬০]

…মনের উদ্ভাবনী শক্তি এবং হৃদয়ের সৌজন্য সহানুভূতিময় প্রসার বিষয়ে ইহাপেক্ষা বড় প্রতিমা এ-যাবৎ বাঙালীর সাহিত্যে দেখা যায় নাই। বিধাতা যুবক শেকস্‌পীয়র ও মিলটন্‌-প্রকৃতির প্রতিভাকেই যেন এক-যুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে মিলটনের বীর্যবত্তা ও কণ্ঠসমুন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুবক-শেকস্‌পীয়রের বহুমুখিতা, পৌরুষ-তেজস্বী হৃদয়াবেগ, উদার সহানুভূতি এবং অমায়িক রসিকতার আভাসটাই নানা দিকে পাইতেছি! [পৃঃ ১৬১]

…দুঃখকে এত ঘনিষ্ঠভাবে বুঝিয়া ট্রাজেডী রচনা করার স্বাভাবিক যোগ্যতা, অনম্য-মেরুদণ্ডী বীর-জীবনের নিদারুণ অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ এবং মৃত্যুবিজয়ী বিনিপাত অঙ্কিত করিবার এমন শিল্পক্ষমতা অপর কোন বঙ্গকবিই লাভ করিতে পারেন নাই।… মধু-জীবনের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিতেছি, জীবনদেবতা তাঁহাকে 'সত্য'-শিক্ষার সে মাহেন্দ্র যোগ দিয়াছিলেন; হৃদয় রক্তের বিনিময়েই তিনি 'কবি' হইবার যোগ্যতা উপার্জন করিয়াছিলেন!…শেকস্‌পীয়রের পূর্বে যেমন চসার, স্পেনসার, মার্লো ছিলেন, বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের স্ব-ক্ষেত্রে তেমন কোন পূর্বসূরি ছিল না।

[পৃঃ ১৬২]

…মধুসূদন শিল্পের ক্ষেত্রে philosophyকে (দার্শনিকতাকে) ঘৃণা করিয়াছেন। কথাটা বুঝিতে পারিলেই আমরা 'কবি'-মধুসূদনকে প্রকৃত প্রস্তাবে জানিতে পারিব। মধুসূদন চিন্তা-শিল্পী নহেন, ভাবশিল্পী। [পৃঃ ১৬৬]

…অপরিসীম গ্রন্থ-পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও মধুসূদনের মধ্যে যে একটা নবতা এবং রসমধুর 'তাজা ভাব' আছে, বালকত্ব-সুলভ লীলার লক্ষণ আছে, তন্মধ্যেই তাঁহার

প্রধান কবিত্ব এবং তাঁহার মহাত্মতা।...এ স্থলেই মধুসূদন ক্ষিতি-পরিব্রাজক এবং বিশ্ব রসগ্রাহী হইয়াও বঙ্গসাহিত্যের বাঙালী কবি।...তিনি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম বিশ্বতা-দীক্ষিত এবং বিশ্ব অধিবাসী বাঙালী। কাব্যের রসাত্মা বিষয়ে তিনি প্রাচীন ঋষিপুত্র কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের শিষ্য, শিল্পতন্ত্রে বস্তু এবং ভাবের সামঞ্জস্যময় প্রমূর্তন এবং প্রয়োগের প্রণালীতে তিনি হোমরের এবং হোমর-শিষ্য ইউরোপীয় মহাকবিগণের পথানুবর্তী।...সৌন্দর্যের বস্তুদৃষ্টি এবং রসাবিষ্ট তন্ময়তা বিষয়ে 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র কবিকে বরঞ্চ ইংরেজী সাহিত্যের সেই 'আধুনিক প্যাগান' (pagan) কীটস কবিরই সর্বাধিক নিকটবর্তী বলিয়া অনুভব হইতে থাকিবে।... কবিগণের কুলপঞ্জীর মধ্যে মধুসূদন 'গ্রীক'। জন্মত ভারতীয় হিন্দু ও শাক্ত, এবং স্বীকারত খ্রীস্টান হইয়াও মধুসূদন তত্ত্বত গ্রীক এবং প্যাগান।...এই গ্রীক-লক্ষণ যেমন ভারতে, তেমন বঙ্গদেশের সাহিত্যতন্ত্রেও নানা দিকে অ ভনব ; বাঙালীর 'শাক্ত' আদর্শের সঙ্গেই উহার সান্নিধ্য এবং নানাদিকে সামঞ্জস্য। মধুসূদনও নাকি অনেক সময় বলিতেন, 'লোকে আমাকে চিনিতেছে না—my writings are three-fourths Greek'।* [পৃঃ ১৬৮—১৬৯]

* অধ্যাপক প্রভাপ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং এ. মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১২ প্রকাশিত শশাংকমোহন সেনের 'মধুসূদন' (অন্তর্জীবন ও প্রতিভা) গ্রন্থ থেকে উৎকলিত।—সম্পাদক।

মেঘনাদবধ কাব্য প্রসঙ্গে

মোহিতলাল মজুমদার

…মেঘনাদবধ কাব্য বাঙালী কি কখনও ভাল করিয়া পড়িয়াছে?—কেহ কি এখনও পড়ে? এই কাব্য-কাহিনীর ঘনঘটার ফাঁকে ফাঁকে বাঙালীর কুললক্ষ্মী, মাতা ও বধূর বেশে, কবিচিত্ত মথিত করিয়া ক্রন্দন রবে দিক্‌দেশ বিদীর্ণ করিতেছে। সেই আলুলায়িতকুন্তলা রোদনোচ্ছ্বনেত্রা অপরূপ মমতাময়ী মূর্তি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কবির চক্ষে বিরাজ করিয়াছে। বাঙালীর কাব্যে সত্যকার সৌন্দর্য আর কি ফুটিতে পারে?—তাহার জীবনে আর আছে কি? সর্বস্ব বিসর্জন দিয়া, মনুষ্যত্ব হারাইয়া, নারীর যে প্রেম ও স্নেহের আত্মত্যাগ সে এখনও প্রাণে প্রাণে অনুভব করে, এবং করে বলিয়াই এখনও একেবারে বিনষ্ট হয় নাই, সেই অনুভূতি মেঘনাদবধ-এর কবির বাঙালীত্ব অটুট রাখিয়াছে, বাঙালীর গৃহসংসারের সেই পুণ্যদীপ্তি—মধুসূদনের হৃদয়ে তাঁহার মায়ের সেই স্নেহ-ব্যাকুলতার অশান্ত স্মৃতি তাঁহাকে বিধর্ম হইতে রক্ষা করিল। হোমর, ভার্জিল, ট্যাসোর কাব্যগৌরব বিফল হইল—বীরবিক্রমের গাথা অশ্রুধারে ভাঙিয়া পড়িল, মাতা ও বধূর ক্রন্দনরবে বিজয়ীর জয়োল্লাস ডুবিয়া গেল—বীরাঙ্গনার যুদ্ধযাত্রা বাঙালী বধূর সহমরণ-যাত্রার করুণ দৃশ্যে, অদৃষ্টের পরম পরিহাসের মত নিদারুণ হইয়া উঠিল। স্বর্গ, নরক, পৃথিবী ও সমুদ্রতলব্যাপী এই আয়োজন, রাজসভার ঐশ্বর্য, রণসজ্জার আড়ম্বর, অস্ত্রের ঝঞ্জনা, এবং অযুত যোধের সিংহনাদ সত্বেও অশোক-কাননে বন্দিনী নারীলক্ষ্মীর মূক শোক-ঝংকারে সমস্ত আকাশ ভরিয়া উঠিয়াছে; এবং শক্তিশেল-মূর্চ্ছিত ভ্রাতার শ্মশানশিয়রে রামের শোকোচ্ছ্বাস, অথবা সিন্ধুতীরে পুত্র ও পুত্রবধূর চিতাপার্শ্বে দণ্ডায়মান রাবণের শোকোচ্ছ্বাস, অথবা সিন্ধুতীরে পুত্র ও পুত্রবধূর চিতাপার্শ্বে দণ্ডায়মান রাবণের সেই মর্মান্তিক উক্তিকেও প্রতিহত করিয়া যে একটি অতি-কোমল ক্ষীণ কণ্ঠের বাণী, লবণাম্বুগর্ভে নির্মল উৎসবারির মত উৎসারিত হইয়াছে—

> সুখের প্রদীপ সখি, নিবাই লো সদা
> প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলরূপী
> আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা!
> নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী।
> বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি
> লক্ষ্মণ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,

শ্বশুর ! অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
শূন্য রাজসিংহাসন ! মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষপক্ষে ভীম ভুজবলে,
রক্ষিতে দাসীর মান ! হ্যাদে দেখ হেথা,—
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে।

—কবির কাব্যলক্ষ্মীও সেই বাণী মন্ত্রে কবির কণ্ঠে স্বয়ম্বরমালা অর্পণ করিয়াছেন। ইহাই হইল বাঙালীর মহাকাব্য।

আয়োজনের ত্রুটি ছিল না,—ছন্দ, ভাষা, ঘটনা-কাহিনী, হোমর-মিল্টনের ভঙ্গী, দান্তে-ভার্জিলের কল্পনা, এবং সর্বোপরি বিদেশী কাব্যের প্রাণবস্তু—এমন কি বাক্যঝঙ্কার পর্যন্ত আত্মসাৎ করিবার প্রতিভা সবই ছিল, কিন্তু কবি, সত্যকার কবি বলিয়া, সৃষ্টিরহস্যের অমোঘ নিয়মের বশবর্তী হইয়া যাহা রচনা করিলেন—তাহা মহাকাব্যের আকারে বাঙালী জীবনের গীতিকাব্য। দূর দিগন্তের সাগরোর্মি তাঁহাকে আহবান করিয়াছিল, তিনি তাহারই অভিমুখে তাঁহার দেহমনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া কাব্য-তরণী চালনা করিয়াছিলেন। সমুদ্রবক্ষে তরণী ভাসিল, ছন্দে, ভাষায় ও বর্ণনাচিত্রে নীলাম্বুপ্রসার ও জলকল্লোল জাগিয়া উঠিল—কিন্তু কবি-কর্ণধারের মনশ্চক্ষু আধ-নিমীলিত কেন? সাগরবক্ষে উত্তাল তরঙ্গরাশির মধ্যেও এ কার কুলু-কুলু ধ্বনি? —এ যে কপোতাক্ষ! তীরে ভগ্ন শিবমন্দিরে, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছে, জলে "নূতন গগন যেন, নব তারাবলী" এবং গ্রাম হইতে সন্ধ্যারতির শঙ্খধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। সমুদ্র গর্জন করুক, ফেনিল জলরাশি তরণী-তটে আছাড়িয়া পড়ুক—তথাপি এ স্বপ্ন বড় মধুর! সমুদ্রতলে কপোতাক্ষের অন্তঃস্রোত তাঁহার কাব্যতরণীর গতি নির্দেশ করিল, সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া আর হইল না। তরী যখন তীরে আসিয়া লাগিল, তখন দেখা গেল 'সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।'*

---

* মোহিতলাল মজুমদার লিখিত 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য'-এর প্রস্তাবনার অংশবিশেষ।

—সম্পাদক।

মেঘনাদবধ-এর কাব্য সৌন্দর্য : একটি মন্তব্য—

'মেঘনাদবধ কাব্য যেন বহুপ্রকোষ্ঠ, বহুতল, বহুমহল, বিরাট এক মহাহর্ম্য। এ যেন আমাদের কালের মানুষের কীর্তি নয়। না জানি কোন ময়দানব বিশাল তক্ষণীর আঘাতে কোন এক ভূধর কাটিয়া ইহা নির্মাণ করিয়াছে; ইহার শালপ্রাংশু স্তম্ভগুলি বৃষস্কন্ধে যে ছাদ বহন করিতেছে, তাহার সরল সুষম কারুকার্যে দেবলোকের ছন্দ; ইহার বলভি, অলিন্দ, দ্বার, গবাক্ষ, ইহার কৌমুদীশুভ্র শ্বেতমর্মর-নির্মিত দুস্তর সোপানাবলী, ইহার বহুপদসঞ্চার মসৃণ মণিকুট্টিম, শরৎ-সূর্যাস্তের ঘনীভূত রশ্মি জমাইয়া তৈরি স্বর্ণপালঙ্ক, প্রাসাদ-চত্বরে ভূপতিত নভখণ্ডবৎ নির্মল জলাশয়ে বিস্মিত পদ্মফুলের নেত্রবিস্তার, আর সর্বোপরি স্থিরদামিনী-ভাস্কর-অত্যুচ্চ সৌধচূড়া, ইহা কি সত্যই আমাদের মত সাড়ে তিন হাত দৈর্ঘ্যের সদ্যঃপাতী মানুষের জন্য সৃষ্টি হইয়াছিল? ইহার নানা প্রকোষ্ঠে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময়ে প্রাচীরে প্রাকারে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত, আহত-প্রত্যাহত হইয়া আমাদের মরকণ্ঠও যেন ক্ষণিকের জন্য 'প্রাচীন কালের কণ্ঠস্বরে' পরিণত হয়। আমরা পরোক্ষে অমরত্ব লাভ করিয়া বিস্মিত হই। ইহাই মেঘনাদবধ কাব্য।

—প্রমথনাথ বিশী

[মাইকেল রচনাসম্ভারের ভূমিকা]

বাংলা মহাকাব্য ও মধুসূদন

সুশীলকুমার দে

মহাকাব্য রচনা গত যুগের বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই রচনার রীতি ও আদর্শ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ছিল না। প্রাচীনতর সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকাব্য ছিল বটে। কিন্তু তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি ছিল স্বতন্ত্র। গঠনে ও উপকরণসংগ্রহে, ছন্দ ভাষা ও ভঙ্গীর প্রয়োগে, ভাববস্তুর কল্পনায় বাংলা মহাকাব্য হইল সম্পূর্ণ নূতন ধরনের রচনা। সংস্কৃত মহাকাব্যের কিছু প্রভাব হয়ত ছিল। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে, গত যুগের বাংলা সাহিত্যে যে ভাববিপ্লব আসিয়াছিল, বাংলা মহাকাব্য হইল তাহারই সর্বপ্রথম নিদর্শন, এবং ইহার আদর্শ ছিল মুখ্যত পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্য। ভারতচন্দ্র হইতে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত বাংলায় যে রচনা-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহার রস ও রুচির জের তখন এরূপ জীর্ণ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল যে বিশাল ও বিচিত্র ইংরেজী কাব্যে অভ্যস্ত শিক্ষিত সমাজ তাহাতে আমোদ পাইলেও তাহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিল না। সুতরাং নবযুগের নব-জাগ্রত রস-পিপাসা যে পাশ্চাত্ত্য আদর্শের বশবর্তী হইবে তাহা কিছুই আশ্চর্য নয়।

কিন্তু সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে মহাকাব্য ছিল না ; ছিল স্কট, মুর ও বায়রণের উচ্ছ্বাসপ্রবণ উপাখ্যান কাব্য। সে যুগের হিন্দু কলেজে পোপ এবং গোল্ডস্মিথও পাঠ্য ছিল। শেলি, কীটস ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের সূক্ষ্মতর প্রভাব তখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। তাই আধুনিক যুগের প্রথম কবি রঙ্গলাল যখন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তখন তিনি এই সদ্য আহৃত উপাখ্যান কাব্যের স্থূল অনুকরণে কাব্য রচনা করিলেন। কিন্তু নূতন সাহিত্যে কৃতবিদ্য হইলেও রঙ্গলালের পক্ষপাত ছিল প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ভাব ভাষা ও ভঙ্গীর দিকে। সেইজন্য, সাময়িক ইংরেজী metrical romance-এর যাহা প্রকৃত রূপ ও অন্তর্গত ভাব, এবং যাহার জন্য এই শ্রেণীর রচনার বৈশিষ্ট্য ও উপাদেয়তা। সেই ভাব ও রূপ তিনি তাঁহার বাংলা কথা-কাব্যে সঞ্চারিত করিতে পারেন নাই। একদিকে যেমন বাঙালী পাঠকের রুচি তখনও সম্পূর্ণ নূতন করিয়া গঠিত হয় নাই, অন্যদিকে তেমনি পাশ্চাত্ত্য কাব্যকলা আয়ত্ত করিবার শক্তি বা ইচ্ছা রঙ্গলালের ছিল না। তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালী পাঠকের ধাতে যতটুকু নূতন ভাব সহ্য হয় ততটুকুই আমদানি করিয়া তিনি ক্ষান্ত ছিলেন ; প্রাচীন রীতি বজায় রাখিয়া নূতন আদর্শের যতটুকু অনুকরণ করা যায় ততটুকুই তিনি করিয়াছিলেন। তাই তিনি বাংলা কাব্যে কোন স্বতন্ত্র ধারা প্রবর্তিত করিতে পারেন নাই।

রঙ্গলালের মত মধুসূদনেরও উপাখ্যান কাব্য লেখা যে স্বাভাবিক ছিল, তাহা তাঁহার প্রথম ইংরেজী রচনা The Captive Lady কাব্যে দেখা যায়। ইহার প্রত্যক্ষ আদর্শ ছিল তৎকালীন হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিওর Fakeer of Jungheera (১৯২৮)। কিন্তু যখন ইংরাজী ছাড়িয়া দিয়া মধুসূদন বাংলা ধরিলেন, তখন প্রচলিত উপাখ্যান-কাব্য বা নীতি-কবিতা তাঁহাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠে, মহাকাব্য রচনা তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল কেন? এ-জাতীয় কাব্য বাংলা ভাষায় কোনোদিন রচিত হয় নাই—প্রাচীন বাংলা কাব্য ছিল চিরদিনই গীতি-প্রাণ বা উপাখ্যান-প্রধান। সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে মহাকাব্য রচনার রীতি ছিল না—ছিল উপাখ্যান-কাব্য বা গীতি-কবিতার ধারা। মধুসূদনও প্রথমে উপাখ্যান-কাব্য ও পরে গীতি-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাকাব্য-রচনার মধ্যেই কি তিনি তাঁহার অভীপ্সিত কাব্য-মন্ত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন?

মহাকাব্যের প্রতি মধুসূদনের আকৃষ্ট হইবার কারণ কি, তাহা ঠিক বলা যায় না। হয়ত তাঁহার কবি প্রকৃতির এই দিকেই ঝোঁক ছিল। স্বল্পায়ু জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মধুসূদন পথ খুঁজিতেছিলেন, পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কাব্যে, নাটকে, গীতি-কবিতায়, প্রহসনে, সনেট-রচনায়, নূতন ভাষা, ভঙ্গী ও ছন্দের প্রবর্তনে —সর্বত্রই তিনি জাতির সাহিত্য-পথের পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। হয়ত মহাকাব্য রচনা ছিল তাঁহার এই নিত্য নূতন প্রয়োগ-পরীক্ষার একটি দিক। কিন্তু একথা ঠিক যে, পাশ্চাত্ত্যের প্রাচীন মহাকবিদের গুরুগম্ভীর মহাকাব্য মধুসূদনকে যে রূপ আকৃষ্ট করিয়াছিল, সমসাময়িক তরল ভাবপ্রধান উপাখ্যান কাব্য বা গীতি-কবিতা তাঁহাকে সে রূপ মুগ্ধ করিতে পারে নাই। যে কবি-কল্পনার স্ফূর্তি ও মুক্তির মন্ত্র তিনি খুঁজিতেছিলেন তাহার সন্ধান বোধ হয় এইখানেই পাইয়াছিলেন; তাই মহাকাব্য রচনাকেই শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভার উপযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। অথবা, মহাকাব্য না লিখিলে মহাকবি হওয়া যায় না, এইরূপ একটি প্রচলিত ধারণাও হয়ত মধুসূদনকে মহাকাব্য-রচনায় প্রথম প্রেরিত করিয়াছিল।

কিন্তু কারণ যাহাই হউক না কেন, মধুসূদন যে ঠিক হোমর বা মিল্টনের ধরনের মহাকাব্য লিখিতে পারিয়াছেন—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। বাহ্যত সাদৃশ্য থাকিলেও, মর্মগত পার্থক্য রহিয়াছে যথেষ্ট। মধুসূদন যে কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা দেশীয় বা বিদেশীয় কোনও কাব্য-শাস্ত্রের লক্ষণ অনুসারে মহাকাব্য নয়। ইংরাজীতে যাহাকে Epic বলা হয় এবং হোমরের রচনা যাঁহার আদর্শ স্বরূপ, তাহা একমাত্র সহজ সরল বীররস প্রধান heroic যুগেই সম্ভবপর। আমাদের মহাভারত এবং অনেকাংশে রামায়ণ এই শ্রেণীর রচনা। ইহাদের অনুকরণে

অধিকতর মার্জিত যুগে ও অনেক পরবর্তী সময়ে যে সকল কাব্য রচিত হইয়াছিল—যেমন মিল্টন বা কালিদাসের কাব্য—সেগুলিকে Epic বা মহাকাব্য বলা হয় বটে, কিন্তু সেগুলি প্রকৃতপক্ষে কৃত্রিম ও অনুকৃতিমূলক। ইহাদের মধ্যে আদিম যুগের বা জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ দেখা যায় না। শিল্প হিসাবে উৎকর্ষ লাভ করিলেও, কাব্যপ্রেরণা হিসাবে এগুলিকে প্রাচীন যুগের Epic বা মহাকাব্যের পর্যায়ে ধরা যায় না।

কিন্তু মহাকাব্য কেন, পাশ্চাত্ত্য আদর্শে যে কোন উচ্চ শ্রেণীর রচনায় প্রধান অন্তরায় ছিল এই যে, বাংলা ভাষার সুপ্ত প্রকাশ শক্তি তখনও ছিল অগোচর। যাঁহাদের স্বজাতি-প্রীতি ও বাংলা ভাষার প্রতি মমতা ছিল, তাহাদের কাছে তখন ইহাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, কি করিয়া বাংলা ভাষাকে ইংরাজীর মত স্বাধীন সৌন্দর্য সৃষ্টি ও উৎকৃষ্ট কাব্যকলার উপযুক্ত করিয়া তোলা যায়। অর্থাৎ, কি উপায়ে ইংরাজী কাব্যের শুধু বহিরঙ্গ নয়, অন্তর্গত প্রাণটিকে বিজাতীয়তা হইতে মুক্ত করিয়া বাংলা কাব্যের নির্জীব দেহে সংক্রামিত করা যায়। বাংলা মহাকাব্য রচনার মধ্য দিয়া মধুসূদনের দুর্দমনীয় প্রতিভার দুঃসাহস সর্বপ্রথম এই সমস্যা সমাধানেব সন্ধান দিল। সে সময় অনেকেই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের মর্মটি প্রাণের মধ্যে অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার বিশিষ্ট রূপটি, রঙ্গলালের মত, প্রতিফলিত করিতে পারেন নাই। বাংলা ভাষার তৎকালীন অবস্থায় এরূপ চেষ্টা দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হইয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভাব, ভাষা, ছন্দ ও ভঙ্গী যে বাংলা ভাষায় অনুকরণ করা যায় তাহা নহে, সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করাও যায়, তাহা মধুসূদনই প্রথম দেখাইলেন। শুধু উপকরণ সংগ্রহ নয়, কাব্য-কৌশল নয়, ভাষার পারিপাট্য নয়,—পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের মূল আদর্শটি, তাহার কাব্যকলার অসীম সম্ভাব্যতা, তাহার অপূর্ব কল্পনা ভঙ্গী ও বিচিত্র রসমাধুর্য, তাহার ভাষার অপরিমেয় শক্তি ও ছন্দের অবাধ স্বাচ্ছন্দ্য,—এক কথায়, পাশ্চাত্ত্য কাব্যের যে প্রাণটি সে যুগের অন্য কেহই মৃতকল্প বাংলা কাব্যের দেহে সঞ্চারিত করিতে পারেন নাই, মধুসূদন সেই প্রাণটি সংযোজিত করিয়া দিলেন। ইহার ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে নবজীবন লাভ করিল, তাহা দিনের পর দিন নিত্যনূতন যুগের সূচনা আনিয়া দিল।

এই অসাধ্য সাধনে কার্যকরী হইয়াছিল একদিকে মধুসূদনের স্বকীয় দুর্লভ কবি-প্রতিভা, অন্যদিকে বিদেশী কাব্যের একাগ্র সাধনা। তাঁহার সহজাত প্রতিভাকে পুষ্ট ও পরিণত করিয়াছিল নানা উৎকৃষ্ট পাশ্চাত্ত্য কাব্যের অনুশীলন—একথা আমরা জানি এবং তিনি নিজেও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের প্রকৃতি ও পরিমাণ কি ছিল, তাহা না বুঝিলে, তাঁহার প্রতিভা বিকাশের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইবে না। কবির সজ্ঞান অভিপ্রায় ছিল, তাঁহার কল্পনাকে নানা 'কবি চিত্ত-ফুলবনে' মধু আহরণে নিযুক্ত করিবেন ; এবং এই অভিপ্রায়ের ফলে

যে মধু-চক্র তিনি রচনা করিয়াছেন, তাহার সমগ্র মাধুর্যে যেমন আত্মগত ভাব ও কল্পনা রহিয়াছে, তেমনি বাহিরের আহৃত উপকরণও তাহার গঠন-কার্যে সহায়তা করিয়াছে। বহু পণ্ডিত সমালোচক দেখাইয়াছেন, মধুসূদন বিদেশী সাহিত্য হইতে ভাব, বর্ণনা, পুরাণ-আখ্যায়িকা, প্রকাশরীতি, কল্পনাদর্শ, উপমা, ছন্দ প্রভৃতি কাব্য-রচনার বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু এই কথা বলিলেই সব কথা বলা হয় না। মধুসূদনের কাব্য কেবল কেতাবী বিদ্যার আহরণ পটুতায় পর্যবসিত হয় নাই। তাই কেবল উপকরণের তালিকার দ্বারা পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের পরিমাপ করা যাইবে না। তাঁহার প্রতিভার নূতন করিয়া সৌন্দর্য-সৃষ্টির শক্তিও বোঝা যাইবে না। মধুসূদন নিজে লিখিয়াছেন: 'I never read any poetry except that of Valmiki, Homer, Virgil, Kalidas, Dante (in translation), Tasso (in translation) and Milton. These কবিকুলগুরু, ought to make a first-rate poet if nature has been gracious to him.

এই উল্লেখের মধ্যে স্বদেশের কবি কৃত্তিবাসের নাম বাদ পড়িয়াছে। কিন্তু বিদেশী কবিদের মধ্যে ভার্জিলের কতটুকু প্রভাব ছিল বলা যায় না। দান্তে বা তাসসোর মধ্যযুগীয় খ্রীস্টান মনোভাব মধুসূদনের ছিল না: তাই তাঁহার কাব্যে দান্তের নরক বর্ণনার অনুসরণ সার্থক হয় নাই। কেবল ইংরাজ কবি মিল্টন ও গ্রীক কবি হোমর তাঁহার কবি-চিত্তকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। উদাত্ত-গম্ভীর ছন্দ-সঙ্গীতে মিল্টন যে তাঁহার গুরু ছিলেন এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। মিল্টনের মত মধুসূদনেরও বিদ্যার সাধনা ছিল, এবং একই ধরনের প্রশস্ত ও উচ্চ সারস্বত ভিত্তির উপর তিনিও তাঁহার কাব্যসৌধ নির্মাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কবি-মানস ও কাব্যের প্রকৃতি ছিল মিল্টনের কবি-মানস ও কাব্যের প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র। মিল্টনের কঠোর পিউরিটান মনোভাব অথবা গ্রীক-লাতিন কাব্যের আন্তরিক সংস্কারে classicality-র কঠিন সংযম, মধুসূদনের কল্পনা ও মনোবৃত্তির অনুকূল ছিল না। কারণ, মধুসূদনের কাব্যের Classic আবরণটি ছিল রচনাগত আদর্শ, বাইরের সংযম মাত্র, ইহার প্রাণবস্তু ছিল খাঁটি romantic। এই সকল কারণে তাঁহার তথাকথিত মহাকাব্য মিল্টনের মহাকাব্যের সগোত্র হইতে পারে না। সেইরূপ হোমরের প্রভাব ছিল দেশ ও কালের ব্যবধানে দূরাগত সাহিত্যিক প্রভাব মাত্র। মধুসূদন যখন লিখিয়াছেন:—

'I shall not borrow Greek stories, but write, rather try to write, as a Greek would have done.'

তখন বোধ হয় গ্রীক কবির বাণীভঙ্গী বা গঠন-রীতির অনুসরণের কথাই বলিয়াছেন। 'The grand mythology of our ancestors-এর প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল, এ-কথা সত্য। কিন্তু উপাখ্যানের বিস্তারে তিনি হিন্দু

পুরাণ নয়, গ্রীক পুরাণের দিকেই বেশি ঝুঁকিয়াছেন। কিন্তু গ্রীক কাব্যের নিরবচ্ছিন্ন বীর রসের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার নিজের ভাষায়—'Homer is all battles !' কেবল যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনায় যে বীররস সার্থক হয় না, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন মিল্টন-বর্ণিত শয়তানের অপূর্ব মানসিক স্থৈর্য ও বীর্য হইতে। সেইজন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ বাদ দিয়া রাবণের চরিত্রে তিনি অনুরূপ মানসিক বলের প্রকাশ দেখাইতে চাহিয়াছিলেন। বীররসের উদ্দেশ্য কাব্যের প্রারম্ভে ঘোষণা করিলেও, মধুসূদন বীরবিক্রমের কাহিনীকে শেষ পর্যন্ত বাঙালীর স্বভাবসিদ্ধ করুণরসে ডুবাইয়া দিয়াছেন। এ সকল পার্থক্য সত্ত্বেও গ্রীক মনোভাবের সঙ্গে এক জায়গায় তাঁহার কবি-চিত্তের গভীর মিল ছিল। যাহাকে আমরা গ্রীক Paganism বলি, অর্থাৎ স্বাভাবিক সৌন্দর্যজ্ঞান ও সুস্থ সহজ জীবন-প্রীতি, যাহা পাপ-পুণ্যে উদাসীন, আধ্যাত্মিকতার ভারে অপীড়িত, প্রেমে, ঘৃণায়, সুখে দুঃখে সমান অধীর,—এই মনোভাব খাঁটি ভারতীয় সংস্কারের বিরোধী হইলেও বাঙালীত্বের বা স্বভাব-কবিত্বের বিরোধী নয়। তেমনি গ্রীক অদৃষ্টবাদ ও দেবদেবীর উপর নির্ভরশীলতা তাঁহার মজ্জাগত হিন্দু কর্মবাদ বা অদৃষ্টবাদের বিপরীতগামী ছিল না। ইহা ছাড়া, যখন মধুসূদন দাবী করেন যে, তাঁহার কাব্য three-fourths Greek, তখন তাহা কবিজনোচিত অত্যুক্তি বলিয়াই মনে হয়।

অবশ্য নিছক কাব্যকলার দিক হইতে গ্রীক ও ইংরেজী কাব্যের অনুশীলনে মধুসূদন পাইয়াছিলেন সাহিত্যিক শিক্ষা বা সংস্কৃতি। এবং নিপুণভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যাহাকে বলে শিল্পিজনোচিত বুদ্ধি। সৌন্দর্যের অনুভূতি ও অনুভূত সৌন্দর্যের প্রকাশ শক্তি কবির নিজস্ব। কিন্তু বিদেশী সাহিত্যের শিক্ষাগারে এই স্বাভাবিক অনুভূতি ও রূপদক্ষতা অপূর্ব ও অভাবনীয় পরিণতি লাভ করিয়াছিল। ইহা শুধু কাব্য-কসরৎ নয় ; ভাব, ভাষা ও ভঙ্গীর অভিনব প্রয়োগ, গঠন সৌকুমার্য, ছন্দের নূতন ঝঙ্কার ও ধ্বনি-বৈচিত্র্য,—কাব্যকে রসাত্মক করিবার যাহা উপায়, তাহা মধুসূদন স্বকীয় প্রতিভায়, শুধু আত্মসাৎ নয়, আত্মস্থ করিয়া নবযুগের নূতন কাব্যের পথ নির্দেশ করিয়া দিলেন। এই হিসাবে তিনি পাশ্চাত্ত্য কাব্য-কলার যাহা উৎকৃষ্ট আদর্শ, তাহাকে জয়যুক্ত করিয়া বাংলা কাব্যে আধুনিকতার সূত্রপাত করিলেন।

কিন্তু বিদেশী কাব্যের অনুসরণে মধুসূদনের কাব্যে যেটুকু পাশ্চাত্ত্য ভাব আছে তাহা মুখ্যত আকৃতিগত ; কাব্যের প্রকৃতিতে বিদেশীর উপর দেশী ভাবই জয়ী হইয়াছে। নূতন শিক্ষা ও রুচির বিস্তারে পাশ্চাত্ত্যের প্রবল প্রভাব তাঁহার নবজাগ্রত চেতনাকে আলোড়িত করিয়াছিল, কিন্তু গভীর মর্মস্থলে ছিল বাঙালীর অতি-প্রাচীন মজ্জাগত বাঙালীত্ব। এই মনোবৃত্তির মূলে ছিল সে-যুগের বিদেশী ভাব ও চিন্তায় প্রপীড়িত বিপর্যস্ত বাঙালী প্রাণের আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষা ;

আয়োজনের ত্রুটি ছিল না,—সাহিত্য অনুশীলন, সৌন্দর্যজ্ঞান ও ভাবগ্রাহিতার অভাব ছিল না, হোমার ভার্জিল তাসসো মিল্টন বাল্মীকি ও কালিদাসের আদর্শ উপলব্ধি করিবার যথেষ্ট প্রতিভা ছিল, কিন্তু কবি যাহা রচনা করিলেন, তাহা প্রাচীন মহাকাব্যের ব্যর্থ নকল মাত্র নয়, তাহা মহাকাব্যের আকারে বাঙালী জীবনের প্রতিচ্ছায়া-মূলক খাঁটি আধুনিক কাব্য। এ কথা সত্য, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যের আদর্শে মধুসূদন অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বর্তমান সময়ের কবির পক্ষে, বিশেষত বাঙালী কবির পক্ষে, প্রাচীনতম যুগের প্রেরণা রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। ছন্দের উদাত্ত ধ্বনি-বৈচিত্র্য, কল্পনার অবাধ বিস্তার ও বিপুল বিবিধ বিষয়ের সন্নিবেশ প্রভৃতি মহাকাব্যের কয়েকটি লক্ষণ মধুসূদনের কাব্যে রহিয়াছে সত্য ; কিন্তু যে বহির্বস্তুগত সংযত-শান্ত রসাবেশ, বিরাট-গম্ভীর বস্তুর যে গৌরব-গান মহাকাব্যের প্রাণস্বরূপ, তাহা মধুসূদনের কাম্য হইলেও তাঁহার কবি-প্রকৃতির অধিগম্য ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ বলিযাছেন যে মধুসূদনের মন ছিল মহাকাব্য-সঞ্চারী ; কিন্তু আমাদের মনে হয়, Classic মহাকাব্যের অনুরাগী হইলেও তাঁহার কবি-প্রকৃতি ছিল মুখ্যত রোমান্টিক। বাহিরের বস্তুজগৎ হইতে উপাদান আহৃত হইলেও, তাঁহার আত্মগত ভাব ও আবেগই সেই আবেগকে কাব্যসম্মত রূপদান করিয়াছে। মেঘনাদবধের উপাখ্যানভাগ পুরাতন বটে, কিন্তু কবির রাম-লক্ষ্মণ, রাবণ-ইন্দ্রজিৎ, সরমা-প্রমীলা প্রভৃতি বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসের সন্ততি নয়, হোমার বা মিল্টনের চরিত্র-চিত্রের সগোত্রও নয়, কারণ, প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের কাব্য-প্রেরণার মূলে ছিল না রামায়ণ, ইলিয়াদ বা প্যারাডাইস্ লস্ট ; ছিল একদিকে বর্তমান যুগের সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির ভাবজগৎ ও নব-মানবতার আদর্শ, অন্যদিকে বাঙালীর সংস্কারগত একান্ত সুকুমার ভাব-প্রবণতা। কাব্যের প্রথমেই কবি বলিয়াছেন—

> "গাইব মা, বীর রসে ভাসি'
> মহাগীত ;"

কিন্তু তিনি যে মহাগীত রচনা করিলেন, তাহাতে বীররস নয়, করুণ রসই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সেইজন্য তাঁহার চরিত্রগুলি বীর-গরিমার লোকাতীত আদর্শে অঙ্কিত নয় ; এগুলিতে দেখিতে পাই বাঙালী জীবনের নিতান্ত লৌকিক সংস্কার, বাঙালী চিত্তের স্নেহার্দ্র কোমলতা। রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিতের প্রতি কবির পক্ষপাত এই কারণেই ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য আদর্শে তিনি মনুষ্যের মনুষ্যধর্ম ও পুরুষের পৌরুষকে তাঁহার কাব্য কল্পনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ফল্গুর মত অন্তর-প্রবাহী বাঙালী-সুলভ মমতা ও প্রীতি বহিরাগত আদর্শকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইতে দেয় নাই।

এই ভাবপ্রবণতা লক্ষ্য করিয়া এক সময় তরুণ রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্যের অসম্পূর্ণতা দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এদিক দিয়া লক্ষ্য করেন নাই যে, এই আত্মভাব-নিমগ্নতাই মধুসূদনের তথাকথিত মহাকাব্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এই

মূলগত আবেগের বেগ রাবণের বিলাপে, রামচন্দ্রের মমতায়, সীতার দুঃখে, প্রমীলার ক্রন্দনে সর্বত্রই Epic-এর বাস্তব-আবরণ ভেদ করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কবির এরূপ আত্মগত ভাবের প্রাধান্য মহাকাব্য-জাতীয় রচনার নয়, গীতি কবিতারই উপজীব্য। বাস্তবিক মধুসূদনের রচনা মহাকাব্য হিসাবে সফল হয় নাই; সফল হইয়াছে কেবল কাব্য হিসাবে। কাব্যের নূতন আদর্শকে আয়ত্ত করিয়া। অর্থাৎ নকল 'মহাকাব্য' না হইয়া তাঁহার রচনা যে অপূর্ব বাংলা কাব্য হইয়াছে তাহা দোষের কথা নয়, সৌভাগ্যের বিষয়। ইহাই বিস্ময়কর যে, রবীন্দ্রনাথের মত lyric কবি মধুসূদনের কাব্যের এই lyric ভাবটি গ্রহণ করেন নাই, ইহার epic আবরণ তাঁহাকে ভুলাইয়া দিয়াছিল। মহাকাব্য হিসাবে ইহার অসম্পূর্ণতা আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল কাব্য হিসাবে ইহার সার্থকতাকে।

নিছক মহাকাব্য-রচনার দিক দিয়া পাশ্চাত্ত্য প্রভাব মধুসূদনের মনের উপর কার্যকরী হয় নাই; কিন্তু এই স্বাধীনচেতা পুরুষ সাহিত্যে স্বাধীনতার যে মূলমন্ত্রটি খুঁজিতেছিলেন, নূতন শিক্ষার আলোক তাঁহাকে তাহার সন্ধান দিয়াছিল। বিদেশী সাহিত্য হইতে যে সব নূতন প্রয়োগের পরীক্ষা তিনি করিয়াছিলেন তাহার সবগুলি হয়ত পূর্ণাঙ্গ হয় নাই। কিন্তু তাঁহার সকল প্রেরণার মূলে ছিল কবিকল্পনার মুক্তির জন্য দুর্ধর্ষ আকাঙ্ক্ষা। সেইজন্য শুধু নির্দিষ্ট সিদ্ধি হিসাবে নহে, সাধনা হিসাবেও এই সকল রচনা মূল্যবান। তিনি যাহা করিয়াছিলেন শুধু তাহাই নহে, যাহা করিবার প্রথম পথ দেখাইয়াছিলেন তাহাও ধরিতে হইবে।

কিন্তু ঐতিহাসিক মূল্যই কাব্যের একমাত্র মূল্য নয়। পথিকৃৎ হিসাবে আমরা মধুসূদনকে স্মরণ করি, কিন্তু কেবল কবি হিসাবেও তাঁহার কৃতিত্ব যে অনন্যসাধারণ তাহা প্রায়ই ভুলিয়া যাই। বাংলা সাহিত্যে তিনি যে সকল নূতন ধরনের রচনার অবতারণা করিলেন, প্রকৃত কবিত্ব-শক্তি না থাকিলে তাহার একটিকেও রূপ দিতে পারিতেন না। এ বিষয়ে তাঁহার প্রধান কীর্তি হইতেছে বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন। এই একটি বিষয়ের প্রয়োগ নৈপুণ্য হইতেই তাঁহার অসামান্য কবি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন যিনি করিয়াছিলেন, তিনি কত বড় প্রতিভাবান কবি এবং এই ছন্দের অপূর্ব ঝংকার তাঁহার কবিত্ব-শক্তির কতখানি সাক্ষ্য দিতেছে, তাহা বুঝিতে গেলে প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিচিত্র-বিপুল সঙ্গীত, যাহা ধরা-বাঁধা কাঠামোর মধ্যে ধরা দেয় না, তাহাকে আয়ত্ত করিতে কতখানি ক্ষমতার প্রয়োজন। বিদেশী ভাষার উৎকৃষ্টতম ও সর্বাপেক্ষা কঠিন ছন্দ তৎকালীন অতি দুর্বল ও অপরিণত বাংলা কাব্যের দেহে (শুধু অক্ষর গুনিয়া নয়, কানের সূক্ষ্মতায় ও প্রাণের অনুভবে) ধ্বনিত করিয়া তোলা যে কতখানি বিস্ময়ের ব্যাপার, তাহা কাব্যরসজ্ঞ পাঠক মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। মধুসূদনের দুর্লভ কবিত্ব-শক্তি ছিল

বলিয়াই তাঁহার নূতন ছন্দ পুরাতন ভাষায় এত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাহাই নয়। এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, এই সম্পূর্ণ অভিনব ছন্দ বাংলা কাব্যের চিরাগত রীতি ও প্রকৃতি এবং সেই সঙ্গে তাহার গতিও ফিরাইয়া দিল। ইহা শুধু কাব্যের ছন্দ-ভাণ্ডারে একটি নূতন ছন্দের দান নয়; এই প্রেরণার মূলে রহিয়াছে কবি-কল্পনার মুক্তি ও প্রকাশরীতির অবারিত স্বাচ্ছন্দ্য। ইহা শুধু বাংলা কবিতার পয়ারের বোড় ভাঙে নাই, সঙ্গে সঙ্গে নূতন পথেরও সন্ধান দিয়াছে, যাহার মুক্তিমন্ত্র পরবর্তী কবিদের অন্তরে নব সৃষ্টির সাহস ও স্বাধীন কল্পনার স্ফূর্তি জাগাইয়া দিল। ভাবের দিক হইতে যেমন, তেমনি আবার কবিতার বহিরঙ্গ ভাষা ও ছন্দের ব্যাপারেও মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। বাংলা কবিতার আদিরূপ যে পয়ার এবং যাহা বাংলা ছন্দের মেরুদণ্ড স্বরূপ, সেই পয়ারের অন্তর্নিহিত শক্তি যে কত বৃহৎ, তাহা মধুসূদনই প্রথম দেখাইলেন। ইহার পরে অসামান্য ধ্বনি বৈচিত্র্যে ও বিবিধ রূপের সমৃদ্ধিতে পয়ারের শক্তি বহু পরিমাণে বাড়িয়া গেল; শুধু একতারা নয়, বঙ্গভারতীর সপ্তস্বরা বাজিয়া উঠিল।

তাই অমিত্রাক্ষর রচনা কেবল অভিনব কলাকৌশলের প্রমাণ নয়, ইহাতে একটি সম্পূর্ণ কবি-মানসের পরিচয়ও রহিয়াছে। অমিত্রাক্ষরের সঙ্গীত তরঙ্গে ছন্দ-সরস্বতীর যে পুতন্ত্রী বাজিয়াছে, তাহা সম্ভব হইল কেমন করিয়া? মধুসূদন কি কেবল ছন্দ-কুশলী, ছন্দ-ধ্বনির সুনিপুণ কলাবিদ্? যে অবস্থায় যে-ভাবে তিনি এই বিদেশী সঙ্গীতকে স্বদেশী ছন্দে ধরিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে শুধু কলানৈপুণ্যের পরিচয় ছাড়াও মহত্তর কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মধুসূদন যে ছন্দ শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা করিয়া এই অপূর্ব ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। যাহা সকল উৎকৃষ্ট কবিতার উৎস, যাহা কাব্যের ছন্দ-সঙ্গীতে রূপ গ্রহণ করে, সেই অকৃত্রিম ভাব-প্রেরণাই তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দে স্পন্দিত হইয়াছে। তাই ইহার বিচিত্র ও অবারিত ঝঙ্কারের মধ্যেই আমরা কবি-প্রাণের প্রকৃত পরিচয় পাই। তাঁহার যাহা বক্তব্য তাহা অপেক্ষা এই আবেগের মধ্যেই আমরা তাঁহার কবি-কল্পনার মহত্ত্ব অনুভব করি। বাহিরের যে ছন্দোময় প্রকাশ, তাহা শুধু বাহিরের বেশ নয়, তাহা ইহার অন্তরের ভাব-মূর্তি। কবির প্রাণে কবিতার যে আদর্শ রহিয়াছে, লোকাতীত কল্পনা-জগতে বিচরণ করিবার যে দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, সর্ববন্ধন মুক্তির যে অসীম আনন্দ তাঁহার কবিচিত্তকে উদ্বেল করিয়াছে, মেঘনাদবধের অমিত্রাক্ষর ধ্বনির সাগরকল্লোলবৎ গম্ভীর মধুর প্রাণোচ্ছ্বাসে তাহাই পরিস্ফুট হইয়াছে। তাই মনে হয়, মধুসূদনের ভাবাবেগ ও কবিত্বশক্তির বিরাট নিদর্শন এই সঙ্গীত,—ইহাই তাঁহার কাব্যকীর্তি, সৃষ্টি-সামর্থ্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, নূতন সৃষ্টির পথ খুঁজিয়া পাইলেও, বাঙালীর কবি-প্রতিভা মহাকাব্য রচনার অনুকূল ছিল না। বরং গীতি সুলভ ভাব-প্রবণতার জন্য তথাকথিত মহাকাব্যগুলিতে Classic সংযম অপেক্ষা

romantic আবেগ ওতপ্রোত রহিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে দেখিলে মনে হইবে, সে যুগের মহাকাব্য রচয়িতাগণ কাব্যের প্রেরণার জন্য আপনার মনোরাজ্যে দৃষ্টিপাত না করিয়া, বাহিরের বস্তুজগতে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়াছিলেন, আত্মগত অনুভূতির মধ্যে নয়, ইতিহাস পুরাণের মধ্যে উপকরণ সন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, বাইরের বাস্তব আবরণের অন্তরালে, epic বা narrative রূপের পিছনে, তাঁহাদের কাব্যের সমস্তটাই মনঃসৃষ্টি, অন্তরগত ভাবকল্পনার বিজয়গীতি, lyric আবেগের অসীম আনন্দ। যে শক্তির স্ফূর্তি ও সংস্কার-মুক্তির প্রেরণা বাংলা সাহিত্যের সংকীর্ণ খাতে সমুদ্র গর্জন আনিয়াছিল, নির্জীব পয়ারকে সঞ্জীবিত ও পক্ষমুক্ত করিয়া মহাকাব্যের আকাশে ছাড়িয়া দিয়াছিল, তাহা প্রকৃতপক্ষে একটি Lyric আবেগ, প্রাণের দুর্দমনীয় বিদ্রোহের উল্লাস। বিশ্ব-জগৎকে অস্বীকার না করিলেও, তাহাকে হৃদয়ের ভাব ও চিন্তার দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল সে যুগের কাব্য সৃষ্টি। সেইজন্য একটি প্রচ্ছন্ন গীতি কবিতার সুর সমস্ত রচনায় বিক্ষিপ্ত হইয়া বিরাজ করিতেছিল। বিহারীলালের প্রায় সমসাময়িক গীতি কবিতায় এই সুরটি ক্রমশ আপন মূর্তিতে অন্যান্য সমস্ত সুরকে অতিক্রম করিয়া অবশেষে বাংলা কাব্যের আসরে একক হইয়া পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। বিদেশী ছাঁচে ঢালা মহাকাব্য বাঙালীর ধাতে সহিল না, মহাকাব্য রচনার প্রয়াস স্থায়ী হইল না। বাংলা সাহিত্যের অতি পুরাতন গীতি-কবিতার সুরটি, সমসাময়িক গীতি-কবিতার সুরের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া, পুনরায় নূতন আকারে প্রধান হইয়া দাঁড়াইল। এবার আর পরকীয় ভাব রহিল না, কবি নিজস্ব সুরেই বিশিষ্ট সুখ দুঃখের কথাকে নির্বিশেষ রসধারায় অভিষিক্ত করিয়া দিলেন।*

* অধ্যাপক ডঃ সুশীলকুমার দে'র 'নানা নিবন্ধ' (প্রথম সংস্করণ ১৯৫৩) গ্রন্থ থেকে প্রকাশক মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা ১২-র সহৃদয় অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত। —সম্পাদক

ছন্দশিল্পী মধুসূদন

প্রবোধচন্দ্র সেন

মধুসূদনের ছন্দপ্রতিভার অসাধারণত্ব সর্বস্বীকৃত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর ছন্দকীর্তির সামগ্রিক রূপটি এখনও সর্বজনগোচর হয়নি। তাঁর প্রবর্তিত প্রবহমাণ অমিত্রাক্ষর পয়ারই তাঁর একমাত্র কীর্তি, অধিকাংশ মানুষেরই এই ধারণা। অথচ এই ছন্দোবন্ধের আসল প্রকৃতি সম্বন্ধেও অনেকের স্পষ্ট ধারণা নেই। তা ছাড়া, নানা মতভেদ এ বিষয়ে আরও বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে মধুসূদনের ছন্দপ্রতিভার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। এখানে শুধু কয়েকটি মাত্র বিষয়ের উল্লেখ করাই যথেষ্ট।

কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্ত প্রমুখ কবিদের রচনার সঙ্গে মধুসূদনের ছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়। বৈষ্ণব পদাবলী ও কীর্তন-গানের প্রতিও তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল। তা ছাড়া, চলতি ভাষা ও লোক সাহিত্যের প্রতিও তিনি উদাসীন ছিলেন না, এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। ফলে বাংলা ছন্দের তিন রীতির সঙ্গেই তাঁর অল্পাধিক পরিচয় ঘটেছিল। প্রথমেই ধরা যাক লোকরীতির (folk style-এর) কথা, যাকে আমি বলি দলবৃত্ত রীতি (Syllabic style)। 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' প্রহসনে (১৮৬০) আছে—

> এখন্ কি আর্ নাগর্ তোমার্
> আমার্ প্রতি, তেমন্ আছে।
> নূতন পেয়ে পুরাতনে
> তোমার্ সে যতন্ গিয়েছে॥
> তখন্কার ভাব থাক্‌তো যদি,
> তোমায় পেতেম্ নিরবধি,
> এখন্, ওহে গুণনিধি,
> আমায় বিধি বাম হয়েছে।

লোকছন্দের একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এটি। দুটি দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি ও একটি চৌপদী পঙ্‌ক্তি নিয়ে গঠিত এর স্তবকবন্ধটিও লক্ষণীয়। আরও লক্ষণীয় হস্ চিহ্নগুলি। এ বিষয়ে তিনি ঈশ্বর গুপ্তের অনুবর্তী। এই হস্‌চিহ্নের দ্বারাই বোঝা যাচ্ছে, এখানে মুক্তরুদ্ধ-নির্বিশেষে এক-একটি দল অর্থাৎ সিলেব্‌ল্‌ই এক এক মাত্রা বলে গণ্য হয়েছে। তাই একে বলি আমি দলবৃত্ত (Syllabic) ছন্দ। 'বুড় শালিকের

ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের 'বাইরে ছিল সাধুর আকার, মনটা কিন্তু ধর্ম ধোয়া' ইত্যাদি সুবিখ্যাত শ্লোকটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

তারপরে ধরা যাক কলাবৃত্ত রীতির (moric style এর) কথা। এ ক্ষেত্রে মধুসূদনের কান তৈরি হয়েছিল প্রধানত সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ও বৈষ্ণব পদাবলীর দ্বারা। কিন্তু সম্ভবত তারও মূলে ছিল তাঁর আন্তরিক সঙ্গীত প্রীতি। মধুসূদন এক জায়গায় নিজেই বলেছেন—"I think I have a tendency in the Lyrical way।" মধুসূদনের হৃদয় যে মূলত লিরিক ভাবাপন্ন ছিল, একথা আজ আর কারও অজানা নয়। কিন্তু তাঁর লিরিক প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায়নি। তিনি যদি সে সুযোগ পেতেন তা হলে তাঁর হাতেই কলাবৃত্ত রীতির ছন্দ অনেকখানি পরিণতি লাভ করত, এমন মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। কেননা, কলাবৃত্ত রীতির ছন্দ হচ্ছে প্রকৃতিতে সঙ্গীতধর্মী এবং লিরিক কবিতার মুখ্যবাহন। এ রীতির ছন্দ মধুসূদনের হাতে পরিণতি লাভের সুযোগ না পেলেও তাঁর রচনার নানা স্থানেই কলাবৃত্ত রীতির প্রতি একটা সুস্পষ্ট প্রবণতা (tendency) দেখা যায়। তার কিছু কিছু নিদর্শনও পাওয়া যায় বিভিন্ন রচনায়। যেমন, 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের (১৮৫৯) একটি গানে আছে—

পিককুল-কূজিত ভৃঙ্গ-বিগুঞ্জিত,
রঞ্জিত কুঞ্জ নিতান্ত।
যত বিরহিণীগণ, মন্মথ তাড়ন,
তাপিত তনু বিনে কান্ত॥

এটুকু প্রায় কলাবৃত্ত (প্রাচীন 'মাত্রাবৃত্ত') রীতিতে রচিত। বলা বাহুল্য, এখানে বাংলা উচ্চারণের প্রভাবে দীর্ঘস্বর মাঝে মাঝে হ্রস্বতা প্রাপ্ত হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে এ জাতীয় স্খলনের নিদর্শন সুপ্রচুর। এর প্রতি পঙ্‌ক্তিতে আছে সাত পর্ব, আর প্রতি পর্বে আছে চার কলামাত্রা। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যে, বৈষ্ণব ব্রজবুলি পদাবলী ও রবীন্দ্র রচনায় এ জাতীয় কলাবৃত্ত ছন্দোবন্ধের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' গানের ছন্দোবন্ধ। কিন্তু মধুসূদনের কালে এ রীতির ছন্দের ব্যবহার প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছিল। এই জন্য এই রচনাটির ছন্দোবৈশিষ্ট্য 'মধুসূদনের কৃতিত্বের পরিচায়ক বলে স্বীকৃত হবার যোগ্য'। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের আর একটি গানের দুটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করি।—

জয় উমেশশঙ্কর, সর্বগুণাকর,
ত্রিতাপ-সংহর, মহেশ্বর।
হলাহলাঙ্কিত, কণ্ঠ সুশোভিত,
মৌল বিরাজিত সুধাকর॥

এটিও পূর্বোদ্ধৃত দৃষ্টান্তটির ন্যায় একই কলাবৃত্ত ছন্দোবন্ধে রচিত। এর বিশিষ্টতা শুধু এটির স্তোত্র প্রকৃতিতে। কিন্তু এটিতে কোন অভিনবত্ব নেই।

কেননা, এটি স্পষ্টতই ভারতচন্দ্রের স্তোত্র রচনার ছাঁচে ঢালাই করা।

'শর্মিষ্ঠা' নাটকের এই দুটি গীত কার রচনা, মধুসূদনের না যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের, তা নিঃসন্দেহে বলার উপায় নেই। যাঁরই হোক, এ দুটি রচনার ছন্দোবৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। আর, এ দুটির ছন্দ-সঙ্গীত যে মধুসূদনের কানের প্রসন্নতার পরিচায়ক, এ প্রসঙ্গে সে কথাটাই আমাদের পক্ষে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

'পদ্মাবতী' নাটকের (১৮৬০ এপ্রিল মে) একটি গান থেকে দুটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি,—

সৈন্য সকল সমরকুশল
নিরখি ভীত অরিদলবল,
কম্পিত হয় ধরণীতল,
বাসুকী নত লাজে।
ভূপতি অতি বীর্যবান,
বিভব নিরখি সুরসমান,
ইন্দ্র যেন শোভমান
মর্ত্য-ভুবন মাঝে॥

এটিও প্রত্নকলাবৃত্ত (প্রাচীন 'মাত্রাবৃত্ত রীতিতে' রচিত)। এর প্রতি পঙ্‌ক্তিতে আছে আট পর্ব, আর প্রতি পর্বে আছে ছয় কলামাত্রা। জয়দেবের গীতিরচনায় এই ছন্দোবন্ধের নিদর্শ নেই। বৈষ্ণব ব্রজবুলি পদাবলীতে আছে। কিন্তু পদ্মাবতীর এই বাংলা গীতিরচনাটিতে প্রত্যক্ষত ব্রজবুলির আদর্শ অনুসৃত হয়েছে কিনা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। এই রচনাটির বিষয়, ভাষা ও ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই হিসাবে আধুনিক বাংলা ছন্দোবিবর্তনের ইতিহাসে এই রচনাটির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

খাঁটি বাংলা উচ্চারণ-সম্মত নব কলাবৃত্ত রীতি প্রবর্তনের কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু তার কিছু পূর্বাভাস পাওয়া যায় মধুসূদনের রচনাতেও। যাঁর কান প্রত্ন-কলাবৃত্ত রীতিতে অভ্যস্ত তাঁর রচনায় নব কলাবৃত্ত রীতির পূর্বাভাস পাওয়া যাবে, এটা আশ্চর্যের বিষয় নয়। তাঁর 'পদ্মাবতী' নাটক থেকেই একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :—

যে জন পীরিতে রত,
সুখ দুঃখ সহে কত
পরেরি তরে।...
নলিনী ভানুর বশে,
মগন প্রণয়-রসে,
তথাপি কখন ভাসে
বিষাদ-নীরে।

এর সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের 'হৃদয়-যমুনা' কবিতার ('সোনার তরী') এই দুই পঙ্‌ক্তি—

যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ
এসো ওগো এসো মোর
হৃদয় নীরে।
তলতল ছল ছল
কাঁদিবে গভীর জল
ওই দুটি সুকোমল
চরণ ঘিরে।

দুটি রচনার পূর্ণ স্তবক উদ্ধৃত হলে সাদৃশ্য আরও স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পেত। এই দুটি রচনার কোনটিরই ধ্বনিবিন্যাস পারিভাষিক অর্থে কলাবৃত্তসম্মত নয়। কিন্তু ছন্দোগত রসের বিচারে দুটিতেই যে সমপরিমাণে কলাবৃত্ত সুলভ লিরিক সুর ধ্বনিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। বস্তুত এই দুটি রচনাতেই কলাবৃত্ত জাতীয় লিরিক সুরেরই প্রাধান্য এবং পারিভাষিক অর্থেও এ-দুটিকে অনায়াসেই কলাবৃত্তে পরিণত করা যায়। কেননা, এ-দুটি রচনারই ঝোঁক কলাবৃত্তের দিকে। প্রয়োজন শুধু যুক্তাক্ষর সূচিত রুদ্ধ দলগুলিকে দুই মাত্রার মূল্য দেওয়া।

'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের (১৮৬১) 'কুসুম' কবিতার প্রথম স্তবকটি এই—

কেন এত ফুল তুলিলি, সজনি, ভরিয়া ডালা ?
মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী তারার মালা ?
আর কি যতনে কুসুম-রতনে ব্রজের বালা ?

এই অংশটুকুর ধ্বনিবিন্যাসেও কলাবৃত্তসুলভ লিরিক-সুর সুস্পষ্ট। অধিকন্তু যুক্তাক্ষর বর্জনের ফলে এখানে কলাবৃত্ত ছন্দোরীতিতেও কোন ত্রুটি ঘটেনি। কেননা, এ রীতির ছন্দে শব্দ-মধ্যবর্তী একমাত্রক যুক্তাক্ষর প্রয়োগে ছন্দের তাল কেটে যায়। মধুসূদনের পরিশীলিত কানে তা ধরা পড়েছিল। তাই এই কবিতাটির পরবর্তী অংশেও যথাসম্ভব যুক্তাক্ষর বর্জনের সুস্পষ্ট প্রয়াস দেখা যায়। এটা মধুসূদনের লিরিক ধ্বনিরসবোধ ও কলাবৃত্ত ছন্দোবোধেরই পরিচায়ক। যুক্তাক্ষরসূচিত রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রিক প্রয়োগের দ্বারা কলাবৃত্ত-রীতির বাংলা ছন্দকে কিভাবে তরঙ্গিত করে তোলা যায়, তা প্রথম দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের রচনায়। 'মানসী' কাব্যের 'ধ্যান' কবিতার (১৮৮৯) প্রথমেই আছে—

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি ;
তুমি আছ মোর জীবন মরণ হরণ করি।

'কুসুম' কবিতার পূর্বোদ্ধৃত প্রথম স্তবকটির সঙ্গে এই অংশটুকুর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ছন্দোরূপের বিচারে দুটি অভিন্ন, দুটিই ত্রৈতক (triplet) বন্ধে রচিত।

ছন্দোরীতিতেও দুটি অভিন্ন, দুটিই রচিত কলাবৃত্ত রীতিতে। পার্থক্য শুধু এই যে, রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রিক প্রয়োগের কৌশল অনায়ত্ত ছিল বলে মধুসূদন যুক্তবর্ণ বর্জন করে চলেছেন। তাই তাঁর ছন্দ হয়েছে সমতল। আর রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রিক প্রয়োগের নবাবিষ্কৃত কৌশলে রবীন্দ্রনাথের হাতে ওই একই কলাবৃত্ত রীতির ছন্দ দেখা দিয়েছে তরঙ্গিত ভঙ্গিমায়।

'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের 'বংশীধ্বনি' কবিতাটিতেও নিঃসন্দেহে কলাবৃত্ত সুলভ লিরিক সুর বেজেছে, এটির পর্দাবিন্যাসও কলাবৃত্তরীতিসম্মত। যেমন—

> কে ও বাজাইছে বাঁশী, স্বজনি,
> মৃদু মৃদু স্বরে নিকুঞ্জবনে ?
> নিবার উহারে ; শুনি ও ধ্বনি ?
> দ্বিগুন আগুন জ্বলে লো মনে।—
> এ আগুনে কেনে আহুতি-দান ?
> অমনি নারে কি জ্বালাতে প্রাণ ?

'নিকুঞ্জবনে' না লিখে 'কুঞ্জবনে' লিখলেই এই স্তবকটির ছন্দ নিখুঁত কলাবৃত্ত রীতিতে পরিণত হত। 'অক্ষর মাত্রার' সংস্কার কাটাতে পারেননি বলে মধুসূদন এই কবিতাটিতেও যথাসম্ভব যুক্তাক্ষর বর্জন করে চলেছেন। নতুবা এই কবিতাটি কলাবৃত্ত ছন্দের একটি চমৎকার নিদর্শন রূপে গণ্য হতে পারত। এই কবিতাটির পঙ্‌ক্তিসজ্জাও অভিনব। এটির মূল উপাদান প্রাচীন 'একাবলী'। তবু শুধু বিন্যাসগুণেই এটি একটি মনোরম লিরিক-বিশিষ্টতা লাভ করেছে।

'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের 'বসন্তে' কবিতার প্রথম স্তবকের শেষাংশ এই,—

> পিক কুল কল কল,
> 'চঞ্চল' অলিদল,
> উছলে সুরবে জল,
> চললো বনে।

এই চৌপদী পঙ্‌ক্তিটির সঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত 'নলিনী ভানুর বশে' (মধুসূদন) এবং 'তলতল ছল ছল' (রবীন্দ্রনাথ), এই দুটি অংশের—বিশেষত দ্বিতীয়টির সাদৃশ্য কান এড়িয়ে যেতে পারে না। তবে সামান্য একটু পার্থক্যও আছে। এই তৃতীয় দৃষ্টান্তটিতে 'চঞ্চল' শব্দের চঞ্‌ দলটিকে যে কায়দায় দুই কলামাত্রার মূল্য দেওয়া হয়েছে, অন্য দুটি রচনায় সে কায়দা অনুসৃত হয়নি। এই পার্থক্যটুকু সামান্য হলেও তার গুরুত্ব কম নয়। রুদ্ধদলের অনুরূপ দ্বিমাত্রক প্রয়োগই কলাবৃত্ত রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং তাতেই কবিতার ভাষায় লিরিকের সুর ধ্বনিত হয়। বাংলা কবিতায় দ্বিমাত্রক রুদ্ধদলের সচেতন ও ব্যাপক প্রয়োগ প্রথম দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যে (১৮৯০)। তখন থেকেই বাংলা ছন্দে এই নূতন কলাবৃত্ত রীতি প্রচলিত হয়েছে। তার পূর্বে কারও কারও রচনায় কখনও কখনও

এরকম প্রয়োগ দেখা দিত কবির ধ্বনি রসবোধের প্রেরণায়। 'চঞ্চল' শব্দের উক্ত চতুর্মাত্রিক প্রয়োগও মধুসূদনের সহজাত ধ্বনিরুচি ও ছন্দপ্রতিভারই পরিচায়ক, সচেতন ছন্দবোধের নয়। 'চঞ্চল' শব্দের চঞ্ দলটির দ্বিমাত্রিক প্রয়োগ যদি জ্ঞানকৃত হত তা হলে 'বসন্তে' কবিতার অন্যত্রও অনুরূপ প্রয়োগ থাকত। কিন্তু তা যে থাকেনি তাতেই বোঝা যায়, মধুসূদন অক্ষরমাত্রার সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। শুধু ওই 'চঞ্চল' শব্দটিতে তাঁর শিক্ষালব্ধ অক্ষরমাত্রার সংস্কারকে পাশ কাটিয়ে তাঁর সহজাত ছন্দ প্রতিভা আত্মপ্রকাশ ক'রছে ব্যতিক্রম হিসাবে। কিন্তু ওই ব্যতিক্রমটুকুর মধ্যেই উত্তরকালীন কলাবৃত্ত রীতির পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে। এখানেই ওই ব্যতিক্রমটুকুর গুরুত্ব। 'হৃদয়-যমুনা' কবিতাটির রচনার কালেও (১৮৯৩) রবীন্দ্রনাথ এ জাতীয় ছন্দে রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রিক প্রয়োগের সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারেন নি। অথচ তার বত্রিশ বৎসর পূর্বেই মধুসূদনের কান (তাঁর জ্ঞান নয়) যে এ রকম ছন্দ রচনায় ব্যতিক্রম হিসাবেও রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রকতার প্রতি ঝুঁকেছিল, এটা তাঁর শ্রুতিরুচির কলাবৃত্ত-প্রবণতার তথা তাঁর অসাধারণ ছন্দরস-বোধের পরিচায়ক। মধুসূদন এ জাতীয় রচনায় কলাবৃত্তরীতি প্রয়োগের সুযোগ পাননি। সে সুযোগ পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর উত্তরকালীন রচনা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এই ছন্দোবন্ধেই কলাবৃত্ত পদ্ধতিতে রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রিক প্রয়োগের দ্বারা কবিতার ধ্বনিপ্রবাহ কেমন তরঙ্গিত হয়ে ওঠে, তার অতি-সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' কাব্যের 'বরযাত্রা' (১৯২৮) কবিতাটিতে। যেমন,

পথপাশে মল্লিকা দাঁড়াল আসি,
বাতাসে বসন্তের বাজান বাঁশি।
ধরার স্বয়ম্বর
উদার আড়ম্বরে
আসে বর অম্বরে
ছড়ায়ে হাসি

মধুসূদনের 'বসন্তে' কবিতায় 'চঞ্চল' শব্দে চকিত প্রয়োগে যার সূত্রপাত, রবীন্দ্রনাথের 'বরযাত্রা' কবিতায় রুদ্ধদল প্রয়োগের উদার আড়ম্বরে তার পরিণতি। মধুসূদনের রচনায় কলাবৃত্ত প্রবণতার প্রসঙ্গে এ কথাটুকু মনে রাখা কর্তব্য।

কলাবৃত্তরীতির প্রতি মধুসূদনের শ্রুতিরুচিজাত স্বাভাবিক আকর্ষণের সংশয়াতীত প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর শেষ জীবনে রচিত 'দেবদানবীয়ম্' নামক আট পঙ্ক্তির কৌতুক রচনাটিতেও। তার প্রথম চার পঙ্ক্তি এই:

কাব্যেকখান রচিবারে চাই
কহো কি ছন্দঃ পছন্দ, দেবি!
কহো কি ছন্দঃ মনানন্দ দেবে
মনীষীবৃন্দে এ সুবঙ্গ দেশে?

এই অংশটুকুতে কলাবৃত্তের সুর সুস্পষ্ট। যদি 'মনানন্দ' ও 'এ সুবঙ্গ', এই দুই স্থলে লেখা হত 'আনন্দ' ও 'এ বঙ্গ', তা হলে এই চার পঙ্‌ক্তিতে কলাবৃত্ত মাত্রা-বিন্যাস রীতিও হত নিখুঁত। কোন্ রীতির ছন্দ যে বাংলার ছন্দ সরস্বতীর পছন্দ আর কোন্ ছন্দ যে ভাবী বাংলার মনীষিবৃন্দকে আনন্দ দেবে, তার সুনিশ্চিত পূর্বাভাস মধুসূদনই দিয়ে গেছেন এই চার পঙ্‌ক্তিতে। এই রচনাটিতে মধুসূদন দেবী সরস্বতীর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন—তোমার ছন্দোবীণাটি আমার হাতে দাও, 'বাজাইয়া তাই যশস্বী হবো।' কিন্তু দেবী সরস্বতীর ছন্দোবীণায় কলাবৃত্তের সুর বাজিয়ে যশস্বী হবার সৌভাগ্য মধুসূদনের হয়নি। সে সৌভাগ্য হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। তিনিই বঙ্গ ভারতীর ছন্দোবীণায় কলাবৃত্ত ছন্দের সুর বাজিয়ে সুবঙ্গদেশের মনীষিবৃন্দকে অভাবিতপূর্ব আনন্দে অভিভূত করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি সচেতনভাবেই বলতে পেরেছিলেন—

> ১। নব সংগীতে নূতন ছন্দ—
> হৃদয় সাগরে পূর্ণচন্দ্র
> জাগাবে নবীন বাসনা।
> —'সোনার তরী', 'বিশ্বনৃত্য'।
>
> ২। নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
> ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,
> নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
> নূতন রাগিণী ভরে।
> —'চিত্রা', অন্তর্যামী।

কলাবৃত্ত রীতির প্রতি মধুসূদনের ছন্দপ্রতিভার নিঃসন্দিগ্ধ প্রবণতার বিষয়টি এখনও প্রায় উপেক্ষিত রয়ে গেছে বলা চলে। তাই এই বিষয়টি একটু বিশদভাবেই আলোচিত হল।

মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ ছন্দকীর্তি মিশ্রবৃত্ত (পূর্বতন অক্ষরবৃত্ত) রচনার ক্ষেত্রে। বঙ্গসরস্বতীর ছন্দোবীণায় এই রীতির ছন্দ বাজিয়েই তিনি 'যশস্বী' হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর দানের বিষয়টি বহুকাল যাবৎ বহুভাবে আলোচিত হয়েছে। তাই বর্তমান ক্ষেত্রে এ বিষয়ে কয়েকটি মাত্র প্রসঙ্গে কথা বলেই বক্তব্য শেষ করব।

বাংলা ছন্দে মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ দান অমিত্রাক্ষর পয়ারবন্ধের প্রবর্তন। অন্য কথায়, পূর্বাগত পয়ারবন্ধকে অমিল ও প্রবহমাণ রূপদান। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন, মধুসূদন যখন সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন, তখনও পূর্বাগত পয়ারবন্ধটি সুনিশ্চিত ও সুগঠিত রূপ ধারণ করতে পারেনি। পয়ার পঙ্‌ক্তিতে

চোদ্দটি করে অক্ষরমাত্রা থাকা চাই—শুধু এইটুকু ছিল তখনকার দিনের স্বীকৃত নীতি। পয়ার-পঙ্‌ক্তির মধ্যে কোথায় যতি থাকবে, আট মাত্রার পর যতি থাকা আবশ্যক কিনা, বিজোড় সংখ্যক মাত্রার পরে যতি দিলে ছন্দে ত্রুটি ঘটে কিনা, এসব বিষয়ে তখনও কোন নির্দিষ্ট নীতি কবিসমাজে স্বীকৃতি লাভ করেনি। আর, অক্ষরসংখ্যা-নিরপেক্ষ শুধু ধ্বনিমাত্রানির্ভর ছন্দোবন্ধের কথা তখন কারও চিন্তায়ও দেখা দেয়নি। কবিরা চালিত হতেন আপন আপন সহজাত ছন্দোবোধের প্রেরণায়। ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বরগুপ্তের পয়ারবন্ধ বিশ্লেষণ করলেই এ কথার সত্যতা বোঝা যাবে। মধুসূদনকে এই অগঠিত পয়ার নিয়েই কারবার করতে হয়েছিল, রচনা করতে হয়েছিল মহাকাব্য। অর্থাৎ তাঁকে কাঁচা ভিতের উপরেই মহোচ্চ ইমারত গড়তে হয়েছিল। এ কথা মনে রাখা চাই। নতুবা তাঁর কৃতিত্বের যথার্থ মূল্য নিরূপণ সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, মিলটনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের আদর্শেই মধুসূদন বাংলা অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করেছেন, এই বহুপ্রচলিত ধারণার মূল্য কতখানি ? মিলটনের অমিত্রাক্ষর বন্ধের উপাদান প্রস্বরান্ত দ্বিদল পঞ্চপর্বিক পঙ্‌ক্তি (Iambic pentameter verse)। সে উপাদান স্বভাব-বলিষ্ঠ ও তরঙ্গগত। আর মধুসূদনের উপাদান সমতল বাংলা ভাষার এলানো ও সুরেলা পয়ার-পঙ্‌ক্তি। সে পয়ার একে তো অগঠিত, তাতে নিস্তরঙ্গ ও নিস্তেজ। তাতে না আছে সংস্কৃতের মতো হ্রস্বদীর্ঘ ধ্বনির উচ্চাবচতা, না আছে ইংরেজীর মত প্রাস্বরিকতাজনিত ধ্বনির উৎক্ষেপ-অবক্ষেপ। ইংরেজী ছন্দ কঠিন দলময় উপাদানে গঠিত, আর বাংলার প্রচলিত পয়ার গঠিত কোমল কলাময় উপাদানে। মিলটনের অবলম্বন দশটি কঠিন ও ঝোঁকালো দলমাত্রা আর মধুসূদনের অবলম্বন চোদ্দটি কোমল ও এলানো কলামাত্রা। এ সব কথা মনে রাখলেই বোঝা যাবে, মধুসূদন কি মহা দুঃসাধ্যসাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। যে ক্ষেত্রে পদার্পণ করতে ফরাসী কবিরাও সাহসী হন নি, বাঙালী কবি মধুসূদন সেখানে অকুণ্ঠিত ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে সাফল্যের জয়ধ্বজা তুলে দিলেন। কোমল ও দুর্বল উপকরণ নিয়ে কঠিন তৈজস মূর্তি গড়ার, সমতল ভাষাকে তরঙ্গিত করার এবং সুরেলা বাংলা পয়ারে উদাত্ত ভেরীধ্বনি মন্দ্রিত করার দুঃসাধ্য সাধনায় তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। এ সব কথা মনে না রাখলে মধুসূদনের কৃতিত্বের স্বরূপ উপলব্ধি ও যথাযথ পরিমাপ সম্ভব নয়।

প্রথমে দেখা যাক, মধুসূদন অপ্রবহমাণ পয়ারবন্ধকে প্রবহমাণ করলেন কি উপায়ে। কবি হেমচন্দ্র বলেছেন,—"ভেবে দেখলে অমিত্রাক্ষরবন্ধের মধ্যে আসলে খুব বেশি নূতনত্ব নেই ; মধুসূদন পয়ার পঙ্‌ক্তির ছাঁচ রক্ষা করে তার মধ্যেই প্রয়োজন মতো সাধারণ পয়ার, ত্রিপদী ও চৌপদী বন্ধের বিভিন্ন আয়তনের পদ একত্র সমাবিষ্ট করেছেন মাত্র ; ফলে পঙ্‌ক্তির কোনো নির্দিষ্ট স্থানে যতি পড়েনি, পড়েছে কবির ভাব-বিরতির অনুসরণে পঙ্‌ক্তির অন্তে বা মধ্যে যে কোনো স্থানে। হেমচন্দ্রের এই

বিশ্লেষণ (১৮৬৭) আজও সমর্থনযোগ্য বলে মনে করি। অর্থাৎ চোদ্দ মাত্রার সীমার মধ্যে প্রয়োজন মতো চার, ছয়, আট বা দশ মাত্রার পর্ব ও পদ একত্র সমাবিষ্ট করাই অমিত্রাক্ষরবন্ধের প্রধান কৌশল। আর, ভাবগত গুরুত্বের তারতম্য ভেদে এই সব পর্ব ও পদের পরে লঘু, অর্ধ বা পূর্ণ যতি স্থাপিত হয়। ফলে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে এ সব যতি স্থাপনের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না। একটু পূর্বেই বলেছি, সে সময়ে পয়ার-পঙ্‌ক্তির মধ্যে যতি স্থাপন বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট নীতি স্বীকৃত ছিল না, যদিও আট মাত্রার পরে অর্ধযতি স্থাপনের রীতি সুপ্রচলিত ছিল। ভারতচন্দ্রের রচনা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

১. নগর পুড়িলে। দেবালয় কি এড়ায়।

২ সভাসদ্ তোমার। ভারতচন্দ্র রায়।

৩. তুমি তারে। রায় গুণাকর। নাম দিও।

এ-রকম আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত প্রমুখ কবিদের রচনা থেকে। সুতরাং স্বীকার করতে হবে, মধুসূদনের রচনায় পঙ্‌ক্তির মধ্যে যতিস্থাপন বিষয়ে যে স্বচ্ছন্দতা দেখা যায় তাতে তাঁর কোনো বিশেষ কৃতিত্ব নেই। তাঁর আসল কৃতিত্ব পঙ্‌ক্তি-প্রান্তের চিরস্বীকৃত পূর্ণযতির বিধান লঙ্ঘন করে, ধ্বনি ও ভাবের ধারাকে এক পঙ্‌ক্তি থেকে অন্য পঙ্‌ক্তিতে প্রবাহিত করে দেবার মধ্যে। এই স্বচ্ছন্দ প্রবহমাণতাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'পঙ্‌ক্তিলঙ্ঘন'। আসলে মধুসূদন-প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর পয়ারের এই মুখ্য লক্ষণটিকে 'পঙ্‌ক্তিলঙ্ঘন' না বলে 'পঙ্‌ক্তিযতি-লঙ্ঘন' বললেই তার যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয়। আরও একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে—শুধু পঙ্‌ক্তিযতি নয়, লঘু-অর্ধ-পূর্ণ নির্বিশেষে সর্ববিধ যতিবিধানকে লঙ্ঘন করে চলাই এই প্রবহমাণ পয়ারের আসল লক্ষণ বা প্রকৃতি। সুতরাং এক কথায় বলা যায়, যতিলঙ্ঘনই (elision of pause ই) এই ছন্দোবন্ধের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। অন্যত্র[১] এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছি। এখানে অধিকতর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

তবে যতিলঙ্ঘন-প্রসঙ্গে এখানেই একটি ভিন্ন মতের কথা বলা কর্তব্য। তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছিলেন, ('বিবিধার্থ সংগ্রহ' শক ১৭৮২ অগ্রহায়ণ)—"তাঁহারা (পাঠকরা) পয়ারের অষ্টম ও চতুর্দশাক্ষরে যতি রাখিয়া, বাক্যার্থের শেষ হইলে পৃথক যতি রাখিলেই তিলোত্তমা-পাঠে সুখী হইতে পারিবেন।" দেখা যাচ্ছে, রাজেন্দ্রলাল অমিত্রাক্ষর পয়ারে দু-রকম যতির অস্তিত্ব মেনে নিয়েছিলেন—অষ্টম ও চতুর্দশ মাত্রার পরে দুটি ছন্দোযতি, আর বাক্যের শেষে অর্ধযতি বা ভাবযতি। আধুনিক কালে কেউ কেউ এই অভিমতটিকেই নূতনরূপে উপস্থাপিত করেছেন। ছন্দের ধ্বনিগত বিরতি এবং বাক্যের অর্থগত বিরতি, এই উভয়প্রকার বিরতিকেই রাজেন্দ্রলাল 'যতি' নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তাঁর

১. ছন্দ-পরিক্রমা (২য় সংস্করণ) পৃঃ ৭-৮ এবং পৃঃ ১৪।

আধুনিক অনুবর্তীরা উক্ত দু-রকম বিরতিকে 'যতি' ও 'ছেদ,'—এই দুই নাম দিয়ে জটিলতাকে জটিলতর করে তুলেছেন। শুধু তাই নয়, অভিন্নার্থক দুটি শব্দকে দুই ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করার ফলে পাঠকদের মনে অকারণ বিভ্রান্তিও দেখা দিয়েছে। বস্তুত অমিত্রাক্ষর পয়ারে দু-রকম যতির অস্তিত্ব স্বীকার একেবারেই অনাবশ্যক। অষ্টম ও চতুর্দশ মাত্রার পরবর্তী যতি দুটিকে প্রয়োজন মতো উপেক্ষা করে চলাই অমিত্রাক্ষর পয়ারের আসল বিশিষ্টতা, এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। বাক্যের অন্তর্গত যতি অর্থাৎ ভাবযতিই অমিত্রাক্ষর পয়ারের একমাত্র যতি। বাক্পর্বের, মানে বাক্যের অর্থসঙ্গত বিভাগের পরবর্তী বিরতির গুরুত্বভেদে যতিরও তারতম্য ঘটে। অর্থাৎ বিভিন্ন বাক্পর্বের পরে ভাববিরতির গুরুত্ব অনুসারে লঘুযতি, অর্ধযতি বা পূর্ণযতি স্থাপিত হয়। প্রবহমাণ অমিত্রাক্ষর পয়ারে যতি স্থাপনের এটাই একমাত্র বিধান। কবি মধুসূদন স্বয়ং এই এক-রকম যতির কথাই বলেছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের ভূমিকা-লেখক কবি হেমচন্দ্রও দু-রকম যতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। করেন নি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও। শুধু এক-রকম যতি মেনে নিলে এই প্রবহমাণ পয়ারের স্বরূপ উপলব্ধিতে কোনো ত্রুটি ঘটে বলে মনে করি না। পক্ষান্তরে, দু-রকম যতি, ভাবান্তরে ছেদ ও যতি মেনে এই প্রবহমাণ পয়ার-বন্ধের স্বরূপ ব্যাখ্যায় অকারণ জটিলতা ও বিভ্রান্তি ঘটে বলেই আমার বিশ্বাস।

দেখা গেল, যতি-লঙ্ঘনের কৌশলে গতিহীন পয়ারকে স্বচ্ছন্দ গতিদানই মধুসূদনের প্রধান কীর্তি। তাঁর দ্বিতীয় কীর্তি তরল ও কোমল-প্রকৃতি বাংলা পয়ারকে দৃঢ় কাঠিন্য দান এবং সঙ্গে সঙ্গে নিস্তরঙ্গ সমতল ভাষাকে তরঙ্গ ভঙ্গিতে দোলায়িত করা, সোজা কথায় নিঃস্পন্দ ভাষায় ছন্দস্পন্দ (rhythm) সঞ্চার করা। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই এ কথার সার্থকতা বোঝা যাবে।—

১. যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে।
২. লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।
৩ কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে।
৪ রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ বেশে।
৫ অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হুঙ্কারে।
৬ লক্ষ রক্ষঃশিল্পী আশু নির্মিল মিলিয়া।
৭ আনন্দে বান্দলা
বন্দীবৃন্দ রক্ষঃসেনা বিজয়সংগীতে।
৮. তুঙ্গ-শৃঙ্গ ধরাকারে তরঙ্গ-আবলী
কল্লোলিল বায়ুসঙ্গে রণরঙ্গে মাতি।

এ সব পঙ্ক্তিতে রুদ্ধ দলগুলি কিভাবে সংশ্লিষ্ট ও ঘনীভূত হয়ে দানা বেঁধে উঠেছে, আর, এই জমাট-বাঁধা রুদ্ধদলগুলি এক-একটি শব্দকে কিভাবে এক-একটি

কঠিন উপলখণ্ডের মতো দৃঢ়তা দান করেছে, তা সহজেই অনুভব করা যায়। মনে হয় এই শব্দগুলি যেন এক-একটি ঢেউএর মতো আমাদের শ্রুতিতটমূলে আছড়ে পড়ে মন্দ্রিত হয়ে উঠছে—'সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনি সম।'

বস্তুত এই সুদৃঢ় কঠিন শব্দগুলির আঘাতেই বাংলার তরল ধ্বনিপ্রবাহ হয়ে উঠেছে উৎক্ষিপ্ত, আন্দোলিত ও তরঙ্গমুখর। বাংলা ভাষার তরল প্রবাহে এই উৎক্ষেপ, আন্দোলন ও তরঙ্গধ্বনি সঞ্চার মধুসূদনের আর-একটা বড় কীর্তি।

বাংলার সরল পয়ারকে মধুসূদন একদিকে দিয়েছেন গতি, অপর দিকে দিয়েছেন শক্তি। এই দুই মহাকীর্তির জন্য বাঙালী কবিরা চিরকাল তাঁর কাছে ঋণী থাকবেন। মধুসূদনের আবাল্য সমালোচক রবীন্দ্রনাথও এই দুই বিষয়ে বরাবর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে গেছেন। এ বিষয়ে পূর্বসূরীর অনুবর্তনের বহু নিদর্শন পাওয়া যায় রবীন্দ্র রচনায়। যেমন—

১. তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো।

২. মধুমত্ত ভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধচিতে,

উদ্দাম সঙ্গীতে।

এ সব পঙ্‌ক্তি স্বভাবতই মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্র রচিত অন্য একটি পঙ্‌ক্তির কথা—

চম্পক-অঙ্গুলিঘাতে সংগীত ঝংকারে।

এই যে সংগীত-ঝংকার, এ কিন্তু মূলত রবীন্দ্রনাথের অঙ্গুলিঘাতসম্ভূত নয়। এই সংগীতধ্বনি আসলে মধুসূদনের অঙ্গুলিস্পর্শসঞ্জাত। মধুসূদনই সর্বপ্রথমে বাংলা ভাষার মৃদঙ্গে করাঘাত করে এই গুরুগম্ভীর ধ্বনিকে মন্দ্রিত করে তুলেছিলেন।

সবশেষে একটি প্রশ্ন—মধুসূদনের ছন্দ-রচনা কি একেবারেই তিলোত্তমা, নিখুঁত ত্রুটিহীন? মোহিতলাল প্রমুখ কারো কারো ধারণা প্রায় সে-রকমই। আমি কিন্তু তা মনে করি না। স্বয়ং মধুসূদনও তাঁর কাব্যের metrical blemishes সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তা ছাড়া, তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে তিনি সাধারণভাবে বলেছেন—"I am sure the poem has many faults, what human production has not?" তাঁর প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর পয়ার সম্পর্কেও অনুরূপ মন্তব্য করা যায়। কিন্তু এ স্থলে তাঁর রচনার খুঁত নির্দেশ করে তাঁর অসামান্য ছন্দ-প্রতিভার প্রতি অবিচার করতে চাই না। দেবতাত্মা হিমালয়ের সৌন্দর্য মহিমাও নিখুঁত নয়। কিন্তু সে সব খুঁতের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করার প্রবৃত্তি হবে কোন্ সৌন্দর্য-পূজারীর।*

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, গবেষণা পরিষদের উদ্যোগে 'জিজ্ঞাসা' কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৭৭) 'বাংলা ছন্দ-জিজ্ঞাসা' নামক সংকলন গ্রন্থ থেকে লেখকের অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।—সম্পাদক।

মধুসূদন–প্রতিভার স্বরূপ সন্ধানে

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মধুসূদন আধুনিক সাহিত্যের ক্রান্তিলগ্নের প্রতীকী-কবি। তাঁর কাব্যমূল্য মোটামুটি চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হলেও তাঁর ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল এখনও অতৃপ্তই আছে। তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার উৎস নিঃশেষিত না হয়ে চির-প্রবহমাণ। তাঁর এই ঐতিহাসিক ভূমিকাই তাঁর সম্বন্ধে বিচিত্র ও বহুমুখী ধারাকে উন্মুক্ত রেখেছে। বিদেশীয় সাহিত্য ও দেশী সংস্কৃতির অপূর্ব সমন্বয় রহস্যের সূত্রটি তাঁর হাতেই বিধৃত। প্রায় দেড়শত-বৎসরের আধুনিক বাংলা সাহিত্যধারা যে পথে প্রবাহিত হয়েছে তাঁর রচনাই তার গতিপথ নির্ণায়ক। মধুসূদনকে সম্যক্ না বুঝলে যে মানসচেতনা ও কল্পনাসমৃদ্ধির মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রাণরস ভারতীয় কবি-চিত্তের অন্তঃপ্রকৃতির অঙ্গীভূত হয়েছে তার রহস্য অবিদিতই থাকবে। নূতন ও পুরাতনের এই অন্তরঙ্গ মিলন মধুসূদনের কবিপ্রতিভারই স্বীকরণশক্তির পরিচয় ও তাঁর পরবর্তীদের সাহিত্যকীর্তির আদিম প্রেরণা।

মধুসূদন সম্বন্ধে আলোচনা প্রচুর হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিস্বভাবের ও কবিস্বভাবের মৌল প্রাণকেন্দ্রটি এখনও অনাবিষ্কৃতই আছে। তাঁর প্রথম যৌবনের আগ্নেয় উচ্ছ্বাস, ভাঙনের নেশা যে কোন্ মন্ত্রে বাইরের সমস্ত বিক্ষোভ সংবরণ করে সৃষ্টিসুষমার রূপচ্ছন্দে শান্ত কল্যাণশ্রী ধারণ করল তা তাঁর জীবনীকারদের চোখে ধরা পড়েনি। ইয়ং বেঙ্গলের উগ্র মদিরা কোন্ নিগূঢ় প্রভাবের ফলে নব্যসাহিত্য সৃষ্টির অমৃতরসে উদ্বর্তিত হয়েছে, খেয়ালী অস্থির-মতিত্ব কেমন করে নূতন নূতন রূপকলা-উদ্ভাবনের নিয়মিত কক্ষে ছন্দ পরিক্রমায় স্থির হয়েছে তা জীবন-বিধাতার দুর্লক্ষ্য অভিপ্রায়ের মধ্যেই চিরবন্দী হয়ে থাকল। তাঁর কাব্যপ্রতিভা প্রস্তুতির প্রক্রিয়াও একইরূপ দুর্ভেদ্য অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আছে। তাঁর জীবনে ভারসাম্যের পুনরুদ্ধার ও কাব্যে সৃষ্টিপ্রতিভার দীপ্ত উন্মীলনের ইতিহাস তাঁর মাদ্রাজ প্রবাসের কয়েক বৎসরের অখ্যাত ও আপাত-ব্যর্থ জীবনকাহিনীর মধ্যে গুহায়িত। এই কয়েক বৎসরের জীবনায়নের ও প্রবৃত্তিচালিত হৃদয়োচ্ছ্বাসের, প্রেমের বিভ্রান্তি, মোহভঙ্গ ও নূতন পরীক্ষার যে বহির্ঘটনামূলক বিবরণ আমরা পাই, তা প্রতিভার উৎস-উন্মোচনের উপর কোন আলোকপাত করে না। তরুণ মনের প্রেমচর্চা ও জ্ঞানচর্চা কোনটাই প্রতিভাস্ফুরণের ভূমিকা-রচনায় সহায়তা করে বলে মনে হয় না। শিক্ষকতা ও সম্পাদকতাবৃত্তি, নীলনয়না ইংরেজ তরুণীর চটুল কটাক্ষে বিহ্বল

আত্মসমর্পণ তার বেদনাময় উপসংহার ও দগ্ধ হৃদয়ের প্রলেপ রূপে নূতন প্রণয়িণীর স্পর্শাতুরতা—এই তুচ্ছ অভিজ্ঞতার আবরণে কোন দিব্য সম্পদের অস্তিত্ব-কল্পনা দুরূহ। যে কবি অষ্টাদশ শতকের অন্তর্দৃষ্টিহীন ইংরাজ কবিগোষ্ঠীর অনুসরণে বিদেশী ভাষায় মামুলি প্রেমকবিতা ও আলংকারিক গাথাকাব্য রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁর প্রেরণা যে পরাণুকারীর সুলভ অভিমান তৃপ্তির ঊর্ধ্বে কোন সূক্ষ্মতর কবিচেতনার অনুশীলন নয়, তা বুঝতে বিশেষ কষ্ট হয় না। এ যেন বিলাতী সুরারই একটা সারস্বত অনুকল্প। আর তিনি যে নিয়মিত ভাবে নানা প্রাচীন ও আধুনিক ভাষার চর্চায় নিবিষ্ট ছিলেন, তা তাঁর জ্ঞানসাধনার নিদর্শন হতে পারে, কিন্তু এই বিপুল সমিধ-সংগ্রহ যে কবিপ্রতিভার হোমাগ্নি প্রজ্বলনের প্রস্তুতি তা সহজে প্রতীয়মান হয় না। অবশ্য এই বিচিত্র পাঠক্রমের মধ্যে সংস্কৃতের অন্তর্ভুক্তি ও বিশেষ ফরমাইস দিয়ে বাংলা রামায়ণ-মহাভারতের সংগ্রহ পরবর্তী কালের আলোকে এক নূতন তাৎপর্যে প্রতিভাত হয়। হয়ত এই দুইটি ক্ষুদ্র খবর সমসাময়িক কালে কারুর দৃষ্টিই আকর্ষণ করে নি। আজ ভবিষ্যৎ পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা উপলব্ধি করছি যে, এগুলি ধূমায়মান যজ্ঞকাষ্ঠ সঞ্চয়ে শিখাবর্ধক, প্রাণরসসিক্ত ঘৃতের অঞ্জলি-নিষেক।

এই স্থূল মৃত্তিকা আধার থেকেই রত্নসম্ভবা বিভা হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে আমাদের চোখকে ধাঁধিয়ে দিয়েছে। মধুসূদনের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর কৃতিত্ব হল প্রতীচ্য ও প্রাচ্য ভাবাদর্শের আশ্চর্য সমীকরণ। মধুসূদনের কৈশোর ও যৌবনের জীবন-অভিজ্ঞতা ও সাহিত্যচর্চাপ্রসূত রুচি-প্রকর্ষের কথা বিবেচনা করলে এই সমন্বয়-প্রতিভা অসাধ্য সাধনের অলৌকিক নিদর্শন বলে মনে হবে। তাঁর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনচর্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই মিশ্র আবহ সৃষ্টিকে প্রতিভার জ্ঞানাতীত, বোধাতীত, দুর্লভতম দিব্যদৃষ্টির অগম্যসিন্ধ লীলাবিস্তারের পর্যায়ভুক্ত করা অনিবার্য হয়ে উঠে। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর প্রথম আবির্ভাবকালে ভারতীয় সংস্কৃতি উপেক্ষা ও অবজ্ঞার নিম্নতম বিন্দুতে অবনমিত হয়েছিল। এক ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছাড়া ঐ গোষ্ঠীর মধ্যে আর কেউই হিন্দুধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের যথার্থ অনুরাগী ও নিষ্ঠাবান সমর্থক ছিল না। ভূদেবের অবিচল প্রত্যয়ের উৎস ছিল তাঁর পারিবারিক ধর্মনিষ্ঠা। মধুসূদন ঘরে-বাইরে কোথাও হিন্দু আদর্শের শ্রেষ্ঠতম বিকাশের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাননি। তাঁর পরিবার ভোগবিলাস-নিমজ্জিত ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার অনুসারী ছিল। তাঁর পিতা বিলাসী ও ঐশ্বর্যমত্ত ছিলেন এবং মধুসূদন তার উত্তরাধিকাররূপে তাঁর রক্তধারার মধ্যে এই বিকারের বীজ বহন করেছিলেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষা তাঁর এই ভোগশক্তি ও স্বৈরাচারের শিক্ষাকে অনুকূল বায়ুসঞ্চারে সর্বধ্বংসী উগ্রতায় উদ্দীপ্ত করেছিল। তিনি ধর্মত্যাগী, সমাজদ্রোহী, ও পাশ্চাত্ত্য জীবনমদিরামত্ত হয়ে তাঁর ব্যক্তিসত্তা ও ভাবসত্তার প্রাচীন

উপাদানকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে প্রত্যাখ্যান করে পরকীয় সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীন স্বী-করণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি নিজের বাঙালী পরিচয় মুছে ফেলে শুধু আহার বিহারে নয়, বহিরঙ্গ জীবন ব্যবস্থায় নয়, যে অন্তরতম সত্তা প্রাণকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত থেকে সমস্ত অন্তর্জীবনের সৌরভ বিকশিত করে তোলে, সেই সৃষ্টিধর্মী চেতনার মূলে সাহেব হতে চেয়েছিলেন। পরাধীন জাতির মধ্যে টম-ডিক-হ্যারির মত ঘৃণ্য জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। প্রতীচ্য মনীষী ও মহাকবিদের সূক্ষ্মতর আত্মিক প্রভাব আত্মসাৎ করে তিনি তাঁদের সমকক্ষতার স্বপ্নে মশগুল ছিলেন। তিনি বিশ্বকর্মার মত উৎকট তপস্যার দ্বারা কাব্যজগতে দ্বিজত্বলাভের অভিলাষী ছিলেন, এবং জীবনচর্যার যে ভূমিতে এই কাব্য পারিজাত ফুটে উঠে, সেই পারিজাতগন্ধে বিভোর হয়ে তিনি তাঁর মানসক্ষেত্রটিকেই রূপান্তরিত করার দুরাশা পোষণ করতেন। এই জটিল-প্রক্রিয়ার কার্যকারণশৃঙ্খলা, এই সংস্কৃতির সমাহার-কৌশল আমাদের কাছে অবিদিত রয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর অভুতপূর্ব সিদ্ধিকে আমরা ফল-পরিণতির মানদণ্ডে বিচার করে তাঁর দুরূহ সাধনার সাফল্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় হই।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে এই গ্লানিকর, দ্বিধা-দ্বন্দ্বদীর্ণ, ভোগলোলুপ ও প্রবৃত্তি-তাড়িত জীবন পরিবেশে তিনি তিলোত্তমাসম্ভব ও মেঘনাদবধের মহাকাব্যিক ভাবকেন্দ্রনিষ্ঠ নিটোল একটি ঘটনাবৃত্ত ও রসসংহতির উপাদান কেমন করে সন্ধান করলেন? রাবণ ও ইন্দ্রজিতের স্বাজাত্যাভিমান ও দৃঢ়মূল ব্যক্তিসত্তা হয়ত তাঁর নিজ ব্যক্তিত্ব ও যুগমানসের প্রতিভাসরূপে মহাকাব্যের অন্তর্লোকে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল, কিন্তু সেই বিক্ষিপ্ত, চঞ্চল, নানা দ্বন্দ্বমথিত যুগে মহাকাব্যের কায়াব্যূহনির্মিতি, তার বিরাট, কেন্দ্রানুগ অবয়বসংস্থানের সংকেত আসে কোন অদৃশ্য উৎস হতে? এ যুগের দান নয়, মধুসূদনের প্রতিভা ও মানস অনুশীলনের বিরল, ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টিসুষমার উদ্ভাসন। হোমার, ভার্জিল, দান্তে, মিলটন, ট্যাসো, এরিয়েস্টো প্রভৃতি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় মহাকাব্য রচয়িতাবৃন্দের আত্মার নির্যাস তিনি আকণ্ঠ পান করেছিলেন ও তাঁর কল্পনার মধুচক্র নানা দেশ-কালের বিচিত্র মধুসঞ্চয়ে পূর্ণ ছিল। তাঁর পাঠ-আহরণ তাঁর কবি-স্বভাবের সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গভাবে মিশে গিয়েছিল যে, যখনই তাঁর পূর্বগামী কবিদের অনুরূপ পরিস্থিতি তাঁর কবিকল্পনাকে উত্তেজিত করেছে, তখনই স্মৃতিসঞ্চয় তাঁর স্বাধীন প্রেরণার সঙ্গে সহযোগিতা করে তার মধ্যে প্রাণশক্তি ও অনুরণননির্ঘোষ সঞ্চার করেছে। মধুসূদনের মহাকাব্যগঠন-শিল্প এক কষ্টার্জিত ভারসাম্যের উপর নির্ভরশীল ছিল,—দশ বৎসরের মধ্যেই সেই ভারসাম্য তাঁর অনুগামীদের হাতে বিচলিত হয়ে উপাদান-বিভিন্নতায় বিশ্লিষ্ট হয়েছে।

এ ছাড়া মধুসূদনের কাব্যজীবনে আরও অনেক জটিল প্রশ্ন উত্তরের প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হয়ে আছে। তিনি যেমন তাঁর নায়ক রাবণ ইন্দ্রজিতকে এক গূঢ় নিয়তির

ক্রীড়নকরূপে দেখিয়েছেন, তাঁর নিজের সৃষ্টিকার্যেও তেমনি অনিবার্য নিয়তির অলক্ষ্য প্রভাব ক্রিয়াশীল। তিনি সচেতনভাবে যা করতে চেয়েছিলেন, তাঁর অবচেতন মনে সুপ্ত এক অদৃশ্য শক্তি তাঁর সৃষ্টিকে এক অনভিপ্রেত পথে চালনা করেছে। তাঁর অন্তরের গোপন উৎস থেকে করুণারসের উচ্ছ্বাস উৎসারিত হয়ে তাঁর বহুঘোষিত শৌর্য সাধনাকে অশ্রু নিষেকে কোমল করে তাঁর কাব্যের সিগ্ধরসকে ভারতীয় ঐতিহ্যানুগ করেছে। প্রমীলার বীর্যসারগঠিত প্রণয়লাবণ্য তাঁর কবিচিত্তকে এক দুর্বোধ্য ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার প্রেরণায় সীতাচরিত্রের শাশ্বত আদর্শানুগামী ম্লান মাধুর্য কল্পনার পরিপূরক চিত্র সংযোজনায় অনুপ্রেরিত করেছে। প্রমীলা তাঁর পাশ্চাত্ত্য জীবনবোধের সদ্যোজাত অনুরাগের প্রখর প্রকাশ। সীতা তাঁর অন্তরশায়ী রক্তধারা প্রবাহিত প্রাচীন সংস্কারের স্নিগ্ধ উদ্ভাসন। সীতা ও প্রমীলার চিত্র পাশাপাশি রেখে তিনি তাঁর সমন্বয় প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় দিয়েছেন। রাম-লক্ষ্মণ তাঁর নব-আদর্শ সন্ধানী সমাজ চেতনার দ্বারা নিন্দিত হয়ে তাঁর দাক্ষিণ্যবঞ্চিত। কিন্তু সীতারূপিনী ম্লান লতিকা তাঁর সক্রিয় মনের সমর্থন রহিত হয়েও কবির বোধাতীত এক নিগূঢ় সমবেদনার ধারায় অভিস্নাত ও স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার করুণ লাবণ্যে বিকশিত। প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শের মোহাকর্ষণ এক অদৃশ্য জীবন দেবতার অমোঘ ইঙ্গিত কবির সচেতন মনের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে, তাঁর যুক্তিবাদের সমস্ত ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে তাঁর মনোলোকের কোন এক অজ্ঞাত স্মৃতিসমাধির বিচরণ পথে অকস্মাৎ উদ্বুদ্ধ ও স্বতঃ উৎসারিত হয়েছে। মহাকবির এই উভচরত্বের লীলা-সংক্রমণ, এই আধুনিক ও প্রাচীনের মধ্যে সহজ যাতায়াতের পথটি কোন সমালোচনার মানচিত্রে এখনও সংকেত হয়নি।

তাঁর সংকল্প ঘোষণা ও কাব্যরচনায় পূর্বনির্ধারিত পথ থেকে মুহুর্মুহু বিচ্যুতি—এই দুইয়ের মধ্যে বৈপরীত্য কবিমানসে এক দ্বৈতশক্তির নিগূঢ় ক্রিয়ার ইঙ্গিতবাহী। তিনি বারে বারে বলেছেন যে, তিনি একজন গ্রীকের মত লিখবেন; তিনি আলংকারিক বিশ্বনাথের নির্দেশ মানবেন না, ও প্রথাসিদ্ধ অলংকার বিন্যাস পদ্ধতি অনুসরণ করবেন না—তা' স্পর্ধার সঙ্গে জানিয়েছেন। এবং নিষ্ঠাবান, বিবেকবান সাহিত্যস্রষ্টার ন্যায় তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁর ঘোষিত আদর্শের অনুবর্তন করেছেন। সচেতন শিল্পী হিসেবে তিনি কখনও আদর্শভ্রষ্ট হন নি। কিন্তু তাঁর যুগযুগান্তরের সাধনা সংস্কার লালিত অন্তর্যামী পুরুষ তাঁকে বঞ্চনা করেছেন। তিনি গ্রীকের মত লিখেছেন এ-কথা অবিসংবাদিত সত্য। তাঁর মহাকাব্য কায়া নির্মাণের প্রতিটি রেখা ও রং, প্রতিমার সূক্ষ্মতম অঙ্গবিন্যাস, তার আখ্যান বস্তুবৈচিত্র্যের অভ্রান্ত কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন সুর ও রসের অপূর্ব সমাহার —সবই গ্রীক ভাস্কর্য-শিল্পের নিখুঁত রূপাদর্শের সার্থকতম প্রতিষ্ঠা। তবু তাঁর অজ্ঞাতসারে এর মধ্যে ভারতীয় জীবন-চেতনার কিছু কি প্রতিফলন ঘটেনি?

যুদ্ধক্ষেত্রের বিভীষিকার মধ্যে, লংকার ঐশ্বর্যাড়ম্বরের মধ্যে, বীরের স্পর্ধা-বিনিময়ের মধ্যে, কিছু কি জীবনের নশ্বরতাবোধ, কিছু কি মাতার শোকদীর্ণ হৃদয়ের করুণ হাহাকার, কিছু কি সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম প্রত্যয়ের আভাস, বাঙলার বিগত জীবনেতিহাসের মর্ম-উৎসারিত কিছু কি ক্ষীণ স্মৃতির কলধ্বনি ভেসে এসে পাঠককে উন্মনা ও অতীত চিন্তা-বিভোর করে না? প্রধান সুরটি পাশ্চাত্য অর্গানেয় গুরুগম্ভীর ধ্বনির মাধ্যমে অভিব্যক্ত। কিন্তু গৌণ সুরগুলি সবই ভারতীয় বীণাযন্ত্রের সূক্ষ্ম তার হতে অনুরণিত। এবং এই উভয়বিধ ধ্বনিসংমিশ্রণ থেকে এক অভিনব সুরসঙ্গীতি জন্ম নিয়েছে। অবশ্য হোমারেও মানবিক রসের যথেষ্ট স্ফুরণ হয়েছে। তবে সেই বর্বর যুগে মানবমনের কোমল বৃত্তিসমূহ শৌর্যপ্রধান, নৃশংস জীবনাদর্শের অবদমন প্রক্রিয়ায় অনেকটা সংকুচিতই ছিল। প্রায়াম, হেকুবা ও আনড্রোমেকীর চক্ষুতে শোকাশ্রু টলটল করে উঠে, কিন্তু এ অশ্রুধারা লৌহযুগের বিরল রন্ধ্রে ক্ষরিত ও একিলিস-আগামেমননের রুদ্র রোষে শীর্ণ ও ক্ষীণপ্রবাহ। করুণ রস সে যুগের জীবনযাত্রার উপজাত রস (bye-product); ওর স্নিগ্ধতা জীবনের প্রান্ত-সংলগ্ন, কেন্দ্র-উৎসারিত নয়। রুক্ষ, প্রস্তরময় পর্বতগাত্রে ক্বচিৎ-দৃষ্ট ও বিরল-প্রক্ষিপ্ত সবুজ-শ্যামলিমার ন্যায়। মধুসূদন হোমারের অনুসরণ করলেও তাঁর শোকোচ্ছ্বাস জাতীয়-জীবনের উৎস-লালিত, ভারতীয় সাধনা সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় রসধারাপুষ্ট ও তার উপর নদীমাতৃক বাংলা দেশের হৃদয় যমুনার প্লাবনে উচ্ছল। তাঁর করুণ-রস বীর্যকে দ্রবীভূত করে স্বাধীন মহিমায় স্ব-প্রতিষ্ঠ – বীররসের প্রসাদ ভোগী নয়। তাঁর মহাকাব্যের সংযত ও সাধারণীকৃত বিলাপ যেমন একদিকে অতিরেকমুক্ত, তেমনি অন্যদিকে অন্তরের গভীরতম স্তর হতে অনুরণিত ও মর্মভেদী। তিনি পাশ্চাত্য মহাকাব্যের ইস্পাত-দৃঢ় মৃত্তিকা খনন করতে গিয়ে অকস্মাৎ যুগ যুগান্তরসঞ্চিত করুণরসের অন্তঃসলিলপ্রবাহ আবিষ্কার করলেন, এবং এই অপ্রত্যাশিত ভাবতরঙ্গ তাঁকে এক নূতন রসতীর্থে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। অতীত সংস্কার যে তাঁর মধ্যে কত দুর্নিবার তা তিনি অতীতদ্রোহের প্রয়াসের মধ্য দিয়েই অনুভব করলেন। তাঁর কাব্যতরণী তাঁকে পশ্চিমের উপকূলে না পৌঁছে দিয়ে শাশ্বত আদর্শের ভাগীরথী তীরেই ফিরিয়ে নিয়ে এল। তাঁর সমুদ্রযাত্রা সৈকততীরে ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলার প্রাচ্যভাবাপ্লুত সৎকার-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ভূমিতে, পিতৃ পিতামহের স্মৃতিপূত শ্মশান-প্রাঙ্গনেই তার গতিবেগকে সংহরণ করে দিল। তাঁর লংকা-ঐশ্বর্যের সমস্ত অস্তমিত মহিমার উপর অশোকবনের করুণ স্মৃতি সন্ধ্যাতারার ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে রইল।

অলংকার ও উপমা প্রয়োগেও তিনি প্রথাজীর্ণ ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারেন নি। তাঁর বহু অলংকার ভারতকাব্যের চিরন্তন সঞ্চয় থেকে গৃহীত, পুরাণ-চেতনার দ্বারা অনুবিদ্ধ। কোথাও কোথাও তাঁর মৌলিকতা আশ্চর্যভাবে প্রকাশ পেলেও মোটের উপর তিনি পাঠকের চিরাভ্যস্ত প্রত্যাশাকে নিদারুণভাবে ক্ষুণ্ণ করেন

নি। দেবলোক ও স্বর্গ-নরকের পরিকল্পনাতে তিনি পাশ্চাত্ত্য চিন্তা প্রভাবিত হলেও, যথাসম্ভব পৌরাণিক আদর্শের প্রতি বিশ্বস্তই থেকেছেন, উৎকটভাবে প্রচলিত সংস্কারের উল্লঙ্ঘন করেন নি। সচেতন সৃষ্টি প্রয়াসে তিনি বিদেশের মুখাপেক্ষী হলেও অবচেতনের গভীরে তিনি জাতীয় সংস্কৃতির টানে সাড়া দিয়েছেন। তাঁর সরস্বতীর স্তব, বাল্মীকি বন্দনা ও এই ভক্তিবিহ্বলতা প্রকাশের ভাষা ও ভঙ্গী সবই সুপ্রাচীন ভারতীয় কাব্যসাধনার শিষ্টরীতির অনুগামী। এই অস্থিমজ্জাগত ভাবচেতনার মূল তাঁর মনোভূমিতে কোথায় প্রচ্ছন্ন ছিল, তাঁর জীবন কাহিনী সে সম্বন্ধে নীরব। এর হেতু খুঁজতে গিয়ে অন্য পর্যাপ্ত কারণের অভাবে একে মধুসূদনের জাতিস্মরতার অলৌকিক নিদর্শন রূপে নিতে আমরা বাধ্য হই। যিনি সমস্ত জীবন দিয়ে পাশ্চাত্ত্য আদর্শের সাধনা করেছেন, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে দেশের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক চেতনার মূল পর্যন্ত প্রসারিত ও অবিস্মরণীয়।

মধুসূদনের জীবন ও কাব্যের অসমাহিত সমস্যা দুটির কথা উল্লেখ করলাম। প্রথম হল তাঁর কবি-জীবনের ভূমিকা সম্বন্ধীয় ও দ্বিতীয় হল তাঁর মনে প্রাচ্য ভাবের বদ্ধমূলতা বিষয়ক। কেমন করে তিনি মহাকবি হলেন ও কেমন করে পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য সংস্কৃতির অপূর্ব সমন্বয়কারী জীবনচেতনার প্রতীক রূপে তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন—এই দুই প্রশ্নের সমাধান শেষ পর্যন্ত প্রতিভারহস্যের স্বরূপ-উপলব্ধির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। আধুনিক যুগের আর দুই প্রতিভাধর প্রবর্তক—বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাদের এই সংশয়িত মনোভাব নাই। কেবল এই ভাবগঙ্গার আদি ভগীরথ এককালে মাইকেল, এখন শ্রীমধুসূদন সম্বন্ধে আমরা যত জানি, তার চেয়ে অনেক বেশী জানি না—এই ধারণাই অখণ্ডিত রয়ে গেল।*

* উক্ত নিবন্ধটি ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে ডক্টর অরুণকুমার বসু সম্পাদিত এবং ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি প্রকাশিত মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের ভূমিকা হিসেবে লিখিত হয়। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক এবং অধ্যাপক অরুণকুমার বসুর সহৃদয় অনুমতিক্রমে এই ভূমিকাটি পুনর্মুদ্রণ করা সম্ভব হলো। রচনাটির শিরোনাম সম্পাদকের দেওয়া।
—সম্পাদক।

মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভা ঃ প্রহসন সৃষ্টিতে

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

মধুসূদনের প্রতিভা বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে এপিক বা মহাকাব্য রচনায় নাট্য সাহিত্যেও তাঁহার দান উপেক্ষণীয় নয়। ইহা সত্য যে, তাঁহার কোন নাটকই মেঘনাদবধ বা বীরাঙ্গনা কাব্যের সঙ্গে তুলনীয় নয়। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি আধুনিক বাংলা নাটকের জনক এবং তাঁহার পরে নাট্যসাহিত্য খুব বেশী অগ্রসর হয় নাই। মধুসূদনের পরে দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি কয়েকজন নামজাদা নাট্যকার আবির্ভূত হইয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও একাধিক নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে খুব উচ্চ শ্রেণীর নাটক—যাহা কালিদাস, শেক্সপীয়র, মলিয়ের, ইবসেন, বা বার্ণাড শ'য়ের নাটকের সঙ্গে তুলিত হইতে পারে—লিখিত হয় নাই। শুধু সাহিত্যিক মানদণ্ড দিয়া বিচার করিলে বলা যাইতে পারে যে, 'কৃষ্ণকুমারী' বা 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ'—এখনও বাংলা নাটকের ইতিহাসে উচ্চ স্থান পাইবে। মধুসূদনের নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে আরও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। শর্মিষ্ঠা নাটক লিখিয়াই মধুসূদন বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন, আর পদ্মাবতী নাটকেই তিনি সর্বপ্রথমে—নিতান্ত পরীক্ষামূলক ভাবে—অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন।*

মধুসূদনের পূর্বে বাংলা রঙ্গমঞ্চের যে ইতিহাস পাই তাহা খুব দীর্ঘ বা জমকালো নয়। শর্মিষ্ঠা নাটক রচিত হইয়াছিল ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে। গবেষকেরা বলেন যে, ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রথম আধুনিক রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়। ইহার পর নানা জায়গায় নানা রঙ্গমঞ্চের উল্লেখ দেখা গেলেও মধুসূদনের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা নাটক গড়িয়া উঠে নাই। যে সব নাটক অভিনীত হইত তাহা পৌরাণিক কাহিনীর অভিনেয় রূপান্তরণ অথবা সংস্কৃত বা কখনও কখনও ইংরেজী নাটকের অনুবাদ. বাংলার প্রথম মৌলিক নাটক 'কুলীন কুল সর্বস্ব,' রচিত হয় ১৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার এক বৎসর পরে। রামনারায়ণ সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তখনকার পণ্ডিত সমাজ সাহিত্য রচনায় সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রত্যাশা করিতেন। সুতরাং রামনারায়ণও সংস্কৃত ঢংয়েই বাংলা

* অবশ্য তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য এবং পদ্মাবতী নাটক একই সময়ে (১৮৫৯) খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল এবং উভয়ই সম্পূর্ণ গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে।

নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তখন ইংরেজি ভাবধারার সঙ্গে অপরিচিত, কিন্তু প্রতিভাবান কোন নাট্যকারের আবির্ভাব হইলে বাংলা নাটক হয়ত সংস্কৃত নাটকের অনুগামী হইত এবং বাংলা নাটকের এখন যে মূর্তি আমরা পাই তাহা দেখা যাইত না; কিন্তু সত্যই যে প্রতিভাবান নাট্যকারের আবির্ভাব হইল তিনি বিশ্বনাথের নির্দেশ মানিতে রাজী হইলেন না, তাই আধুনিক বাংলা নাটক অনেকাংশে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব হইতে দূরে সরিয়া গেল। মধুসূদন যে রচনাভঙ্গীর প্রবর্তন করিলেন তাহা কালধর্মের অনুযায়ী। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা পশ্চিমের মুখাপেক্ষী ছিল এবং য়ুরোপীয় সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান এই দেশে নূতন ভাবোন্মাদনা আনিয়া দিয়াছিল। মধুসূদন যে পাশ্চাত্ত্য আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন তাহা শুধু ব্যক্তিগত রুচির প্রকাশ নয়, ইহার মধ্যে প্রতিভাবান কবির ভবিষ্যদ্দৃষ্টির পরিচয়ও পাওয়া যায়। শর্মিষ্ঠা নাটকের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ব্যঙ্গচ্ছলে বলিয়াছিলেন, 'দাগ দিতে গেলে কিছু থাকবে না। তবে কিনা আমি যে চোখে দেখছি, সে রকম চোখ আর গোটা দুই লোকের আছে; আমরা ফতে হয়ে গেলে তোমার বই খুব ভাল চলে যাবে, বাহাবা বাহাবা পড়বে।' বাস্তবিকপক্ষে তখন তর্কবাগীশদের যুগ বিলীয়মান এবং মধুসূদনের যুগের অভ্যুদয় আসন্ন। মধুসূদনের রচনার মধ্য দিয়াই নূতন যুগ তাহার অভ্যাগম বিঘোষিত করিল।

... ...

মধুসূদন শুধু যে পৌরাণিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক ও ট্রাজেডিই রচনা করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি দুইখানি প্রহসনও লিখিয়াছিলেন। নানা প্রকরণের সাহিত্যসৃষ্টিনৈপুণ্য তাঁহার প্রতিভার বহুমুখীনতার পরিচয় দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে বঙ্গদেশের পুরাতন সমাজ ভাঙিয়া পড়িতেছিল ও এক নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল; তখনকার সমাজের দুইটি কলঙ্কময় অংশের প্রতি সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। যে জাতি বা সমাজের প্রাণশক্তি ক্ষয়িষ্ণু সে সাধারণত অতীতের দিকে তাকাইয়া থাকে এবং তাহার বিচারবুদ্ধি আচারের মরুবালুরাশিতে লুপ্ত হইয়া যায়। তাই সেইখানে একশ্রেণীর ধর্ম্মধ্বজী সমাজপতির আবির্ভাব হয় যাহারা আচারনিষ্ঠ, কিন্তু নীতিবোধ বিবর্জ্জিত। ইঁহাদের প্রতিনিধিস্থানীয় একজন সমাজপতিকে লইয়াই মধুসূদন 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' লিখিয়াছেন। এই জাতীয় লোক সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে পাওয়া যায়, কিন্তু অধঃপতনোন্মুখ সমাজে ইঁহাদের উৎকট আধিপত্য বিশেষ করিয়া লক্ষ্যগোচর হয়। যখন নবজাগ্রত বঙ্গদেশ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মাধ্যমে বুদ্ধির মুক্তির আস্বাদ পাইল তখন সেই নূতন সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকে এই পাপিষ্ঠ ধর্ম্মধ্বজীদের জীবনের বীভৎসতা সমধিক স্পষ্ট হইল। কিন্তু যাহারা এই নবজাগরণের অগ্রদূত তাহাদের মধ্যে অনেকেই নূতন জ্ঞানের মত্ততায় আত্মহারা হইয়া গেল। য়ুরোপীয় সভ্যতার অভ্যন্তরে

অনেকেই প্রবেশ করিতে পারে নাই ; তাই স্বেচ্ছাচারকেই বুদ্ধির মুক্তি ভুল করিয়া তাহারা উচ্ছৃঙ্খলতার পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইল। তাহারা বেকনের সতর্কবাণী ভুলিয়া গেল যে, কুসংস্কারের অভাবই একটা কুসংস্কার। উনবিংশ শতাব্দীর নব্য বঙ্গের এই অসংযম ও অনাচার হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্রদের মধ্যেই দেখা গিয়াছে এবং মধুসূদনের বিরুদ্ধেও এই জাতীয় অনাচারের অপবাদ প্রচলিত ছিল। তিনি তাঁহার নিজের সমাজকেই ব্যঙ্গ করিয়াছেন 'একেই কি বলে সভ্যতা?'—নামক প্রহসনে।

প্রহসনে সাধারণত সমাজের দোষ-ত্রুটি ও পাপাচারের ব্যঙ্গ করা হয়। এইখানে ব্যঙ্গ যত তীব্রই হউক একটা লঘু, কৌতুকময় আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হইয়া থাকে। সাধারণত প্রহসনের পরিসর হয় খুব ছোট। এই সংক্ষিপ্ততাই কমেডি ও প্রহসনের মধ্যে অন্যতম পার্থক্য। মধুসূদন যে সম্পূর্ণাঙ্গ কমেডি না লিখিয়া ছোট প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন তাহার অন্য কারণও ছিল। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মধুসূদনকে লিখিয়াছিলেন যে, শর্মিষ্ঠা-নাটকের সঙ্গে একটি ছোট প্রহসন যোগ করিয়া দিলে অভিনয় সমধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করিবে। তাঁহারা দেখাইতে পারিবেন যে, তাঁহারা উচ্চাঙ্গের পৌরাণিক নাটক ও লঘুহাস্য চপল প্রহসন উভয়ই পরিবেশন করিতে পারেন। প্রহসন আয়তনে সংক্ষিপ্ত ; তাহার উদ্দেশ্য হইল সমাজের অন্যায় ও অসঙ্গতির উপরে লঘু বিদ্রূপ বর্ষণ। বলা বাহুল্য, এই কারণেই প্রহসনের মধ্যে সূক্ষ্ম চরিত্র বিশ্লেষণের অবতারণা করা যায় না এবং ইহার প্লটের মধ্যেও জটিলতা বা বিস্তৃতি থাকে না। অথচ নাটক বা অন্য যে কোন প্রকারের কাহিনী-প্রধান সাহিত্যেই আমরা চাই—চরিত্রের বৈচিত্র্য এবং প্লটের গতিশীলতা ও গ্রন্থি-বহুলতা। এই জন্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রহসন সৎ-সাহিত্যের পর্যায়ে পঁহুছাইতে পারে না। সমসাময়িক কোন অনাচার লইয়া প্রহসন লিখিত হয় এবং তাহার বিষয়বস্তু সম্পর্কে যখন আর কোন কৌতূহল থাকে না তখন তাহা বিস্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া যায়। খুব কম প্রহসনই সাহিত্যের দরবারে স্বীকৃতি পাইয়াছে। প্রহসন তখনই সৎ-সাহিত্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে যখন তাহার মধ্যে বৈচিত্র্যের আভাস থাকে এবং প্লটের মধ্যে আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতের সমন্বয় হয়। শেষের গুণটিই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাহার কারণ চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তন্তুজালের আভাস দেওয়া প্রহসনের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ; সেই আভাস দিতে গেলে প্রহসনের সংক্ষিপ্ততা নষ্ট হইয়া যাইবে। কোন চরিত্রকে বিস্তারিতভাবে রূপায়িত করিতে গেলে প্রহসন কমেডিতে পরিণত হইবে এবং তাহার লঘু চপলতা তিরোহিত হইবে। চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ অপেক্ষা প্লটের অভিনবত্বের প্রতিই প্রহসন-রচয়িতা দৃষ্টি দিয়া থাকেন। প্লটের মধ্যে খুব বেশী বিস্ময়কর ঘটনার সমাবেশ করিলে প্রহসনের বাস্তবধর্মিতা নষ্ট হইয়া যায় ; অথচ কাহিনীর আকস্মিকতাই প্রহসনের প্রধান উপজীব্য। যেখানে বিস্তৃতি, জটিলতা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের অবকাশ

নাই, সেইখানে স্বভাবতঃই অতর্কিত ব্যাপারের সন্নিবিশের প্রতি নাট্যকারের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে। তাই বলা হইয়াছে যে প্রহসনের প্লটের মধ্যে সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য, প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিতের সমন্বয় হইয়া থাকে এবং প্রধানত এই সমন্বয়ের কৌশলের উপরে প্রহসনের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে এবং ইহার মাধ্যমে অনেক সময় চরিত্রের রহস্য সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত দেওয়া যাইতে পারে।

এই ভাবে বিচার করিলে 'একেই কি বলে সভ্যতা' ?-কে উচ্চ শ্রেণীর প্রহসন বলিয়া অভিনন্দিত করা যায় না। ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই মদ্যপান করিত ও বেশ্যাসক্ত ছিল এবং তাহার ফলে ঘরে ঘরে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। এই কথা সোজাসুজি বলার মধ্যে কোন সাহিত্যিক কৌশলের পরিচয় নাই। জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার নাম করিয়া কতকগুলি যুবক মদ্যপান করিত; বারবিলাসিনীদের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক ছিল, সেইখান হইতে নায়ক নবকুমার মদোন্মত্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরিয়া আসিল এবং তাহার স্তম্ভিত পিতা সবাইকে লইয়া পাপ কলিকাতা নগরী ত্যাগ করিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। ইহাই এই প্রহসনের বক্তব্য বিষয়; ইহার কাহিনীতে বা চরিত্র সৃষ্টিতে কোন অভিনবত্ব নাই। প্রহসনের মধ্যপথে এক বৈষ্ণব বাবাজিকে আনিয়া খানিকটা লঘু কৌতুকের সৃষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্তু এই বাবাজির সঙ্গে মূল উপাখ্যানের কোন সম্পর্ক নাই এবং তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া যে হাস্যরসের অবতারণা করা হইয়াছে তাহা খুব মোটা রকমের। মূল কাহিনীর সঙ্গে তাঁহার সংযোগ এই যে, তিনি নবকুমার ও তাহার বন্ধুর সভাগৃহে প্রবেশে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটাইলেন, কিন্তু এই বিলম্বের কোন তাৎপর্য নাই। বাবাজির চরিত্রের নীচতারও ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহা এই নাটকে অপ্রাসঙ্গিক। শুধু একটি কথাতে একটু নাট্যোচিত বৈদগ্ধ্যের পরিচয় আছে। নবকুমার ও কালীনাথ পাশ্চাত্য শিক্ষায় খুব বেশি অগ্রসর হইয়াছে এমন কোন প্রমাণ নাই। যে প্রতিভা দীনবন্ধুর নিমচাঁদের প্রতি কথায় দেদীপ্যমান, তাহার কণামাত্র ইহাদের মধ্যে নাই। কিন্তু ইহারা সাহেবী ঢঙ শিখিয়াছে, ইংরেজীতে সভার কার্য পরিচালনা করে এবং সেই জন্যই সভাসমিতি সম্পর্কিত কতকগুলি বুলি—যেমন, propose, second, resolution প্রভৃতি আওড়াইতে অভ্যস্ত হইয়াছে, নবকুমারের পিতা যখন বলিলেন যে, তিনি ছেলেকে লইয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যাইবেন তখন পানোন্মত্ত পুত্র অর্ধ সজ্ঞানে মন্তব্য করিয়া উঠিল —আই সেকেন্ড দি রিজলিউশন!

'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ, 'একেই কি বলে সভ্যতা' ? অপেক্ষা অনেক উঁচু দরের প্রহসন। এইখানে আচারনিষ্ঠ, ধর্মধ্বজী বৃদ্ধ লম্পট ভক্তপ্রসাদ বাবুর ধর্মের মুখোস উদ্ঘাটিত হইয়াছে। প্রহসনটি আয়তনে ছোট, কিন্তু ইহার প্লট অতি সহজে চমৎকার উৎপাদন করে, এবং নানা ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়া ভক্তপ্রসাদবাবুর

ভণ্ডামি প্রকাশিত হইয়াছে। কোথাও অতিরঞ্জনের চেষ্টা নাই; যাহা কিছু অস্বাভাবিক তাহাও যেন অতি সহজ ভাবেই প্রকটিত হইয়াছে। ভক্তপ্রসাদের চরিত্রে নানা প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব নাই, নানা সচেতন ও অবচেতন সংবেদন নাই; এক কথায় বলা যাইতে পারে, এই চরিত্রে বৈচিত্র্য খুব কম। চরিত্রে জটিলতার অবতারণা করিলে, প্রহসনের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু তবু ছোট ছোট ঘটনা ও সংক্ষিপ্ত আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়া এই চরিত্রটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। মূল আখ্যানটি ছোট হইলেও তাহার মধ্য দিয়া প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিতের সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে। ফতেমা যখন তাহার স্বামীর জ্ঞাতসারেই পুঁটির নিকট হইতে টাকা লইয়াছে তখনই বোঝা গিয়াছে যে, ভক্তপ্রসাদবাবুর বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র ধূমায়িত হইতেছে। অথচ ষড়যন্ত্রটি যে ঠিক কি তাহার রহস্য শেষ মুহূর্তের পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। চরম মুহূর্তে ফতেমা নিজেও আতঙ্কিত হইয়াছে এবং সেইজন্য এই অস্পষ্টতা আরও ঘনীভূত হইয়াছে। এইভাবে কাহিনী সাজান হইয়াছে বলিয়া ইহার উপসংহার একই সঙ্গে প্রত্যাশিত ও অতর্কিত বলিয়া মনে হয়। ভক্তপ্রসাদকে জব্দ করার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার মধ্যেও খুব সুসঙ্গতি আছে। রাত্রিকালে নির্জন জায়গায় ভাঙা শিবমন্দিরে ভূতের আবির্ভাব অসম্ভব নহে এবং পুঁটির আতঙ্কিত উক্তি হইতে মনে হয় শেষ পর্যন্ত তাহাদের ভুল ভাঙে নাই। অথচ যে ভাবেই হউক বাচস্পতি ও হানিফ যে ভক্তপ্রসাদের সমস্ত ভণ্ডামির আবরণ খুলিয়া ফেলিবে এই সম্পর্কে পাঠক বা দর্শকের মনে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। ভূতের অভ্যাগম সচরাচরের ব্যাপার নহে, কিন্তু স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করিলে অপ্রত্যাশিতও নয়। এইভাবে এই প্রহসনে সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা হইয়াছে। কোথাও বাহুল্য নাই অথচ কোথাও কোন কিছুর অভাবও নাই 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রহসন।*

* এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা-১২ কর্তৃক ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে (১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) প্রকাশিত অধ্যাপক ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখিত 'মধুসূদন: কবি ও নাট্যকার' গ্রন্থের অংশবিশেষ (পৃষ্ঠা —১১৮-১২০; ১৪৭-১৫২) লেখকের অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত। এই রচনার শিরোনাম সম্পাদকের দেওয়া।

—সম্পাদক।

বাংলা চলিত গদ্যের প্রথম সতর্ক লেখক মধুসূদন

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মুনসী সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় কেরী সাহেব বাংলা গদ্যের পথ খননে যেদিন ব্রতী হয়েছিলেন সেদিন থেকে এখনো দু'শো বছর পার হয়নি। কিন্তু ইতিমধ্যেই বাংলা গদ্য হাজার বছরের ত্রুটি পূরণ করে ফেলেছে। গদ্যভাষা আজ যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তা একদিন কল্পনারও অতীত ছিল। সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সে আবদ্ধ নেই। সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই আজ তার অখণ্ড প্রতাপ। কবিতার জন্য যৎসামান্য স্থান রেখে বাকী সবটুকুই সে অধিকার করেছে। এমন কি কবিতার অন্তঃপুরেও গদ্যের যাতায়াত আজ ততটা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।

কিন্তু প্রারম্ভকালের গদ্য আর আজকের গদ্য এক নয়। পৌনে দু-শ বছর ধরে তার বিবর্তন চলেছে। সাহিত্যশিল্পীরা সচেতনভাবে তার সংস্কারের কথা ভেবেছেন। তার দেহে শক্তি, সৌন্দর্য এবং গতিতে সাবলীলতা সঞ্চারের প্রয়াস পেয়েছেন। সে প্রয়াস ব্যর্থ হয়নি।

গদ্য রচনার সূচনা থেকেই লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাষারীতির আদর্শ সম্বন্ধে একটা সংশয় দেখা দিল। সাহিত্যের বাহন হবে কোন্ রীতি? সাধু না চলিত? 'সাধু' এবং 'চলিত'—এই শব্দ দুটি আজ বাংলা ব্যাকরণের দুটি পরিভাষা, বিশিষ্ট অর্থে এদের ব্যবহার। সেদিন এদের যে অর্থে ব্যবহার করা হত আজ পুরোপুরি সে অর্থে এদের ব্যবহার করি না। নামেরও পার্থক্য হত। বঙ্কিমচন্দ্র ভাষার এই দুই রূপের নাম দিয়েছিলেন 'সাধু' এবং 'অপর' বা লৌকিক। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রসঙ্গে বলেছেন,—

"তাঁহার (রামমোহনের রায়ের) পর যে গদ্য সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমনকি বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটির নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য ভাষা, আর অপরটির নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য ভাষা। এ স্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে।"

বঙ্কিমচন্দ্র "সাধু ভাষা" বলতে 'সংস্কৃতানুসারিণী' পণ্ডিতী ভাষা বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর মতে 'সর্বজন হৃদয়গ্রাহিতা সংস্কৃতানুসারিণী ভাষার পক্ষে দুর্লভ' এবং "যে বাঙ্গালা সর্বজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত" সর্বজন-হৃদয়গ্রাহিতা সে ভাষার সহজ গুণ। তাঁর মতে "আলালের ঘরের দুলাল"-এর ভাষা সেই গুণে গুণী। "যে

ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্তৃক ব্যবহৃত" গ্রন্থপ্রণয়নে সেই ভাষা প্রথম ব্যবহার করেছেন বলে বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রশস্তি গান করেছেন। কিন্তু আমরা জানি, আলালের ভাষায় ক্রিয়া ও সর্বনামের পূর্ণতর রূপে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রক্ষিত আছে। অনেক স্থলে পূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত রূপ একত্র প্রযুক্ত হয়েছে। বঙ্কিম এই সংক্ষিপ্ত রূপের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন ভাষা সরল ও সহজবোধ্য হোক, কিন্তু ক্রিয়ারূপের কথ্যরূপ ব্যবহারে তাঁর মনের আনুকূল্য ছিল না। ছাত্রছাত্রীদের জন্য তিনি একটি রচনা শিক্ষার বই লিখেছিলেন। তাতে বিশুদ্ধ রচনার কয়েকটি নিয়ম নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। সেই নিয়মাবলী থেকে দুটি নিয়ম তুলে দিচ্ছি—

"সংক্ষিপ্ত। মুখে বলি "কোরো" "কচ্চি" "করব" 'কচ্ছিলুম', কিন্তু লিখিতে হইবে 'করিয়া' 'করিতেছি' 'করিব' 'করিলাম' 'করিতেছিলাম' ইত্যাদি।

"প্রাদেশিকতা। বাঙ্গালার কোন প্রদেশের লোক বলে "কল্লুম," কোন প্রদেশ 'কল্লেম,' কোথাও 'কল্লাম.' কোথাও 'কনু'। কোন প্রদেশ বিশেষের ভাষাই ব্যবহার করা হইবে না ; —যাহা লিখিত ভাষায় চিরপ্রচলিত, তাহাই ব্যবহৃত হইবে।"

এই নির্দেশটির দিকে ভাষা-কৌতূহলী সারস্বতদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করছি। এই নির্দেশটি থেকে সাধু চলিত সম্পর্কে বঙ্কিমের ধারণাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সর্বজনবোধগম্যতা তাঁর কাম্য ছিল কিন্তু তার মধ্যে ক্রিয়াপদের রূপ বদলানোর প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নি ; তাঁর দৃষ্টি ছিল শব্দাবলীর দিকে। ভাষার সারল্য বা কাঠিন্য নির্ণয়ের জন্য শব্দাবলীর উপরেই ছিল তাঁর প্রধান নির্ভর। সাধু ভাষার নিন্দা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

"আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি তাহা সংস্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না, 'খদির' বলিতেন, কদাচ 'চিনি' বলিতেন না. 'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাঁহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, 'আজ্যই বলিতেন, কদাচিৎ কেহ 'ঘৃতে' নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না, 'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না, 'রম্ভা' বলিতে হইবে। ফলাহারে বসিয়া 'দই' চাহিবার সময় 'দধি' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি একজন অধ্যাপক একদিন 'শিশুমার' ভিন্ন 'শুশুক' শব্দ মুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ শিশুমার অর্থ জানেন না, সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে ঐরূপ ছিল তবে তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গলা ভাষা আরও কি ভয়ংকর ছিল, তাহা বলা বাহুল্য।"

সংস্কৃত বিশেষত গুরুভার বৃহদায়তন সংস্কৃত শব্দের বাহুল্যই ছিল বঙ্কিমের মতে সুবোধ্যতার প্রধান অন্তরায়। বিদ্যাসাগরের ভাষাকে তিনি প্রশংসা করেছেন।

সংস্কৃতানুসারিণী হলেও "তত দুর্বোধ্য নহে।" বরং "অতি সুমধুর ও মনোহর।" "তাহা হইলেও সর্বজনবোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল।" কারণ কি? না, "সকল প্রকার কথা এ ভাষায় ব্যবহার হইত না"। তাঁর মতে বিদ্যাসাগরের ভাষায় "সকল প্রকার কথা" অর্থাৎ সাধারণ লোকের মুখের কথায় যে সকল শব্দ সচরাচর ব্যবহৃত হয় সেগুলির পর্যাপ্ত ব্যবহার হলে তবেই তা সর্বজনবোধগম্য হতে পারত। 'অপর' বা 'লৌকিক' বা 'প্রাকৃত' বা 'চলিত' যে নামই দিই না কেন অন্যতর ভাষাটির চরিত্র বিচার হত কেবল সহজবোধ্যতার দ্বারা।

এ যুগের বিচারকের দৃষ্টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ যুগে সুধীন্দ্র দত্তের দুর্বোধ্য ভাষা 'চলিত'। প্রমথ চৌধুরীর রচনার ভঙ্গী সর্বজনবোধ্য নয়, কিন্তু তাঁর লেখাও 'চলিত'। অথচ কমলাকান্তের দপ্তরের ভাষা এ যুগের বিধানে 'সাধু', হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সুখপাঠ্য গদ্য 'সাধু'।

সে যাই হোক, এখনকার হিসাবে যা 'চলিত' সাহিত্য ক্ষেত্রে তারই প্রভাব বেশী। সবুজ পত্রের যুগ থেকেই তার সূচনা। ঐতিহাসিক আলোচনার সময় রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'-টাকেও আমরা তুলে ধরি।

কিন্তু মুখের ভাষা মুখের কথার মধ্যেই যে বন্দী ছিল না, নাটকের মধ্যে সাহিত্যের আসরেও যে দীর্ঘকাল আগেই প্রবেশ ঘটেছিল সে কথাটা আমরা ভুলে যাই। গদ্য ভাষারীতির ইতিহাস এবং ক্রমবিবর্তনের প্রসঙ্গে আমরা প্রবন্ধ এবং গল্প-উপন্যাসের কথাই ভাবি। নাটককে নিতান্তই দৃশ্যকাব্য মনে করে গণনার মধ্যে আনি না। অথচ নাটকের সংলাপের মধ্যে কথ্য ভাষায় সাহিত্য রচনার যে সচেতন প্রয়াসের অনেক পরিচয় প্রচ্ছন্ন আছে সেদিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যাবে, চলিত রীতির প্রবর্তনে নাটকগুলি আমাদের অজ্ঞাতসারেই কাজ করে যাচ্ছিল।

বাংলা নাটকের প্রথম যুগে সংলাপের রীতি সুনির্দিষ্ট হয়নি। নাট্যকারদের সামনে ছিল সংস্কৃতের আদর্শ। সাহিত্যিক বাংলা গদ্যের মান তখনও স্থিরীকৃত হয় নি। এ অবস্থায় নাট্যকারদের আপন আপন চেষ্টাতেই আপন-আপন পথ তৈরী করে নিতে হয়েছিল। প্রথম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন রামনারায়ণ তর্করত্ন। যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায় 'ঘি' কে 'আজ্য' বলতে অভ্যস্ত, রামনারায়ণ বঙ্কিম-নিন্দিত সেই পণ্ডিত সম্প্রদায়েরই মানুষ। সুতরাং যদি তাঁর নাটকে সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা ব্যবহার করলে বিস্মিত হবার কারণ নেই। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়, সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে ভাষার ভঙ্গীও বসিয়েছিলেন তিনি ভিন্ন ভিন্ন রকম। সংস্কৃত নাটকে স্ত্রীলোকের এবং নিম্নতম শ্রেণীর মুখে প্রাকৃতের প্রয়োগ হয়। প্রাকৃতেরও শ্রেণীভেদ আছে। রাণী এবং কোটাল একজাতীয় প্রাকৃতে কথা বলে না। কুলীনকুলসর্বস্বের লেখক সেই রীতিটি তাঁর নাটকে অনুসরণ করেছেন। তাঁর সূত্রধরের ভাষা প্রায় সংস্কৃতের অনুবাদ। তাঁর ভাষা পূর্ণাঙ্গ

সাধুভাষা। ক্রিয়াপদ সর্বনাম পদ অসংক্ষেপিত। বড় বড় সমাসবহুল শব্দসমষ্টি এবং চেষ্টাকৃত অলংকারের প্রয়োগে ভাষার ভার যতটা বেড়েছে লাবণ্য তেমন বাড়ে নি। দৃষ্টান্ত—

"প্রিয়ে! সাধু সাধু, উত্তম সঙ্গীত করিয়াছ, তোমার কণ্ঠনির্গলিত রাগ-রাগিণী-সংকলিত রসভাবপূর্ণ মধুর সঙ্গীত শ্রবণে সমস্ত সামাজিক লোক একতানান্তঃকরণে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় হইয়া রহিয়াছেন; ইঁহারা প্রথমতঃ তোমার লোকাতীত রূপলাবণ্য নিরীক্ষণেই মুগ্ধপ্রায় ছিলেন, এক্ষণে তোমার অসামান্য সঙ্গীত-নৈপুণ্যে যে কি পর্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন, তাহা বাক্‌পথাতীত।

স্ত্রীজাতি অতি অবোধ। প্রিয়ে, চিরদিন চিন্তাকে সহচরী করিয়া সুখমুখাবলোকনে বিরত হইলে কি হইবে? শুভাদৃষ্ট ব্যতীত কদাচ কোন অভীষ্টই সিদ্ধ হয় না। বিশেষত বিবাহকার্য, আমি তন্নিমিত্ত তৎপ্রতি প্রতীক্ষায় রহিয়াছি। দেখি অদৃষ্টে কি হয়!"

মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা থেকে কিছু নিদর্শন দিই। কিন্তু তার পূর্বে জানিয়ে রাখি, মধুসূদনের রচনা থেকে যাবতীয় উদ্ধৃতির জন্যে আমি ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত "মধুসূদন রচনাবলী" এবং "কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী" এই দুটি বইয়ের পাঠের উপরে বিশেষভাবে নির্ভর করেছি। শুক্রাচার্য ও তাঁর শিষ্য কপিলের সংলাপ—

শুক্রাচার্য। আহা, কি রম্য স্থান! ভো কপিল! ঐ পরিদৃশ্যমানা নগরী কি মহাত্মা মহাতেজাঃ পরন্তপ চন্দ্রবংশীয় রাজচক্রবর্তীগণের রাজধানী?

কপিল। আজ্ঞা হাঁ।

শুক্রাচার্য। আহা, কি মনোহর নগরী! বোধ হয় যেন বিশ্বকর্মা ঐ সকল অট্টালিকা পরিখাচয় আর তোরণ প্রভৃতি নানাবিধ সুদৃশ্য প্রীতিকর বস্তু কুবেরপুরী অলকা আর ইন্দ্রপুরী অমরাবতীকে লজ্জা দিবার নিমিত্তেই পৃথিবীতে নির্মাণ করেছেন।

…বৎস, বহুদিবসাবধি আমার পরম স্নেহপাত্রী দেবযানীর চন্দ্রানন দর্শন করি নাই এবং তার যে সন্তানদ্বয় জন্মেছে, তাদেরও দেখতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। সেই জন্যেই ত আমি এদেশে আগমন করেছি। কিন্তু অদ্য ভগবান্ আদিত্য প্রায় অস্তাচলে গমন কল্যেন। অতএব এ মুখ্য কালবেলার সময়; তা এই সময় রাজধানী প্রবেশ করা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। হে বৎস, অদ্য এই নিকটবর্তী অতিথিশালায় বিশ্রামের আয়োজন কর।

…বৎস, তুমি এদেশের সমুদয় বিশেষরূপে অবগত আছ, কেননা দেবযানীর পাণিগ্রহণকালে তুমিই রাজা যযাতিকে আহ্বানার্থে আগমন করেছিলে, অতএব তুমি কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্যাদি আহরণ কর। দেখ, এক্ষণে ভগবান মার্তণ্ড অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হলেন, আমি সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করি।"

এ ভাষাকেও বঙ্কিমের মানদণ্ডে বিচার করলে সংস্কৃতানুসারিণী বলতে হবে।

কারণ সংস্কৃত শব্দের এতে বহুল ব্যবহার হয়েছে।

শব্দের শ্রেণী ও সংখ্যানুপাত মোটামুটি এই রকম—

	শব্দ সংখ্যা	তৎসম শব্দ সংখ্যা	চলিত শব্দ সংখ্যা
প্রথম অনুচ্ছেদ—	১৫	১২	৩
দ্বিতীয় ,, —	২	০	২
তৃতীয় ,, —	৩০	২০	১০
চতুর্থ ,, —	৫৮	৩৪	২৪
পঞ্চম ,, —	৩৫	২১	১৪
মোট	১৪০	৮৭	৫৩

গড়পড়তা হিসেবে বলা যায় উদ্ধৃত সংলাপে সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা শতকরা ষাটের কিছু বেশী। পয়ষট্টি বললেও দোষ হয় না। কারণ, 'চন্দ্রবংশীয়' 'রাজচক্রবর্তিগণের', 'বহুদিবসাবধি', 'আহ্বানার্থে' 'অস্তাচলচূড়াবলম্বী' প্রভৃতি বৃহদায়তন সমাসবদ্ধ শব্দগুলিকেও এক একটি স্বতন্ত্র শব্দ বলে ধরা হয়েছে।

'কুলীনকুলসর্বস্ব' থেকে উদ্ধৃত সূত্রধারের সংলাপে সংস্কৃত শব্দের সংখ্যানুপাতও প্রায় একই রকম, অন্ততঃ 'শর্মিষ্ঠা' থেকে উদ্ধৃত নিদর্শনের চেয়ে বেশী নয়। তবু মাইকেলের রচনা তুলনায় ভাল। মুখের কথা হিসেবে ক্রিয়া-সর্বনামের অনাকুঞ্চিত রূপের জন্যে অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক বোধ হচ্ছে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে 'নাই' 'নহে'—এই রকম কয়েকটি শব্দ ছাড়া ক্রিয়াপদে সাধুরূপের বড় একটা প্রয়োগ হয়নি। নেতিবাচক অতীতকালের চলিত ক্রিয়াপদের 'নাই'-টা 'নি' হয়ে যায়। মধুসূদন অধিকাংশ স্থলে 'নাই' রেখেছেন। যেমন—

অমরগণ দৈত্যরাজের সহিত ভগবান ভার্গবের বিবাদের কোন সূচনা প্রাপ্ত হয় নাই। শর্মিষ্ঠা ১/১

তা সেই অবধি তার আর কোন অনুসন্ধান পাই নাই। পদ্মাবতী /১

কাল সমস্ত রাত্রি আমার নিদ্রা হয় নাই। মায়াকানন ১/২

তোর কি এত হেঁটেও কিছু পরিশ্রম হয় নাই? পদ্মাবতী ৩/১

এমন অদ্ভুত শরজাল ত আমি কখনও দেখি নাই। পদ্মাবতী ৪/১

নরকে যেতে দিয়ে ভাল করি নাই। একেই কি বলে সভ্যতা? ১/১

'নি' প্রয়োগও অনেক জায়গায় আছে, সাধারণত লঘু চরিত্রে। দৃষ্টান্ত

— ওকে যখন প্রসব করেছিলাম তখন নুন খাইয়ে মেরে ফেলতে পার নি?—একেই কি বলে সভ্যতা? ২/২

ওমা, ছেলেটিকে যে ভূতেটুতে পায় নি?—২/২

আমি যার মুখ কখনও দেখিনি। মায়াকানন ৫/২

আমার বাপ দাদা নওয়াবের সরকারে...কসবীগিরি করেনি।—বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ ১/২

অনেকদিন বাড়ী আসা হয়নি।—বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ। ২/১

'না আছে' অর্থে আমরা একালে চলিত ভাষায় 'নাই'-এর স্থানে সাধারণত 'নেই' ব্যবহার করি। অবশ্য 'নাই'-এর প্রয়োগও চলে। মাইকেল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 'নাই' এবং দু-এক জায়গায় 'নেই' ব্যবহার করেছেন। যেমন—

কত মেয়ের পরকাল খেয়েছি ঠিক নাই।—বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ, ১/২

তুই যদি ভাই আমার কথা শুনিস্ তবে তোর আর দেরি করে কাজ নেই। ঐ ১/২

তোদের ত আর কুলমান নাই। ঐ ১/২

না, তবে আমি, এর মধ্যে নাই। ঐ ২/১

এর যে কোন গূঢ় কারণ আছে তার আর কোনই সন্দেহ নাই। মায়াকানন ১/২

আমার মত অভাগা লোক এ পৃথিবীতে আর নাই। ঐ ১/২

মধুসূদনের সংলাপের ভাষায় ক্রিয়াপদের সুনিপুণ প্রয়োগ তাঁর ভাষা-সচেতনতার এক অত্যাশ্চর্য নিদর্শন। উচ্চ নীচ সকল চরিত্রের মুখেই ক্রিয়াপদের মৌখিক রূপ বসিয়েছেন প্রায় সর্বত্রই। উচ্চতর চরিত্রের সংলাপে, যেখানে বেশ গুরুভার দীর্ঘকার শব্দসমষ্টির প্রয়োগ হয়েছে, সেখানেও সাধুপদের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন নি। রামনারায়ণের সঙ্গে এই বিষয়ে তাঁর তুলনা চলতে পারে। রামনারায়ণের নাট্য সংলাপে ক্রিয়াপদের দুই রূপই দেখি, সাধুও আছে, চলিতও আছে' কিন্তু উচ্চতর চরিত্রে সাধুরূপের প্রাধান্য, নিম্নতর চরিত্রে চলিতের। একই ভূমিকায় সাধু-চলিতের সংমিশ্রণও বিরল নয়।

উভয়ের রচনার নিদর্শন থেকে ক্রিয়াপদের ব্যবহার সম্পর্কে উভয়ের দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাবে।

(১) এ কি মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত! সহস্র কিরণে সূর্য প্রচুর কিরণ প্রদানে আপনার সহস্রকিরণ নামই কি সার্থক করিতে উদ্যত হইয়াছেন? এক্ষণে অনবরত পথ পরিশ্রান্ত ও দিনকরকিরণে নিতান্ত ক্লান্ত পান্থ লোকেরা সন্তাপ শান্তি নিমিত্ত ছায়াপ্রধান পাদপতলে পল্লবশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা-ভজনা করিতেছে। মহীরুহচয় একান্ত পবনপাতবিরহে সজ্জনমানসের ন্যায় চাপল্য পরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে, বরাহগণ পল্বলপঙ্কে সর্বাঙ্গ বিলীন করিয়া রহিয়াছে।......ভিক্ষোপজীবীরা সাতিশয় বুভুক্ষায় ক্ষীণকায় ও ব্যগ্র হইয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে সঞ্চরণ করিতেছে। গৃহিগণ স্ব স্ব ব্যাপারে নিবৃত্ত হইয়া ক্ষুধা নিবারণোপায়ে প্রবৃত্ত হইতেছে। কুলবধূরা সুমধুর শাক-সূপাপূপাদি নানাবিধ ভোজনীয় বস্তু প্রস্তুতকরণে অন্তঃকরণ অর্পণ করিতেছে......সম্পন্ন ব্যক্তিরা মনোরম্য হর্ম্যমধ্যে পয়ঃফেননিভ এবং পর্যঙ্কোপরি পরিচারিকা-করকলিত তালবৃন্তে

বীজ্যমান হওত আমীলিত লোচনে ঐশ্বর্যসুখ আস্বাদন করিতেছে। অতএব এতাদৃশ সময়েও আমি পরিশ্রম স্বীকার করিতেছি।

কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক—১ম অঙ্কে কুলপালকের উক্তি।

(২) রাজা। আর ভাই বলবো কি ? যেমন কোন পোতবণিক ঘোরতর অন্ধকারময় বিভাবরীতে ভয়ানক সমুদ্র মধ্যে পথ হারালে ব্যাকুল চিত্তে কোন দিঙ্‌নির্ণায়ক নক্ষত্রের প্রতি সহায় বিবেচনায় মুহুর্মুহুঃ দৃষ্টিপাত করে, আমি সেইরূপ এই অপার বিপদ-সাগরে পতিত হয়ে পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে একমাত্র ভরসা জ্ঞানে সর্বদা মানসে ধ্যান কর্চি। হে জগতপিতঃ, এ বিপদে আমাকে রক্ষা করুন।

বিদূষক। (স্বগত) এ ত কোন সামান্য ব্যাপার নয়। ত্রিভুবন বিখ্যাত রাজচক্রবর্তী যযাতি যে এতাদৃশ ত্রাসিত হয়েছেন, কারণটাই কি ? (প্রকাশ্যে) মহারাজ, ব্যাপারটা কি বলুন দেখি ?……

রাজা। সখে, সে কথা কেন জিজ্ঞাসা কর। বিধাতা বিমুখ হলে লোকের আর দুঃখের পরিসীমা থাকে না। মহিষী অদ্য সায়ংকালে অনেক যত্নপূর্বক তাঁর পরিচারিকাদের উদ্যানে ভ্রমণ করতে আমাকে আহ্বান করেছিলেন ; আমিও তাতে অস্বীকার হতে পাল্যেম না। সুতরাং আমরা উভয়ে তথায় ভ্রমণ করতে করতে প্রেয়সী শর্মিষ্ঠার গৃহের নিকটবর্তী হলেম। ভাই হে, তৎকালে আমার অন্তঃকরণ যে কি প্রকার উদ্বিগ্ন হলো তা বলা দুষ্কর।—শর্মিষ্ঠা নাটক। ৪/১

উদ্ধৃত দুটি নিদর্শনই উচ্চ চরিত্রের সংলাপ রূপেই পরিকল্পিত। রামনারায়ণের ভাষায় সব কটি ক্রিয়ারই পূর্ণরূপ।—'করিতে,' 'হইয়াছেন' 'করিতেছে' 'করিয়া' 'রহিয়াছে' 'হইয়া' 'হইতেছে' 'হওত, (হইয়া অর্থে')।—এ গুলির মধ্যে একটিও চলিত রূপ নেই।

মধুসূদনের রাজা ও বয়স্যের কথোপকথনে ঠিক বিপরীত, একটিও সাধুরূপ দেখা যাচ্ছে না। 'বলবো' 'হারালে' 'হয়ে' 'কর্চি' 'নয়' 'হয়েছেন' 'হলে' 'করতে' 'করেছিলেন' 'হতে' 'পাল্যেম' 'করতে করতে' 'হলেম' 'হলো'—সব কটি চলিত। মধুসূদনের ব্যবহৃত ক্রিয়াপদের রূপ সম্বন্ধে আলোচনা পরে করব।

সর্বনাম পদ সম্বন্ধেও তিনি অনবহিত নন। 'তাঁর' এবং 'তাতে' বিশুদ্ধ চলিত রূপ। তা ছাড়া ইহা অর্থে 'এ'-র প্রয়োগ বিশেষ সতর্কতার লক্ষণ।

•

রামনারায়ণ তখন বিদ্বৎসমাজে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। নাট্যকার হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে, আর সেই সঙ্গে বাংলা ভাষায় একজন প্রামাণিক পণ্ডিতরূপেও তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। মধুসূদন যত বড়ই ইংরেজীনবীশ হোন, বাংলা সাহিত্যে নিতান্তই নবাগত। তাই তাঁর শর্মিষ্ঠার

ভাষা সংশোধনের ভার দেওয়া হয়েছিল রামনারায়ণের উপরে। রামনারায়ণ কোন্ কোন্ স্থানে কতখানি পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন তা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। কিন্তু যাই করুন, মাইকেলের তা মনঃপূত হয়নি। রামনারায়ণ বোধ হয় তাঁর কলমটা সবিস্তারে চালিয়েছিলেন যার ফলে মূল পাণ্ডুলিপির প্রকৃতিটাই বদলে গিয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে গৌরদাস বসাককে লিখিত মধুসূদনের পত্রটি স্মরণীয়।—

> Ramnarayan's 'version,' as you justly call it, disappoints me. I have at once made up my mind to reject his aid. I shall either stand or fall by myself. I did not wish Ramnarayan to recast my sentences—most assuredly not. I only requested him to correct grammatical blunders—if any. You know that a man's style is the reflection of his mind, and I am afraid there is but little congeniality between our friend and poor self. However I shall adopt some of his corrections.

রামনারায়ণের স্টাইল যে তাঁর ভাল লাগতে পারে না সে তো 'রত্নাবলী' নাটক সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য থেকেই আমাদের জানা আছে।

রামনারায়ণের প্রস্তাবিত কয়েকটি সংশোধনে তাঁর সম্মতি ছিল, কিন্তু style-এর উপরে তাঁর হস্তাবলেপ সহ্য করতে কবি প্রস্তুত নন। তাঁর রাগের একটি কারণ স্পষ্ট করেই বলেছেন—

"He (Ramnarayan) has made my girls talk d-d cold prose."

রামনারায়ণ মধুসূদনের নারীচরিত্রগুলির মুখে যে গদ্য বসিয়েছিলেন কবির মতে তা নিতান্তই পরুষ গদ্য, রমণী চরিত্রের পক্ষে অনুপযোগী। তিনি মধুসূদনের বাক্যগুলি "recast' অর্থাৎ পুনর্বিন্যাস করেছিলেন। এই পুনর্বিন্যাস যে কেবল নারী চরিত্রের সংলাপেই হয়েছিল তা নয়। মাইকেলের চিঠি থেকে মনে হয় সমগ্র নাটকের উপরেই রামনারায়ণের কলম চলেছিল। বাক্যের যে পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে মধুসূদন প্রবল আপত্তি জানিয়েছেন সে 'পুনর্বিন্যাসে'র ধরনটা কি রকম ছিল জানতে কৌতূহল হয়। কিন্তু 'Ramnarayan's version'-তো আর পাবার উপায় নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রামনারায়ণ অন্যান্য পরিবর্তনের সঙ্গে ক্রিয়াপদগুলিরও পরিবর্তন করেছিলেন, চলিত রূপগুলিকে সাধুত্ব দিতে চেয়েছিলেন। মেয়েদের মুখে সেটা বিশেষভাবে শ্রুতিকটু হয়েছিল। দুরুচ্চার্য বৃহদায়তন সমাসবহুল সংস্কৃত শব্দসমষ্টিও নিশ্চয়ই তিনি অধিক পরিমাণে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। এ অনুমান ষোল আনা সঠিক না হতে পারে কিন্তু নিতান্ত অযৌক্তিক হবে না।

শর্মিষ্ঠার ভাষার উপরে মাইকেল রামনারায়ণকে হস্তক্ষেপ করতে দেননি—এটা

স্পষ্টই বোঝা গেল। দিলে যে কি হত তা অনুমানসাপেক্ষ। কবি তাঁর নিজের মূল রচনাকেই যথেষ্ট সরল এবং সর্বসাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য মনে করছেন না। শর্মিষ্ঠা নাটকের ইংরেজী অনুবাদ প্রসঙ্গে গৌরদাসকে লিখিত পত্রের এই অংশটি লক্ষণীয়,—

Everyone says it (শর্মিষ্ঠার ইংরেজী অনুবাদ) is superior to that book (রত্নাবলীর ইংরেজী অনুবাদ), as for the Bengali original (শর্মিষ্ঠা), the only fault found with it is that the language is a little too high for such audiences as we may expect now to patronize it.

সেদিনকার সাধারণ শিক্ষিত লোকের সম্বন্ধে কবির মনোভাব খুব অনুকূল নয়। যাঁরা তাঁর নাটকের দর্শক বলে কবি কল্পনা করেছেন তাঁদের বঙ্গভাষাজ্ঞানের প্রতি কবির তেমন আস্থা নেই। কিন্তু নিজের সম্পর্কে বিশ্বাস প্রবল। শ্রোতা অজ্ঞ বলে তিনি ভাষার মানকে নামিয়ে আনতে রাজী নন। তিনি যে উচ্চ মানকে আদর্শ মনে করেন তাই রাখবেন, দেশ যেদিন উপযুক্ত হবে সেদিন বুঝবে। কবির বিশ্বাস, দু-দশকের মধ্যেই দেশবাসীর ভাষাজ্ঞান এতখানি বৃদ্ধি পাবে যে, তাঁর নাটক পড়ে তার রস গ্রহণে সক্ষম হবে। তাঁর মতে,—

> This (that the language is a little too high) is nothing, for if the book is destined to occupy a permanent place in the literature of the country, it will not be condemned on this head twenty years hence, for everyone is learning Bengali.

মাইকেলের গদ্য নিয়ে আলোচনার উৎসাহ বঙ্গীয় লেখক সমাজের মধ্যে বড় একটা নজরে পড়ে না। হেক্টরবধকে মধুসূদন দত্তের অপ্রধান রচনা বলে ধরা হয়। মুখ্য কবির গৌণ গদ্য রচনাটিকে যে মূল্য দেওয়া হয় সে যতটা জীবনেতিহাসের উপকরণরূপে ততটা রচনা-গৌরবের জন্য নয়। এই বইটিকে বাদ দিলে মাইকেল হন কবি, নয় নাট্যকার। সুতরাং সমালোচক তাঁর কাব্য ও নাটকের সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হন। হেক্টরবধ প্রসঙ্গে রামগতি ন্যায়রত্ন মন্তব্য করলেন,—

> "মাইকেল নাটক ও পদ্য রচনা করিয়া যে কিছু খ্যতিলাভ করিয়াছিলেন সেই তাঁহার ভাল ছিল। তিনি আবার গদ্য কাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে গেলেন কেন? এই কাব্য রচনায় না আছে চাতুর্য, না আছে লালিত্য, না আছে পাণ্ডিত্য। এই রচনায় ব্যাকরণকে পদদলিত করাই যেন রচয়িতার অভীষ্ট ছিল বোধ হয়। নচেৎ রিপুবৃন্দ, সিঞ্চন, রণদার্ণব, মহা মহা অক্ষৌহিনী, ধার্মতা, ব্যক্তার্থে, মনান্তর, তুষ্ণীভাবে, হে দেবকুলেন্দ্রনন্দিহিতে, পতিবিরহকাতরা কলত্রবৃন্দ ইত্যাদি ভূরি ভূরি ব্যাকরণ-দোষ কি কারণে পদে

পদে থাকিবে ?”

এ মন্তব্য সাহিত্য রসানুরাগীর নয়, এমনকি রচনারীতি পরীক্ষকেরও নয়, এ মন্তব্য নিতান্তই বৈয়াকরণের। বঙ্কিমের গদ্য প্রসঙ্গেও ‘বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে’র প্রস্তাবক একই ধরনের সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু আমরা বিবিক্ত দৃষ্টি দিয়ে যদি হেকটরবধের ভাষার বিচার করি তা হলে মধুসূদন দত্তের সৃজনী প্রতিভার আর একটি অপরিচিত দিক উদ্‌ঘাটিত হবে। আমরা দেখব বাংলা ভাষার মর্মরহস্যটি তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। বাংলা গদ্যের মহৎ সম্ভাবনার আভাস তাঁর এই রচনায় সুস্পষ্ট। অনেক শব্দে ব্যাকরণগত অশুদ্ধি ছিল, অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দেরও অপ্রতুল ছিল না, পাশ্চাত্য ভাষারীতির প্রভাবও যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এ সত্ত্বেও হেক্‌টরবধের রচনারীতির মধ্যে শক্তিমান গদ্যলেখকের হস্তের স্পর্শ লক্ষ্য করা যায়। স্মরণ রাখতে হবে, হেক্‌টরবধ কবির মৌলিক রচনা নয়, হোমারের ‘ইলিয়াড’ মহাকাব্যের অনুবাদ—আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ। এই অনুবাদ যাতে ভাব বা ভাষা কোন দিক দিয়েই অনুবাদগন্ধী না হয়, সেজন্য কবির সতর্ক প্রয়াসের অবধি ছিল না। প্রিয় বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ পত্রে লেখেন,—

> “কাব্যখানি পাঠ করিলে টের পাইবে যে আমি কবিগুরুর মহাকাব্যের অবিকল অনুবাদ করি নাই।……স্থানে স্থানে এই গ্রন্থের অনেকাংশ পরিত্যক্ত এবং স্থানে স্থানে অনেকাংশ পরিবর্তিত হইয়াছে। বিদেশীয় একখানি কাব্য দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া আপন গোত্রে আনা বড় সহজ ব্যাপার নহে, কারণ তাহার মানসিক ও শারীরিক ক্ষেত্র হইতে পরবংশের চিহ্ন ও ভাব সমুদায় দূরীভূত করিতে হয়। এ দুরূহ ব্রতে যে আমি কতদূর পর্যন্ত কৃতকার্য হইয়াছি এবং হইব তাহা বলিতে পারি না।”

মাইকেলের বই প্রকাশিত হল ১৮৭১ সালে। তারও চার বৎসর আগে অর্থাৎ ১৮৬৭ সালে লেখা শেষ হয়েছিল। বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে তার কিছু পূর্বেই অনেক যশস্বী লেখকের আবির্ভাব হয়েছে। সাধু-চলিত প্রসঙ্গ নিয়েও আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। কয়েকটি গ্রন্থের প্রকাশকাল উল্লেখ করলেই চিত্রটা পরিষ্কার হবে। —বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা (১৮৫৪), তারাশংকরের কাদম্বরী (১৮৫৪), আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৫), সীতার বনবাস (১৮৬০), হুতোম প্যাঁচার নকসা (১৮৬২)। যে বন্ধুকে হেক্‌টরবধ উৎসর্গ করা হচ্ছে সেই ভূদেব মুখোপাধ্যায়েরই অনেকগুলি বই—‘শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব’ ‘পুরাতত্ত্বসার’ ও ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ বেরিয়ে গেছে। বাংলা গদ্যের শৈশব পার হয়েছে,—এ কথা অবশ্যই বলা যায়। মাইকেল তা অবশ্যই বুঝেছিলেন। কাব্যরচয়িতা মাইকেলের কোন প্রতিযোগী ছিল না। গদ্য রচয়িতা মাইকেলের সম্বন্ধে সেই কথা বলা যায় না। গদ্য

রীতি বিষয়ে সাহিত্য সমাজ আন্দোলন করছে, চিন্তা করছে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে গদ্য ভাষায় শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে। এ অবস্থায় মাইকেল যখন গদ্যে হাত দিলেন তখন বুঝতে হবে রীতিমত ভেবেচিন্তেই এ ক্ষেত্রে নেমেছেন। কাব্যের ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ। গদ্যের ক্ষেত্রেও নূতন পথ প্রবর্তন করবেন এমন আশাও হয়তো তিনি মনের মধ্যে পোষণ করতেন। সে আশা করে থাকলে তা সফল হয়নি নিশ্চয়ই। কারণ হেক্‌টর বধ তেমন জনপ্রিয়তা কখনোই লাভ করে নি। বাংলা গদ্যরীতির পরম্পরার মধ্যে হেকটর বধ তেমন স্থান পায়নি। পরবর্তী গদ্য লেখকদের উপরে তার কোন প্রভাব পড়ে নি; কিন্তু তৎকালীন প্রতিষ্ঠাবান গদ্য লেখকদের অতিক্রমণ না করলেও তাঁদের সঙ্গে তিনি যে একই আসনে বসতে পারেন এতে সন্দেহ নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েক ছত্র উদ্ধার করা দরকার।—

"সুরলোকে ও নরলোকে সর্বজীবকুল নিদ্রাকৃত হইল। কিন্তু নিদ্রাদেবী দেবকুলপতির নেত্রদ্বয় এক মুহূর্তের জন্যও নিমিলিত করিতে পারিলেন না। কেন না, তিনি কিরূপে আকিলীসের সম্ভ্রম বৃদ্ধি, এবং রাজা আগেমেমননের অধঃপাত সাধন করিবেন, এই ভাবনায় সমস্ত রাত্রি জাগরিত রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে দেবরাজ কুহকিনী স্বপ্ন দেবীকে আহবান করিয়া কহিলেন, হে কুহকিনী! তুমি দ্রুতগতিতে রাজা আগেমেমননের শিবিরে যাও এবং তথায় গিয়া রাজশিরোদেশে দণ্ডায়মান হইয়া এই কহিও যে, হে আগেমেনন অলিম্পুস নিবাসী অমরকুল দেবেন্দ্রাণী হীরীর অনুরোধে তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তুমি সসৈন্যে প্রশস্ত পথশালী ট্রয়নগর আক্রমণ করতঃ তাহা পরাজয় কর। দেবেন্দ্রের এই আদেশ পালনার্থে স্বপ্নদেবী অতি বেগে শিবির প্রদেশে আবির্ভূতা হইলেন।"

হেক্‌টর বধ। প্রথম পরিচ্ছেদ।

এ ভাষা সরল সুললিত সুমধুর নয়, কিন্তু একে দুর্বোধ্য দুষ্পাচ্যও বলা চলে না। কবি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে ভাষায় যথোচিত গাম্ভীর্য এবং ওজস্বিতা সঞ্চার করেছেন। রচনা-গৌরবের প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। শর্মিষ্ঠার ভাষা সম্পর্কে গৌরদাসকে যে কথা লিখেছিলেন হেক্‌টরবধের ভাষা সম্পর্কেও খুব সম্ভব তাঁর মনোভাব একই রকম ছিল, যারা পড়বে তাদের পক্ষে "a little too high"।

কিন্তু মধুসূদন হালকা ঢঙের যে গদ্য লিখতে পারতেন নাটকের লঘুতর চরিত্রে এবং প্রহসনে তার নিদর্শন অজস্র দেখতে পাচ্ছি।

তবে একথা সত্য যে পদ্য রচনায় তিনি যতটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন গদ্যে ততটা নয়। বাংলা গদ্যে যে অধিকার অর্জন করেছিলেন সে কেবল অধ্যবসায় ও অভ্যাসের জোরে। বিদ্যাসাগরকে লিখিত সেই বিখ্যাত পত্রটির কথা এখানে স্বভাবতই মনে পড়বে।—ফরাসী দেশ থেকে লিখিত ১৮৬৪ সালের ১৮ই

ডিসেম্বর তারিখের দীর্ঘপত্র, যার মধ্যে একটি অনুচ্ছেদ শুধু বাংলায় লেখা।* বাংলা অনুচ্ছেদটির পরেই লিখেছেন,—

If I could write Bengali like you, I should continue in that language, but want of practice prevents my doing so.

পত্রে যে আবেগ, আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে সেটা মাতৃভাষার মধ্য দিয়েই ব্যক্ত হওয়া উচিত। কবি নিজেও সেটিই স্বাভাবিক বলে অনুভব করেছেন। কিন্তু পারছেন না। সাহিত্য রচনা হলে তার জন্যে বিশেষ করে সময় দিতে হত, মনোযোগ দিতে হত। এখন সে সময় ও মনোযোগ দেবার অধিকার নেই। বৈষয়িক সমস্যায় তিনি বিব্রত। তার সমাধানের জন্য পত্র লিখতে হচ্ছে, সে পত্র যে ভাষায় সত্বর লেখা যায় এবং স্বচ্ছন্দে লেখা যায় সেই ভাষায় লিখছেন। প্রবাসে বাংলা চর্চার অবকাশ কম, তাতে চিঠি লেখাটা কঠিন বোধ হচ্ছে। সেটা যে গদ্য, নিতান্ত বৈষয়িক গদ্য! কিন্তু সনেট লেখার অসুবিধা হচ্ছে না। সেটা কাব্যের জগৎ সেখানকার ভাষা স্বতন্ত্র, তার অভ্যাস চলছে মনের অলক্ষ্য অন্তঃপুরে।

গদ্য লেখেন যখন না লিখলে নয়। একটি পত্র পাওয়া যাচ্ছে যার ভাষা আগাগোড়া বাংলা। লিখিত হয়েছিল ১৮৬৬ সালের মে মাসে মনোমোহন ঘোষের মায়ের কাছে। মনোমোহন ঘোষের পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বন্ধুর মাকে সান্ত্বনা দিতে কবি এই চিঠি লেখেন। তার ভাষা আজকের বিচারে সম্পূর্ণ সুন্দর বলে বিবেচিত না হলেও ভাষার সারল্য ও বিশুদ্ধি সম্পর্কে কোন অভিযোগ তোলা যাবে না। চিঠিটি উদ্ধারযোগ্য।—

"শ্রীচরণকমলেষু

জেঠামহাশয়ের স্বর্গপ্রাপ্তি সংবাদে যে কি পর্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি তাহা পত্রে লেখা বাহুল্য। সংবাদ পাইবামাত্র আমার স্ত্রী ও আমি প্রিয়বর মনোমোহনের বাসায় যাইয়া তাঁহাকে এ বাটীতে আনিয়া সাধ্যানুসারে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টায় আছি, আপনি তন্নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতা হইবেন না। আপনি পরম জ্ঞানবতী, সুতরাং ইহা কখনই আপনার নিকট অবিদিত নহে যে, এরূপ তীক্ষ্ণ শরস্বরূপ শোক এ সংসারে সর্বদাই মানবকুলের হৃদয় বিন্ধন করে। পিতৃচরণ দর্শনসুখ প্রিয়বর যে আর এই পৃথিবীতে করিতে পারিবেন না, ইহাতে তিনি নিতান্ত

* আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি যে এ হতভাগার বিষয়ে হস্তনিক্ষেপ করিয়া আপনি এক বিষম বিপদজালে পড়িয়াছেন। কিন্তু কি করি? আমার এমন আর একটি বন্ধু নাই যে, তাহার শরণ লইয়া আপনাকে মুক্ত করি। আপনি এখন অভিমন্যুর মতন মহাব্যূহ ভেদ করিয়া কৌরব দলে প্রবেশ করিয়াছেন, আমার এমন শক্তি নাই যে আপনাকে সাহায্য প্রদান করি। অতএব আপনাকে স্ববলে শত্রু-দলকে সংহার করি। বহির্গত হইতে হইবেক; এবং বাহিরে আসিয়া এ শরণাগত জনকে রক্ষা করিতে হইবেক। এ কথাটি যেন সর্বদা স্মরণ পথে থাকে।

ক্ষুণ্ণমান। এ দাসেরও আশালতা ছিন্ন হইল। ভাবিয়াছিলাম যে কৃতকার্য্য হইয়া দুই ভাই একত্রে দেশে ফিরিয়া যাইব এবং আমি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত নির্বাণ স্নেহাগ্নি পুনর্বার পদসেবা করিয়া প্রজ্জলিত করিব। কিন্তু এ আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল। এক্ষণে আপনি স্মরণপথে রাখিয়া আশীর্বাদ করিলে চরিতার্থ হইব। প্রিয়বর তার-পথে কলিকাতায় যে সংবাদ পাঠাইয়াছেন, তাহা বোধ করি পাইয়া থাকিবেন। তিনি এদেশ হইতে অতি ত্বরায় ফিরিয়া যাইবার চেষ্টায় আছেন। যতদিন এখানে থাকেন, তাঁহার মনের বেদনা লঘুতর করিতে কোন মতেই অমনোযোগী হইব না। নিবেদনমিতি,

আশীর্বাদাকাঙ্ক্ষী দাস মধুসূদন দত্ত"

চিঠি লেখার একটি শিষ্ট রীতি সকল সভ্য সমাজেই প্রচলিত আছে। কালে কালে তার রূপ বদলায় কিন্তু যে রূপেই হোক না কেন, তৎকালোচিত রীতি অলঙ্ঘনীয়। মাইকেল বন্ধুর মাকে চিঠি লিখতে গিয়েও সেদিনকার প্রচলিত শিষ্ট রীতির আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁর প্রযুক্ত বাগ্‌বিন্যাস ধারার মধ্য দিয়েই তা প্রকাশিত হয়েছে। শব্দ নির্বাচনে এবং অলংকারাদি প্রয়োগেও সেই পুরাতন ধারারই অনুবর্তন করেছেন। সেদিনকার পক্ষে সামাজিক শিষ্টতার যে অলিখিত বিধান ছিল এ চিঠিতে তা অনুসৃত হয়েছে কিন্তু যে সহজ স্বতঃস্ফূর্তি এ যুগে হলে প্রত্যাশা করতাম সেটার অভাব লক্ষ্য করছি। ভাষা কঠিন বলছি না, কিন্তু আজকের বন্ধু বন্ধুর মাকে যে ভাষায় প্রবোধ দেবেন এ ভাষার প্রকৃতি তার থেকে ভিন্ন। ক্রিয়া বা সর্বনাম পদগুলিকে সংক্ষিপ্ত করে চলিত রূপ দিলেও তাব পরিবর্তন হত না। 'সবুজপত্রে'র আগে পর্যন্ত আমরা দেখেছি—'করিয়াছে' 'করিতেছে' দিয়েই সকল গদ্য লেখা হয়েছে, তার কোনটা কঠিন কোনোটা সহজ, কারও ভঙ্গী আড়ষ্ট, কেউ বা সাবলীল, কারও চাল হালকা কারও বা গুরুগম্ভীর। লেখকের ব্যক্তিগত রুচি ও ক্ষমতার উপরে সেটা নির্ভরশীল।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত যে সহজ রচনা শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছি তাতে বলা হয়েছে ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ সাহিত্যের ক্ষেত্রে বর্জনীয়। সেগুলি কোন না কোন অঞ্চলের কথিত রূপ অর্থাৎ প্রাদেশিক রূপ, লিখিত ভাষায় চির-প্রচলিত নয়, অতএব অপ্রযোজ্য।

'রাজধানীর ভাষা' সম্পর্কে বঙ্কিমের বিধানে কিছুটা আধুনিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। বলেছেন—

> "অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা রাজধানীর ভাষাই সমধিক পরিচিত। অতএব রাজধানীর ভদ্রসমাজে যে ভাষা প্রচলিত, তাহা লিখিত রচনায় ব্যবহৃত হইতে পারে। কোন দেশে বলে 'ছাড়ি', কোন দেশে বলে 'নড়ি'। 'ছাড়ি' কলিকাতায়

ভদ্রসমাজে চলিত। উহা ব্যবহৃত হইতে পারে। 'লগি' 'লগা' চৈড়'—ইহার মধ্যে লগিই কলিকাতায় চলিত। উহাই ব্যবহৃত হইতে পারে। অপর দুইটি ব্যবহৃত হইতে পারে না।"

এখানেও দেখছি বঙ্কিমচন্দ্র 'ভাষা' কথাটি শব্দ অর্থেই ব্যবহার করেছেন। তাও আবার সকল শব্দ নয়, অন্তত ক্রিয়াপদ তো নয়ই। সে বিষয়ে নির্দেশ সুস্পষ্ট, "করিয়া" "করিতেছি" "করিব" "করিলাম" "করিতেছিলাম" লিখতেই হবে।

একটি জায়গায় তার ব্যতিক্রম হতে পারে। যেখানে মুখের কথাই শোনানো, সেখানে লেখক স্বাধীনতা গ্রহণ করতে পারেন। বঙ্কিমের বিধান—"নাটক ও উপন্যাস গ্রন্থে যে স্থানে কথোপকথন লিখিত হইতেছে সেখানে এই চারটি দোষ অর্থাৎ বর্ণাশুদ্ধি, সংক্ষিপ্ত, প্রাদেশিকতা ও গ্রাম্যতা থাকিলে দোষ ধরা যায় না। কেননা মৌখিক রচনা এ সকল নিয়মের অধীন নহে…কথোপকথন মৌখিক রচনা মাত্র"।

বঙ্কিমের এই সহজ রচনাশিক্ষার রচনাকাল আমাদের ঠিকমত জানা নেই। পরিষৎ সংস্করণ (যেখান থেকে আমি উদ্ধার করেছি)-এর পাঠ ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে গৃহীত। প্রথম সংস্করণ যখনই প্রকাশিত হোক তার ত্রিশ বছর আগে মাইকেলের নাটক লেখা আরম্ভ ও শেষ হয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে এই ত্রিশ বছরের মধ্যে সাহিত্যের ভাষানীতির মধ্যে বিশেষ কিছু পরিবর্তন ঘটেনি।

নেতিমূলক নীতিটি সর্বজন স্বীকৃত, এবং সেদিন পর্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে অনুসৃত।—ক্রিয়াপদ সংক্ষেপিত করা চলবে না। বঙ্কিম নাটক উপন্যাসের কথোপকথনে 'প্রাদেশিকতা' দোষ মার্জনীয় বলেও নিজে সে দোষ যথাসাধ্য পরিহার করেছেন। অর্থাৎ দোষটা তাঁর মতে দোষই। তবে কেউ যদি সে দোষ করে বসে তাকে তিনি ক্ষমা করতে অসম্মত হবেন না।

ইতিমূলক নীতিটি এই।—"রাজধানীর ভদ্রসমাজে যে ভাষা প্রচলিত তাহা লিখিত রচনায় ব্যবহৃত হইতে পারে।" বঙ্কিমের মুখে বঙ্গভাষার এই মৌলিক তত্ত্বটি উচ্চারিত হবার ত্রিশ বছর আগেই মাইকেল এ কথাটি উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই তত্ত্বের প্রথম সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ পরীক্ষায় সাহসী হয়েছিলেন। রাম-নারায়ণের রচনা তাঁর সম্মুখে ছিল। যে রচনা তিনি পড়েছিলেন। কিন্তু তার চেয়ে বেশি সুবিধা হয়েছিল, 'নাটকের সংলাপ তিনি শুনেছিলেন স্ব-কর্ণে। ক্রিয়াপদের অসঙ্গতি দৃষ্টি যদিও বা এড়িয়ে যায় শ্রুতিকে এড়াতে পারে না। তা ছাড়া মাইকেল মৌখিক বাংলা ভাষা থেকে যতই দূরে থাকুন তাঁর ভাষাবোধ এমন সূক্ষ্ম ছিল যে, চলিত ভাষার যে অসঙ্গতি অন্যের কানে ধরা পড়েনি সেটাই তাকে পীড়া দিয়েছিল। তাঁর সুফল আমরা পেলাম। যে চলিত

ভাষায় আজ সারা বঙ্গদেশ আপনাকে প্রকাশ করছে তার প্রথম পাণ্ডুলিপি রচিত হল তাঁরই হাতে। এমন বিচিত্র যোগাযোগের কথা ভাবলে বিস্ময় লাগে।

গদ্য ভাষার পথও তিনি স্ববলে 'খনন' করেছিলেন। নাটক লিখতে গিয়ে কোন্ চরিত্রের মুখে কি রকম রীতির ভাষা বসাতে হবে তা নিয়ে তাঁকে অবশ্যই চিন্তা করতে হয়েছিল। মুখের ভাষাই যে নাটকের পক্ষে উপযোগী এই বিষয়ে তাঁর মনে কোনো সংশয় ছিল না। কিন্তু মুখের ভাষাও তো হুবহু বসানো যায় না। মুখের ভাষাকে অবলম্বন করে তার বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর চরিত্রের উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন রীতির আদর্শ তৈরী করে নিতে হয়। রাজার ভাষা আর দৌবারিকের ভাষা একরকম হতে পারে না। এমন কি একই রাজার ভাষা দরবারে যেমন কথিত হবে অন্তঃপুরে তেমন হবে না। বামুন পণ্ডিতের যে রীতি বসবে, চোর-ডাকাত নিশ্চয়ই সেই রীতিতে বাক্যালাপ করবে না। মাইকেল যে সে বিষয়ে কতখানি অবহিত ছিলেন তা তাঁর নাটকগুলির দিকে দৃষ্টি দিলেই বোঝা যাবে।

ভিন্ন ভিন্ন নাটকে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় ভিন্ন ভিন্ন বাক্‌রীতি প্রযুক্ত হলেও সকল সংলাপেরই ক্রিয়াপদের গঠনে একটি নিয়ম লক্ষ্য করা যাবে। হানিফ গাজি, ফতেমা (বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ), সারজন, চৌকিদার, মুটিয়া (একেই কি বলে সভ্যতা?) প্রভৃতির ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা জাতের। হানিফ ফতেমার কথায় কেবল যে যশুরে আঞ্চলিকতা আছে তা নয়, একটা সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্যও প্রদর্শিত হয়েছে। ঠকচাচার (১৮৫৮) কথা এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে পড়বে। মাইকেল নিম্ন শ্রেণীর এই মুসলমান সমাজের কথায় ফারসী শব্দের (অশুদ্ধ ভাবে উচ্চারিত) বহুল ব্যবহার করেছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিই ঃ

হানিফ। (সরোষে) এমন গরুখোর হারামজাদা কি হেঁদুদের বিচে (মধ্যে) আর দুজন আছে? শালা রাইওৎ বেচারীগো জানে মারো, তাগোর সব লুটে নিয়ে তারপর এই করে। আচ্ছা দেখি এ কুম্পানির মুল্লুকে এনছাফ (বিচার) আছে কিনা। বেটা কাফেরকে আমি গরু খাওয়ায়ে তবে ছাড়বো। বেটার এত বড় মকদুর (দুঃসাহস)।

ফতেমা। আরে মিছে গোসা কর কেন? ঐ দেখ যে কুটনী মাগীকে মোর কাছে পেটুয়েছ্যাল সে ফের এই দিগে আসতেচে।

হানিফ। গস্তানীর মাথাটা ভাঙতি পাত্তাম, তা হলি গাটা ঠাণ্ডা হতো।

ফতেমা। চল মোরা একটু তফাতে দাঁড়াই, দেখি মাগী আস্যে কি করে।

হানিফ-ফতেমার সমাজ-সম্প্রদায় এবং শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য কেবল কথার দ্বারা যতটা পরিস্ফুট করা যায় তার চেষ্টা করা হয়েছে। এই শব্দগুলি লক্ষ্যণীয়।—

হেঁদুদের, বেচারীগো, মারো, তাগোর, লিয়ে, কুম্পানির, এনছাফ (স স্থানে ছ), খাওয়ায়ে, পেটায়েছ্যাল, আসতেছে, ভাঙতি, হলি, আস্যে।

সারজনের ইংরেজী মিশ্রিত হিন্দী ও চৌকিদারের নিজস্ব হিন্দী হাস্যরসের উদ্দেশ্যে রচিত। বাংলা গদ্যের প্রসঙ্গে তার নিদর্শন এখানে তোলা অনাবশ্যক ; কিন্তু হোটেলের বাক্সবহনকারী যে দুজন মুটিয়ার অবতারণা করা হয়েছে 'একেই কি বলে সভ্যতা'য়, তারা বাংলা গদ্যই বলে। তাদের ব্যবহৃত শব্দাবলী এবং উচ্চারণ প্রণালী প্রায় হানিফেরই মত, কারণ তারা হানিফ সম্প্রদায়েরই মানুষ। একটুখানি নমুনা দিই।—

"প্রথম মুটিয়া। ইঃ আজ যে কত চিজ পেটিয়েছে তার হিসাব নাই, মোর গরদানটা যেন বেঁকে যাচ্চে।

দ্বিতীয়। দেখ মামু, এই হেঁদু বেটাবাই দুনিয়াদারির মজা করে নেলে। বেটারগো কি আরামের দিন, ভাই।

প্রথম। মর বেকুফ্, ও হারামখোর বেটারগো কি আর দিন আছে ? ওরা না মানে আল্লা, না মানে দ্যেবতা।

দ্বিতীয়। লেকিন কেবল এই গরুখোরগো বেটারগো দৌলতেই মোগর পেটিবের এত ফেঁপে ওঠতেচে ; সাম হলেই বেটারা বাদুড়ের মাফিক ঝুঁকে ঝুঁকে আসে পড়ে ; আর কত যে খায় কত যে পিয়ে যায়, তা কে বলতি পারে ?"

খাঁটি কলকাতার ভাষার, যে নিদর্শন মধুসূদনের রচনায় দেখা যায়, ভাষা চর্চার দিক থেকে তার গুরুত্ব, প্রদর্শিত এই দৃষ্টান্তগুলির চেয়ে অনেক বেশি। কারণ সেগুলির একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। তিনি নিজে এবং তাঁর আশেপাশের মানুষ যে ভাষায় কথা বলত তার একটা স্থূল পরিচয় তাঁর মধ্যে থেকে পাই। সে পরিচয় প্রহসন দুটিতে যেমন পাওয়া যায় তেমন অন্য নাটকগুলিতে নয়। অন্য নাটকে গতানুগতিক নাট্যপ্রথাকে তিনি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে পারেন নি, তাই সর্বনাম ক্রিয়াপদের চলিত রূপ সত্ত্বেও তাদের ভাষা সর্বতোভাবে স্বাভাবিক হতে পারেনি। প্রহসনে সেটি সম্ভব হতে পেরেছে।

কালীনাথবাবু এবং নবকুমার বাবু ইংরেজী শিক্ষিত ভদ্রলোক, বড় বংশের সন্তান। মদ্য মাংস বারাঙ্গনাকে সংস্কারমুক্তির লক্ষণ বলে মনে করেন। পরস্পরের মধ্যে তাঁরা যখন কথোপকথন করেন তখন বাংলার সঙ্গে ইংরেজী বুকনির মেশাল হয়।—

"কালী। কি সর্বনাশ ! তবে এখন এর উপায় কি ?

নব। আর উপায় কি ? সভাটা দেখচি এবলিশ কত্তে হলো।

কালী। বাঃ তুমি পাগল হলে না কি? এমন সভা কি কেউ কখন এবলিশ করো থাকে? এত তুফানে নৌকা বাঁচিয়ে এনে ঘাটে এসে কি হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত? যখন আমাদের সবস্ক্রিপশন লিস্ট অতি পুয়র ছিল, তখন আমরা নিজে থেকে টাকা দিয়ে সভাটি সেভ করেছিলেম, এখন—

নব। আরে, ওসব কি আর আমি জানিনে যে তুমি আমাকে আবার নতুন করে বলতে এলে? তা আমি কি ভাই সাধ করে সভা উঠিয়ে দিতে চাচ্চ? কিন্তু করি কি? কর্ত্তা এখন কেমন হয়েছেন যে দশ মিনিট আমি যদি বাড়ী ছাড়া হই তা হলে তখনি তত্ত্ব করেন।'

কালীর মুখ দিয়ে কবি অপেক্ষাকৃত শিষ্টতর ভাষার নমুনা দেখিয়েছেন যখন কর্তার সঙ্গে তার আলাপ চলছে। কর্তার ভাষা সম্ভ্রান্ত সদ্বংশজ বর্ষীয়ান ধর্মানুরাগী ভদ্রলোকের কথা। কালীনাথকে তাঁর সঙ্গে সংলাপে নিরত করেছেন বলেই কবি তাঁর মুখে যথোপযোগী ভাষা বসিয়েছেন। আমরা যেমন সভাস্থলে একটু সংযত হয়ে বলি সেই রকম।

"কালী। জ্যেঠা মহাশয় আজ নবকুমার দাদাকে আমার সঙ্গে একবার যেতে আজ্ঞা করুন—

কর্তা। কেন বাপু তোমরা কোথায় যাবে?

কালী। আজ্ঞে আমাদের জ্ঞানতরঙ্গিনী নামে একটি সভা আছে, সেখানে আজ মিটীং হবে।

কর্ত্তা। কি সভা বললে বাপ?

কালী। আজ্ঞে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা।

কর্তা। সে সভায় কি হয়?

কালী। আজ্ঞে আমাদের কালেজে থকে কেবল ইংরেজী চর্চা হয়েছিল, তা আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিৎ জানা চাই, তাই এই সভাটি সংস্কৃত বিদ্যা আলোচনার জন্য সংস্থাপন করেছি। আমরা প্রতি শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্মশাস্ত্রের আন্দোলন করি।"

'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' তেও ভক্তপ্রসাদ বাচস্পতি এবং আনন্দর সংলাপে কলকাতার শিষ্ট ভাষার আদলটি ধরা হয়েছে। আবার এঁদেরই স্বগত উক্তির মধ্যে তাঁদের স্বরূপও কবি সুকৌশলে প্রকাশ করেছেন। বাচস্পতির স্বগত উক্তি বড় বেশি রকমের 'সংস্কৃতানুসারিণী'।—

"বাচস্পতি। (স্বগত) অনেক কাষ্ঠের দেখি আবশ্যক হবে, তা ঐ প্রাচীন তেঁতুল গাছটাই কাটা যাউক না কেন? আহা, বাল্যাবস্থায় যে ঐ বৃক্ষমূলে কত ক্রীড়া করেছি তা স্মরণপথারূঢ় হলে মনটা চঞ্চল হয়। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) দূর হোক ওসব কথা আব এখন ভাবলে কি হবে?"

আবার ভক্ত যে চরিত্রের মানুষ তার স্বগত উক্তির অশিষ্ট অশালীন শব্দ ও বাগ্‌বিশেষাবলীর প্রয়োগের মধ্যে কবি তা সুন্দর ভাবে দেখিয়েছেন।—

"ভক্ত। (স্বগত) এই তাজটা মাথায় দেওয়া ভালই হয়েছে। নেড়ে মাগীরা এই সকল ভালবাসে, আর এই একটা আরও উপকার হব্যে যে টিকিটা ঢাকা পড়েছে।······দেখি একটু আতর গায় দি। নেড়েরা আবালবৃদ্ধবণিতা আতরের খোসবু বড় পছন্দ করে, আর ছোট শিশিটাও টেঁকে করে সঙ্গে নে যাই। কি জানি যদি মাগীর গায়ে প্যাঁজের গন্ধ টন্ধ থাকে, না হয় একটু আতর মাখিয়ে তা দূরে করবো।"

আমরা প্রহসনের স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে একমাত্র ফতেমার উক্তির উল্লেখ করেছি। কোনো শিষ্ট চরিত্রের ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করিনি। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'-র মধ্যে যতগুলি স্ত্রীলোকের চরিত্র সন্নিবিষ্ট হয়েছে তারা কেউ উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় কয়েকটি গৃহস্থবাড়ীর অন্তঃপুরিকার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে 'গৃহিনী' ছাড়া বাকী সব কজনই নবীনা। মাইকেল তাসের আসরে তাদের সংলাপ শুনিয়েছেন ; এই সংলাপে সেকালের কলকাতার ভদ্রঘরের মেয়েদের বাগ্‌ভঙ্গী কেমন ছিল তার পরিচয় পাই। কবি বিস্ময়কর নৈপুণ্যের সঙ্গে সেটি নকল করেছেন ঃ—

"প্রসন্ন। এই নেও।

নৃত্য। কি খেল্‌লে ভাই ?

প্রসন্ন। চিড়িতনের দহলা।

নৃত্য। আরে মলো, চিড়িতন যে রঙ্, তুরুপ খেললি কেন ?

প্রসন্ন। তুই ভাই মিছে ব'কিস্ কেন ? হাতে রঙ না থাকলে পাশ দে যা।

নৃত্য। এই এসো আমি টেক্কা মারলেম।

হর। এই নেও।

নৃত্য। ও কি ও, পাস দিলে যে ?

হর। হাতে তুরুপ না থাকলে পাশ দেবো না ত কি করবো ?

নৃত্য। এস কমল, এবার ভাই তোমার খেলা।

কমলা। আমি ভাই বিবি দিলাম।

নৃত্য। মর্, ও যে আমাদের পিট, তুই বিবি দিলি কেন ?

কমলা। বাঃ বিবি দেবো না তো কি ? সায়েব কোথা ?

নৃত্য। এই যে সাহেব আমার হাঁতে রয়েছে—?

কমলা। আমি তো ভাই আর জান নই।

নৃত্য। মর্ ছুড়ি, খেলার ইসারায় বুঝতে পারিস নে ? তোর মতন বোকা মেয়ে তো আর দুই নাই লা, তুই যদি তাস না খেলতে পারিস তবে খেলতে আসিস কেন ?···একে কি কেউ খেলা বলে ? তুই আমার টেক্কার উপর বিবি

দিলি।

কমলা। কেন? বিবিটে ধরা গেলে বুঝি ভালো হতো?

হর। আর ভাই মিছে গোল করিস কেন?

নৃত্য। (কমলার প্রতি) কি আপোদ, যখন সাহেব আমার হাতে আছে তখন তোর আর ভয় কি?

কমলা। বস তুই পাগল হলি নাকি লো? তোর হাতে সাহেব তো আমি টের পাব কেমন করে লো?

আমরা একালে বাংলা বানানের সংস্কার প্রসঙ্গে কেউ কেউ ধ্বন্যাত্মক বানানের (Phonetic spelling) কথাও বলে থাকি। মাইকেল সেদিন যে বানান পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তাও কতকটা উচ্চারণানুগ ছিল। সাধারণ মানুষের মুখের কথার উচ্চারণকে তিনি আমাদের বর্ণমালার সাহায্যেই যতটা পারা যায় প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, এবং তাঁর সে চেষ্টা যে নিতান্ত ব্যর্থ হয়নি আজ তাঁর নাটকগুলি পড়তে গিয়ে সেটা বুঝতে পারি।

চলিত ভাষার বানান কি হবে সেটা তাঁকে নিজেই ভেবে ঠিক করতে হয়েছিল। কৌতূহলী পাঠক আজকের বানানের সঙ্গে তাঁর বানানের তুলনা করে দেখতে পারেন।

সংস্কৃত শব্দগুলি তিনি যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন? তার বানানে হাত দেননি। কিন্তু তেমন তেমন চরিত্রের সংলাপে সংস্কৃত শব্দ কতটা কম ব্যবহার করে কাজ চালানো যায় তারও নিদর্শন এই দুইটি কৌতুক নাট্যে যথেষ্ট আছে। তার দৃষ্টান্ত আগের উদ্ধৃতিতেই পাওয়া যাবে।

তদ্ভব, অর্ধতৎসম এবং বিদেশী শব্দের উচ্চারণ রক্ষার চেষ্টায় কবিকে যে বানান পদ্ধতি আশ্রয় করতে হয়েছিল স্বভাবতই সেটা সম্পূর্ণ সুনিয়ন্ত্রিত হয়নি। তার মধ্যে লেখকের দ্বিধা-সংশয়ের অবকাশ ছিল। তাঁর ক্রিয়াপদগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হবে। আমরা দেখতে পাব সংশয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাধানের চেষ্টাও ক্রিয়া করছে। আমরা ক্রিয়াপদগুলির রূপ বিশ্লেষণ করে সেদিনকার রাজধানীর উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের কয়েকটি সূত্র পাই।

ক্রিয়াপদের মধ্যে বা অন্তে- বিশেষ করে অন্তঃস্থিত মহাপ্রাণের লোপ প্রবণতা দেখা যায়।—'কাচ্চি কচি' কচ্যি' (<করিতেছি), কচ্চিস (<করিতেছিস), 'কচ্যেন, কচ্চেন (<করিতেছেন), আসচে (<আসিতেছে), দিচ্চি (<দিতেছি), 'হচো' (<হইতেছে) 'পাচ্চি পাচ্যি (<পারিতেছি), 'যাচো' (<যাইতেছে), বলছি (<বলিতেছি)। 'করেছিল করেছি করতেছিলেন, হয়েছি রয়েছে এসেছি দেখতেছিলেম প্রভৃতি স্থলে পদমধ্যবর্তী ছ-যুক্ত রূপ বজায় আছে। 'কাচ্চি" জাতীয় ক্রিয়াপদে ছ-এর স্থলে চ-এর ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের রচনায় অনেক দেখা যায়।

র্-কারান্ত ধাতুর সঙ্গে—ত,—ছ,—ল যুক্ত হলে র তার স্বাতন্ত্র্য হারাতে চায় এবং অনেক ক্ষেত্রেই যথাক্রমে ত, চ, এবং ল-য়ে পরিণত হয়। যেমন, 'কল্যোন' বিকল্পে

'করলেন', পাল্যেম (পার+লেম), কত্যে বিকল্পে 'করতে'। আমাদের বাগ্‌যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য আজও বিশেষ বদলায়নি। আমরা সচেতন ভাবে যখন উচ্চারণ না করি তখন 'করিতেছি'র চলিত রূপকে একালেও 'কচ্চি'ই বলি, অনেক সময় লিখেও থাকি।

সেদিনকার কলকাতার কথ্য ভাষায় কোনো কোনো অসমাপিকা ক্রিয়ায় অপিনিহিতির ফলে উদ্ভূত একটি অনতিশ্রুত ই-ধ্বনির আভাস পাওয়া যায়। যেমন, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।' 'দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া'র যে সংক্ষিপ্ত রূপটি কবি প্রকাশ করতে চেয়েছেন 'দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে' এই বানান দিয়ে সেটি ভালো করে বোঝানো যায় না। বেরুয়েচে (বাহির হইয়াছে), পাঠ্যে (পাঠাইয়া), লুক্যে (লুকাইয়া), হারুয়েচে (হারাইয়াছে)। উত্তর কলকাতার আঞ্চলিক ভাষার প্রাচীন প্রাচীনাদের মুখে এখনও সেদিনকার উচ্চারণের আভাস পাওয়া যাবে। আমরা যদি উল্লিখিত শব্দগুলির প্রত্যেকটির প্রথম অক্ষরের পর একটি করে ঈষদুচ্চারিত ই-ধ্বনি বসাতে পারি তাহলে সেদিনকার উচ্চারণের কাছাকাছি যেতে পারব। আজ সে ধ্বনি আমাদের চেনা নয় বলে অনেক কষ্ট করে বোঝাতে হচ্ছে। কিন্তু মাইকেলের পক্ষে কোনো অসুবিধা হয়নি। তিনি যে বানান প্রয়োগ করেছিলেন সেই বানান দেখে সেদিনকার পাঠকের পক্ষে কবির উদ্দিষ্ট উচ্চারণ বোঝা কঠিন ছিল না। সে উচ্চারণ পাঠকের পরিচিত ছিল। শ্যামবাজার অঞ্চলের পুরাতন অধিবাসী আমার এক বাল্য বন্ধুর মুখে পাইঠ্যে (পাঠাইয়া), হাইর্যে (হারাইয়া) একালেও শুনেছি।

বল্যে (বলিয়া), বল্যেন (বলিলেন), কল্যে (করিলে), আস্ত্যে আস্ত্যে (আসিতে আসিতে), হল্যেন (হইলেন) প্রভৃতি ক্রিয়াপদের য-ফলাগুলির একটি তাৎপর্য আছে। এ গুলি য-ফলা যুক্ত অক্ষরের পূর্বে ঈষদ্‌ধ্বনিত ই কারের সূচক। 'আস্ত্যে' কথাটি ধরে সেটি সহজে দেখানো যায়। আদিতম সাধুরূপ 'আসিতে'। বাংলার স্বাভাবিক নিয়মে প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ার ফলে 'সি'-এর ইকার লুপ্ত হল কিন্তু সে যেয়েও যায় না, অনেকদিন ধরে চললো টানাপোড়েন। সেই সময়টার চেহারা যদি বর্ণমালার সাহায্যে দেখাতে হয় তো সেটা হবে এই রকম—'আইস্তে'। ই-ধ্বনিটা যে ছিল সেটা বোঝা যায়। কিন্তু সেটা ছিল 'স'-এর পরে। এখন তার কায়া নেই, ছায়াটা আছে। কিন্তু সেটা পড়েছে স-এর আগে। মাইকেল স্‌-এ ত্‌-এ য-ফলা লাগিয়ে সেই ছায়াটিকে এনে দিয়েছেন। এই ই-কারের অপিনিহিত ধ্বনিটি দেখানোর জন্যে য ফলার ব্যবহার মধুসূদনের আগেই প্রবর্তিত হয়েছিল। পুরাতন সাহিত্যে তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। তাছাড়া রামনারায়ণও একই উদ্দেশ্যে য-ফলা ব্যবহার করেছিলেন। মধুসূদন সেই রীতিকে সমর্থন করলেন। ভূতপূর্ব ই-কারের এই ভৌতিক অবস্থান রাঢ়ী উচ্চারণ রীতির একটি বৈশিষ্ট্য, যার ফলে 'চাউল' 'চাইলে'র মধ্য দিয়ে 'চেল'-এ পরিণত হয়।...বীরভূমে যে 'ই'-র অপিনিহিত ধ্বনি আজও শোনা যায় সেকালের কলকাতায় সেই ধ্বনিটি বর্তমান ছিল। পুরাতন নাট্যকারদের বানানে পুরাতন কালের অনেক ধ্বনির ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। পুরাতন

সাহিত্যের অনেক নবীন সংস্করণ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হচ্ছে। কোনো কোনো সম্পাদক পুরাতন গ্রন্থের পুরাতন বানানকে নবাবিধানে সংশোধন করে দিচ্ছেন। তাঁদের প্রতি যুক্তকরে নিবেদন, তাঁরা সম্পাদন করুন, দয়া করে সংস্কার করবেন না।

য-ফলা সর্বত্রই যে আপনিহিত ই-র চিহ্ন তা নয়, দ্বিত্ব বোঝানোর জন্যেও মাইকেল ক্রিয়াপদে য-ফলা ব্যবহার করেছেন। 'কচ্চি'র বিকল্প 'কচ্যি' আছে। 'পাচ্চি পাচ্চে যাচ্চি যাচ্চে'র বিকল্পে 'পাচ্যি পাচ্যে যাচ্যি যাচ্যে' বানান ব্যবহৃত হয়েছে। 'বলুলেন বল্লেন বল্যেন' তিন রূপেই আছে।

ক্রিয়াপদের অতীতকালে উত্তম পুরুষে '—লেম' বিভক্তির প্রয়োগ '—লাম'-এর চেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে। '—তেম' সম্বন্ধেও বোধ হয় একই কথা বলা যায়।

'না' স্থলে 'নে'-র ব্যবহারও বিশেষ প্রচলিত ছিল। 'জানিনা' 'জানি নে' দুই রূপেই আছে। রবীন্দ্র-রচনায়—লেম,—তেম, -নে-র ব্যবহার অবিরল। রবীন্দ্রনাথ 'লুম'-ও ব্যবহার করেছেন, মাইকেলে '-লুম' দেখছি না।

'-ছ (ইতেছ),-ইত,-ইল,-ছিল,-ইব' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদের শেষাক্ষরের অ-কারের সংবৃত উচ্চারণ বোঝানোর জন্যে মাইকেল ও-কার ব্যবহার করেছেন বিকল্পে। হলো হতো বলুবো করুবো বলুতো কচ্যো (করিতেছ) উঠুলো পড়লো বকুচো বলুচো এলো প্রভৃতি ও-কারান্ত রূপ অবিরল, অবশ্য অকারান্ত রূপেরও অভাব নেই।

আদ্যক্ষর অকারের স্থলে ও-উচ্চারণ বোঝানোর জন্যে মাঝে মাঝে ও-কার ব্যবহার করেছেন যেমন, পোড়বে (পড়িবে)। স্বর সঙ্গতির বিধানে উ স্থানে ও যেখানে স্বভাবতই উচ্চারিত হয় সেখানে কবি প্রায়ই ও ব্যবহার করেছেন। যেমন,—ওঠো, ওঠে।

স্বরসঙ্গতির নিয়মে 'আজ্ঞা' বিকল্পে 'আজ্ঞে' হয়েছে। 'ইচ্ছা'র চলিত রূপ 'ইচ্ছে' পাওয়া যাচ্ছে। 'দিয়া'র থেকে 'দিয়ে' আরও সংক্ষেপিত হয়ে কোথাও কোথাও 'দে' হয়েছে। 'নিয়ে' এবং 'লয়ে' এই দুটি রূপ পাচ্ছি। ষষ্ঠীর রূপ দিয়ে কর্মকারক করা হয়েছে একেবারে একালের মত—"তাদেরকে আমি পিত্রাশ্রমে আনাব।" 'পিত্রাশ্রমে'র মত দুরুচ্চার্য শব্দের ব্যবহার হয়েছে যে বাক্যে সেই বাক্যেই 'তাদেরকে' এই অতিচালিত সর্বনাম শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। তার থেকে এই বোঝা যাচ্ছে কথ্য ভাষার মর্মস্থলে তিনি প্রবেশ করেছিলেন। কলকাতার ককুনি এবং স্ল্যাং সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান ছিল পুরোমাত্রায়, তাই শিষ্টজনের কথ্য ভাষায় কোনুটায় কতখানি রক্ষণ-বর্জন করতে হবে তার বিচার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। চলুতি ভাষার দেহটি শুধু নয়, প্রাণকেও তিনি স্পর্শ করেছিলেন—যা তাঁর পূর্বে আর কেউ পারেন নি।*

---

*লেখকের অনুমতিক্রমে 'চতুষ্কোণ', বৈশাখ, ১৩৮০ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।—সম্পাদক।

নবজাগৃতি ও মধুসূদন

মোবাশ্বের আলী

এক

উনিশ শতকের নবজাগৃতির মানসপুত্র মধুসূদন। মানবতার মন্ত্রে উজ্জীবিত ও সঞ্জীবিত হয়ে তিনি মনুষ্যজীবনের অপার মহিমা নিরীক্ষণ করেছেন। এ যেন কলম্বাসের মতোই নতুন বিশ্ব আবিষ্কার। ক্ষণস্থায়ী, নশ্বর মানব জীবনের এই মহিমা-কীর্তন বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে অচিন্ত্যনীয়, অভাবনীয়। সুতরাং নবজাগৃতির আলোকেই তাঁর কবি-কর্ম ও কবি-প্রতিভার পুনর্বিচার করতে হবে।

উনিশ শতকে ইংরেজী শিক্ষা ও শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার ফলে অকস্মাৎ বাঙালী জীবনে ঘটে প্রচণ্ড আলোড়ন ও অভূতপূর্ব চিত্তজাগরণ এবং এর ফল সুদূরপ্রসারী হয়। একেই রেনেসাঁস্ বা নবজাগৃতি বলে।

এই নবজাগৃতি বিধাতার পরম আশীর্বাদের ন্যায় বাঙালী জীবনে দেখা দিল। বহুকালের অন্ধকার অতিক্রম করে বাঙালী নতুন সূর্যের আলোয় স্নাত হ'ল, মধ্যযুগের তামসিকতাকে পরিহার করে আধুনিক মুক্তিবাদে দীক্ষিত হ'ল, আত্মার চাইতে দেহকে অধিকতর মর্যাদা দিল, মোক্ষলাভের চাইতে মুক্তিলাভকে শ্রেয় বলে ভাবল। সমষ্টির চাইতে ব্যষ্টি, সমাজের চাইতে ব্যক্তি অধিকতর মর্যাদা পেল। অন্ধ শাস্ত্রনিষ্ঠা অপেক্ষা মানব-কল্যাণের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল।

নবজাগৃতি বাঙালীর জাড্যদশা ঘুচিয়ে তাকে মনুষ্যত্বের সন্ধান দেয়, তার দুর্বল দেহে প্রাণের সাড়া জাগায়, মনের মধ্যে উৎসাহ জাগিয়ে তোলে, অস্তিত্বের প্রতি তাকে অনুসন্ধিৎসু করে তোলে। ফলে তার মধ্যে দুর্জয় প্রাণাবেগ ও প্রখর মুক্তিনিষ্ঠা দেখা দিল। তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় জাগল। সে দেখল জীবন আদৌ তুচ্ছ নয়, অবহেলার সামগ্রী নয় এবং জীবনোপভোগই যথার্থ পুরুষার্থ। সে নিজের শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন এবং নিজেকে ব্যক্ত করবার আগ্রহে ব্যাকুল হ'ল। রঘুনন্দনের শাস্ত্রবিধিকে সে আর প্রামাণ্য বলে মেনে নিল না। তার মধ্যে নতুনভাবে জানবার প্রবল আগ্রহ দেখা দিল; প্রচলিত সমাজবিধিকে উল্লংঘন করে অপরিমিত ভোগাকাংক্ষা উদ্দাম হয়ে উঠল। জীবন তার পক্ষে ভোগায়ত্ত বলেই জগৎ তার কাছে সুন্দর ও মনোহর রূপে প্রতিভাত হ'ল।

নবজাগৃতির মর্মবাণীকে কোন একটি সূত্রের মধ্যে নির্দেশ করতে চাইলে বলা

চলে, তা হ'ল যুক্তি মুক্তি ও ভুক্তি। য়ুরোপ থেকে নবাগত জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিচর্যার ফলে বাঙালীর বহুকালের মানসিক সুপ্তি ঘোচে। ফলে ধর্মীয় ও সামাজিক সকল প্রকার আইন-কানুন, আচার অনুষ্ঠানের নাগপাশ থেকে সে মুক্তি খোঁজে। তার এই মুক্তির সন্ধান চলে কোন এক বিদেহী বিধাতা থেকে দেহধারী মানুষের প্রতি এবং কল্পিত স্বর্গলোক থেকে প্রত্যক্ষ ধরার ধূলির প্রতি। মর্তের অতি তুচ্ছ মানুষ—যে মানুষ এতকাল শুধু আত্মবিলোপ করতে চেয়েছিল—স্বর্গের দেবতার চাইতে অনেক বড়, অনেক মহান হয়ে ওঠে। এবং জীবনকে অস্বীকার করে নয়, বরং স্বীকার ও গ্রহণ করেই সে জীবনের তাৎপর্য নির্ণয় করতে চায়। তাই তার মধ্যে দেখা দেয় জীবনের প্রতি প্রবল ভোগাসক্তি, কেননা ভোগই যথার্থ পুরুষার্থ। এবং এই ভোগাকাঙ্ক্ষার ফলেই জীবন তার কাছে হয়ে ওঠে তাৎপর্যপূর্ণ। সে আবিষ্কার করে জীবনের এক নতুন মহিমা। মানুষ তুচ্ছ বা ক্ষুদ্র নয়, দেবতার হাতে নিছক ক্রীড়নক নয়। তার মধ্যে নিহিত রয়েছে অমিত শক্তি, অপার বীর্য এবং স্বীয় শক্তি ও বীর্যবলে সে সমস্ত জগতে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। সে শুধু জগতের কেন্দ্র-মূলে নয়, সমস্ত জগৎ তার হাতের মুঠোয়।

নবজাগৃতি মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় জাগিয়েছে, তাকে দিয়েছে আত্মমর্যাদা। ফলে জীবন হয়ে উঠেছে ধন্য।

নবজাগৃতির ফলে ব্যক্তির প্রাতিস্বিক মূল্য স্বীকৃত হয়েছে বলেই জীবন অসীম মহিমা নিয়ে দেখা দিয়েছে। এবং কোন এক অলীক স্বর্গ অপেক্ষা মাটির পৃথিবীই অধিকতর সৌন্দর্য নিয়ে আবেদন জানিয়েছে।

দুই

নবজাগৃতির ফলে বাঙালীর যে চিত্তজাগরণ ঘটে তা প্রথমে রামমোহনের মধ্যে স্ফুরিত হয়। তিনিই নবজাগৃতির প্রথম দ্রষ্টা।

তিনি নবজাগৃতির আলোকে আলোকিত হন বলেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী একান্তভাবে জীবনমুখী—গতানুগতিক বাঙালীদের মতো জীবন-বিমুখ নয়। এজন্য তিনি ত্যাগ নয়, ভোগকে শ্রেয় বলে মনে করেছেন এবং এও তিনি জেনেছেন, দেহ ব্যতিরেকে ভোগ করা কখনও সম্ভব নয়। অথচ এ দেহকে—দেহগত কামনা, বাসনা, চাঞ্চল্য, বেদনা ও বিক্ষোভকে—কতকাল ধরে বাঙালী পুণ্য ও পরিত্রাণের খাতিরে কত ভাবেই না নির্যাতন ও অস্বীকার করেছে। কিন্তু য়ুরোপ থেকে নবাগত মানববাদ একান্তভাবে দেহগত ও দেহসর্বস্ব। দেহের বেদীমূলে এর যত সাধনা ও আরাধনা। দেহ সাধনপীঠ বলে মনুষ্যত্বের আশ্চর্য বিকাশ ও প্রকাশ সম্ভব। নবাগত দেহাশ্রয়ী মানববাদ দ্বারা রামমোহন উজ্জীবিত হন। তিনি দেহধারী বলে আদৌ বিব্রত বা

সংকুচিত বোধ করেন নি, বরং দেহকে বিধাতার মন্দির বলে মনে করেছেন। এ নশ্বর দেহকে যতখানি সম্ভব ভোগের সামগ্রী করে তোলার তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াস দেখা যায়। 'ভোগ' কথাটি শুচিবায়ুগ্রস্ত বাঙালীদের কাছে আদৌ হৃদ্য নয়। ভোগ বলতে তারা ইন্দ্রিয়গত অসংযম, অমিতাচারিতা, উচ্ছৃংখলতা ও উন্মার্গগামিতা বলেই বোঝে। কিন্তু 'ভোগ' কথাটির যথার্থ তাৎপর্য অসংযম নয়। জীবনাকাঙ্ক্ষার অপর নামকেই ভোগ বলা যেতে পারে। যার জীবনাকাঙ্ক্ষা তীব্র, তার পক্ষেই ভোগস্পৃহা জাগা সম্ভব। এ অর্থে রবীন্দ্রনাথও একান্ত ভোগবাদী এবং রামমোহনের যথার্থ উত্তর সাধক।

জীবন-রস-রসিক রামমোহনের মধ্যে একদিকে যেমন ভুক্তি অপরদিকে তেমনি যুক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যুক্তিধর্মিতা তাঁর চরিত্রের অপর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই যুক্তি ধর্মিতাই তাঁকে অত্যন্ত জ্ঞানস্পৃহ করে তোলে এবং এজন্য তাঁর মধ্যে আশ্চর্য রকম কৌতূহল, বিচারবুদ্ধি ও অনুসন্ধিৎসা লক্ষ্য করা যায়। গতানুগতিক ধর্মকে তাঁর যুক্তিবাদী মন অন্ধভাবে মেনে নিতে পারে নি। তাই তিনি নানা ধর্মশাস্ত্র গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেন। বিভিন্ন ধর্মমতের তুলনামূলক আলোচনা করে তিনি হিন্দুধর্মের সংস্কার সাধন করার মানসে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি যে নানা ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করে নতুন ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা করেন, এতেই তাঁর প্রখর যুক্তিবাদী ও নৈয়ায়িক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুক্তিধর্মিতার জন্যই তাঁকে নতুন যুগের সারথি বলে অভিহিত করা যায়। অষ্টাদশ শতকের য়ুরোপকেAge of Reason বলা হয়। রামমোহনের মধ্যে উনিশ শতকের বাংলাদেশে তাই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে।

তিন

নবজাগৃতির অন্যতম দিশারী ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষক। তিনি ড্রমণ্ডের ছাত্র এবং ড্রমণ্ডের কাছ থেকে ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা ও মুক্তবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। তরুণ বয়সে কাণ্টের দর্শনের সমালোচনা করে তিনি আশ্চর্য পাণ্ডিত্য ও স্বাধীন চিন্তাশক্তির পরিচয় দেন।

যুক্তিবাদী ডিরোজিও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সকল প্রকার সামাজিক আচার বিচারের নাগপাশ হতে মুক্ত হয়ে স্বাধীন স্বতন্ত্র ও স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে উজ্জীবিত করে তোলেন। এরূপ যুক্তিপ্রবণতার ফলে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম ও সমাজবোধের প্রতি সংশয়ের ভাব জাগে এবং নানাবিধ ধর্মীয় ও সামাজিক আচার বিচারকে—যা বহুকাল ধরে প্রচলিত হবার ফলে প্রাণহীন অন্ধ প্রথায় পর্যবসিত হয়েছে এবং ফলে জীবনকে মুক্ত না করে শৃংখলিত করে মাত্র—বর্জন করার

প্রচেষ্টা প্রবলভাবে দেখা যায়। রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী" রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার প্রমুখ ডিরোজিওর ভাব-শিষ্য। এঁরা ইয়ং বেঙ্গল বলে পরিচিত।

যুগধর্মবশত ইয়ং বেঙ্গলের প্রগতিশীল আন্দোলন প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নি। তাই কূপমণ্ডূক সমাজ ইয়ং বেঙ্গলের উদ্গাতা ডিরোজিওর প্রতি খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে। এবং ছাত্রদের নাস্তিক্যবুদ্ধি ও নীতিহীনতায় দীক্ষিত করার অভিযোগে তাঁকে হিন্দু কলেজ থেকে অপসারিত করা হয় (১৮৩১)।*

অতি অল্পকালের মধ্যে ডিরোজিও এদেশের শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে চিন্তায় ও কর্মে যে ব্যক্তিস্বাধীনতার বাণী স্ফুরিত করেছেন এবং শিষ্যরা যে তাঁর চিন্তাধারাকে রূপায়িত করতে চেয়েছেন, এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের যথার্থ-মূল্য। ইয়ং বেঙ্গলের ব্যক্তিচেতনা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ উনিশ শতকের নবজাগৃতির ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট অধ্যায় সূচনা করেছে।

চার

কিন্তু ইয়ং বেঙ্গলের মধ্যে যে ব্যক্তি-চেতনার বিকাশ ঘটে তা খণ্ডিত ও দ্বিধাগ্রস্ত এবং বিদ্যাসাগরের মধ্যেই তা প্রথম পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে। ব্যক্তির রূপায়ণ দু'ভাবে হতে পারে—একটি ব্যক্তিত্বে (Personality), অপরটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে (Individuality)। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মানুষকে অহং-সর্বস্ব করে তোলে। ফলে সে হয়ে ওঠে আত্মভাবপ্রধান এবং একই কারণে বৃহত্তর কল্যাণসাধন থেকে হয় বঞ্চিত, বিচ্যুত। কিন্তু ব্যক্তিত্ব মানুষকে নিজের প্রতি প্রত্যয়ী করে তোলে বলেই তার মধ্যে মানবীয় মহৎ বৃত্তির বিকাশ ঘটে এবং সে নিজের সীমিত গণ্ডী হ'তে নিজেকে প্রসারিত করে বৃহত্তর জীবনে। ইয়ং বেঙ্গলরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, কিন্তু বিদ্যাসাগরের মধ্যে ব্যক্তিত্বের লক্ষণ সুপরিস্ফুট।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মানুষকে উন্মার্গগামী ক'রে তোলে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের প্রসার ঘটে বিশ্বে। তাই ইয়ং বেঙ্গলরা একটি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমিত রয়েছে, বৃহত্তর কোন মানবিক কল্যাণে—বৈঠকী আলাপ আলোচনা এবং সংবাদপত্রে লেখনী ধারণ ও জনমত সংগঠন ব্যতীত নিজেদের নিয়োজিত করতে সমর্থ হননি। কিন্তু ব্যক্তিত্বশীল বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গী হয়ে উঠেছে একান্তভাবে মানবমুখী।

এই মানবমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে মানুষই হয়ে উঠেছে তাঁর সকল সাধনা ও

* নবজাগৃতির আবাহক মধুসূদনকেও ইতিপূর্বে প্রায় অনুরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত করা হ'লে তাঁকে কলেজ কমিটি হ'তে সরে দাঁড়াতে হয়। অথচ তিনিই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা।

আরাধনার বিষয়। তাঁর সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ও কর্মকাণ্ডের মূলে রয়েছে মানুষ—যে মানুষ বাঁচে ও বাঁচার জন্যে সংগ্রাম করে।

তিনি নিঃসীম করুণা নিয়ে মানুষের দুঃখ, বেদনা, হতাশা ও পীড়নকে অনুভব করেছেন। বহুকালের সামাজিক কুসংস্কারের ফলে মানুষের যে নির্যাতন, তা তাঁর কাছে অভ্রভেদী রূপ নিয়ে দেখা দেয়। ফলে মানুষের দুঃখমোচনের দুশ্চর তপস্যাতেই তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন।

তাঁর বিধবা-বিবাহ আন্দোলন, বহু-বিবাহ-নিরোধ, নারী-শিক্ষা-আন্দোলন, বাল্য-বিবাহ-নিরোধ প্রভৃতি সামাজিকে সংস্কারের মূলে মানব কল্যাণের মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত। তাঁর দৃষ্টিতে মানুষ অভ্রভেদী মহিমা নিয়ে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে। তিনি শুধু মানুষের কল্যাণ কামনা করেছেন বলে নয়, যে মানুষ এতকাল ধরে সমাজে লাঞ্ছিত, নির্যাতীত, নিপীড়িত সেই মানুষ তাঁর কাছে অপরিসীম মহিমা লাভ করেছে বলেই তাঁকে সত্যিকারের মানববাদী বলা যায়।

পাঁচ

যে নবজাগৃতি-প্রভাবে বিদ্যাসাগর মানব-কল্যাণের পথে নিয়োজিত হলেন, সে ভাবপ্রেরণাই মধুসূদনকে মানব জীবনের এক নবতর মহিমা উপলব্ধিতে উদ্দীপ্ত করে। হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং ডিরোজিওর ভাব-শিষ্য মধুসূদন 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'তে আলোকিত হয়ে জীবনের এক আশ্চর্য মহিমা উপলব্ধি করেছেন। এতকাল বাঙালী বিশাল বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একান্ত ঘরের কোণে খড়ির গণ্ডী এঁকে চক্ষু মুদে কোনমতে দিন যাপন করেছে মাত্র। জীবনে যত দুঃখ-বেদনা আঘাত-অবমাননা নীরবে নিঃশব্দে সহ্য করেছে। কেননা ইষ্টদেবতা যদি ভাগ্যে লিখে থাকেন তবে আর কি? কিন্তু নবজাগৃতির ফলে বাঙালীর মানসলোক সঞ্জীবিত ও সচকিত হয়ে ওঠে। নবাগত যুক্তিবাদ তাকে ধর্মভীরুতা থেকে মুক্ত করে, তার সামাজিক আচার-বিচারের নাগপাশ ঘুচায়। তাই মধুসূদন ধর্ম ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নতুনভাবে জগৎ ও জীবনকে অবলোকন করবার দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেন। শুধু তাই নয়, মানববাদ তাঁর নিকট জীবনের এক নবতর তাৎপর্য নিয়ে দেখা দেয়। মানবজীবনের অপার মহিমা নতুনভাবে অনুভূত হ'ল।

মানবজীবন অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী। যে মুহূর্তে আমরা জন্মলাভ করি, সে মুহূর্তে সর্বনাশা মৃত্যুর সংকেতধ্বনি বেজে ওঠে। তাই মানবজীবনে দেবতার অমরতা নেই। তবু জীবন এত ক্ষণস্থায়ী বলেই এমন মধুর ও মহিমময়। এই নশ্বর জীবনেই আমরা দেবতার অমর মহিমা লাভ করতে পারি। জীবনের চারদিকে ছড়ানো আছে ভোগের আয়োজন, বিলাসের উপকরণ ও ঐশ্বর্যের আড়ম্বর। শুধু

যদি আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হওয়া যায়, আমাদের মধ্যে যদি আত্মপ্রত্যয় জাগে, তবেই জীবনের সকল ঐশ্বর্য আমরা লুণ্ঠন করে নিতে পারব। অন্ধ ধর্মবোধ নয়, শুধু আত্মশক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনোপভোগের আকাঙ্ক্ষা করলে দেখা দেবে জীবনের অপার, অসীম মহিমা। তবে জীবন হবে সত্য, সুন্দর ও সার্থক।

নবজাগতির এই বাণী মধুসূদনের সমগ্র অন্তরচৈতন্য মথিত করে কাব্যরূপ লাভ করে। 'মেঘনাদবধ কাব্য' শুধু তাঁর অন্তরচৈতন্য মথিত করে প্রকাশিত হয় নি, উনিশ শতকের নবজাগ্রত জীবন-চেতনার পরিচয়ও এর মধ্যে বিধৃত। যুগের আশা আকাঙ্ক্ষা, উল্লাস-অবসাদ, স্বপ্ন-সাধ, কামনা-বাসনা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংঘাত-সংঘর্ষ, ব্যর্থতা-বিক্ষোভ, চাঞ্চল্য, চিত্তচমৎকারিত্ব এর মধ্যে ধরা পড়েছে।

উনিশ শতকের নবজাগ্রত জীবন-চেতনার প্রতীক রাবণ। রাবণের মধ্যে নবাগত মানবতা রূপায়িত করতে গিয়ে কবি তাকে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের মর্যাদা দিয়েছেন। মধুসূদনের দৃষ্টিতে পাপাচারী রাবণও মনুষ্যত্বের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

রাবণ প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বশালী এবং পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তার ব্যক্তিত্ব বিচিত্র ও বহুমুখী। সে শত পুত্রের পিতা, স্বর্ণলংকার অধীশ্বর, মস্ত বড় যোদ্ধা। এরূপ পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বশালী চরিত্র ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে অচিন্ত্যনীয়, অভাবনীয়; কেননা ব্যক্তিত্বের কোন ধারণাই তখনও গড়ে ওঠেনি।

রাবণ ব্যক্তিত্বশালী বলেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছে। তার মধ্যে দেখা দিয়েছে আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রসারের প্রবল তাগিদ। তাই মৃত্যু নয়, জীবনই তার কাম্য এবং এই জীবনে বেঁচে থেকেই সে জীবনের সকল দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছে। সম্রাট রাবণ শত পুত্রশোকের জ্বালা অন্তরে ধারণ করেও স্বীয় কর্তব্যকর্মে নিয়োজিত রয়েছে এবং শত্রুর কবল থেকে লংকাপুরী ও লংকাপুরবাসীকে রক্ষার গুরুদায়িত্বভার বহন করেছে।

পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনেও শেষ অবধি সে স্বীয় শক্তিবলে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত হয়েছে। এবং বীর পুত্র মেঘনাদের মৃত্যুতে শুধু করুণায় বিগলিত হয়নি, বরং রুদ্রমূর্তি ধারণ করে শত্রুসেনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পুত্রহন্তাকে বধ করে সে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ এবং হৃদয়ের সকল জ্বালা প্রশমিত করতে চেয়েছে।

রাবণ মহাবিদ্রোহী। তার ঔদ্ধত্য নভস্পর্শী। সমস্ত বিশ্ববিধানকে সে ভ্রূকুটি হেনেছে। ফলে বিশ্ববিধান তাকে সমুচিত শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েছে। কিন্তু সে কোনক্রমেই পারবশ্য স্বীকার করবে না। সে ধ্বংস হয়ে যাবে, তবু হার মানবে না। এই বিদ্রোহী আত্মা প্রমিথিয়ুসের মতো অপরাজেয় গৌরবে বিরাজ করতে থাকে। এই মুক্ত আত্মার কাহিনী আমাদের কাছে জীবনের অপার মহিমাই বহন করে নিয়ে আসে।

রাবণের আত্মা পরাজয় সত্ত্বেও অপরাজেয় গৌরবে বিরাজমান। রাবণ আমাদের

এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, মানুষ ধ্বংস হতে পারে, কিন্তু পারবশ্য স্বীকার করতে পারে না। মানবাত্মা অবিনশ্বর—মধুসূদনের 'মেঘনাদবধকাব্য' আমাদের কাছে এই পরম আশ্বাসবাণী বহন করে নিয়ে আসে।

ছয়

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে' সর্বপ্রথম মানববাদের জয় ঘোষণা করা হয়েছে। এ কাব্যে দেখা যায় মধুসূদন মৃত্যুর চাইতে জীবনকে, জরার চাইতে যৌবনকে, দৈবশক্তির চাইতে মানবীয় শক্তিকে, মোক্ষলাভের চাইতে মুক্তিপিপাসাকে বড় করে তুলে ধরেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সংক্ষিপ্ত এই কয়টি দিন মহাকালের তুলনায় অতিমাত্রায় সামান্য। অন্ধকার থেকে তা উদ্ভূত হয়ে অন্ধকারেই লীন হয়ে যায়। অন্ধকারে আবৃত ক্ষণস্থায়ী জীবনে নিষ্ঠুর নিয়তি মুখ ব্যাদান করে আছে। তাই জীবনে এত বিপত্তি, এত বিপর্যয়। তবু এ জীবনেই আমরা—আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাস বলে—দেবতার অমর মহিমা লাভ করতে পারি এবং ধূলির ধরণীকে ইন্দ্রের অমরাবতীতে রূপায়িত করতে পারি।

মধুসূদন যে অপার বিস্ময় নিয়ে মনুষ্য জীবনে দুর্ধর্ষ শক্তিমদমত্তা নিরীক্ষণ করেছেন ও দুর্বার মুক্তিস্পৃহা অনুভব করেছেন, এর ফলে মনুষ্যজীবন অভ্রভেদী মহিমা লাভ করেছে। এজন্যেই তিনি নবজাগৃতির প্রথম ও সার্থক কবি।

মানবতার প্রতি মধুসূদনের এই যে দৃপ্ত বিশ্বাস ও সুগভীর প্রত্যয়, এদিক দিয়ে তিনি রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের যথার্থ উত্তরসূরী। এই মানববাদকে ইতিপূর্বে যুক্তিবাদী রামমোহন ধর্মীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা করেন, সমাজসেবক বিদ্যাসাগর সমাজস্থিতির মধ্যে বাস্তব রূপ দেবার প্রয়াস পান। রামমোহনের নিকট যা জ্ঞান ও যুক্তির বিষয়, বিদ্যাসাগরের নিকট তাই হয়ে ওঠে কর্মমন্ত্র এবং মধুসূদন তাকেই কাব্যের উপজীব্যরূপে লাভ করেন। এজন্য রামমোহনে বিশুদ্ধ যুক্তিনিষ্ঠা, বিদ্যাসাগরে প্রীতি ও সেবা এবং মধুসূদনের মধ্যে প্রাণের অকারণ, অবারণ উল্লাস দেখা যায়।

উনিশ শতকের বাঙলাদেশে জীবনের নানা ক্ষেত্রে—ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি—নবজাগৃতি মূর্ত হয়ে ওঠে। এবং নবজাগৃতির ফলশ্রুতি যে মানবতা, একথা অবশ্যস্বীকার্য। এই মানবতার প্রেরণাই রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্মে, ডেভিড হেয়ারের শিক্ষাদানে, ডিরোজিওর তত্ত্বালোচনায়, রিচার্ডসনের সেক্সপীয়ার চর্চায়, বিদ্যাসাগরের সমাজ সেবায়, অক্ষয় দত্তের জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনায়, রামগোপাল ঘোষের রাজনীতি চর্চায়, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু ও মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্য রচনায়, কেশব সেন ও বিবেকানন্দের ধর্মান্দোলনের মূলে সক্রিয় রয়েছে এবং

বাঙালী জীবনকে বিচিত্রভাবে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তুলেছে।

এই নবজাগৃতির ফলে বাঙালীর কূপমণ্ডুকতার গণ্ডী অতিক্রম করে বিপুল বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছে এবং তার সেই বিশ্বের কেন্দ্রমূলে বিরাজমান হল মানুষ—যে মানুষ স্বীয় শক্তিবলে সমস্ত বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে এবং বিরূপ ভাগ্যকে ভ্রূকুটি হানাতে পারে। মানুষের প্রতি এই যে অভ্রান্ত বিশ্বাস এবং অপরিসীম মর্যাদা, এই তো নবজাগৃতির শ্রেষ্ঠ ফসল।

মধুসূদনের সাহিত্যসাধনা তথা জীবনভাবনা নবজাগৃতির এই অপরাজেয় মানবতামন্ত্রে সঞ্জীবিত।

মধুসূদন ও যুগচেতনা

সীতাংশু মৈত্র

ভারতীয় প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রে সাহিত্যবিচারে যুগচেতনার কোন আলোচনা করার বিধি ছিল না। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের প্রারম্ভে সূত্রধার বলেছেন, 'আ পরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানম্।' বিদ্বান শব্দের অর্থ প্রকৃত রসজ্ঞ ব্যক্তি। রস কি এবং প্রকৃত রসজ্ঞ ব্যক্তি বলতে কাকে বোঝায় তা অলংকার শাস্ত্রের বিভিন্ন প্রস্থানে ব্যাখ্যাত হয়েছে। লৌকিক 'ভাব' কি প্রকারে রসে রূপান্তরিত হয় তাও, এই বিষয়ে প্রাচীনতম গ্রন্থ ভরতের নাট্যশাস্ত্রে, সূত্রাকারে নির্দেশ করা হয়েছে এবং অভিনব গুপ্ত তাঁর অভিনবভারতী নামক টীকাগ্রন্থে সেই সূত্রের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অন্যান্য আলংকারিকেরাও করেছেন। কিন্তু কোথাও স্রষ্টার যুগচেতনার কথা নিয়ে আলোচনা নেই। এমন কি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবেও নেই। পাশ্চাত্যেও ঊনিশ শতকের মধ্যভাগের পরে এই Zeitgeist আর স্রষ্টাকে নিয়ে আলোচনা শুরু হয় যদিও স্রষ্টারা এ সম্পর্কে প্রায়ই সচেতন ছিলেন ঃ স্বয়ং শেক্সপীয়রের হ্যামলেট নাটকে হ্যামলেট বলেছেন Polonius কে নট এবং নাটক সম্পর্কে ঃ "Do you hear, let them be well used, for they are the abstract and brief chronicles of the time ; after your death you were better have a bad epitaph than their ill report while you live". "অন্য স্রষ্টাদেরও এই সম্পর্কে অনুরূপ মতামত উদ্ধৃত করা যায়। কিন্তু যেমন আমাদের প্রাচীন আলংকারিকদের সাহিত্য-আলোচনায় এই জিনিস নেই, তেমনি সেই প্রাচীন গ্রীক আলংকারিকদের মধ্যেও। প্লেটোকে এই হিসাব থেকে বাদ দেওয়াই ভালো, কারণ তিনি মূলত দার্শনিক এবং শিল্প সাহিত্যের আলোচনা তিনি করেছেন আদর্শ রাষ্ট্রনায়কদের শিক্ষাপ্রসংগে। তাঁর ছাত্র, মূলত দার্শনিক হয়েও, শিল্প-সাহিত্যের আলোচনা করেছেন অন্য কোনো সূত্রে নয়, শিল্প -সাহিত্যের স্বকীয় স্বতন্ত্র মূল্য আছে ব'লেই। তিনি Aristotle। তিনিও কিন্তু ভাব ও রসের আলোচনাই করেছেন। কোন ক্ষেত্রেই যুগ-চেতনার আলোচনা করেন নি।

স্রষ্টা এবং সমালোচক—দুজনের ক্ষেত্রেই যুগচেতনা অপরিহার্য। (আবার পাঠকের পক্ষেও)। সমালোচকের ক্ষেত্রে যুগের বাতাবরণ সচেতনেও থাকতে পারে, অচেতনেও থাকতে পারে—প্রভাব, তিনি কেন, কেউই এড়াতে পারেন না। কিন্তু

স্রষ্টার ক্ষেত্রে এই যুগপ্রভাব অচেতনে থাকাই বোধহয় বাঞ্ছনীয়, কেন না সচেতনে থাকলে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিপ্রেরণা ব্যাহত হবার সম্ভাবনা। সব সময় 'সমাজজীবনের ঠিক রূপটি ধরে দিচ্ছি কি না' এই চিন্তায় মন ব্যাপৃত থাকায়, যে ভাবটি রূপ ধরতে চাইছে সেটি খণ্ডিত হয়, হাতছাড়া হয়ে যায়। অবশ্য এখানে তর্কের অবকাশ আছে। যাঁরা চেতনাকে পুরোপুরি যুগের দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে করেন তাঁদের পক্ষে এই সমস্যাটি নেই। তাঁরাই কিন্তু আবার অনেক ক্ষেত্রে অসন্তুষ্ট হয়ে মত প্রকাশ করেন যে অমুকের লেখায় যুগ-সত্যটি ধরা পড়ে নি। এই যুগ-সত্য বা spirit of the Age ব্যাপারটাই খুব গোলমেলে, কেন না প্রত্যেক সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক পৃথক। এই সম্পর্কে একদিকে environmentalism অথবা marxism, অন্যদিকে স্রষ্টার চেতনার স্বয়ম্ভরতা—এই দুই মতের দ্বন্দ্ব। Toynbee-র কথা এই প্রসঙ্গে শ্রোতব্য ঃ

"My study of history would be incomplete if, after having surveyed the process of history, I failed to ask myself what history is and how an account of it comes to be written I do not think that history in the objective sense of the word, is a succession of facts (as Aristotle thought mine). Historians, like all human observers, have to make reality comprehensible and this involves them in continuous judgments about what is true and what is significant. This requires classification, and the study of the facts has to be synoptic and comparative. Since the succession of facts flows in a number of simultaneous streams. Historians who accept the full implications of their task are in danger of erecting determinative explanations but I do not think that this need be so. I believe that human beings are free to make choices within the limitations of their human capacity. I also believe that history shows us how men may born to make choices that are not only free but effective by learning to acheive harmony with a *supra-human reality* that makes itself felt although it is impalpable. A curiosity to explain and understand the world is the stimulus that has exerted men to study their past, so I conclude by looking at same of the impulses that have moved individual historians to embark on their work of discovery and explanation. (*A Study of History*, part XI, preanble ঃ Toynbee)

Determinism-এর দিকে গেলে আর সৃষ্টির কথা বা স্রষ্টার স্বাধীনতার কথা বলাই চলে না ; আবার অপরপক্ষে *supra human* reality-র সঙ্গে দুর্নিরীক্ষ্য সামঞ্জস্যের ব্যাপারটাও তথাকথিত জড়বাদী স্বীকার করবেন না। কিন্তু মজাটা হচ্ছে এই যে,

সৃষ্টি যে করে সে জড় নয়, সে চেতন। তাই তার পক্ষে ঐ দুর্নিরীক্ষ সংযোগ অনুভবে আসা মোটেই বিচিত্র নয়; আর যিনি জড়বাদী তিনিও যখন এখনও পর্যন্ত জড় থেকে চৈতন্যের আবির্ভাব প্রমাণ করতে পারেন নি, এমন কি চেতনা কি তারই সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারেন নি, তখন যুগপরিবেশ দিয়ে এত ভাবতে গিয়ে তাঁরও তো একথা মনে হওয়া উচিত যে, এই যুগ-বাতাবরণও কোন জড় পদার্থ নয়, শুধু পরিবেশ নয়, শুধু socio-economic forces নয়—সৌট মানব জাতির সমগ্র ঐতিহ্য যা মানুষের চেতনাতেই ধৃত হয়ে আছে। কোন সময়ে পরিবেশের কোন একটি বৈশিষ্ট্য মনে বেশী উদ্দীপনা জাগায়। কোন সময়ে বা আর একটি। কিন্তু সেইটিকে দিয়ে সমগ্র শিল্পসৃষ্টি বা তার একাংশেরও উৎসের ব্যাখ্যা করা যায় না। আবার একই যুগের স্রষ্টারা বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত হতে পারেন। মধুসূদন দত্তের যুগেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বপ্নপ্রয়াণ লিখেছিলেন; একই যুগে William Morris লিখেছেন *News from Nowhere* এবং Oscar Wilde লিখছেন *Picture of Dorian Grey* এবং Ruskin লিখেছেন *Unto This Last*। ভিক্টোরীয় যুগে যিনি সামাজিক সত্য বা পরিবেশগত সত্যকে অতি সতর্কতার সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপায়ণ করেছিলেন সেই George Gissing কে আজ আর কেউ পড়ে না, কিন্তু অতি বিদগ্ধেরা নাক সিঁটকালেও আজও Charles Dickens সর্বজনপ্রিয় এবং ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। আর যুগপরিবেশই যদি সৃষ্টির নিয়ামক হত তাহলে শ্রেষ্ঠ শিল্পের সমাদর সর্বকালেই হতে পারত না। লোকের তথাকথিত রুচিবদলের এবং জীবনের রীতিবদলের সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলিও হতাদর হয়ে পড়ত। যে মঞ্চে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে Æschylus বা Sophocles-এর নাটক বা ধ'রে নেওয়া যাক খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে কালিদাসের শকুন্তলা অভিনীত হত, সেই সব মঞ্চ আজ আর নেই এবং সেই সব মঞ্চরীতিরও পরিবর্তন হয়েছে বিপুল; তবু সেই সব সৃষ্টি আজও আমাদের গর্বের বস্তু।

তাই বলে কি যুগপরিবেশকে জানবার কোন প্রয়োজনই নেই? আছে, কিন্তু তার মূল্য সাহিত্য বা শিল্পবিচারে খুব গৌণ। যেমন যুগের বা কালের বেশী পার্থক্য হলে বা কোন সময় অল্প ব্যবধানেও শব্দের অর্থের পরিবর্তন হ'তে পারে। সেই পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন না হলে সাহিত্যের অর্থবোধের ভ্রান্তি ঘটবে, সামাজিক রীতি বা প্রথার পরিবর্তন ঘটলে সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটবে এবং সেই পরিবর্তন সম্পর্কে ঐতিহাসিক চেতনা না থাকলে আবার অর্থবোধে ভ্রান্তি ঘটবে। শেক্সপীয়রের বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি One touch of Nature makes the whole world kin উনিশ শতকের মধ্যভাগে যে অর্থে গৃহীত হত আজ আর সে অর্থে হয় না, কেন না 'Nature' শব্দটি শেক্সপীয়রের যুগে যে অর্থে গৃহীত হত ঐ context-এ সেই অর্থটি পণ্ডিতেরা পরবর্তীকালে আবিষ্কার করেছেন। তেমনি বসন্তসেনা নাম্নী সাধারণীকে যখন অভিজাত বণিক চারুদত্ত বিবাহ ক'রে গৃহবধূ

করলেন শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকে তখন কোন সামাজিক আলোড়ন দেখা যায় না কিন্তু Alexander kuprin-এর Yama the Pit উপন্যাসে ঐ রকম ঘটনা ঘটা অত সহজ নয়।

পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবর্তনগুলি সাহিত্যে প্রতিফলিত হলেও মহৎ সাহিত্য ও শিল্পের রস আস্বাদন আমরা যুগে যুগে ক'রে থাকি, একটু আধটু এদিক ওদিক হলে কিছু যায় আসে না। পরিবর্তন সত্ত্বেও এটা যে সম্ভব হয় তার কারণ পরিবর্তনগুলি মনের এতই উপরিতলের জিনিস যে মহৎ স্রষ্টা সব সময়েই সেগুলিকে অতিক্রম ক'রে থাকেন; আর আসলে তো ওগুলি উপকরণ। যে ভালো পাচক সে সামান্য বা যে কোন উপকরণ দিয়ে ভালো রাঁধতে পারে। রবীন্দ্রনাথ পোস্টমাস্টারও লেখেন আবার ক্ষুধিত পাষাণও লেখেন।

তা ছাড়া কোন্ পরিবেশে কেমন সাহিত্য সৃষ্ট হবে তার কোন লেখাজোখা নেই। কেননা কোন পরিবেশে মন কেমন করে সাড়া দেবে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। মনস্তত্ত্বের কোনও প্রস্থানই মনের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্কের কোনও নির্দিষ্ট বিধি বা প্রকার নির্ধারণ ক'রে উঠতে পারেনি। কতকগুলি স্থূল প্রবৃত্তি-ভিত্তিক সাড়া (response) নিয়েই কিছু বিধি ঠিক করবার চেষ্টা হয়েছে মাত্র; তাও আবার প্রবৃত্তি বা instinct নিয়েও আজকের মনস্তাত্ত্বিকদের মধ্যে মতের মিল নেই। পরিবর্তমান পরিবেশ কেমন ক'রে একজন স্রষ্টার মনকে প্রভাবিত করল তা নিয়ে চিরকাল মনস্তত্ত্ব গবেষণা করে যেতে পারে কিন্তু সাহিত্য যেহেতু প্রত্যক্ষত জ্ঞানের ভাণ্ডার নয়, আনন্দের ভাণ্ডার, সেইজন্যে পরিবেশ-বিচারে সাহিত্যের সৌন্দর্যের বা রসের আস্বাদন হয় না। পণ্ডিতেরা documentation করে আনন্দ পেতে পারেন কীট্স্ Ode to A Nightingale সকালে লিখেছিলেন না সন্ধ্যায় লিখেছিলেন, আর রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলীর একটি পত্রের কাঁচা ধান কি করে কবিতায় সোনার ধানে পরিণত হল তা নিয়ে চারুবাবু জিজ্ঞাসু হতে পারেন, তবে এ সবে স্রষ্টার কি পাঠকের কোন প্রয়োজন নেই। documentation না হলে Ph. D না পাওয়া যেতে পারে কিন্তু সাহিত্যপাঠের আনন্দ না পাবার কোন কারণ নেই। Shakespeare-এর নাটকের source গুলি যতই নাড়াচাড়া করি সেগুলিতে Shakespeare-এর নাটকের রস মিলবে না। Schiiicking শেক্সপীয়রকে primitive artist বলেছেন, প্রায় উড়িয়েই দিয়েছেন তার মূল্য আবার শেক্সপীয়রের যুগেই; Ben Jonson-এর মতে Shakespeare is for all ages। আসলে পরিবেশ বা উপকরণ গৌণ জিনিস। এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উক্তি মনে পড়েঃ "সৌন্দর্য জাত মানিয়া চলে না— সে সকলের সঙ্গেই মিলিয়া আছে। সে আমাদের ক্ষণকালের মাঝখানেই চিরন্তনকে, আমাদের সামান্যের মুখশ্রীতেই চিরবিস্ময়কে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়া দেয়। সমস্ত জগতের যেটি মূল সুর সৌন্দর্য সেটি আমাদের মনের মধ্যে ধরাইয়া দেয়—সমস্ত সত্যকে তাহার সাহায্যে নিবিড় করিয়া দেখিতে পাই। একদিন ফাল্গুন মাসের

দিন শেষে অতি সামান্য যে একটা গ্রামের পথ দিয়া চলিয়াছিলাম—বিকশিত সর্ষের ক্ষেত হইতে গন্ধ আসিয়া সেই বাঁকা রাস্তা, সেই পুকুরের পাড়, সেই ঝিকিমিকি বিকাল বেলাটিকে আমার হৃদয়ের মধ্যে চিরদিনের করিয়া দিয়াছে। যাহাকে চাহিয়া দেখিতাম না, তাহাকে বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছে, যাহাকে ভুলিতাম তাহাকে ভুলিতে দেয় নাই। সৌন্দর্যে আমরা যেটিকে দেখি কেবল সেইটিকেই দেখি এমন নয়, তাহার যোগে আর সমস্তকেই দেখি, মধুর গান সমস্ত জল-স্থল-আকাশকে, অস্তিত্ব মাত্রকেই মর্যাদা দান করে। যাঁহারা সাহিত্যবীর, তাঁহারাও অস্তিত্বমাত্রের গৌরব ঘোষণা করিবার ভার লইয়াছেন।"

যুগচেতনা তো পরিবেশের অন্তর্গত—পরিবেশের তাৎকালিকতামাত্র এবং তাও ব্যক্তি-চেতনায়। এই যুগচেতনার বিশ্লেষণে মতপার্থক্যের অন্ত নেই। তার উপর বিশ্লেষণ চলে শুধু মনের উপরিতলের। মনের গভীরতর স্তর-স্তরান্তরের বিশ্লেষণ সম্ভবও নয় এবং সেখানে মতপার্থক্য আরও বেশী।

মধুসূদনের যুগের কথা বলতে গেলেই তথাকথিত রেনেসাঁসের কথা এসে পড়ে। প্রতীচ্যের শিক্ষা-দীক্ষা চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে এ দেশীয় মধ্যবিত্তের পরিচয় ঘটায় এবং মার্কসের মতে উৎপাদন-পদ্ধতির ও সম্পর্কের চিরাচরিত প্রাচ্য ধারায় প্রতীচ্যের প্রথম আঘাতে, এ দেশে মানুষের মনে জীবনকে দেখবার, গ্রহণ করবার, বুঝবার এক নূতন ভঙ্গী প্রকট হল। অবশ্য জীবনদর্শনে এই পরিবর্তন ঘটল প্রধানত মধ্যবিত্তেরই মনে। একেই নবজাগরণ আখ্যা দেওয়া হয়। এই নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। নূতন তথ্য কিছু কিছু সব সময়েই আবিষ্কৃত হবে; তবে মূল কথাটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও ঐহিকতা। কিন্তু নিছক ঐহিকতা প্রায় কারও লেখাতেই নেই। মধুসূদনেও নেই। আবার মধুসূদন ব্যক্তির জয়গান করতে গিয়েও সেই ব্যক্তি যে স্বয়ম্ভর নয়, সে যে নিজের জীবনের নিয়ামক নয়, এই বোধকেই যেন প্রতিষ্ঠিত করেছেন মেঘনাদবধ মহাকাব্যে। আঙ্গিকের দিক থেকে তিনি বহুধা অভিনব কিন্তু যে জীবনদর্শনকে তিনি তাঁর মহাকাব্যের উপজীব্য করেছেন সেই জীবনদর্শনে দেবতা-রাক্ষসকে সমপর্যায়ে দেখলেও তাঁকে রাবণের মুখে বসাতে হয়েছে "কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?" এই জীবনদর্শনে ব্যক্তিপূজা থাকলেও ব্যক্তি যে অন্যব্যক্তিনির্ভর সে স্বীকৃতি তো আছেই; আরও আছে শুধু হারানোর বিলাপ। এই হারানোর ব্যথাকে তাৎকালিক পরিবেশ-প্রসূত বলে এক কালে বুঝবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এই ব্যথা তো সর্বকালের। মানুষ যেতে দিতে চায় না তবু তা চলে যায়। কোন্ শক্তি এই যাওয়া-আসাকে নিয়ন্ত্রিত করে মধুসূদন সেই প্রশ্নে যান নি; প্রাচীন গ্রীক নাট্যকারেরা, শেক্সপীয়র মিলটন সে প্রশ্ন তুলেছেন এবং ভেবে আকুল হয়েছেন। ভেবে কূলকিনারা পাওয়া না পাওয়া

অন্য কথা। রাক্ষস এবং মানুষকে এক পর্যায়ে বসিয়ে ব্যক্তির যে জয়গান মধুসূদন করলেন সে কথা অনেক কাল আগে কর্ণও বলেছিলেন :

সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা কো বা ভবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষং॥

কিন্তু মহাভারতের যুগে এটি ব্যতিক্রম এবং দুর্যোধন পাশে থেকে কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষেক না করলে এ দম্ভের কোন মূল্য থাকত না সেই ক্রীড়াক্ষেত্রে। আর মধুসূদনের যুগে এই ব্যক্তির মূল্য নূতন ক'রে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। যেমন Sophocles এর *Antigone* এবং Oedipus Rex নাটকদ্বয়ে একদিকে মানুষের জয়গান আবার অন্যদিকে অনির্দেশ্য বিধিবশে মানুষের জীবনের সর্বাঙ্গ ণ নিয়ন্ত্রণ। সেইখানে মানুষের কোন স্বাধীনতাই নেই। Euripides প্রথম প্রথম এই অনির্দেশ্য বিধি নিয়ে অনেক তর্কাতর্কির অবতারণা করেছেন ; শেষে Hippolytus এবং Bacchae নাটকদ্বয়ে এই শক্তিকে স্বীকার ক'রে নিলেন। মধুসূদন Iliad মহাকাব্যের বাংলায় নাম দিলেন হেকটরবধ কাব্য। তাঁর কাছে পরাজিতের শৌর্যমণ্ডিত মৃত্যুই কাব্যের প্রধান সামগ্রী, ইলিয়ম বা ট্রয়ের পতন নয়। তার কারণ হোমারের কাছে দেশই বড়, আর মধুসূদনের কাছে ব্যক্তি।

এই ব্যক্তির যে elevation এটির পেছনে অনেক শক্তি কাজ করেছে। সেটি আমার পূর্বতন গ্রন্থে সম্যক আলোচনা করেছি।*

এই সূত্রে একটি অন্য কথা বলি :

John Milton যখন Paradise Lost এবং Paradise Regained লেখেন তখন ইংলণ্ডে নবজাগরণের (Renaissance) যুগ শেষ হয়েছে ; রাজা দ্বিতীয় চার্লস সিংহাসনে ফিরে এসে বসেছেন এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চূড়ান্ত পূজারীদের পরাজয় ঘটেছে। Milton কখনও কোন ধর্মীয় দলের সঙ্গেই একাত্ম হতে পারেন নি ; প্রথম চার্লসের পতন তিনি সমর্থন করেছিলেন এবং তা নিয়ে মসীযুদ্ধও করেছিলেন তীব্র, শুধু ঐ ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্যেই, রাজার স্বেরাচারের বিরুদ্ধে। সেই যে আবার রাজা এসে বসলেন সিংহাসনে, এতদিনেও আর নড়লেন না। আজকের পৃথিবীতে বিরল রাজতন্ত্রের মধ্যে ইংলণ্ড একটি। অবশ্য কালে কালে সেই রাজতন্ত্রের খোলনলচে পর্যন্ত পাল্টে গিয়েছে : রাজা আর সত্যিকারের রাজা নেই, প্রায় তাসের রাজা হয়েছে ; তবু ইংলণ্ডে রাজা আছেন এবং ইংরেজদের মানসিকতার এমন একটি রাজানুগত্য আছে যাকে অদ্ভুত ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। অবশ্য এটি ঐতিহ্যগত। এখনও The Queen বলতে ইংরেজ অজ্ঞান, এক-আধজন বুদ্ধিজীবী ছাড়া। এই মানসিকতা মিলটনের মানসিকতার বিপরীত কোটিতে একেবারে। Milton পুরোপুরি রাজদ্রোহী অথচ তাঁর Paradise Lost শুরু হচ্ছে মানুষের

---

* দ্রঃ যুগন্ধর মধুসূদন, ১ম সংস্করণ।

অবাধ্যতারই নিন্দা করে। পঙ্‌ক্তি কয়টি স্মরণীয় একাধিক কারণে এবং বিশেষ করে মধুসূদনের ভাবলোকের সঙ্গে একান্ত পার্থক্যে :

Of man's first disobedience and the fruit
Of that forbidden tree whose mortal taste
Brought Death into the world, and all our woe
... ... Till one greater man
Restore us,...

এই যে মানুষের অবাধ্যতা, ভগবানের ইচ্ছাকে না মেনে আপন ইচ্ছাকে তার ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া, একে কি সত্যিই Milton নিন্দা করেছেন? Paradise Lost-এর সপ্তম পর্বে free will এবং determinism নিয়ে গভীর এবং আবেগপূর্ণ আলোচনা আছে Gabriel এবং Michael-এর মধ্যে। সাধারণত এই পর্বকে পাঠকেরা নীরস বলে থাকেন কিন্তু Milton-এর কাব্যের মূল বিষয় যে এইটিই। তাই যাঁরা শুধু লিরিকধর্মী কাব্যপাঠে আনন্দ পান তাঁরা এই পর্বকে তেমন মূল্য না দিলেও, বা এই অংশের মূল্য স্বীকার না করলেও এই পর্বগত সমস্যাই Paradise Lost মহাকাব্যের উপজীব্য এবং সেই জন্যেই বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই কাব্যের মহত্বকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। এই সমস্যাই তো মনুষ্য জীবনের মূল সমস্যা—আমার ইচ্ছাই শেষ কথা, না, তোমার ইচ্ছা। এখানে এই তুমি ভগবান নাও হতে পারেন, এই তুমি সমাজ হতে পারে, নীতিবোধ হ'তে পারে, যা কিছু আমার ইচ্ছার অতীত অথচ বেশী শক্তি ধরে তাই হ'তে পারে। Milton সমাজকে দেখলেন, সব দিক থেকে দেখলেন—রাজনৈতিক, পারিবারিক, এমন কি ব্যক্তিগত নীতিবোধের দিক থেকেও। ব্যক্তির ইচ্ছার কতটুকু শক্তি তাও দেখলেন। মধুসূদনও দেখলেন, পুরোপুরি। আবার দুজনেই দেখলেন, Milton বেশী করে, ধর্মের ক্ষেত্রেও নানা আপোষ বা compromise। শেষে তিনি আশ্রয় নিলেন আপন নিভৃত গৃহকোণে, কিন্তু সেখানেও আপন সন্তানের অবাধ্যতা। পরিবার থেকে রাষ্ট্র—সব ক্ষেত্রেই এই না মেনে নেবার প্রবণতা বা non-conformism। কিন্তু এই non-conformism থেকে যে কোন কল্যাণ এসেছে তা তো বোঝা গেল না। তবু মানুষের সেই আদিম স্বৈরাচরণ থেকেই তো মানুষের ইতিহাসের সৃষ্টি। কিন্তু মধুসূদন তা মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর মহাকাব্যের রস করুণ; মূল ভাব শোক।

মধুসূদন ও আধুনিকতা

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মাইকেল-হেম-নবীন বাঙালির পৌরাণিক সংস্কারকে বাদ না দিয়ে উনিশ শতকের প্রবণতা অনুসারে দেবদেবীসংঘের বিচিত্র ভাবমূর্তি নির্মাণ করলেন। মধুসূদনের চিত্ততলশায়ী নবযুগ রক্তশতদলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।...কিন্তু ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির সমগ্র সত্তাকে বুঝি মধুসূদনের মতো আর কেউ *Sturm and strang* ঝড়-ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করতে পারে নি। উনিশ-বিশ শতকের কোন ভারতীয় কবিই একক চেষ্টায় এই ধরনের সার্বিক চিত্ত সংস্কারের পথ প্রস্তুত করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। অবশ্য মধুসূদনের সমস্ত রচনাই কিছু নিখুঁত শিল্পকর্ম হতে পারে নি। তাঁর জীবন ও শিল্পকর্মে এক ধরনের আত্মনাশী প্রধর্ষিতা ছিল। ফলে এতবড়ো প্রতিভার সবটা তাঁর রচনাকর্মে প্রকাশিত হতে পারে নি। প্রমেথ্যুসের মত এই মহাগরুড় যে অগ্নি চয়ন করেছিলেন তার চেয়ে বড় আধুনিকতা আর কাকে বলে? অবশ্য তিনি একাকী নির্জন নিঃসঙ্গ দ্বীপের মত বাংলা সাহিত্যের মূল স্রোত থেকে দূরে রয়ে গেলেন। সেই মূল স্রোত হলো গীতিপ্রবণতা, আবেগের নির্বাধ মুক্তি।...লীরিকের প্রভাবে ভেসে যেতে বাঙালি অভ্যস্ত। মধুসূদন প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী ছিলেন বলে বাঙালির প্রাণের ধাতু ও ধর্মকে ভিন্ন পথে চালিত করতে চেয়েছিলেন, অবশ্য তাঁর মনোভঙ্গীও গীতিকবির অনুকূল। সে যাই হোক, তাঁর অনুকারীরা সেই শক্তি থেকে বঞ্চিত ছিলেন বলে উনিশ শতকের শেষ তিন দশক ধরে অলংকার শাস্ত্রের গজকাঠি দিয়ে মেপে মেপে মহাকাব্য রচনার বৃথা চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মাইকেলও কি মহাকাব্য রচনার বস্তুতন্ময়তা পুরোপুরি আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন? মেঘনাদবধ কাব্য যেন গীতিকাব্যের আধারে রচিত আখ্যানকাব্য, উর্মিমুখর সাগর বেলায় রাবণের অশ্রু বিসর্জনে যার শোচনীয় সমাপ্তি।

...মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে অন্য গ্রহের জীব বলে প্রতিভাত হয়েছিলেন। লোকে যেমন ভীতিমিশ্রিত বিস্ময়ের সঙ্গে অগ্ন্যুৎপাত, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, ধূমকেতু দেখে, মধুসূদনের রচনায় তেমনি বাঙালি অন্তর-বাহির মন্থনকারী, কিছু পরিচিত, কিছু বা অপরিচিত শঙ্কা-সম্মোহের সম্মুখীন হয়েছিল।...মধুসূদনের প্রচণ্ড শক্তি ও প্রবল passion কিন্তু উনিশ শতকের বাঙালি জীবনে সন্ততি সৃষ্টি করতে পারল না। সে স্থানে এলেন স্বয়ং বিহারীলাল ও তাঁর শিষ্যেরা, পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ।

মাইকেল মধুসূদন বাঙালির মধ্যযুগীয় স্থাবর চিত্তকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিলেও তিনি জাতির নেতৃত্ব করেন নি। সে ভার নিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

…১৯০৭ সালে রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন-এ 'সাহিত্যসৃষ্টি' শীর্ষক যে প্রবন্ধ রচনা করেন তাতে আধুনিকতার স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের উল্লেখ করেন এবং মেঘনাদবধ কেন আধুনিক কাব্য সে প্রসঙ্গে বলেন ঃ

> মেঘনাদবধ কাব্য কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে, স্পর্ধাপূর্বক তাহার শাসনও ভাঙিয়াছেন।

এই অংশে রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্য অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার স্বরূপ এইভাবে সংক্ষেপে নির্দেশ করেছেন ঃ

১। মেঘনাদবধকাব্য আধুনিক। কারণ এর ভাব ও রসের মধ্যে অপূর্ব পরিবর্তন আছে। এ পরিবর্তন কবি-মনের সচেতন প্রয়াসের ফল।*

২। এই কাব্যের মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। বিদ্রোহ অর্থাৎ পুরাতনকে অস্বীকার ও নবীনের আবির্ভাব ঘোষণা। মধুসূদন আধুনিক কবি, বাইরের দিক থেকে কাব্য-প্রকাশের ভাষাকে নতুন রূপ দিয়েছেন ছন্দে, এবং তা সম্ভব হয়েছে, তিনি পয়ারের কৃত্রিম বন্ধন থেকে অমিত্রাক্ষরের স্বতন্ত্র চালচলনের স্বাধীনতা স্বীকার করেছেন।

৩। শুধু বাহ্যিক আঙ্গিক নয়, এই কাব্যের রাম-রাবণের চরিত্রাংকনেও আমাদের পুরাতন ভাব ও আদর্শকেও প্রবলভাবে আঘাত করেছেন।

৪। ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে এই আধুনিকতার আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে।

এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, তিনি এই সময়ে মনে করেছিলেন যে, বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার স্বরূপ সন্ধান করতে হলে মেঘনাদবধ কাব্যকেই দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তাঁর মতে, বিদ্রোহ অর্থাৎ ভাব-ভাষা-ছন্দ-শব্দ প্রয়োগের অভিনবত্ব ও জীবনবোধের মৌলিক পরিবর্তন, যা রাম ও রাবণ চরিত্রে প্রকাশিত হয়েছে, তাই হচ্ছে আধুনিকতার মূল লক্ষণ। ডানিয়েল লার্নার (Daniel Larner) তাঁর 'The Passing of Traditional Society' গ্রন্থে বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগতের যে গতিশীলতা ও পরিবর্তনের কথা বলেছেন, বহুপূর্বেই রবীন্দ্রনাথ উক্ত প্রবন্ধে (সাহিত্যসৃষ্টি) মাইকেল মধুসূদন ও মেঘনাদবধ কাব্য

সম্বন্ধে অনুরূপ অভিমতই প্রকাশ করেছেন।…তিনি দেখেছেন বাংলা সাহিত্যের যথার্থ আধুনিকতা সঞ্চারিত হয়েছিল মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা।

মাইকেল বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর এনেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ সেই প্রবন্ধে তা ঘোষণা করেন। মধুসূদন সম্বন্ধে তাঁর উক্তিটি উদ্ধারযোগ্য ঃ

> নবযুগের প্রাণবান সাহিত্যের স্পর্শে কল্পনাবৃত্তি যেই নবপ্রভাতে উদ্বোধিত হল অমনি মধুসূদনের প্রতিভা তখনকার বাংলা পায়ে-চলা পথকে আধুনিক কালের রথযাত্রার উপযোগী করে তোলাকে দুরাশা বলে মনে করল না।…বাংলা ভাষাকে নির্ভীকভাবে এমন আধুনিকতার দীক্ষা দিলেন যা তার পূর্বানুবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

মাইকেল তাঁর কাব্যে যে আধুনিকতার সৃষ্টি করলেন, তা পুরাতন যুগ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অবশ্য সে স্বাতন্ত্র্যের মূলে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের দান স্পষ্ট ছিল। মধ্যযুগীয় বাঙালী মানস তদানীন্তন সাহিত্যে 'চিরাভ্যাসের অপ্রশস্ত বেষ্টন' অতিক্রম করে মুক্তির উদার প্রাঙ্গনে আবির্ভূত হল।…এই নিবন্ধে তাঁর মতে মধুসূদন ও বঙ্কিম যে আধুনিকতা পত্তন করলেন তা পুরাতনের ঘাট ছেড়ে নতুন বন্দরের দিকে তরী ভাসালো, সে বন্দর হচ্ছে বিশ্বমানবের সমুদ্রতটে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতা বিশ্বমানবের মানসিকতার সঙ্গে যুক্ত হল। সুতরাং আধুনিকতার দুটি লক্ষণ, অর্থাৎ বিদ্রোহ ও আধুনিকত্ব, এর সঙ্গে তৃতীয় লক্ষণ যুক্ত হল—বিশ্ব—মানবিকতা।…আধুনিক সাহিত্যের এটাই কুল লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের দুই সারস্বত দিকপাল—মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে আধুনিক মানসিকতা লক্ষ্য করেছেন।

…মধুসূদন শ্লথগতি, এলায়িত পয়ারের ছেদ-যতির বন্ধন মোচন করে কবি-কল্পনাকে করে তুললেন উদ্দাম তুরঙ্গ। এ ছন্দের ঐরাবত চালচলন তিরোহিত হল, নিদ্রাকর্ষক 'Sing-Song' ধরনের সুরের বদলে চৌদ্দ মাত্রার পঙ্‌ক্তিতেই যুক্ত হল ধ্বনি নির্ঘোষ, ভাঙল তার ছেদের আগল, মুক্তপক্ষ বিশালতাবোধ আমাদের পৌরাণিক সংস্কারকেও নবরূপ দেবার চেষ্টা করল।…মধুসূদন কাব্যভাষায় আনলেন আত্মার দীপ্তি।

মধুসূদন অতি উত্তমরূপে সংস্কৃত শিখে উপাদান হিসেবে ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসরণ করলেও তাঁর মনোভঙ্গী পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য দ্বারাই লালিত হয়েছিল। অবশ্য এ কথাও স্বীকার্য যে, তাঁর মনের অন্তরাল দিয়ে অতি প্রচ্ছন্নভাবে ভারতীয় সংস্কার ও বাঙালিয়ানার ধারা বহমান ছিল, যা রচনার মধ্যে তাঁর অজ্ঞাতসারেই প্রকাশিত হয়েছে। মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদন একটি দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েছিলেন। একটি হল প্রত্যক্ষ আকর্ষণ, অর্থাৎ গ্রীক নিয়তিবাদ। রাবণের পরিণাম-সূত্র যেন কোন অলঙ্ঘ্য স্থান থেকে কোন এক সর্বকর্তৃত্বশীল ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনি বা

সেই শক্তি দৃষ্ট নন বলে তাঁকে বলা হয় অদৃষ্ট। গ্রীক নেমেসিস, অ্যাড্রাসটেইয়া, টাইকি, ফরটুনা প্রভৃতি দেবদেবীরা কোথাও 'inescapable one,' কোথাও 'retributive justice,' কোথাও-বা সৌভাগ্য দেবতা বলে গ্রীক ও রোমান উপকথায় এবং পরবর্তী কালে দার্শনিক তত্ত্বে স্বীকৃত হয়েছেন। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অথবা নৈতিক আদর্শের বিরুদ্ধে অপরাধ করলে গ্রীক অদৃষ্টদেবী তার উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে থাকেন। তাই তিনি retributive justice. কিন্তু রাবণের পরিণামের পিছনে রয়েছে একটি অনির্দেশ্য রহস্যময় অনিবার্য শক্তি, যাকে গ্রীক অনুসরণে বলা যাবে অ্যাড্রাসটেইয়া, অর্থাৎ যার কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না। মাইকেলের বিধি, অদৃষ্ট অনেকটা অ্যাড্রাসটেইয়ার অনুরূপ। এটি তাঁর গ্রীক সংস্কার। অপর দিকে রাবণের পরিণামের জন্য কোন বাইরের শক্তি নয়, তার কৃতকর্মই দায়ী, অন্তত মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গ, চতুর্থ সর্গ, এবং তাঁর সম্বন্ধে দেবদেবীদের উক্তি থেকেই তা মনে হওয়া স্বাভাবিক। মানুষ নিজের কর্মফল ভোগ করে—ভারতবর্ষের তাত্ত্বিক এই কথা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে টেনিসনের "We make our fortunes and call them fate" ছত্রটি মনে পড়বে, কিংবা ওথেলোর শেষ উক্তি—"Who can control his fate" এবং এদেশের 'নিয়তি কেন বাধ্যতে'—যেখানে অদৃষ্টের অমোঘতা স্বীকৃত হয়েছে। গ্রীক অদৃষ্টবাদ ও ভারতীয় কর্মবাদ—এই আপাত-বিরোধী মনোভাবের মধ্যে মাইকেলের মানসিক ভারসাম্য আন্দোলিত হয়েছে। ফলে সমগ্র কাব্যের মূল পরিকল্পনার মধ্যে দ্বৈধতা সৃষ্টি হয়েছে। এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালীর অন্তর্দ্বন্দ্বকেই পরিস্ফুট করেছে।…এই-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়ই উনিশ শতকের আধুনিকতাকে শিল্প-সাহিত্যে ত্বরান্বিত করেছিল। ইংরেজ সমালোচক উনিশ শতককে 'age of interrogation' বলেছেন। এই প্রশ্নমনস্কতা, পূর্বপ্রচলিত সংস্কারকে যুক্তির কষ্টিপাথরে ঘর্ষণ করে তার মূল্য যাচাই করা—মধুসূদনের কাব্য এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও প্রবন্ধ নিবন্ধে তার বিচিত্র পরিচয় ফুটে উঠেছে। মধ্যযুগীয় সংস্কারের স্থানে আধুনিকতার আবির্ভাব, যে মধ্যযুগীয় সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'অন্ধকার, একাকার, সুপ্তি,'—নবযুগের মধ্যে দেখেছেন, 'আলোক, আশা, সঙ্গীত, বৈচিত্র্য।' উনিশ শতকের দিকপালদের সৃষ্টির মধ্যে তিনি এই সমস্ত প্রাণবন্ত উচ্ছলতা লক্ষ্য করেছেন, এবং এই শেষোক্ত গুণগুলিকে আধুনিক সাহিত্য ও মনের প্রধান লক্ষ্য বলে ধরেছেন।*

---

* ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে 'উচ্চারণ'-কলিকাতা-৪৩ থেকে প্রকাশিত অধ্যাপক ডক্টর অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা' গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ লেখকের সহৃদয় অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত। রচনাটির শিরোনাম সম্পাদকের দেওয়া —সম্পাদক।

কবি মধুসূদনের ভারতীয় উত্তরাধিকার

গার্গী দত্ত

ঊনবিংশ শতকে আমাদের দেশে যে নূতন শিক্ষাদর্শ এবং বিদেশি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার প্রবর্তন হয়েছিল, তার ফলে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির দ্বারা পুষ্ট দীর্ঘকালবাহিত সাহিত্য ধারায় পরিবর্তন ঘটল। এই সার্বিক নবজাগরণের একটি লক্ষণ যেমন জীবনাচরণ ও সাহিত্যে পাশ্চাত্যের অনুকৃতি তেমনি দেশীয় ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার-প্রচেষ্টা এর অপর লক্ষণ। শতাব্দীর প্রথমার্ধ ব্যয়িত হয়েছে এই নবলব্ধ সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ কোরে মৌলিক সৃষ্টির জন্য প্রস্তুত হোতে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাহিত্য দিয়েই আধুনিক বাংলার সৃষ্টিপর্বের সূত্রপাত হোল। তাই তাঁর রচনায় পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা ও শৈলীর সঙ্গে ভারতীয় উত্তরাধিকারের অনুপাত বিচার তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথমে ইংরেজি শিক্ষার পীঠস্থান হিন্দুকলেজ ও পরে বিশপ্স্ কলেজের ছাত্র মধুসূদন ইংরেজ ভাষা ও সাহিত্য থেকে প্রাথমিক প্রেরণা লাভ করেছিলেন। অবশ্য তারও আগে বাল্যে গ্রামের পাঠশালায় ও নিজের মায়ের কাছে তাঁর বাংলা কাব্য-পাঠের হাতেখড়ি হয়েছিল। পরে তিনি প্রাচীন ও আধুনিক ইয়োরোপীয় অনেকগুলি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। বহু পঠনশীল এই ব্যক্তিটি ইংরেজি সাহিত্য ছাড়াও ইয়োরোপের মূল মহাকাব্যগুলি পড়েছিলেন নিবিষ্টভাবে। এসব কবি ও কাব্য তাঁর রচনাকে বিশিষ্ট কোরে তুলেছে। এর সঙ্গে তিনি দেশীয় সংস্কৃত ক্লাসিক্যাল সাহিত্য এবং মহাকাব্য পুরাণাদিও পড়তেন। তাঁর নিজের ভাষাতেই তাঁর পঠনশীলতার পরিচয় নেওয়া যাক্—

Perhaps you do not know that I devote several hours daily to tamil. My life is more busy than that of a school boy. Here is my routine ; 6 to 8 Hebrew, 8 to 12 School, 12-2 Greek, 2-5 telegu and sanskrit, 5-7 Latin, 7-10 English. •

১৮৪৯, ১৮ আগষ্ট মাদ্রাজ থেকে বন্ধু গৌরদাস বসাককে একথা লিখেছিলেন। অন্যত্র[১] বলেছেন—

I generally devote four to five hours to law, I read Sanskrit,

১ রাজনারায়ণ বসুকে ১৫ মে, ১৮৬০ এর পত্র

Latin and Greek and scribble. *All this is enough to keep a man* engaged from morn to dewy eve and so on.

কেবল পড়া নয়, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মহৎ কবিদের প্রভাবে তাঁর রসরুচি ও সৃষ্টি-শক্তি কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তার আভাসও দিয়েছেন তিনি। রঙ্গলাল সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছেন—

Byron, Moore and Scott form the highest Heaven of poetry in his estimation. I wish he would travel further. He would then find what 'hills peep o'er hills'—what 'Alps arise'! As for me, I never read any poetry except that of Valmiki, Homer, Vyasa, Virgil, Kalidasa, Dante (in translation), Tasso (in tran slation) and Milton These 'কবিকুলগুরু' aught to make a fellow a first rate poet—if Nature has been gracious to him.

লক্ষণীয় যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে তিনি সংস্কৃতের উল্লেখ করেছেন প্রতিবারই। কেবল মহাকাব্য বা ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্য নয়, পুরাণ সম্পর্কেও তিনি ছিলেন আগ্রহী। 'I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry'[২] Hindu Antiquities-এর কথা বলেছেন একাধিকবার।[৩] সংস্কৃত ভাষানিবন্ধ এসব সম্পদকে তিনি নিজের রচনায় কতোখানি ব্যবহার করেছিলেন বা করতে চেষ্টা করেছিলেন—বর্তমান নিবন্ধে সেটাই আমরা দেখাতে চেষ্টা করব।

ইয়োরোপীয় ভাষাগুলিকে তিনি ভালোভাবেই অধিগত করতে পেরেছিলেন এ বিষয়ে কারো মনেই কোনো সংশয় নেই। কিন্তু সংস্কৃত তিনি ভালো জানতেন কিনা, মূল গ্রন্থগুলি পড়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল কিনা এ নিয়ে অনেকেরই সন্দেহ আছে। তাঁর জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসুও বলেছেন—"সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ও আগ্রহ ছিল না। পক্ষান্তরে গ্রীক সাহিত্য বিশেষত গ্রন্থসমূহ তিনি অতি যত্নের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন।"[৪] এই ধারণার কারণ মধুসূদনের নিজেরই জীবনাচরণ, ধর্মান্তর গ্রহণ, বিদেশিনী পত্নীগ্রহণ, বিলেত যাবার উদগ্র বাসনা প্রভৃতি এবং সর্বোপরি তাঁর রচনাকালে পণ্ডিতদের সাহায্য গ্রহণ আর বানান ভুল করার কাহিনী এবং তিনি যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতো 'Thundering grammarian' নন সেই স্বীকৃতি। তাই মধুসূদনের সংস্কৃত শিক্ষার সুযোগলাভ কতোখানি

২ তদেব।

৩ গৌরদাস বসাককে ১৯ মার্চ, ১৮৪৯ এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে ২৭ মে, ১৮৪৯ তারিখে লেখা পত্র দ্রষ্টব্য।

৪ যোগীন্দ্রনাথ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সংস্করণ, পৃঃ ১০৪।

হয়েছিল বা পুরাণাদি সংস্কৃত গ্রন্থ তিনি কোথায় পেতেন, সে আলোচনাও এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়।

William Adam ১৮৩৫-৩৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বাঙলাদেশের শিক্ষাবিষয়ক যে রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন, তাতে বলেছেন বিশপ্‌স্‌ কলেজে বাংলা ও সংস্কৃত পড়াবার জন্য তিনজন পণ্ডিত ছিলেন এবং কেবল কাব্য-সাহিত্যের রসাস্বাদন নয়, ঐ কলেজে সংস্কৃত ভাষাটিকে তার সমগ্র বিশেষত্ব সমেত এমনভাবে পুরোপুরি অধিগত করতে হোত, যাতে মূল গ্রন্থাদি পাঠে কোনো বাধা না থাকে।

"...as well as to teach Sanskrit to those whose advancement in the knowledge makes it important that they should possess this means of exploring Hindooism in the sources,' পাশ্চাত্ত্য ভাষাশিক্ষার পদ্ধতিও ছিল ঐরকমই—"...Poets orators though not useless, are deemed a less important subject of concern than those writings which exhibit the chief moral and intellectual features of Greek and Roman literature."[৫]

মধুসূদন বিশপ্‌স্‌ কলেজে বেশিদিন পড়েননি, মাদ্রাজের প্রবাস জীবনে তাঁর বিভিন্ন ভাষাচর্চা ছিল অব্যাহত কিন্তু সে কেবল ব্যাকরণের মাধ্যমে ভাষার গঠনকে আয়ত্ত করার জন্য নয়, আপন মনে সাহিত্যরসাস্বাদনের জন্য। যেমন গ্রীক-রোমান সাহিত্যের moral বা intellectual feature তাঁর কাছে কখনও বড়ো হয়ে ওঠেনি, ঠিক তেমনি সংস্কৃত পুরাণাদির ধর্মীয় দিকটিও নয়—"I dont care a pin's head for Hindiusm". তাঁর প্রায় সমকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে দীর্ঘ সাড়ে বারো বৎসরব্যাপী ব্যাকরণ-অলংকার-কাব্যের সুশৃংখল অধ্যয়নের পরে কলেজের প্রশংসাপত্র পেয়েছিলেন। মধুসূদন দীর্ঘকাল বিশপ্‌স্‌ কলেজে থাকলে কি হোত বলা যায় না কিন্তু অস্থিরতা ও ধৈর্যের অভাব যাঁর মানসিক গঠনেরই বিশেষত্ব, দীর্ঘকালব্যাপী নিয়মাধীন ব্যাকরণ-নির্ভর পাঠাভ্যাস তাঁর পক্ষে কখনোই সম্ভবপর হোত কিনা সন্দেহ। শুষ্ক জ্ঞান ও বুদ্ধির দীর্ঘ সাধনার চেয়ে নিজের মনের আনন্দে রসচর্চাই ছিল তাঁর কাম্য। "মধুসূদন বহু ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সমস্ত শিক্ষার ও অধ্যয়নের নিষ্কর্ষ তাঁহার কাব্যানুরক্তি।"—এটি জীবনচরিতকারও লক্ষ্য করেছিলেন।[৬] নিছক ভাষাশিক্ষার প্রতি নিষ্ঠার অভাবেই এবং প্রবাসজীবনে বাংলা লিপিতে লেখার অনভ্যাসের ফলেই হয়তো বাংলা রচনার সময়ে কিছু তৎসম শব্দের বানানে ভুল থেকে গেছে।

৫ Adam's Report, অনাথনাথ বসু সম্পাদিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, page 28-29

৬ যোগীন্দ্রনাথ বসু, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৯৯।

সেকালের সংস্কৃত শিক্ষার প্রচলিত রীতির তুলনায় মধুসূদনের শিক্ষা ও চর্চা অভিনব। টোল-নির্ভর সংস্কৃত শিক্ষায় যে ব্যাকরণ অভিধান (শব্দার্থ ও প্রতিশব্দ) ছন্দ অলংকারই প্রধান ছিল সে কথা সংস্কৃত কমিশনের রিপোর্টে জানা যায়; অ্যাডামও একই কথা বলেছেন।

"The studies embraced in a full course of instruction in general literature and grammar, lexicology, poetry and drama and rhetoric, the chief object of the whole being the knowledge of language as an instrument for the communication of ideas."[৭] এই একদেশদর্শিতার ফলেই কালের অগ্রগতিতে মানবজীবনের প্রয়োজন ও মুক্তচিন্তার সঙ্গে সংযোগশূন্য হয়ে সংস্কৃত শিক্ষা নিষ্ফল হয়েছে, এ নিয়ে সুশীলকুমার দে-ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।[৮] সংস্কৃত ভাষায় যে বিপুল কাব্যসম্পদ ও তত্ত্বসম্পদ লুকিয়ে আছে, তার প্রতি আগ্রহ লুপ্ত হোতে বসল। ইংরেজ শাসকেরা প্রাচ্য শিক্ষাকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রচুর অর্থব্যয়ে কলেজ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরে, অনুবাদের ব্যবস্থা কোরেও এতে প্রাণসঞ্চার করতে বিফল হলেন। শেষ পর্যন্ত রামমোহন প্রমুখ মনীষীর সমর্থন ও মেকলের সুপারিশে এই সিদ্ধান্ত হোল যে, এরপর থেকে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থের অধিকাংশ ভারতবাসীদের মধ্যে ইয়োরোপীয় সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান• ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে প্রচারের জন্যই ব্যয় করা হবে (১৮৩৫)।

শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হোলেও সংস্কৃত চর্চা কখনই সম্পূর্ণ লুপ্ত হোয়ে যায়নি। তবে কাব্যপাঠের মান হোয়ে দাঁড়াল আলংকারিক রীতিনীতির প্রয়োগবিধি আর শাস্ত্র পাঠের ক্ষেত্রে এলো কেবল নিত্য প্রয়োজনের স্মৃতি-জ্যোতিষ-চর্চা। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পরে বিদেশীয় পণ্ডিতদের গবেষণার ফলে সংস্কৃতচর্চার নূতন পদ্ধতি প্রচলিত হোল। নানা পুরাণ কাব্য ইত্যাদির অনুবাদও করলেন তাঁরা। উইলিয়াম জোনস্, হোরেস হেম্যান উইলসন, কোলব্রুক প্রভৃতির অবদান এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এর ফলে সংস্কৃত ভাষার বিপুল সাহিত্য সম্পদ বিদ্বানমণ্ডলীতে একে একে উদ্ঘাটিত হোতে থাকে। সংস্কৃত ভাষাশ্রিত তত্ত্ব আলোচনারও নোতুন পরিমণ্ডল গড়ে উঠল রামমোহন রায়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখক গোষ্ঠীর অনুবাদ-আলোচনায়। এভাবে সংস্কৃত আর শুধু ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের চর্চার বিষয় হোয়ে না থেকে বৃহত্তর পরিধিতে ছড়িয়ে পড়ল। বিদ্যাসাগরের মতো পণ্ডিতও শকুন্তলা উত্তরচরিত মহাভারতের অনুবাদে উদ্যোগী হলেন। সংস্কৃত ভাষানুশীলন নোতুন তাৎপর্য নিয়ে গভীরতর অধ্যয়নের বিষয় হোয়ে উঠল, ঐতিহ্যের

৭ Adam's Repart, পূর্বোক্ত সংস্করণ, Page 176

৮ The place of Oriental Studies in our Educational System', Krishnagar College Centenary Commemoration Volume, 1948 দ্রষ্টব্য।

পুনরুদ্ধারে ব্রতী হলেন মনীষীরা, আর আমাদের রসরুচিও নোতুনভাবে তৈরি হোল।

মধুসূদনের সংস্কৃতচর্চাও এই নূতন পদ্ধতিতে। তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা বা গবেষণা করেননি, সে মানসিক প্রবণতাই তাঁর ছিল না। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের রসসম্পদকে নূতন কোরে কাজে লাগিয়েছেন নিজের রচনায়। মাদ্রাজে 'যখন কেবল ইংরেজি ভাষায় লিখছেন তখনও পড়ছেন ; আর কলকাতায় ফিরে যখন একের পর এক নাটক কাব্য লিখে চলেছেন তখনও সংস্কৃত সাহিত্য তাঁর মনকে জুড়ে আছে—তাঁর চিঠিপত্রেই তার প্রমাণ পাই। মাদ্রাজে থাকতে ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস ছাড়া আর কি পড়েছেন জানার উপায় নেই। তবে দেশে ফেরার পরে তাঁর পক্ষে কি ধরনের বই পাওয়া সম্ভব ছিল, সে বিষয়ে কিছু অনুমান করা চলে। লঙের ক্যাটালগ (১৮৫২) থেকে এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' থেকে পুস্তক প্রকাশ-বিষয়ক কিছু সংবাদ জানা যায়। অমরকোষ ছাপা হয়েছে কয়েকবার। সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ বেশির ভাগই ন্যায় স্মৃতি ব্যাকরণ ও ধর্মাচরণ সংক্রান্ত ; এগুলি সম্পর্কে মধুসূদনের আগ্রহ থাকবার কথা নয়। তবে অমরকোষ যে তিনি ব্যবহার করতেন তার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ আছে। পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী বিশেষ জনপ্রিয় ছিল বোঝা যায়, এগুলির অনুবাদ বা মূল কয়েকবার ছাপা হয়েছে। এই তিনখানি পুরাণকে মধুসূদন নানাভাবে কাজে লাগিয়েছেন। বিষ্ণুপুরাণ তিনি পড়েছেন তা অনুমান করারও কারণ আছে। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে বই আনতেন তিনি। সোসাইটির প্রেসিডেন্ট Horace Hayman Wi son এর Vishnu Purana, a system of Hindu Mythology and Tradition লণ্ডন থেকে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি অবশ্যই সেখানে এসে থাকবে। ভাগবত হরিবংশ এবং অন্য কিছু পুরাণের বহু কাহিনী প্রাচীনতর এই পুরাণটিতে সংক্ষিপ্ত আকারে পাওয়া যায়। নানা পৌরাণিক কাহিনী কালিদাসের কাব্যের মধ্যেও আছে ; শকুন্তলা কাহিনী মহাভারত ও পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে আছে, কুমারসম্ভবের কাহিনী স্কন্দ পুরাণের। এ ছাড়া রামায়ণ মহাভারত তো আছেই। বহু পৌরাণিক কাহিনী এই দুই মহাকাব্যের মধ্যেও (প্রধানতঃ মহাভারতে) আছে—কোথাও একই ভাবে, কোথাও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে। এই কয়েকখানি পুরাণ মহাকাব্য থেকেই মধুসূদনের সমগ্র সাহিত্যের উপাদান সংগৃহীত হয়ে থাকা অসম্ভব নয়।

মধুসূদনের সংস্কৃত শিক্ষা ও গ্রন্থপাঠ আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর প্রাচীন বাংলা কাব্যপাঠের কথা আলোচনা না করলে ধারণা অপূর্ণ থেকে যায়। কাশীরামদাসের মহাভারত এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণের শ্রীরামপুর সংস্করণ তাঁর চিরসঙ্গী ছিল। এ দুটি সংস্কৃত মহাকাব্যের আক্ষরিক অনুবাদ নয় ; বহু নূতন কাহিনী এতে সংযোজিত

হয়েছে, কিছু বা পরিত্যক্ত হয়েছে আর বাঙালীর মানসিক প্রবণতার ফলে ঘটনা বর্ণনা বা চরিত্র হয়েছে পরিবর্তিত। সূক্ষ্ম বিচারে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার কারণ আছে যে মধুসূদন বাল্মীকির রামায়ণ ভালোভাবে পড়েছেন, নানাভাবে কাজেও লাগিয়েছেন আক্ষরিক ভাবেই ; কিন্তু কাহিনীর ক্ষেত্রে যেখানে বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসে পার্থক্য আছে, তিনি সেখানে কৃত্তিবাসকেই অনুসরণ করেছেন। ব্যাসের মহাকাব্য পড়ে থাকলেও এবং কোথাও কোথাও ব্যাস-কাব্য থেকে কিছু বর্ণনা বা বিশেষণ গ্রহণ করে থাকলেও প্রধানতঃ তিনি কাশীরামকেই নির্ভর করেছেন বলে মনে হয়েছে। কেবল প্রমীলা কাহিনী সংযোজনে নয়, চতুর্দশপদী কবিতার বিভিন্ন কাহিনীতে' বীরাঙ্গনার ভানুমতী-দুঃশলা পত্রিকার নানা ঘটনাতে, অলংকার চিত্রকল্প ব্যবহারে বা প্রসঙ্গোল্লেখের মধ্যে তার পরিচয় আছে।

এছাড়াও মধুসূদন যে বৈষ্ণব পদাবলী, মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্রের আখ্যানকাব্য পড়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা উঁচু ছিল না। বাল্যকালে মায়ের কাছে এবং গ্রামের পাঠশালায় বাংলা শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল। হিন্দুকলেজে বাংলা পড়ানো হোত ঠিকই কিন্তু তার মান তেমন উঁচু ছিল না সে কথা রাজনারায়ণ বসু বলেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে ; বাংলা পাঠ্য-পুস্তকের নামও জানা যায় নি। সবচেয়ে বড়ো কথা বাংলা ভাষাচর্চার কোনো আগ্রহই মধুসূদনের ছিল না। ইংরেজীতে কাব্য লিখে অমর হবার আকাংক্ষা তাঁকে মাতৃভাষা সম্পর্কে বিরূপ করেছিল। তবে এ-ভাষা সম্পর্কে তাঁর সহজাত সংস্কার ছিল, পরে যখন বাংলায় মহাকাব্য রচনায় উদ্যত হলেন তখন এই দৃঢ় প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছিলেন যে সংস্কৃতের দুহিতা বাংলার সুউচ্চ ভাব-কল্পনাকে ধারণ করবার, অমিত্রাক্ষরের উদাত্ত সঙ্গীত ধ্বনিত করবার উপযোগী অবশ্যই। নবযুগের প্রাণরসধারা ছিল ত্রিপথগা —ইংরেজী সংস্কৃত ও বাংলা। প্রথম দুটির চর্চা তিনি করেছেন ছাত্রজীবন থেকে। সেকালে বাংলা শিক্ষার জন্য শাসকশ্রেণী এবং দেশীয় মনীষীরা উদ্যোগী হয়েছিলেন, বাংলা ইস্কুলে শিক্ষা নিয়ে যারা হিন্দু কলেজের অধীন হিন্দুস্কুলে পড়তে যেত তারাই ফল বেশী ভালো করত ; স্বনামধন্য ইংরেজিনবীশ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও আরপুলির বাংলা পাঠশালার ছাত্র ছিলেন প্রথমে।[৯] ১৮৩৫-এর পরে সরকার আর বাংলা শিক্ষার বিষয়ে সহায়তা না করলেও ১৮৫৬-তে বিভিন্ন জেলায় মডেল স্কুল স্থাপনের ভার ন্যস্ত হয়েছিল বিদ্যাসাগরের ওপরে। যখন শিক্ষাধারাতে ক্রমশঃ ইংরেজীর প্রতি প্রবণতা দেখা দিচ্ছিল, সে সময়েই মধুসূদন কলকাতায় আসেন, পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণের নেশায় তিনি বাংলাকে সম্পূর্ণ বর্জন কোরে বিজাতীয় ভাবকে প্রকট কোরে তুলেছেন। বঙ্গবাণী একদিন ভালোভাবেই এর প্রতিশোধ নিলেন !!

৯ এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার জনশিক্ষা (১৮০০-১৮৫৬), বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী, ১৩৫৬

॥ ২ ॥

দেশীয় ভাব ও সংস্কৃতির সঙ্গে ইয়োরোপীয়ের সংমিশ্রণ যেমন বাংলার রেনেসাঁস যুগের লক্ষণ, মধুসূদনের সাহিত্যেও তাই। পাশ্চাত্ত্য জীবনবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি যে কাহিনীর আধারে তিনি প্রকাশ করেছেন সেটি সর্বত্রই ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্য থেকে নেওয়া। পুরাণ কথাটি এখানে একটু বিস্তৃত অর্থে গ্রহণ করা হোল। পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং—কালিদাস যে অর্থে কথাটি ব্যবহার করেছেন, সেই অর্থই এখানে গৃহীত হোল, অর্থাৎ যা কিছু প্রাচীন। পঞ্চলক্ষণযুক্ত পুরাণ, উপ-পুরাণ, মহাকাব্য, ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্য এমন কি প্রাচীন বাংলা কাব্যকেও তাই ভারতীয় পুরাণের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। পাশ্চাত্ত্য পুরাণের কাছে তাঁর ঋণের সম্পর্কে অনবহিত নই, তবু সে-প্রসঙ্গ বর্তমানে আমাদের আলোচনা-পরিধির বাইরে। সমকালীন সামাজিক জীবনের উপাদান সম্বলিত প্রহসন দুটি, কৃষ্ণকুমারী মায়াকানন নাটক দুটি এবং কিছু চতুর্দশপদী বা খণ্ড কবিতা ছাড়া তাঁর সব বাংলা রচনারই কাহনী প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের। হেকটরবধ ইলিয়াডের অসমাপ্ত গদ্যানুবাদ, সেখানেও তিনি অনেকাংশে ভারতীয় রূপ নিয়ে এসে অভিনব কোরে তুলেছেন। ইংরেজি Captive Lady-তে সংযুক্তা পৃথ্বিরাজের প্রণয়-মিলন-আত্মাহুতির লোকশ্রুতিনির্ভর কাল্পনিক কাহিনী, কিন্তু সেখানেও ভারতীয় কথার প্রভাব কবি নিজেই উল্লেখ করেছেন। গৌরদাস বসাককে ১৮৪৯, ১৯ মার্চ লিখছেন—

Pray tell Bhoodeb that when he gets my Poem, he will be surprised at my knowledge of Hindu Antiquities, for it is a *through* Indian work, full of Rishis-Calis, Lutchmees-camas, Rudras and all the Devils incarnate, whom our orthodox fathers worshipped.

কৃষ্ণকুমারীতে কাহনী টডের রাজস্থান থেকে নেওয়া, ঐতিহাসিক কাহিনীর পাত্র-পাত্রীর মুখেও উপমা-অনুষঙ্গ রূপে বহুবার পুরাণ প্রসঙ্গ এসেছে। মৃত্যুর প্রাক্‌ মুহূর্তে রুগ্নাবস্থায় রচিত মায়াকাননের কাহিনী ও পাত্র পাত্রী তাঁর স্বকপোলকল্পিত হোলেও তা অর্ধবাস্তব, চরিত্রগুলি মহাভারতীয় রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কিত, স্থানের নাম পুরাণ মহাকাব্যের আর সংলাপে সর্বদাই মহাকাব্যের প্রসঙ্গ। এতে বোঝা যায় পুরাণ কাহিনী তার মজ্জায় মিশে ছিল।

প্রথমে আমরা কাহিনীর উৎস বিন্যাস আর চরিত্রের দিক দিয়ে এবং পরে সংক্ষেপে শৈলীতে তাঁর প্রাচ্য উত্তরাধিকার বিচারের চেষ্টা করব। কেবল তথ্যসংগ্রহ এই বিচারের উদ্দেশ্য নয়, মধুসূদনের কবিমানসের প্রকৃত স্বরূপটিই ধরা সম্ভব হবে

এর ফলে। মহাকবি হোতে হোলে বিদেশীয় ভাষায় নয়, মাতৃভাষাতেই কবিত্বশক্তির বাণীরূপ সৃষ্টি করতে হবে—বেথুন সাহেবের এই উপদেশের আগেই যে মধুসূদনের মনে বঙ্গভাষায় কাব্যরচনার আকাঙ্ক্ষা জাগেনি এমন বলা যায় না। বিভিন্ন ভাষাচর্চার কথা জানাতে গিয়ে ১৮৪৯ এর ১৮ আগস্ট বন্ধু গৌরদাসকে লিখেছেন—Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers? তবু প্রস্তুতিপর্ব দীর্ঘ হয়েছে। সুযোগ আসতেও হয়েছে দেরি। প্রাণ-ধারণের জন্য অর্থ উপার্জন করতে মাদ্রাজে থেকে ইংরেজিতে লেখা ছাড়া কি বা করার ছিল? পিতার মৃত্যুর পরে সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য ফিরে এলেন কলকাতায়। পুলিস আপিসে দোভাষীর কাজ করতে করতেই সুযোগ ঘটল কলকাতার সাহিত্যসেবীদের সঙ্গে পরিচয়ের; উপস্থিত থাকলেন বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই অভিনীত রামনারায়ণ তর্করত্নের অনুবাদ নাটক রত্নাবলীর অভিনয়ে। বিদেশী দর্শকদের জন্য ইংরেজি অনুবাদও কোরে দিয়েছিলেন; কিন্তু বাংলা নাটকের অকিঞ্চিৎ-করত্বে পীড়া বোধ করলেন। এই দৈন্যমোচনের জন্য তিনি স্বয়ং উদ্যোগী হোয়ে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে সংস্কৃত নাটক এবং তৎকাল-প্রচলিত বাংলা নাটকগুলি পড়ে ফেললেন। কি কি গ্রন্থ তিনি পড়েছিলেন জানা যায় না, এত পুরোনো রেকর্ড সোসাইটিতে রাখা হয়নি। তবু কালিদাস ভবভূতির নাটকগুলি এ সময়ে অথবা আগেই পড়েছিলেন। তার পরিচয় আছে শর্মিষ্ঠা নাটকে তাঁদের ছায়ানুসরণে এবং অনেক জায়গায় আক্ষরিক অনুবাদে। কাহিনীর সূত্রই পেয়েছিলেন অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এ পতিগৃহগমনকালে শকুন্তলার প্রতি কণ্বের আশীর্বচন শ্লোক থেকে, এমন মনে করা চলে।[১০] রামনারায়ণের কুলীনকুলসর্বস্ব বা তারাচরণ শিকদারের নাটক দুটির মতো দুচারটি সামাজিক নাটক ছাড়া তখনকার নাটক ছিল সংস্কৃতের অনুবাদাশ্রিত। এর মধ্যে ছিল বিক্রমোর্বশী, বেণীসংহার-এর অনুবাদ, আর ছিল বিদ্যাসুন্দর কাহিনী। মধুসূদনের প্রথম নাটক শর্মিষ্ঠার কাহিনী নেওয়া হয়েছে মহাভারতের আদিপর্বে আদিবংশাবতরণিকার যযাতি উপাখ্যান থেকে। বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতিতেও এই কাহিনী আছে, তবে তিনি মহাভারত থেকেই নিয়ে থাকবেন। পূর্বাপর সবটা কাহিনী না নিয়ে নাট্যসংঘাত সৃষ্টির উপযোগী অংশই শুধু নিয়েছেন, আধুনিক ঔচিত্যবোধের ফলে কোথাও বা সামান্য পরিবর্তনও করেছেন। তাঁর প্রথম নাটকটিতে কাহিনী এসেছে মহাভারত থেকে (প্রধানতঃ কাশীরাম), ছায়া পড়েছে কালিদাস ভবভূতির (সংলাপে শকুন্তলা, কুমারসম্ভব বা উত্তরচরিতের কিছু আক্ষরিক অনুবাদে), পাশ্চাত্ত্য নাটকের আঙ্গিক সচেতনভাবে

১০। দ্রষ্টব্য, সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ৭ম সং, পৃঃ ৬৮

গ্রহণ করার চেষ্টা[১১] সত্ত্বেও সংস্কৃত নাটকের নানা লক্ষণই রয়ে গেছে[১২]—এতে বিস্মিত হবার কেছু নেই। কেবল প্রথম প্রচেষ্টা বোলেই এই দ্বিধা তা নয়; যাঁর সমগ্র সাহিত্যসাধনাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলনে গড়ে উঠেছে তাঁর পক্ষে এটাই তো স্বাভাবিক। সাহিত্যদর্পণকারের বিধান না মেনে পাশ্চাত্য আদর্শেই নাটক লিখতে চেয়েছিলেন তিনি। "I shall not allow myself to be bound by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya Darpana. I shall look to the great dramatists of Europe for model.[১৩] শর্মিষ্ঠাতে 'foreign air' সৃষ্টিতে তিনি সচেতন হোলেও সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের ভাবালু মন্থরগতির সংলাপ রয়ে গেল। সানন্দে গৌরদাসকে জানিয়েছেন—Jotindra says it is the best drama in the language, "chaste, classical and full of genuine poetry!"[১৪] নাট্য-গতিবেগ সঞ্চারের চেয়ে কাব্যিয়ানার দিকেই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, গতিও মন্থর। সংস্কৃত নাটকেও দ্বন্দ্ব সংঘাতের চেয়ে সৌন্দর্য ও কবিত্বের দিকেই লক্ষ্য বেশী থাকত। পরিসমাপ্তিতেও ব্যর্থতা ও অপচয়জনিত হাহাকারের বদলে শান্তি ও পরিতৃপ্তি। শর্মিষ্ঠা কাহিনীতে ট্র্যাজেডি সৃষ্টির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এটিকে মিলনান্তক করা হোল, এতে সংস্কৃত নাটকেরই প্রভাব সূচিত হয়।

পদ্মাবতী নাটকেও পরিসমাপ্তিতে সংস্কৃতের মতো সংগীত সংযোজন ও ভরতবাক্যের মতো স্বস্তিবাচন আছে। ঘটনার সূচনায় গ্রীক পুরাণের Apple of Discord-এর অনুসরণ থাকলেও পরবর্তী কাহিনী তাঁর কল্পিত, সেখানে ঘাত প্রতিঘাতের স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরণ এবং সংক্ষিপ্ত সংলাপের মধ্য দিয়ে পাত্র পাত্রীর হৃদয়ের অনুভূতির পরিচয় বা পরিণতিমুখী দ্রুতগতির বদলে আছে আবেগ বিহ্বল উচ্ছ্বাস, অতিঅলংকৃত মন্থর দীর্ঘ সংলাপ এবং কাহিনীতেও আছে রূপকথার ছাপ। শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী দুই নাটকেই সংস্কৃতের অনুসরণে শৃঙ্গার বিষয়ে রাজাকে সাহায্য ও হাস্যরস সৃষ্টির জন্য বিদূষক চরিত্রের অবতারণা আছে। পদ্মাবতীতেও শকুন্তলা ও বিক্রমোর্বশীর নানা সংলাপ বা শ্লোকের আক্ষরিক অনুসরণ দেখি। এ নাটকে রামায়ণের উল্লেখ আছে চোদ্দবার এবং মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণের প্রসঙ্গ ষোলবার। এ ছাড়াও নানা স্থানে পদ্মাবতীকে সীতার সঙ্গে অভিন্ন কোরে দেখানো

১১। সংস্কৃত নাটকে পাঁচ থেকে দশটি অংক থাকে কিন্তু সেগুলি দৃশ্যে বিভক্ত নয়। তিনি সেক্সপীয়রীয় নাটকের আদর্শে পাঁচটি মাত্র অংক সন্নিবদ্ধ করেছেন, সেগুলি আবার দৃশ্যে বিভক্ত; ইংরেজি আদর্শেই নাটকের ক্রিয়াবিন্যাসকে ক্রমবিন্যাসে তুঙ্গতা এবং পরিণতিতে নিয়ে আসা হয়। সংস্কৃত নাটকে ভাবরসের দিক দিয়ে এই ক্রমবিন্যাস।

১২। প্রথম সংস্করণে প্রস্তাবনা হিসাবে একটি গান ছিল। নান্দী, সূত্রধর, পারিপার্শ্বিক, প্রবেশক, বিষ্কম্ভক ইত্যাদি স্পষ্টতঃ না থাকলেও বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর উক্তি বা আচরণ-এর আভাস আছে।

১৩। রাজনারায়ণ বসুকে পত্র—১৫. ৫. ১৮৬০

১৪ গৌরদাস বসাককে পত্র—৯. ৯. ১৮৫৯

হয়েছে। বোঝা যায় সেক্সপীয়রের আদর্শে নাটক রচনার বাসনা থাকলেও দৃশ্যকাব্যের সংস্কার বিসর্জন দিতে পারেন নি, মনটিও বিচরণ করেছে পুরাণ মহাকাব্যের জগতে, যে সব কাহিনী দেহে প্রাণবায়ুর মতোই তাঁর কল্পনার সঙ্গে একাত্ম হয়েছিল। কৃষ্ণকুমারী যদিও ট্র্যাজেডির হাহাকারে পরিসমাপ্ত, চরিত্রগুলিও অনেকাংশে কর্মতৎপর, তবু সংস্কৃত নাটকের প্রাণয়তন্ময়তাই কৃষ্ণারও চরিত্রের প্রধান লক্ষণ, তার সখী-সম্ভাষণের ভাষা শকুন্তলার মতো। প্রকৃতির মধ্যে মানবমনের সুখদুঃখ প্রতিফলনের দ্বারা তাকে মানবজীবনের পটভূমিকা কোরে তোলা কালিদাসেরই অনুসরণ। এ নাটকের ভাষা কিছুটা দ্বন্দ্বগর্ভ গতিধর্মী হোলেও পৌরাণিক উল্লেখ সেখানেও বাক্-প্রতিমায় দেহলাবণ্যের মতো একাকার হোয়ে আছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কটির লঘু প্রেমবিষয়ক আলোচনার মধ্যেই পৌরাণিক প্রসঙ্গ এসেছে এগারো বার ; একে বহিরঙ্গ অলংকরণ বলা চলে না, বক্তব্য বিষয়টিই এই ভাষাভঙ্গি অবলম্বন কোরে পরিস্ফুট হোয়ে উঠেছে। এজন্যই 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-র মতো তীক্ষ্ণ সামাজিক প্রহসনেও মহাভারতীয় প্রমীলা-কাহিনীর অপ্রত্যাশিত উল্লেখও যেমন সার্থক তেমনি হাস্যরস সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। মায়া কাননে পৌরাণিক প্রসঙ্গ বোধ করি সর্বাধিক। বাস্তব জগতের বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা ও ব্যর্থতাবোধ কবি মধুসূদনকে দৈনন্দিনতার মালিন্যে নামিয়ে আনতে পারেনি, তাতে বিস্ময় বোধ হয়।

মধুসূদনের রাবণের সমুদ্রের সঙ্গে ছিল সখ্যবোধ। রাবণ তো কবির আত্মবিম্ব। তাঁরও মন সমুদ্রের উদার বিস্তার আর পর্বতের উন্নত মহিমায় আকৃষ্ট হোত। তাঁর প্রথম কাব্য তিলোত্তমাসম্ভবের প্রথমেই যে তপঃমগ্ন মহাদেবের মতো দেব আত্মা হিমালয়ের চিত্র, সেটা বিশেষ অর্থবহ। উদাত্তগম্ভীর সুদূরবিস্তারী কল্পনা তাঁর মানস-বৈশিষ্ট্য। তাই প্রাত্যহিকতা লাঞ্ছিত সমসাময়িক জীবনের কাহিনী তিনি অবলম্বন করেন নি কোথাও। প্রহসন দুটিতে যদিও তাঁর বিশেষ শক্তির পরিচয় আছে তবু তাঁর মনে হয়েছে সেগুলি না লিখলেই ভালো হোতো। "I half regret having published those two."[১৫] বরং তাঁর বাসনা ছিল আরও তিনচার খানা 'classical kind'-এর নাটক রচনার।[১৬] পুরাণের কাল্পনিক জগতে তাঁর মন মুক্তি পেতো ; ব্যবহারিক জীবনের ভাষাকে পরিত্যাগ কোরে উদাত্ত বিশাল ভাবের উপযোগী ক্লাসিক্যাল ভঙ্গির দৃঢ়বন্ধ ধ্বনিবহুল ভাষাসৃষ্টি ছিল তাঁর সাধনা। বাংলার প্রচলিত তরল সমিল পয়ার-ত্রিপদী ছেড়ে মিলটনের অনুকরণে যে অমিত্রাক্ষর ছন্দোবন্ধের প্রবর্তন করলেন, কেবল মিলের অভাব তার বড়ো লক্ষণ নয় ; পয়ারের কাঠামোতেই ভাবকে প্রবাহিত করে দিয়ে ভাবোপযোগী গম্ভীর ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি তার বৈশিষ্ট্য। বাসনার তীব্র আর্তি, অতল বেদনার হাহাকার, প্রকৃতির মহিমান্বিত রূপ—সবই এই ছন্দের সমুদ্রকল্লোল ধ্বনিতে রূপ লাভ করে ; মধুর কোমল ভাব প্রকাশেও অনুপযোগী

১৫ রাজনারায়ণ বসুকে পত্র, ২৪.৪.১৮৬০।

১৬ তদেব।

নয়। কবির শব্দসজ্জাকৌশলই এর যাদুমন্ত্র। বাংলাতে এই ছন্দ ব্যবহার সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে সেকালের কারো কারো মনে সংশয় থাকলেও মধুসূদনের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল সংস্কৃত-দুহিতা বাংলাভাষাতে blank verse-এর সার্থক রূপায়ণ সম্ভব। কেবল পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য নয়, মানস কল্পনার উপযোগী গম্ভীর ভাষারূপ ও ছন্দ তৈরি করে নেওয়া ছাড়া তাঁর উপায় ছিল না। তিলোত্তমাসম্ভব দেবলোকের মহাভারতীয় কাহিনীকে নিয়ে মহাকাব্যধর্মী আখ্যানকাব্য। নূতন ছন্দ সৃষ্টির উল্লাসে এবং সৌন্দর্যের খণ্ড চিত্র রচনার নেশায় কাহিনী তেমন দানা বেঁধে ওঠেনি, ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে কখনও দেবতাদের কখনও বা দৈত্যভ্রাতাদের স্থাপিত করায় লক্ষ্যবিচ্যুতি ঘটেছে আর রোমান্টিক সৌন্দর্য পিপাসার আতিশয্যে ক্লাসিক্যাল রূপবন্ধও বারে বারে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আসলে তিনি নিজেই কাহিনী গ্রন্থন বা চরিত্র চিত্রণের প্রতি বা কবিত্ব শক্তির প্রয়োগের দিকে তখন ততোটা সচেতন ছিলেন না, যতোটা ছিলেন ছন্দ সম্পর্কে। এই কাব্যের সেকালে যাঁরা সমালোচনা করেছিলেন তাঁরাও এর ভাষা ও ছন্দের কথাই বিশেষ করে বলেছিলেন। তবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্য সত্য—"আমরা মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভব প্রকাশ হইতে নূতন সাহিত্যের উৎপত্তি ধরিয়া লইব।" এটি আধুনিক যুগের প্রথম প্রয়োজন নিরপেক্ষ সৌন্দর্যবন্দনা ও মর্ত্যপ্রীতির কাব্য, নিসর্গ সৌন্দর্য-সচেতনতার প্রথম নিদর্শন আর কল্পনার উদাত্ত বিশালতার ক্লাসিক মহিমা-মণ্ডিত হয়েও রোমান্টিক কবিমনের পরিচায়ক। শেলী কীট্‌স্‌ প্রভৃতির সৌন্দর্যচেতনা আত্মসাৎ কোরে নিয়েও মিলটনের ছন্দের সমুদ্র গর্জনধ্বনি সৃষ্টি করলেন মধুসূদন অথচ কাহিনীটি নিলেন মহাভারতের আদিপর্বের ২০৯-২১২ অধ্যায় থেকে। এ কাব্যে ভারতীয় ভাবটি প্রধান হয়ে উঠতে পারেনি, কবি মহাভারতের কাহিনীটির যথাযথ তাৎপর্যকে রক্ষা করার চেষ্টা করেননি, স্বল্প কাহিনীর সঙ্গে নিজের কল্পনা এবং বিদেশী নানা কাব্যের ছায়া মিশিয়ে নিয়েছেন বোলে এর কাহিনী ক্রমপরিণতিতে ক্লাইমেক্স-সমন্বিত organic whole হোয়ে উঠতে পারেনি, গল্পও কেবল আভাসেই আছে। কবির নিজেরও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রথমাবধি ছিল না, সম্পূর্ণ বাইরের কারণে (যতীন্দ্র মোহনের ছাপাবার খরচ সম্পর্কে ভাবনা) এর সর্গসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।[১৭] তবু এ কাব্যের বিশেষত্ব এর sublimity। মধুসূদনের কাছে পত্রে যতীন্দ্রমোহন এই গুণ এবং 'uncommon splendour of diction-এর উল্লেখ করেছিলেন। রাজনারায়ণ বসুও The Indian Field for 2 Feb, 1861-তে এর বিবিধ গুণের সঙ্গে বিশেষ কোরে কল্পনার 'loftiness' এবং ভাষা ও চিত্রকল্পের সুউচ্চ মহিমার কথা বলেছিলেন। প্রথম কাব্যটিতে কবির সর্বাত্মক ঋদ্ধি আশা করা অন্যায়, তবু এর কাহিনী চরিত্র চিত্রকল্প অলংকরণ ইত্যাদির পরিচয় নিলে তাঁর পরবর্তী কাব্যগুলির সম্ভাবনার সূত্র পাওয়া যায়। লক্ষণীয় যে কাব্যদেহ

---

১৭ দ্রষ্টব্য রাজনারায়ণ বসুকে লেখা পত্র, ১৮৬০, তারিখ নেই।

অলংকরণে এক্ষেত্রে তিনি প্রধানতঃ ভারতীয় সাহিত্যের আশ্রয়ই নিয়েছেন যদিও সে-ঋণ তখনও অনেকটা অনুকরণ রয়ে গেছে, আত্মীকরণে পর্যবসিত হোতে পারেনি। উপমা, চিত্রকল্প, অনুষঙ্গে ভারতীয় প্রাচীন কথা এসেছে সর্বদা ; সে উল্লেখ সংখ্যাগত দিকে মেঘনাদবধ কাব্যের চেয়ে বেশি। দেব চরিত্র ফুটিয়ে তোলায়ও পুরাণ-পরিচয়ের প্রমাণ মেলে। একটি ছোট উদাহরণ নেওয়া যাক্। ব্রহ্মা সম্পর্কে দেবতারা বলছেন —"তুষ্ট তিনি/তপে ; যে তাঁহারে ভক্তিভাবে ভজে,/তাঁর তিনি বশীভূত।" শিবপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, রামায়ণ প্রভৃতিতে হিরণ্যকশিপু, শুম্ভনিশুম্ভ, তারকাসুর, বলি, রাবণ, বীরবাহু, অতিকায়, ধূম্রলোচন, নিবাতকবচ প্রভৃতির কাহিনীতে দেখা যায় ব্রহ্মাই তপে তুষ্ট হয়ে তাদের অবধ্য থাকার বর দিয়েছিলেন, তাতে দেবতাদের কম দুর্গতি হয় নি। বর্তমান কাহিনীর সুন্দ উপসুন্দও ব্রহ্মার বর লাভ কোরেই দেবতাদের স্বর্গভ্রষ্ট করেছিল।

দেবতাদের চরিত্র বা রূপবর্ণনায় আছে পুরাণের অনুসরণ, মূল ঘটনায় মহাভারতের অনুসরণ আর এ কাব্যে নিসর্গ বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রেই কালিদাসের অনুসারী। মহাভারতে এই কাহিনীতে যে তাৎপর্য ও নীতির কথা আছে তার সঙ্গে মধুসূদনের যোগ নেই, ইন্দ্রকে নায়ক কোরে কাহিনীর সূত্রপাত হলেও কবি-মনের সহানুভূতি গেছে দৈত্যদের প্রতি—এতে মেঘনাদবধ কাব্যের পূর্বাভাস মেলে। তবু মেঘনাদবধ কাব্যে ঘটনাকে বিশ্বাসযোগ্য স্থান-কালে সন্নিবেশিত কোরে যে বাস্তব ভিত্তি গড়ে তোলা হয়েছে, এখানে তেমন নেই। আর নেই সেই সর্বব্যাপী মানসিকতা—যা তাঁর পাশ্চাত্ত্য উত্তরাধিকার। কালিদাসকে নানাভাবেই অনুসরণ করেছেন ; কুমারসম্ভব কাব্যে অকালবসন্ত সমাগমের চিত্রের মতো শচীপাদস্পর্শে রিক্ত ধবলগিরিতে সৌন্দর্যসঞ্চারের চিত্র এদিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সৌন্দর্য দর্শনের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীটি পাশ্চাত্ত্য প্রভাবজাত হলেও এ কাব্যে যে চিত্রমালা কবি রচনা করলেন তা প্রধানতঃ ভারতীয় সাহিত্য থেকেই অর্জিত। প্রথম কাব্যটিতে কবি ভারতীয় ভাবধারা এবং প্রয়োগরীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ রেখেছেন এই তথ্যটুকু মূল্যবান।

মেঘনাদবধ কাব্যের মূল কাহিনীর উৎস সুবিদিত। লংকার বহুশত বীর যোদ্ধা যখন রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত, তখন লক্ষ্মণের হাতে প্রিয় পুত্র মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণের শোক রোষবহ্নি হয়ে জ্বলে ওঠে ; প্রচণ্ড যুদ্ধে সে লক্ষ্মণকে শক্তি-শেলাহত করল। যুদ্ধকাণ্ডের এই কাহিনী মধুসূদনের মূল উপজীব্য। তবু রামায়ণে ইন্দ্রজিতের মৃত্যু তেমন তাৎপর্যময় হোয়ে ওঠেনি। আর আধুনিক কবি এর মধ্যে বিশেষ কাব্যিক সার্থকতার সম্ভাবনা অনুভব করেছেন। একেই কেন্দ্রীয় ঘটনারূপে স্থাপন কোরে তিনি কাহিনী বিন্যাস করেছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের ষষ্ঠসর্গে ইন্দ্রজিৎ বধে কাহিনীর climax, সপ্তম সর্গে তারই প্রতিক্রিয়া।

নয় সর্গ সমন্বিত এই মহাকাব্যটিতে এইটুকুই রামায়ণ থেকে নেওয়া। অন্য সর্গগুলির কাহিনী তিনি নিজের কল্পনা দিয়ে সাজিয়েছেন, যদিও রামায়ণের সঙ্গে অসঙ্গতি নেই। এই দুই সর্গেও তিনি নিজের কাব্যিক প্রয়োজনে কাহিনীর কিছু পরিবর্তন করেছেন। বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে কৃত্তিবাস রামায়ণেরও কাহিনীতে কিছু পার্থক্য আছে। মধুসূদন প্রয়োজনমতো বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করেছেন; কোথাও উভয়ের সঙ্গেই প্রভেদ। 'কাব্যখানির কেন্দ্রীয় ঘটনা নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মায়ার প্রভাবে অদৃশ্যভাবে প্রবিষ্ট লক্ষ্মণের হাতে একাকী নিরস্ত্র মেঘনাদের উষাকালে মৃত্যু। রামায়ণে কাহিনী অন্যরকম। সেখানে নিকুম্ভিলা বদ্ধ যজ্ঞাগার নয়, নীল মেঘতুল্য এক বটবৃক্ষমূলে নিকুম্ভিলা। কৃত্তিবাসেও আছে, "রয়েছে আশ্রয় করি বটবৃক্ষতলা। যজ্ঞসহ তাহাবে মারহ এই বেলা॥' যজ্ঞসমাপনে ভুতদের উপহার দেবার পরে যুদ্ধে গেলে মেঘনাদ অদৃশ্য হোয়ে শত্রুবধ করে, তাই তার আগেই লক্ষ্মণ যুদ্ধ আরম্ভ করল। বহু রাক্ষস নিহত হচ্ছে দেখে মেঘনাদ যজ্ঞসমাপন না কোরেই যুদ্ধে গেল, প্রবল যুদ্ধে বহুসৈন্য পরিবৃত মেঘনাদের রথ ও সারথি বিনষ্ট হোল; সে লংকায় গিয়ে আবার সুসজ্জিত রথ ও অশ্ব নিয়ে এলো। শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মণ-নিক্ষিপ্ত ঐন্দ্রাস্ত্রে তার মৃত্যু। লক্ষ্মণ বানর সেনা পরিবেষ্টিত হোয়ে বিভীষণসহ প্রকাশ্যভাবেই নিকুম্ভিলায় এসেছিল। অদৃশ্য বা অশ্রুত থেকে নয়।—

> বিভীষণেন সহিতো রাজপুত্রঃ প্রতাবান্।
> অঙ্গদেন চ বীরেণ তথানিলসুতেন চ॥
> বিবিধমমল শস্ত্রভাস্বরং তদ্ ধ্বজ গহনং গহনং মহারথৈশ্চ।
> প্রতিভয়তমমপ্রমেযবেশং তিমিরমিব দ্বিষতাং বলং বিবেশ॥
>
> —যুদ্ধকাণ্ড ৮৫, ৩৫-৩৬

এই প্রচণ্ডযুদ্ধে ঋষিরা, ইন্দ্রাদি দেবতাবা এবং গন্ধর্ব প্রভৃতি লক্ষ্মণকে রক্ষা করবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেন। মধুসূদনের কাব্যে তেমন কোনো প্রয়োজনই সৃষ্ট হয়নি। সময়টাও রামায়ণে সূর্যাস্তকাল। বাল্মীকির বর্ণনায় ইন্দ্র যে শরে দানবদের জয় করেছিলেন সেই ঐন্দ্রাস্ত্র দিয়ে মেঘনাদের শিরশ্ছেদ হয়েছিল। কৃত্তিবাস বলেছেন লক্ষ্মণ নানাবিধ বাণ নিক্ষেপ করার পরে "ব্রহ্মাস্ত্রে পুরিল সন্ধান", সেই বাণেই "ইন্দ্রজিৎ মাথা কাটি করে দুই খান।" মধুসূদন তাঁর কাব্যের সমগ্র দ্বিতীয় সর্গ ব্যয় করেছেন ইন্দ্রজিৎকে মারবার জন্য দেবতাদের অস্ত্র সংগ্রহ কাহিনীতে। বৃষধ্বজ রুদ্রতেজে যে শক্তি-অস্ত্র তৈরী করেছিলেন, তা দিয়ে কার্তিকেয় অসুর নিধন করেছিলেন, মায়াদেবীর কাছে রক্ষিত সেই অস্ত্রই সংগৃহীত হয়েছিল। পুরাণ কাহিনীতে কিন্তু এই শক্তি অস্ত্র তৈরি করেছিলেন বিশ্বকর্মা—সূর্যের জাজ্বল্যমান্ বৈষ্ণবতেজ থেকে। রামায়ণে ইন্দ্রজিতের নানা রাক্ষসীয় মায়া অবলম্বনের কথা আছে, মধুসূদন রাক্ষসদের কোনো মায়ার আশ্রয়ের উল্লেখ করেননি। ইন্দ্রজিৎ রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে এর আগে

তিনবার যুদ্ধ করেছে। একবার তাঁদের নাগপাশে আবদ্ধ করেছে, দ্বিতীয়বার তাঁদের সম্মোহিত করেছে, তৃতীয়বারে মায়াসীতা বধ করেছে। মধুসূদন প্রথম দুবারের যুদ্ধের কথা কয়েকবার উল্লেখ করেছেন কাব্যে, কিন্তু শেষবারের হীন ছলনার উল্লেখ কোথাও নেই ; তাঁর favourite মেঘনাদের এমন আচরণ তাঁর কল্পনায় আসে না।

এই সর্গের ঘটনাকে নানা দিক দিয়েই পরিবর্তিত কোরে নিলেও মেঘনাদ বিভীষণের সংলাপে তিনি বাল্মীকিকে প্রায় সম্পূর্ণতঃ অনুসরণ করেছেন। বিভীষণের আচরণে মেঘনাদের ক্ষোভের সীমা নেই। কিন্তু ঘৃণার সঙ্গে সে সম্ভ্রমও প্রকাশ করেছে। দেশদ্রোহী পিতৃব্যের প্রতি বীর দেশপ্রেমিক সৈনিকের অসীম অশ্রদ্ধাও আছে। বিভীষণকে লক্ষ্মণের সঙ্গে দেখে বিস্ময়-বিমূঢ় মেঘনাদের উক্তি বাল্মীকির—

ইহ ত্বং জাতসংবৃদ্ধঃ সাক্ষাদ্ভ্রাতা পিতুর্মম।

কথং দ্রুহ্যসি পুত্রস্ব পিতৃব্যো মম রাক্ষস॥-এরই আক্ষরিক অনুসরণ। বিভীষণ রাবণের দোষের উল্লেখ কোরে বলেছে-"নিজকর্মদোষে,হায় মজাইলা/এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি! বাল্মীকির ভাষায়—

হিংসাপরদারস্যাহরণো পরদারাভিমর্শনম্।

সুহৃদমহিতাকাঙ্ক্ষা চ ত্রয়ো দোষা ক্ষয়াবহঃ॥

মেঘনাদ এতেও বিভীষণকে সমর্থন করতে পারেনি। তার উক্তি বাল্মীকির হুবহু অনুসরণ—

গুণবান্ বা পরজনঃ স্বজনো নির্গুণোঽপি বা।

নির্গুণঃ স্বজনঃ শ্রেয়ান্ যঃ পরঃ পর এব সঃ॥

মেঘনাদের ক্ষোভ 'গতি যার নীচ সহ নীচ সে দুর্মতি' বাল্মীকির ক্ক চ স্বজনসংবাসঃ ক্ক চ নীচ পরাশ্রয়-এর অনুবাদ। উল্লেখ্য যে এ ক্ষেত্রে কৃত্তিবাসও বাল্মীকিরই অনুরূপ।

নিরস্ত্র বীরের অন্তিম মুহূর্তের বর্ণনায় কবি সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বজ্ঞান দিয়ে তাকে পূর্ণাঙ্গ মানবীয় মহিমায় ভূষিত করেছেন, তাতে তাঁর কল্পনার আধুনিক ভঙ্গীটি ফুটে উঠেছে। মহাকাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্রটির পতনকে মহিমান্বিত কোরে তুলেছেন তিনি।—

থরথরি কাঁপিলা বসুধা ;

গর্জিলা উথলি সিন্ধু! ভৈরব আরাবে

সহসা পুরিল বিশ্ব!

বাল্মীকির বর্ণনায় মেঘনাদের মৃত্যু এ রকম—

তথা তস্মিন্নিপতিতে রাক্ষসান্তে গতা দিশঃ।

শান্তরশ্মিরিবাদিত্যো নির্বাণ ইব পাবক।

মধুসূদনও বর্ণনা করেছেন এভাবেই—

লঙ্কার পঙ্কজরবি গেলা অস্তাচলে।

নির্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি

শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।

ইন্দ্রজয়ী মেঘনাদের অসম্ভাব্য মৃত্যুর সংবাদ বীরভদ্রের মুখে শুনে রাবণ প্রথমে মূর্ছিত হোয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু শিবের প্রেরিত রুদ্রতেজে শক্তিমান হোয়ে সে শোক পরিহার কোরে রণসাজে সজ্জিত হোলেন। বাল্মীকিও দেখিয়েছেন প্রথমে তিনি মূর্ছিত হয়েছিলেন, পরে সন্তাপ রোষানলে পরিণত হোয়ে তাঁকে ভীষণ কোরে তুলল। মহাকবির বর্ণনায় এ সময়ের রাবণ গ্রীষ্মকালের প্রদীপ্ত সূর্য, কুপিত সিংহ, মুখ থেকে সধূম অগ্নি উদ্গীরণকারী বৃত্রাসুর বা সাক্ষাৎ কৃতান্তের মতো। মধুসূদনের হাতেও অমোঘ বিধির বিধানে নিপীড়িত রাবণ শত্রুপক্ষের প্রতি সুতীব্র ঘৃণা অবিচলিত আত্মবিশ্বাস ও দৃপ্ত শক্তিতে ক্লাসিক মহিমামণ্ডিত হয়েছে। কালিদাসের রঘুবংশে রঘুর রণযাত্রার বর্ণনার (৪৩০) সঙ্গে এই রাবণের রণযাত্রা-বর্ণনার মিল। মেঘনাদবধ কাব্যে একবারই মাত্র প্রত্যক্ষ যুদ্ধ বর্ণনা আছে।—সম্মুখ যুদ্ধের বর্ণনায় ভরা ইলিয়াডের ভাষা এই বর্ণনায় মধুসূদনকে অনেকটা প্রভাবিত করেছে ঠিকই, তবু লক্ষণীয় যে তিনি রক্ষ-অনীকিনীর সাজসজ্জা অস্ত্র রণবাদ্য ইত্যাদিকে মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর বিবিধ অস্ত্রসজ্জা ও নাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন ; রক্ষোবাহিনীর চিত্রকল্প হোয়ে উঠেছেন চণ্ডী। মহিষাসুরের সেনাপতি চামর, উদগ্র, বাস্কল, অসিলোমা, বিড়ালাক্ষ, চিক্ষুর এরা দেখা দিয়েছে রাক্ষস সেনানী রূপে। দেবী চণ্ডীকে রাবণের সৈন্যবাহিনীর উপমান করায় এবং 'চণ্ডী' বর্ণিত সেনাপতিদের এই বাহিনীভুক্ত দেখানোতে কবির প্রবণতাটি গোপন থাকে নি। অশুভ ও অন্যায়কারী অসুরদের দমন করার সময়কার দেবীরূপ রাক্ষস বাহিনীর রূপক হওয়ায় বোঝা যায় কবি রাবণকে অন্যায়কারী প্রতিপন্ন না কোরে তার এপিক মহিমাই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। মেদিনী এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য বিষ্ণুর কাছে কেঁদে পড়লেন। সেই সূত্রে বিভিন্ন মন্বন্তর-কালে বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের পুরাণ প্রসঙ্গ এসেছে। সে কাহিনী তিনি যেখান থেকেই নিয়ে থাকুন, জয়দেবের গীতগোবিন্দে দশাবতার স্তোত্রের সঙ্গে বিশেষণাদি এবং অভিধার্থের মিল তাতে স্পষ্ট এবং ধরিত্রীর উক্তিতে স্তোত্রের ভঙ্গীটিও চোখে পড়ে। সপ্তম সর্গের মূল ঘটনাটি রামায়ণ থেকে নেওয়া হোলেও এর রূপায়ণে কবির কল্পনা হয়েছে অবাধ। বিভিন্ন পুরাণ, কালিদাস-জয়দেবের কাব্য থেকে উপাদান সংগ্রহ কোরে সর্গটিকে তিনি রাজকীয় আড়ম্বরে সাজিয়েছেন। মনে রাখতে হবে মেঘনাদ নয়, রাবণই কবির প্রধান লক্ষ্য, তার হৃদয়ের হাহাকার দেখাবার উদ্দেশ্য নিয়েই কাল্পনিক বিস্তার দিয়ে চরিত্রটিকে মহাকাব্যের উপযোগী কোরে তুলেছেন অথচ আধুনিক মানবতাবোধ আছে মর্মমূলে। নবম সর্গে এই বীর নায়কের হৃদয়-বিদারী শোকের পরিচয় আর 'কি পাপে লিখিলা/এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে' —এই বিস্ময়ে অভিমানে রাবণ বিমূঢ়।

ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব/মহাযাত্রা !—তার এই

আক্ষেপের ভাষাও কিন্তু বাল্মীকি থেকেই পাওয়া।[১৮] সেই শোকযাত্রায় শ্বেত উত্তরী পরিহিত রাবণ মধুসূদনের দৃষ্টিতে (ধুতুরার মালা গলায়) ধূর্জটির মতো ; তেমনি শান্ত মহান পবিত্র। সপ্তম সর্গের ভাষা, বর্ণনীয় বিষয় এবং আনুষঙ্গিক ঘটনা সব কিছুতেই প্রচণ্ডতা। সেজন্যই রমেশচন্দ্র দত্ত এই সর্গ সম্পর্কে বলেছিলেন…"in many respects the sublimest in the work, perhaps the sublimest in the entire range of Bengali Literature."[১৯] এই উদাত্ততা সঞ্চারের জন্য মধুসূদন সংস্কৃত সাহিত্যের থেকেই উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন।

রামায়ণে কোথাও দেবতাদের যুদ্ধে নামানো হয়নি ; হয়তো ইলিয়াডের প্রভাবে মধুসূদন দেবতা-গন্ধর্বকে যুদ্ধক্ষেত্রে এনেছেন। রাবণের শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য স্বর্গমর্ত্যব্যাপী আয়োজন, মেদিনী প্রকম্পিত, আর রাবণ কোনো মায়া অবলম্বন না কোরে আপন বাহুবলেই সম্মিলিত শক্তিকে ব্যর্থ কোরে দিয়ে আত্মবলে মহীয়ান্ হোয়ে উঠলেন। এই সর্গে রাবণ চরিত্রের যে চূড়ান্ত বিকাশ হয়েছে, তার ভূমিকা আর একটি মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিকায় কবি রচনা করেছেন। বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ দিয়ে কাব্য আরম্ভ হয়েছে। পুত্রের মৃত্যুর মতো দারুণ আঘাতে বীরহৃদয়ের প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে কবি পাঠককে প্রস্তুত কোরে দিয়েছেন দারুণতর আঘাতের ভিতর দিয়ে রাবণ চরিত্রের পূর্ণ বিকাশের সাক্ষী হবার জন্য।

বীরবাহু চরিত্র বাল্মীকি-রামায়ণে নেই, আছে কৃত্তিবাসে। কৃত্তিবাস বীরবাহুর ব্রহ্মার বরে বলীয়ান্ হবার কথা বলেছেন, তবে তার মধ্যে রামভক্তিরও পরিচয় দিয়েছেন। মধুসূদন সে প্রসঙ্গ আনেন নি স্বভাবতঃই, তার বীরত্বের প্রত্যক্ষ পরিচয়ও নেই। কেবল দূতের মুখে বীরবাহুর বীরত্বের উল্লেখ আছে। বীর পুত্রের মৃতদেহ দেখার জন্য রাবণ প্রাসাদের ওপর উঠলেন, সমগ্র লঙ্কাদ্বীপের মানচিত্রটি তার সামনে ভেসে উঠল। এভাবে কবি একটি বিশ্বাসযোগ্য ভৌগোলিক স্থানবিন্যাসের বাস্তবচিত্র দিলেন। বাল্মীকিতেও রাবণের প্রাসাদশিখর থেকে দূরে দেখার কথা বলেছেন, (যুদ্ধ, ২৬, ৫-৭) তবে ভিন্ন পরিস্থিতিতে।

ষষ্ঠ ও সপ্তম সর্গের মূল কাহিনী ব্যতীত বাকী সব সর্গই মধুসূদনের কল্পনার সৃষ্টি। দ্বিতীয় সর্গ তো পুরোপুরি কল্পনা মাধুকরীর (fancy) সৃষ্টি। তৃতীয় সর্গের প্রমীলা নামটি পাওয়া কাশীরাম দাসের আশ্বমেধিক পর্ব থেকে, তবে সেখানে সম্পূর্ণ অন্য কাহিনী। জগদ্রামী রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ পত্নী সুলোচনার কাহিনী বা চরিত্র অনেকটা এধরনের, তবে মধুসূদন সেটি পড়েছিলেন কিনা জোর কোরে বলা যায় না। চতুর্থ সর্গের সীতাচিত্র বাল্মীকিরই অনুগামী হোয়ে রচিত। এ মহা-কাব্যের সঙ্গে সীতা-কাহিনীর প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও যে পাপের ফলে রাবণের পতন, তার মুখোমুখি কবি হয়তো পাঠককে দাঁড় করিয়ে দিতে চেয়েছেন। এ ছাড়া

১৮। দ্রষ্টব্য যুদ্ধকাণ্ড, ৯৩, ১৩-১৪

১৯। R. C Datta, Literature of Bengal, page 183

সীতার স্মৃতিচারণ আর স্বপ্নে ভবিষ্যৎ দর্শনের দ্বারা সমগ্র রামায়ণ কাহিনীকেই কাব্যবর্ণিত খণ্ডাংশের সঙ্গে যুক্ত করা হলো। রাবণের যে প্রতিদ্বন্দ্বী, তার বীরত্ব ও নির্ভীকতা দেখানো ছাড়া পঞ্চম সর্গের আর কোনোই প্রয়োজন নেই। অষ্টম সর্গের সুদীর্ঘ নরক বর্ণনারও তেমন প্রয়োজন ছিল না, মধুসূদনের সব চেয়ে দুর্বল রচনা এটি। কাল্পনিক কাহিনীর এই সর্গগুলিতে মধুসূদনে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের যথেষ্ট পরিচয় আছে। বস্তুতঃ পাশ্চাত্ত্যের কথা বাদ দিয়ে মধুসূদন সাহিত্যের আলোচনাই হয় না; কিন্তু পুরাণ-মহাকাব্য-কালিদাস-ভবভূতি থেকে তিনি কত উপমা চিত্রকল্প খণ্ডকাহিনী নিয়ে এসেছেন, সে আলোচনা কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। বর্তমান স্বল্প পরিসরে সে আলোচনার অবকাশ নেই। তবু উল্লেখ করা যায়, তাঁর নরক-চিত্র পুরোপুরি পুরাণের অনুসারী; দেবতাদের রূপগুণ ও কাহিনী পুরাণ থেকে বা কালিদাস থেকে পাওয়া—যদিও তিনি তাদের মানুষের মতো ঈর্ষাদ্বেষের অধীন করেছেন। এখানে একথা স্মরণ করি যে, দেবতাদের চারিত্রিক বিশেষত্বের চকিত আভাস সৃষ্টি ছাড়া পূর্ণ চরিত্র নেই, একমাত্র মেঘনাদবধ কাব্যে মহাদেবেরই বিশিষ্ট চরিত্র গড়ে উঠেছে। মধুসূদন রামায়ণের কাহিনীতে বারে বারে মহাভারত প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন—সেটও লক্ষণীয়।

চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে মধুসূদন রাবণকে বড়ো কোরে দেখাতে গিয়ে রাম লক্ষ্মণকে হীন কাপুরুষ কোরে এঁকেছেন এমন অভিযোগ আছে। রাক্ষসবংশকে তিনি রামায়ণ-কারের মতো কুৎসিত মায়াবী জীব কোরে তোলেন নি। রাবণের ঐশ্বর্য তাঁর মনকে আকৃষ্ট করেছে। বাল্মীকির হনুমানের চোখেও লংকাপুরী আকাশে ভাসমান অমরাবতীর মতো দেখিয়েছিল। রাবণের ভোগবিলাসময় জীবনসম্ভোগের প্রতি কবির অন্তরের আকর্ষণ ছিল, অনিবার্য নিয়তির বশে তার ব্যর্থতার হাহাকারে কবিরই জীবনের প্রতিভাস। নূতন যুগের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এই ব্যর্থ রাবণই মহিমা-মণ্ডিত হয়েছে। রামায়ণে (বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস উভয়-এ) রাবণকে পাপী কোরে দেখানো হয়েছে। সীতার প্রতি তার কামলিপ্সার উল্লেখ সেখানে স্পষ্টভাবেই আছে। তাছাড়া সে রাবণ স্থূল; সূক্ষ্ম অনুভূতি বা আদর্শের কথা সেখানে তেমন নেই। আধুনিক কালেও যাঁরা রাবণকে নায়ক করার জন্য মধুসূদনকে দোষী করেছেন, নীতির মানদণ্ডেই তাঁরা সমালোচনা করেন। মধুসূদনের হাতে রাবণ চরিত্রে স্থূলতা বা কামলিপ্সা কোথাও নেই; সীতাও স্মৃতিচারণে সে অভিযোগ করেন নি। বরং সে আদর্শ রাজা, স্নেহময় পিতা শ্বশুর বা স্বামী, দেশপ্রেমী বীর। তাঁর এই কল্পনার পিছনে দ্রাবিড় অঞ্চলের জৈন রামায়ণের প্রভাব ক্রিয়াশীল থাকতে পারে। —সেখানে রাবণ সৎ এবং রামের চেয়ে বলিষ্ঠ। কাম্বা রামায়ণেও রাবণ অত্যাচারী শাসক নয়, সে কামমোহিত হোলেও সুন্দর। রাবণের অলৌকিক শৌর্য, দুর্জয় সাহস, বিপুল সম্পদ, আত্মশক্তি এবং চরিত্রবলও তাঁকে নির্মম নিয়তির হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। দুঃখ সওয়ার শক্তিতেই তিনি superman হোয়ে উঠেছেন।

এর মধ্যে কবি নিজেরই ভাগ্যকে দেখেছিলেন কিনা সে আলোচনায় না গিয়েও বলা যায়, বাংলাসাহিত্যে এই ট্র্যাজিক নায়ক নূতন। অথচ রামায়ণের কাহিনীকে তেমনভাবে পরিবর্তিত করা হয়নি, কেবল দৃষ্টিভঙ্গি নূতন। একথা ঠিক নয় যে তিনি রামকে রাবণের তুলনায় হীন কাপুরুষ করতে চেয়েছিলেন। রাম যে বনবাসী ভিখারী, সে তো নগর সভ্যতার ধারক অনার্য রাক্ষসের দৃষ্টিতে; আরণ্যক আর্যপুরুষের সংযম ও ত্যাগের মহিমা তার উপলব্ধি করার কথা নয়। পুত্রহন্তারক লক্ষ্মণকেও রাবণের ঊর্মিলা-বিলাসী পামর বলায় অস্বাভাবিক কিছু নেই। লক্ষ্মণের বীরত্বের প্রশংসাতেও সে পরাঙ্মুখ নয়—"বাখানি/বীরপণা তোর আমি, সৌমিত্রি কেশরি! / শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস সুরথি।"

এ কাব্যে কাহিনীর যে অংশ নেওয়া হয়েছে তাতে রামের বীরত্ব প্রকাশের অবকাশ তেমন ছিল না। বরং লক্ষ্মণেরই সে সুযোগ ছিল। পঞ্চম সর্গে বিভিন্ন পরীক্ষায় সেই সাহসিকতা প্রতিষ্ঠিত, স্বয়ং মহাদেব তার নির্ভীকতায় অভিভূত। উদ্দীপ্ত-রোষবহ্নি কৃতান্তসম রাবণের সামনে এগিয়ে যেতেও তার হৃদয় কম্পিত হয় নি। রামায়ণের লক্ষ্মণ ছায়ার মতো রামকে অনুসরণ করেছে, তাঁকে ছাড়া ত্রিলোকের ঐশ্বর্য বা অমরত্ব তার কাছে অর্থহীন (অযোধ্যা, ৩১, ৫), বনে যাবার সময় মা সুমিত্রা তাকে রামকে পিতা এবং সীতাকে জননীজ্ঞানে সেবা করতে বলেছিলেন (অযোধ্যা, ৪০, ৯)—সে উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল সে সদাজাগ্রত থেকে। কিন্তু পিতৃসত্য পালনের জন্য রামের এই বনগমন তার মনঃপূত ছিল না। একে তার ক্লৈব্য বলেই মনে হয়েছে (অযোধ্যা, ২৩, ২৬-২৭)। রামের জন্য রাজ্য নির্বিঘ্ন রাখতে সে প্রস্তুত ছিল, বিরোধের চেষ্টা দেখলে ভরতকে হত্যা করতেও সে দোষ দেখেনি—"ভরতস্য বধে দোষং নাহং পশ্যামি কশ্চন।" যে বৃদ্ধ পিতা কৈকেয়ীর প্ররোচনায় রামকে রাজ্যচ্যুত করলেন তাঁকে হত্যা করতেও তার মনে দ্বিধা নেই (অযোধ্যা, ২১, ১৯)। ভোগের মহিমা তার কাছে তুচ্ছ নয়, তবু রামের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধায় সে নিজের সত্তা লোপ কোরে দিয়েছিল। কিন্তু দুর্বলতাকে সে কখনও প্রশ্রয় দেয়নি। শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণকে নিয়ে রামের সুদীর্ঘ বিলাপের কথা আছে যুদ্ধকাণ্ডের ১০২ অধ্যায়ে। পুনর্জীবনপ্রাপ্ত লক্ষ্মণ রামকে মৃদু তিরস্কার কোরে সূর্যাস্তের পূর্বেই দুরাত্মা রাবণকে বধ করতে প্ররোচিত করেছে (যুদ্ধ, ১০২, ৪১-৪৪, ৪৭)। এতে লক্ষ্মণ চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে, মধুসূদন তাকেই কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছেন। সে বিশ্বব্যাপী নৈতিক শক্তির প্রতিনিধি বোলেই চন্দ্রচূড়কেও যুদ্ধে আহ্বানের স্পর্ধা রাখে। একে একে লক্ষ্মণ সেই মায়াকাননে নানা বাধাকে অতিক্রম করল নির্ভীকচিত্ততায়। ছলনাময়ী বামদেলকে মাতৃসম্বোধনে নিবৃত্ত করার কাহিনীতে কৃত্তিবাসী রামায়ণের সেই লক্ষ্মণ চরিত্রের আভাস মিলল—যে সীতার নূপুর-শোভিত চরণ দুখানির ঊর্ধ্বে কখনও তাকিয়ে দেখেনি। অথচ লক্ষ্মণ টাইপ চরিত্র নয়, রক্তমাংসের মানুষ। যে জননীকে

ছেড়ে আসার বেদনা কখনও ভাষায় প্রকাশ করেনি, স্বপ্নে তাঁকে দেখার কাহিনীতে তাঁর জন্য নিভৃত অন্তরের ব্যাকুলতা তাকে বড়োই সজীব কোরে তুলেছে।

কিন্তু ষষ্ঠ সর্গে কবি লক্ষ্মণের এই মহিমা বজায় রাখতে পারেন নি। আত্মবলে নয়, দেববলে বলীয়ান্ হোয়ে সে ছলনার আশ্রয় নিয়েছে, বীরধর্ম লঙ্ঘন করেছে; 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'-এর মতো হীন উক্তি করেছে। রামায়ণে মেঘনাদনিধন কাহিনীতে উভয় পক্ষের বীরত্ব স্বীকৃত ছিল। কিন্তু শক্তিমত্তায় কারো হাতেই মেঘনাদের পরাজয় কবি মধুসূদন সহ্য করতে পারতেন না। তার মৃত্যুকাহিনী লিখতে বড়োই কষ্ট হয়েছে তাঁর, সত্যি তিনি জ্বরাক্রান্ত হোয়ে পড়েছিলেন—'I got a severe attack of fever and was laid up for six or seven days. It was a struggle whether Meghnad will finish me or I finish him.[২০] তাঁর রাবণ আত্মশক্তিতে বলীয়ান্ আর মেঘনাদ বাহুবলে অপরাজেয়। এদিক দিয়ে দেব-নর কারো কাছেই তার পরাজয় তাঁর কল্পনার অতীত ছিল বোলেই রামায়ণ কাহিনী থেকে সরে আসতে হয়েছে। কিন্তু সপ্তম সর্গে আবার লক্ষ্মণ বীর্যে স্বপ্রতিষ্ঠিত। বাল্মীকি-অঙ্কিত মিতবাক্ ভ্রাতৃপ্রেমী লক্ষ্মণ, যে মৃত্যুর মুখোমুখি হোয়ে অধীর হয় না (কবন্ধ কাহিনী স্মর্তব্য), রামের অনুগত হোয়েও প্রতিবাদ করতে নিরস্ত হয় না, তার সঙ্গে এই লক্ষ্মণের তেজস্বিতায় মিল রয়েছে, কেবল মেঘনাদের সঙ্গে সেই বীরধর্ম রক্ষিত হলো না বোলে ক্ষোভ থেকে যায়। মধুসূদনের অন্তরের প্রবণতাই এই বৈপরীত্যের জন্য দায়ী।

রামকে এই কাব্যে প্রত্যক্ষভাবে তেমন পাইনা। কিন্তু কাব্যের প্রথমেই জানতে পারি রাম পক্ষেরই পরাক্রমে লঙ্কা বীরশূন্য, রাবণের পতন আসন্ন। রাবণের যে উদ্বেগ—

> বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
> একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
> নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ এ দুরন্ত রিপু
> তেমনি দুর্বল, দেখ, করিছে আমারে
> নিরন্তর! হব আমি নির্মূল সমূলে
> এর পরে!

—সে তো রামেরই বিক্রমের পরোক্ষ ফল। প্রত্যক্ষভাবে পাই প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশের সময়। প্রমীলার বাহিনীর বিক্রমে রাম ভীত সচকিত একথা ঠিক নয়। বরং যে নারীজাতির স্বরূপ প্রেমময়তায়, তাদের এই আপাত-বীরত্বে তিনি কৌতুকই বোধ করেন। বিভীষণও বলেছিল—'দেখ দেব অপূর্ব কৌতুক'। বিরহের বেদনা তো রামের অজানা নয়,

২০ রাজনারায়ণ বসুকে লেখা পত্র, তারিখ নেই।

প্রমীলার প্রিয়মিলন বাসনায় তিনি বাধা দেবেন কেন ?

কহ তারে শত মুখে বাখানি, ললনে,

তব পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা।—রক্ষঃপতি তাঁর শত্রু, কুলনারীর সঙ্গে তিনি বৈরিভাবে আচরণ করবেন কেন ? এতে রামের মহত্ত্বই প্রমাণিত হয়। রামায়ণের বালকাণ্ডে, অযোধ্যাকাণ্ডে এবং অরণ্যকাণ্ডের প্রথমাংশে রামের বৈরাগ্যশ্রীমণ্ডিত কঠোরতার পরিচয় পাওয়া যায়, পরের অংশে কাব্যশ্রী বেশি। আর শেষ অংশে ধর্মাচরণ ও রাজধর্ম পালনের কথা—দীনেশচন্দ্র সেন তা লক্ষ্য করেছিলেন। এ কাব্যে যে অংশের কাহিনী নেওয়া হয়েছে তাতে কঠোরতার অবকাশ কম। লক্ষ্মণ মেঘনাদকে হত্যা করতে যাবার আগে তিনি যে বলেছিলেন 'নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি'—সেটা কাপুরুষতা নয়, ভ্রাতৃপ্রীতির নিদর্শন। শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণকে নিয়ে বিলাপেও তাই। বাল্যকাল থেকে নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে যে লক্ষ্মণ তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছিল, তাকে হারাবার ভয় অস্বাভাবিক নয়। তিনি নিজেও লক্ষ্মণকে প্রাণাধিক স্নেহ করতেন। রাজ্যাভিষেকের সংবাদে প্রথমেই লক্ষ্মণের গলা জড়িয়ে বলেছিলেন 'জীবিতঞ্চাপি রাজ্যঞ্চ ত্বদর্থমভিকাময়ে' (অযোধ্যা, ৪, ৪৪)। প্রাণাধিক যে পত্নী, তাঁর চেয়েও তাকেই বেশি স্নেহ করেছেন। 'কত যে সয়েছ মোর হেতু তুমি বৎস'—এই উক্তিতে লক্ষ্মণের তুলনাহীন ত্যাগের স্বীকৃতিতে তাঁর উদারতারই পরিচয়। এতে যদি তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে থাকে তবে তা বাল্মীকি-অঙ্কিত চরিত্রেরই দোষ। রামায়ণে রামের কথা বলার ভঙ্গীটিই এরকম। সীতা যখন তাঁর সঙ্গে বনে যাবার প্রার্থনায় ক্রন্দনরতা তখন বলেছিলেন—ন দেবি তব দুঃখেন স্বর্গমপ্যাভিরোচয়ে, শেলাহত লক্ষ্মণকে বলেছিলেন তুমি গত হোলে সীতার উদ্ধার বা বিজয়লাভ বা জীবনে আমার কাজ কি। সুগ্রীবকেও বলেছিলেন—যদি দৈবাৎ তোমার কোনোরূপ ভালোমন্দ ঘটে তবে আমার জানকীকে নিয়ে কি হবে। ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, অধিক কি, নিজের শরীর নিয়েই বা কি হবে। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। সপ্তম সর্গে তাঁর বিলাপ বাল্মীকিরই আক্ষরিক অনুবাদ, যদিও বিলাপের সময় কিছু পৃথক্। রামায়ণকার রামচন্দ্রকে দোষে গুণে জীবন্ত মানুষ করেছিলেন ; তাঁর উক্তিতে আচরণে বৈপরীত্যের অভাব নেই। তিনি বজ্রের মতো কঠোর, কুসুমের মতো কোমল। কোমলতার দিকটিই এই কাব্যে উপস্থাপিত হয়েছে আর কৃত্তিবাসের প্রভাবে মধুসূদনে কোমলভাব প্রাধান্য পেয়ে থাকবে।

রামায়ণের সূচনায় রামচরিত্রের বিশিষ্টতাগুলি কয়েকটি শ্লোকে বিধৃত আছে। রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় সেই গুণাবলীর প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ আছে। মধুসূদন তেমন না করলেও দেব-অস্ত্র পৌঁছে দিতে এসে গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ তাঁর চরিত্র সম্পর্কে যে উল্লেখ করেছিল, তাতে ঐ গুণগুলির সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। সেই গুণেরই পরিচয় পাই অষ্টম সর্গে পাপীদের দুঃখে পরদুঃখকাতর

রামচন্দ্রের মনোবেদনায়। কাব্যের শেষ সর্গে মেঘনাদের সৎকারের জন্য সাতদিন যুদ্ধবিরতির অনুরোধ নিয়ে এসেছিল রাবণমন্ত্রী সারণ। তাকে পরম সমাদরে র জসভায় নিয়ে এসেছিলেন রাম। বলেছিলেন—

পরমারি মম
হে সারণ, প্রভু তব, তবু তাঁর দুঃখে
পরম দুঃখিত আমি কহিনু তোমারে।
রাহুগ্রাসে হেরি সূর্যে কার না বিদরে হৃদয় ?

আরও বলেছিলেন—'ধর্ম কর্মে রত জনে কভু না প্রহারে ধার্মিক'। এতে তাঁর রাজধর্ম পালন, ধার্মিকতা আর আত্মপর অভেদে দুঃখকাতরতার পরিচয়। বাল্মীকির রামের সঙ্গে এঁর কোনোই পার্থক্য নেই। তাই মধুসূদন ইচ্ছা কোরেই রামকে ভীরু কাপুরুষ স্ত্রীস্বভাব কোরে এঁকেছেন এমন ভাবা হয়তো সংগত নয়।

তবু রামায়ণের রামে একটি নৈতিকতার দিক আছে, মধুসূদন পদে পদে যে সব কিছু মেনে চলে সেই ধার্মিক চরিত্রের প্রতি তেমন আকর্ষণ বোধ করেননি—যদিও যেখানে সে কাহিনী নিয়েছেন সেখানে আদি কবিকেই যথাসম্ভব অনুসরণ করেছেন। লক্ষণীয় যে, তাঁর সমগ্র রচনায় আর কোথাও রামের কোনো কাহিনী নেই ; উপমা চিত্রকল্প অনুষঙ্গরূপেও রাম আসেননি যদিও সীতাকে নিয়ে তিনি চতুর্দশপদী কবিতা লিখেছেন, Queen Sita নামে ইংরেজিতে একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচনার বাসনাও ছিল। মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু মেঘনাদবধ কাব্যকে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের কালের রচনা বোলে নির্দিষ্ট করেছেন। ভোগবাসনা সম্বলিত বলিষ্ঠ জীবনবাদ, মানবিকতা ও বাস্তবতা ইয়োরোপীয় ভাবধারা থেকেই তিনি পেয়ে থাকবেন, তবু যে কাহিনী ও চরিত্রের মাধ্যমে সেই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত, সেগুলি তিনি দেশীয় প্রাচীন কথা অনুসরণেই সৃষ্টি করলেন, তার সঙ্গে ক্লাসিক্যাল সাহিত্য থেকেও ঋণ নিলেন—এই সংবাদটিও কম জরুরি নয়। আর মহাকাব্যের কায়াগঠনের বহিরঙ্গ রীতিকেও মেনে নিয়েছেন, যদিও বীররস সৃষ্টি করতে গিয়ে করুণরস হোয়ে উঠল প্রধান আর ক্লাসিক্যাল ফর্মের মধ্যে রোমান্টিক লিরিক প্রবণতাটিও গোপন থাকে নি।

বীরাঙ্গনার গঠন পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে। ইটালির কবি ওভিদের 'হেরোয়েড্‌স্'-এর আদর্শে এই পত্রিকাকাব্য রচিত। তাঁরই আদর্শে একুশখানা পত্রিকা রচনার ইচ্ছা থাকলেও নানা কারণে এগারোখানার বেশি পূর্ণাঙ্গ পত্রিকা লেখা হোয়ে ওঠেনি। পাঁচখানা অসম্পূর্ণ পত্রিকার কয়েকটি মাত্র পঙ্‌ক্তি পাওয়া গেছে। এই নায়িকারা আত্মহৃদয়ের প্রেমভাব অকপটে প্রকাশ করাতেই বীরাঙ্গনা। চরিত্রগুলি সবই ভারতীয় পুরাণের। বন্ধু রাজনারায়ণকে নিজেই এ বিষয়ে জানিয়েছেন (পত্রে তারিখ নেই) —"I have been scribbling the thing to be called 'বীরাঙ্গনা' i. e. Heroic

Epistles from the most noted Pauranic women to their lovers or lords"

প্রতিটি পত্রিকার ভূমিকারূপে তিনি পুরাণ-কাহিনী সংক্ষেপে দিয়ে দিয়েছেন। পূর্ণ পত্রিকার ছয়খানি মহাভারত (শকুন্তলা, দ্রৌপদী, ভানুমতী, দুঃশলা, জাহ্নবী, জনা), দুখানি রামায়ণ (কৈকেয়ী, সূর্পনখা) আর তিনখানি অন্য পুরাণের (তারা, রুক্মিনী, উর্বশী) এবং অপূর্ণ পত্রিকার তিনখানি মহাভারত (শর্মিষ্ঠা, দময়ন্তী, গান্ধারী) দুটি অন্য পুরাণের (লক্ষ্মী, উষা) কাহিনী নিয়ে রচিত। বোঝা যাচ্ছে এ সময়ে মহাভারত-বর্ণিত নারীচরিত্রগুলি তাঁর মনকে বেশি জুড়ে ছিল। কোনো কোনো সমালোচক পত্রিকাগুলির বিশেষত্ব এবং নায়িকার শ্রেণী অনুযায়ী এগুলির সাহিত্য বিচার করেছেন। কিন্তু এগুলিতে উদ্ধৃত কাহিনীর উৎস সন্ধান এবং পৌরাণিক চরিত্রের যথাযথ অনুসরণ অথবা পরিবর্তন লক্ষ্য করলে কবির ভাবনা-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় বলেই মনে হয়।

শকুন্তলা কাহিনী মহাভারতের আদিপর্ব, সম্ভবপর্বাধ্যায়, ৬৭-৭৪ অধ্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণ পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ড প্রভৃতিতে থাকলেও কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এর কাহিনী বর্ণনা এবং ঘটনা পরিস্থিতিই মধুসূদন গ্রহণ করেছিলেন মনে হয়। নাটক-বর্ণিত পরিস্থিতি এবং চরিত্র-বৈশিষ্ট্যই তিনি নিয়ে এসেছেন নিজের রচনায়, অনেক ক্ষেত্রে ভাষাও নিয়েছেন। শকুন্তলা বিবাহিতা, তবু সমাজ ও স্বামীর কাছে তখনও স্বীকৃতি না পাওয়ায় মিলন আকাঙ্ক্ষায় সে উদ্বেল-চিত্ত ; পূর্বরাগের রঙে মন তার রঞ্জিত। এই শকুন্তলার কাছে প্রেম জীবনের নামান্তর, কিন্তু সে আত্মবিস্মৃত নয়। বনবাসিনী নায়িকা যে পৃথিবীর অধীশ্বর দুষ্যন্তের যোগ্য নয়, সে সচেতনতা তার আছে। প্রতিশ্রুতি পালন না করায় দুষ্যন্তের সম্পর্কে কিছু বিচার-প্রবণ হয়েছে সে, আর চির আনন্দময় প্রকৃতির সঙ্গে তার অন্তরের অচ্ছেদ্য আত্মীয়তার সম্পর্কটিও কিছু ক্ষুণ্ন। যুগপ্রভাবে মধুসূদনের শকুন্তলা আর তেমন সংসার অনভিজ্ঞা এবং হৃদয় বেদনায় বাহ্যজ্ঞানরহিত নয় এবং অনেকখানি সমাজ-সচেতন ও মুখরা হোয়ে উঠেছে। উল্লেখ্য যে, এ পত্রিকায় এবং মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গে মধুসূদনের প্রকৃতি-ভাবনায় কালিদাসের সঙ্গে মিল স্পষ্ট। প্রকৃতিকে মানব-মনের পটভূমিকারূপেই দেখতেন ক্লাসিক্যাল কবি, আধুনিক রোমান্টিক কাব্যের মতো প্রকৃতি অন্যনিরপেক্ষ সজীব সত্তা হয়ে ওঠেনি।

কর্তব্য পালনের জন্য জাহ্নবী মর্ত্যমানবের পত্নীত্ব গ্রহণ করেছিলেন, কর্তব্য শেষে তিনি অন্তর্হিতা হোলেন, ব্যাস-কথিত এই কাহিনীকে মধুসূদন যথাযথ অনুসরণ করেছেন। বিদায়কালে তাঁর নয়নে বিন্দুমাত্র অশ্রুরেখা দেখা দেয়নি কিন্তু প্রণয়িনী আশীর্বাদকারিণীতে পরিণত হওয়ায় শান্তনুর মানবহৃদয়ে যে গভীর বেদনা, সেটি কবি বড়ো সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

দ্রৌপদীর কাহিনী গ্রন্থনায় মহাভারতের সঙ্গে পার্থক্য নেই, কিন্তু আধুনিক

কবি রমণীর পঞ্চপতিত্বের বেদনাকেই বড়ো কোরে তুলেছেন। অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতিত্বের আভাস মহাভারতেও আছে, এই পাপে হরিপর্বতে সর্বপ্রথম দ্রৌপদীর পতন হয়েছিল। পঞ্চপতিত্ব রমণীর পক্ষে বঙ্কিমের ভাষায় 'অতি দুঃসাধনীয়'। মধুসূদন একে দেখেছেন সম্পূর্ণ মানবিকভাবে। মাতৃনির্দেশেও এমন সমানুভূতি কি সম্ভব? তত্ত্বের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। মহাভারতের বহু প্রসঙ্গ নিয়ে এসেও তিনি মর্ত্যমানবীর বাস্তব প্রেমের পিপাসাকেই বড়ো কোরে তুলেছেন। অর্জুনের প্রতি তার রাধিকার মতো পূর্বরাগ আর পরে দেহের বেদীতে পূজার উপচার সাজিয়ে প্রিয়তমের আরাধনায় নিজের পরিতৃপ্তির বাসনা ব্যক্ত করিয়ে মহাভারত কাহিনীতেই নূতন মাত্রা সংযোজন করা হয়েছে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড, ১১৬ অধ্যায়ে আছে—সত্যযুগের কুশধ্বজ ঋষির কন্যা বেদবতী—যাকে কেশাগ্র স্পর্শ কোরে অপমান করেছিল রাবণ—তিনিই ত্রেতাযুগে জনককন্যা সীতা। অগ্নি আসল সীতাকে নিয়ে গিয়ে ছায়াসীতাকে রেখে গিয়েছিলেন, তাকেই রাবণ হরণ করে। এই ছায়াসীতাই নারায়ণ সরোবরে গিয়ে বহু তপস্যা কোরে শিবের বর পেয়েছিলেন যে পঞ্চ ইন্দ্র (পঞ্চ পাণ্ডবই যে পঞ্চ ইন্দ্র সে কাহিনী অন্যত্র আছে) তাঁর স্বামী হবেন। অর্থাৎ ঐ পুরাণ অনুসারে বেদবতী সীতা দ্রৌপদী অভিন্ন। মধুসূদনও দেখিয়েছেন দ্রৌপদী হর ধনুর্ভঙ্গ ও সীতার স্বয়ম্বর প্রসঙ্গ উত্থাপন কোরে এবং পুনরায় সেই ধনুর্ভঙ্গে নিজের পতিলাভের বাসনা ব্যক্ত কোরে নিজেকে সীতার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের কাহিনী কবির মনে ছিল, এ ধারণা অযৌক্তিক নয়। পুরাণের খুঁটিনাটি কাহিনীও তাঁর মনকে প্রভাবিত করত এই কথাই প্রমাণ হয় এর থেকে। এই পুরাণটির নানা কাহিনী তিনি অন্য রচনাতেও নিয়েছেন। এটি যে তাঁর সমকালে জনপ্রিয় ছিল তা আমরা আগে দেখেছি।

দুঃশলা ও ভানুমতী পত্রিকায় মধুসূদন ব্যাসের চেয়ে কাশীরামের বর্ণনা ও কাহিনী দ্বারাই পরিচালিত হয়েছেন। ভানুমতীর নামই ব্যাসের কাব্যে নেই ; কিন্তু কাশীরামের কাব্যে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের অনুরূপ ভানুমতীর স্বয়ম্বর বর্ণিত হয়েছে। এ দুটি পত্রিকায় মহাভারতের বহু ছোটোখাটো ঘটনার উল্লেখ আছে এবং প্রায়শঃই সেগুলি কাশীরামের অনুসারী। তার মধ্যে দ্রোণের মৃত্যুদৃশ্য, অভিমন্যুকে সপ্তরথীর হত্যা (ব্যাসে ছয়জনের কথা আছে), গোগ্রহ রণকে 'গোগৃহ' রণ বলা (মেঘনাদবধ কাব্যেও তাই আছে এবং চতুর্দশপদী একটি কবিতার নামই 'গোগৃহ রণ') বহু উদাহরণের মধ্যে কয়েকটি মাত্র। এই দুই নায়িকাই কুলবধূ এরা বীর্যবত্তায় স্বামীর যোগ্য সহধর্মিনী নয়। স্বামীর বীরত্বের খ্যাতিতে গৌরবান্বিত বোধ করবার মতো মানসসম্পদও নেই এদের। জগৎকে ভুলে নিজের স্বামীকে নিয়ে গৃহসুখ উপভোগ-বাসনা ছাড়া কোনো আকাঙ্ক্ষাও নেই—সে বাসনা প্রকাশে সংকোচও নেই। কিন্তু মানব চরিত্র সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টির ফলে কবি এই দুই

রমণীকেও পৃথকরূপে চিত্রিত করেছেন। ভানুমতী কুরুবংশের বধূ, কুলগৌরববোধ তাকে দৃপ্ত এবং পাণ্ডবদের সম্পর্কে ব্যঙ্গপ্রবণ কোরে তুলেছে। দুঃশলার তা নেই, পলায়নে তার লজ্জা নেই। মূল মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বে অর্জুনের নানাদেশে যুদ্ধ প্রসঙ্গে তার চরিত্রের এই ভীরুতা ধরা পড়েছে।[২১] মধুসূদন সেই ইঙ্গিত নিয়ে থাকবেন।

মাহেশ্বরী পুরীর রাজা নীলধ্বজের পত্নী জনার কাহিনীও ব্যাসের কাব্যে নেই, আছে কাশীরামে; আর আছে জৈমিনি ভারতে। ব্যাসের কাব্যে নীল রাজার কথা আছে সভাপর্বের দিগ্বিজয় পর্বাধ্যায়ে, তার পুরীর নাম মাহিষমতী। পত্রিকাটি একদিক দিয়ে বিশিষ্ট—জনা আক্ষরিক অর্থে বীরাঙ্গনা। পুত্রশোকাতুরা মাতার পুত্রহা অর্জুনের প্রতি রোষ পাণ্ডব নারীদের প্রতি ব্যঙ্গে পরিণত। এই উপলক্ষ্যে মহাভারতের বহু কাহিনী-অংশ নিয়ে আসা হয়েছে। সে-শত্রুকে সমাদরে নিজ রাজ্যে নিয়ে আসায় স্বামীর প্রতিও জনার অভিমান। জৈমিনি ভারতে তার নাম জ্বালা, সে উন্মাদিনীর মতো রণক্ষেত্রে ছুটে গিয়েছিল; মধুসূদনের জনা তা করেনি, কাশীরামের জনার মতো সাহায্যের আশায় ভ্রাতৃগৃহেও যায় নি, মনঃকষ্টে গঙ্গায় আত্মবিসর্জন দিয়েছে। বাঙালী ঘরেরই স্বামীর উপর নির্ভরশীলা, সতীত্বের গর্বে গর্বিতা, সামাজিক আচারবদ্ধ গৃহবধূর মতোই সে; স্বামীর ওপরে বড়ো আশা ছিল তার কিন্তু সন্তানবিয়োগ ব্যথায় সে প্রেম হোলো খণ্ডিত। অথচ জনাহীন গৃহে নীলধ্বজের বেদনার কল্পনাও বুকে নিয়ে গেল সে।

রামায়ণের কাহিনী নিয়ে রচিত পত্রিকাদুটিতে কবি বাল্মীকির অনুসরণ করেছেন পুরোপুরি। পূর্বকথা ও পরিস্থিতিতে কোনোই পরিবর্তন না ঘটিয়েও রমণীর প্রেমবাসনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন আর সে প্রেম ভোগবাসনাকে বাদ দিয়ে নয়। কৈকেয়ীর বর-লাভের কাহিনী অপরিবর্তিত রেখেছেন কিন্তু পুত্রের রাজ্যলাভের চেয়ে দশরথের হৃদয়েশ্বরী হবার বাসনা তার বড়ো। এই বাসনা এবং কৌশল্যার প্রতি ঈর্ষা তাকে নিষ্ঠুর কোরে তুলেছে। দশরথকে সে ব্যঙ্গ কোরে বলে—'পাইলা কি পুনঃ এ বয়সে/রসময়ী নারী-ধনে' অথবা 'বাম দেশে কৌশল্যা মহিষী, /এত যে বয়েস তবু লজ্জাহীন তুমি!' বুকের বেদনা দিয়ে লেখা এ পত্র, তার মূল কথা—'না পড়ি ঢলিয়া আর নিতম্বের ভারে'—ইত্যাদি। এই ইঙ্গিতটুকু কিন্তু রামায়ণেরই। বাল্মীকিতে আছে—কৈকেয়ী 'কামোন্মত্ত' রাজাকে স্বসৌন্দর্যে বশীভূত করেছিলেন; কৃত্তিবাসেও 'বুড়ার যুবতী নারী প্রাণ হৈতে বড়ো।'

সূর্পনখা চরিত্রেও ভোগবাসনাই প্রধান। তার প্রেম রূপজ, হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করার ভঙ্গিটিও সহজ লজ্জাহীন সুচতুর। ত্রিভুবনবিজয়ী রাবণরাজের বিলাসবৈভবের মধ্যে প্রতিপালিতা স্বৈরিণী বালবিধবা যে ভগিনী স্বাধীন ইচ্ছাপূরণে অভ্যস্তা,

২১ রাজশেখর বসুর অনুবাদ, ১৩৫৬, পৃ ৪০১

ভোগদীপ্ত প্রেমবাসনা তার উপযুক্ত। এই প্রেম ত্যাগপূত নয়, প্রিয়তমকেও সে ঐশ্বর্য ভোগের আশ্বাস দিয়েই আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করেছে—'ভুঞ্জ আসি রাজভোগ দাসীর আলয়ে'। রাক্ষস রমণীর কামরূপিতা ও স্বেচ্ছাবিহারের বিশেষত্বটিও বজায় আছে। অথচ বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসের মতো লাঞ্ছিত করা হয়নি তাকে। সেখানে তার কামুকতার যে ইঙ্গিত আছে সেটুকুকে অবহেলা না কোরেও মধুসূদন তার চরিত্রকে বাস্তব ও মনস্তত্ত্বসম্মত কোরে তুলেছেন এবং তার চরিত্রের সজীবতা ও রাজকীয় ঐশ্বর্যময়তাকে অপূর্ব কাব্যভাষায় ব্যঞ্জিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

রুক্মিনী পত্রিকাটিতে মধুসূদনের কল্পনার মৌলিকতা নেই মনে কোরে এটির উল্লেখ তেমন কেউ করেন না। রুক্মিনী হরণের কাহিনী আছে বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতিতে। মহাভারতেও পাই—"রুক্মিনী নারায়ণের প্রীতিসাধনার্থে লক্ষ্মীদেবীর অংশে ভীষ্মকরাজার কুলে সমুৎপন্ন হয়েন।"[২২] "স্বয়ং লক্ষ্মীর অবতার" রুক্মিনীর এই কাহিনীটি ভাগবতে দুই অধ্যায়ব্যাপী বিস্তারিত রূপে নিয়েছে। মধুসূদন হয়তো সেখান থেকেই প্রেরণা পেয়েছেন। সেখানে কৃষ্ণের প্রতি রুক্মিনীর সপ্তশ্লোকবিশিষ্ট পত্রও আছে। কৃষ্ণের রূপগুণ শুনে প্রণয়াসক্ত রুক্মিনী তাঁকে হৃদয় সমর্পণ করেছেন, পত্নীরূপে যদি কৃষ্ণ তাঁকে গ্রহণ না করেন তবে জন্মে জন্মে উপবাস ও তপস্যায় তিনি দেহ বিসর্জন করবেন। 'শৃগাল' শিশুপাল আসার আগেই যেন কৃষ্ণ এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। মধুসূদনের রুক্মিনীও 'কাল' স্বরূপ যে শিশুপাল 'আসিছে সত্বরে', তার আগেই এসে উদ্ধার করতে কৃষ্ণকে অনুরোধ জানিয়েছেন। কৃষ্ণের রূপগুণের কথা লোকমুখে শুনে এবং স্বপ্ন দেখে তিনি কৃষ্ণ অনুরক্তা। এতে বৈষ্ণব রসশাস্ত্র উজ্জ্বলনীলমণিতে 'রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং' প্রভৃতি শ্লোক (পূর্ব, ৫) এবং সাহিত্যদর্পণে পূর্বরাগের লক্ষণ (৩য় পরিচ্ছেদ) মনে পড়ে। ভাগবতে যদিও গোপিনীদের সঙ্গে রাসের বর্ণনা আছে, তবু তা প্রধানতঃ কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরসের কাব্য। মধুসূদনের রুক্মিনীর প্রেমে ঐশ্বর্যভাব এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের রাগানুগা ভক্তি মিশে গেছে। বৈষ্ণব কাব্যের প্রতি মধুসূদনের মনের টান ছিল, নানা চিত্রকল্প রচনায় সেই মধুররসের অবতারণা আছে; ব্রজাঙ্গনা কাব্যের কথাও মনে পড়ে যদিও Mrs. রাধা সামাজিক নায়িকা-রূপেই উপস্থাপিতা। এই পত্রিকায় রুক্মিনী জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের সাধিকা নায়িকা। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ এরকম—'সামর্থ্যে সতি ব্রজে শরীরেণ বাসমু কুর্যাৎ তদাভাবে মানসাপিতাৰ্থঃ'। রুক্মিনীর প্রণয়নিবেদনে এই রাগানুগা লক্ষণ ফুটে উঠেছে যদিও তিনি স্বকীয়া সমঞ্জসা মুগ্ধা নায়িকা। ভাগবতের কাহিনীর সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর আত্মনিবেদন ও তদ্গতচিত্ততা মিশে আছে। আর কৃষ্ণের রূপগুণস্মরণে কীর্তনের ভঙ্গি ফুটে উঠেছে, যাকে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলা

২২ কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ, আদি, যদুবংশবর্ণন। ৬৭ অধ্যায়

-হয়েছে 'নামলীলাগুণাদীনা উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্।' ভাগবতের কাহিনীর সঙ্গে মধুসূদন মিশিয়েছেন রুক্মিনীর অন্তরের কল্পিত ছবি—তাঁর ভাববৈচিত্র্য, তাঁর ব্রীড়া সংশয় সসংকোচ ভীরুতা এবং আত্মনিবেদন। কিন্তু এই পত্রিকার প্রেমও দেহসম্পর্ক-হীন নয়, দেহকে বিস্মৃত হোতে পারেন না তিনি, এই জন্মেই তিনি মিলনপিপাসাকে চরিতার্থ কোরে তুলতে উৎসুক। বৈষ্ণব রসতত্ত্বের প্রতিমূর্তি হোয়েও মধুসূদনের হাতে রুক্মিনী বাসনাজড়িত মর্ত্যমানবীরই প্রতিমা। সেদিক দিয়ে এই চরিত্রসৃষ্টিতে তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার দীপ্তি আছে।

তারা পত্রিকাটি বোধ করি সব চেয়ে বিতর্কিত। এই চরিত্র পুরাণে যেভাবে পাই তাকে তিনি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত কোরে নিয়েছেন, শিষ্য সোমের প্রতি বৃহস্পতিপত্নী তারার প্রেম সমাজনীতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ গর্হিত, রুক্মিনী শকুন্তলার কাহিনীর সঙ্গে এই মহাপাতকমূলক ঘটনাকে একত্র গ্রথিত করায় কবি ধিক্কারযোগ্য—এমন কথা উঠেছে। যোগীন্দ্রনাথ বসু এমন মতও ব্যক্ত করেছেন যে 'পৌরাণিক ঘটনার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমাজনীতির প্রতি সম্মান' তাঁর ছিল না বোলেই এমন কাজ করেছেন। এ মত বিচারযোগ্য। নীতির প্রতি জীবনবাদী কবির আকর্ষণ ছিল না ঠিকই, তবু সীতা-রুক্মিনী-শকুন্তলার পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, তাও সত্য। আর সমগ্র কাব্যরচনাতে কোথাও কোনো চরিত্রকে তিনি সম্পূর্ণ মূল্যবিরোধী করেন নি। যত ক্ষীণই হোক্, কোনো একটি আভাস তিনি মূলে পেয়েছেন। যেমন রামচন্দ্রের ধর্মনিষ্ঠার সূত্র ধরেই তাঁকে অতিরিক্ত ধর্মভীরু দুর্বলরূপে এঁকেছেন। তাই তারার চরিত্রেও সোমের প্রতি প্রচ্ছন্ন আকর্ষণের আভাস মূলেই পেয়েছেন কিনা অনুসন্ধান করা যেতে পারে। তাঁর কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য কল্পনার স্বতন্ত্রতা বা Objectivity। কোনো চরিত্রই সামাজিক আদর্শের শ্রেণীগত চরিত্র নয়, তাই তারাও তারা-ই।

এই কাহিনী পাওয়া যায় বিষ্ণুপুরাণ (চতুর্থ অংশ, ষষ্ঠ অধ্যায়) ব্রহ্মপুরাণ (নবম অধ্যায়), মৎস্যপুরাণ (ত্রয়োবিংশ অধ্যায়) এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ (প্রকৃতি খণ্ড ৫৭-৬০ অধ্যায় এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড ৮০-৮১ অধ্যায়)-তে। এর মধ্যে শেষ উৎসটিতেই কাহিনী বিস্তারিত; প্রকৃতিখণ্ডের কাহিনীই কৃষ্ণের জন্মখণ্ডে বিবৃত আছে। সেখানে 'কুলপাংশপ' সোমের প্রতি তারার অভিশাপ আরো কঠোর ও স্পষ্ট।

রাহুগ্রস্তো ঘনগ্রস্তঃ পাপদৃশ্যো ভবানুভব।
কলংকী যক্ষণাগ্রস্তো ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥—৮০, ১৭

মধুসূদন দেখিয়েছেন তারার প্রেম সম্পূর্ণ রূপজ। কিন্তু পুরাণ কাহিনীতে সোমের আকর্ষণই রূপজ, আর তারাই তাকে কিছুটা প্ররোচিত করেছে তার বেশবাস ও আচরণের দ্বারা। পুরাণকারেরা তারাকে যতোই নিষ্কামা নিরপরাধা (নিষ্কামা সা পতিব্রতা; সুরসুরোঃ পত্নীং ধর্মিষ্ঠা চ পতিব্রতাম্) বোলে থাকুন না কেন, তাঁর রূপবর্ণনা কিন্তু মোটেই তেমন নয় (দ্রঃ ব্র. বে পু. প্রকৃতিখণ্ড, ৫৮ অধ্যায়)।

সে রূপ মাতৃমূর্তির নয়, লাস্যময়ী রমণীর। সে সেখানে 'কামাধারা', 'কামুকী', 'সকামা'। মৎস্যপুরাণে 'সাপি স্মরার্তা সহ তেন রেমে' (২৩, ৩১)। তারাকে যতোই নীতিপরায়ণা বা পতিব্রতারূপে উপস্থাপিত করা হোয়ে থাকুক, তার অন্তরের ভোগাসক্ত কামুকতা, রূপজাল-বিস্তারের চেষ্টা এবং নিরন্তর তপস্যাপর বৃদ্ধ পতির সহবাসে তার দুর্লভ নবযৌবনের দিনগুলির ব্যর্থতাবোধ গোপন থাকেনি। পুরাণ-কারেরা নীতি আদর্শ ইত্যাদি নিয়ে যতো ভাবিত ছিলেন, আচরণের যুক্তিসহতা নিয়ে ততোটা নন। মানবিক যুক্তিযুক্ততা আধুনিক যুগের ভাবনাসংগত।

মধুসূদন কাল্পনিক নীতিবাদী নন, বাস্তবনিষ্ঠ কবি। জীবন যৌবন ধন ঐশ্বর্যকে আত্মশক্তিতে অর্জন কোরে নিয়ে সে সুধা আকণ্ঠ পান কোরেই তিনি পরিতৃপ্ত হোতে চেয়েছেন। তারা যে দেহের প্রবৃত্তিধর্মে রূপপিপাসা চরিতার্থ করতে চাইবে সেটাই তাঁর দৃষ্টিতে স্বাভাবিক ও বাস্তব। পুরাণ থেকেই সূত্র নিয়েও তিনি দেখালেন—সোম তারার কেবল দেহ নয় হৃদয়কেও জয় করেছে; অভিশাপের বদলে তারার হৃদয়কুসুম বিকশিত হোয়ে উঠেছে, প্রেমের জন্য তার মনস্তত্ত্বসম্মত আত্মরতিও জেগেছে। দেহাতীতে নয়, দেহাশ্রয়ী জীবনময় স্বর্গীয় বেদনাতেই তারা চঞ্চল। তারার সামাজিক নীতিপরায়ণতার সঙ্গে শৃঙ্গারকামনা-অভিলাষের দ্বন্দ্বও অব্যঞ্জিত থাকেনি। পুরাণের প্রাণহীন চরিত্রটিকে সংস্কার ও অবাধ্য হৃদয়াবেগে দীর্ণ প্রেমপীড়িতা সজীব রমণীতে পরিণত কোরে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে স্বাধীন অবৈধ প্রেমের সূচনা করলেন। পুরাণের কাহিনী চরিত্র ও পরিমণ্ডল অবলম্বন কোরেও নবলব্ধ স্ত্রী-স্বাধীনতার আদর্শ ভোগময় জীবনবাদের প্রকাশ ঘটানোতে আত্মবিবিক্ত নাট্যগুণবিশিষ্ট পত্রিকাগুলি বিশিষ্ট।

উর্বশীর কাহিনী বহু প্রাচীন। ঋগ্বেদে এ কাহিনী আছে প্রচ্ছন্নভাবে। এছাড়া শতপথ ব্রাহ্মণ, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ড, মৎস্যপুরাণ, বিষ্ণুধর্মোত্তর উপপুরাণ প্রভৃতিতেও এই কাহিনী পাই। বিভিন্ন জায়গায় কাহিনীতে কিছু পার্থক্য থাকলেও অপ্সরা উর্বশীর শাপগ্রস্তা হোয়ে মর্তভোগ্যা হবার কথা সব জায়গাতেই আছে। কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকে সেই কাহিনীই, আর মধুসূদন নিজেই জানিয়েছেন যে কালিদাসের থেকে নিয়েছেন। বীরাঙ্গনার নায়িকাদের মধ্যে উর্বশী সামাজিক মর্যাদায় স্বতন্ত্র; সে বারাঙ্গনা—দেবতাদের প্রমোদসঙ্গিনী। প্রাচীন সমাজে গণিকাদের স্থান স্বীকৃত ছিল, বাৎসায়নের কামসূত্রে তাদের কলাবিদ্যার পরিচয় আছে (বিদ্যাসমুদ্দেশ)। সেই বিশিষ্ট গুণবতীর অসংকোচ চতুরতা ও গভীরতাহীন পরিপাটি মুখর বাক্‌ভঙ্গিমাকে মধুসূদন এই নায়িকায় সঞ্চারিত করেছেন। কাহিনী কালিদাসের। বিক্রমোর্বশীয়ম্ নাটকের শেষে পাই পুরুরবাকে ছেড়ে স্বর্গে ফিরে যেতেও উর্বশীর অনাগ্রহ। মধুসূদন কাহিনীর সে-অংশ নেননি, প্রণয় সঞ্চারের উপলক্ষ্য এবং তার স্বরূপ প্রদর্শন দ্বারা তার হৃদয়ের অনাবরণই তাঁর

অভিপ্রেত, তবে স্বর্গ-প্রত্যাবর্তনে অনীহা এবং মর্ত্যজীবনের রূপযৌবনাশ্রিত ভোগাকাঙ্ক্ষার ব্যঞ্জনা আছে। কেবল বিষয়-কথনে নয়, রূপবর্ণনা ও উপমার ভাষাতে কালিদাসের প্রায় আক্ষরিক অনুসরণ আর সংলাপে তাঁর নানা শ্লোকের অনুবাদ অথবা উল্লেখ। এতকাল যে স্থিরযৌবনা স্বর্গনর্তকী হৃদয়হীন ভোগের উপচার হোয়ে ছিল, পৃথিবীর প্রেমাস্পদের জন্য তার অনিন্দ্য রূপের সঙ্গে হৃদয় ঐশ্বর্য নিবেদনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতে গিয়ে কবির ভাষাও হয়েছে আবেগকম্পিত রাগরঞ্জিত।

সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা রচনার রীতি মধুসূদনই বাংলা সাহিত্য প্রথম নিয়ে এলেন। ইংরেজি সনেটে সুনির্দিষ্ট মিলে বিন্যস্ত অষ্টক (octave) ও ষট্‌কে (sestet) বিভাজিত চোদ্দটি 'আয়াম্বিক' ছন্দের 'পেন্টামিটার' পঙ্‌ক্তির মধ্যে একটি সুগভীর হৃদয়ভাবকে প্রকাশ করা হয়। বাইরের গঠনে সনেট ক্লাসিক্যাল দৃঢ়বন্ধ রীতির কিন্তু অন্তর-প্রকৃতিতে আবেগোচ্ছ্বসিত। মধুসূদন এই রূপবন্ধে কতটা সাফল্যের অধিকারী সে আলোচনায় না গিয়েও এটা স্বীকার করতে দোষ নেই যে এই রূপবন্ধ তাঁর মানসপ্রবণতার অনুকূল ছিল এবং সবগুলি না হোক্‌, অনেক-গুলিতেই তাঁর ব্যক্তিগত আনন্দ বেদনা আকাঙ্ক্ষা ও সাহিত্যরুচি ব্যঞ্জিত হয়েছে। চিরচঞ্চল মধুসূদন লক্ষ্মীলাভের আকাঙ্ক্ষায় বিদেশ পাড়ি দেবার পরে নানা অবস্থা বিপর্যয়ের শিকার হয়েছিলেন, নিবিষ্টভাবে সাহিত্যসাধনার অবকাশ ছিল না; নানা ভাষা শিক্ষা তখনও চলছিল কিন্তু সাহিত্যে তার ফল তেমন ধরা পড়েনি, আর হারিয়ে গিয়েছিল সেই পরিশ্রমী শিল্পীটি। তবু লক্ষণীয় যে ১১০-টি সনেটের মধ্যে আটত্রিশটি কবতাই পুরাণ মহাকাব্য সংস্কৃত সাহিত্য ও মধ্যযুগায় বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত। দেশীয় সাহিত্য দেশীয় কবি বা পৌরাণিক কাহিনী সম্বন্ধে তখনও আগ্রহ হারান নি তিনি। এই কবিতাগ্রন্থে মহাভারতের কাব ও কাহিনী নিয়ে লেখা ষোলটি কবিতা, রামায়ণ সম্বন্ধীয় ছয়টি, সংস্কৃত সাহিত্য ও কবিতা-বিষয়ক পাঁচটি, ভাগবতপুরাণ ও মঙ্গলকাব্য নিয়ে লেখা আছে পাঁচটি কবিতা। এছাড়াও নানা কবিতায় উপমা অনুষঙ্গ বা ভাষাশৈলীতে এসেছে এসব প্রসঙ্গ। বস্তুধর্মী কাহিনীকাব্য বা নাটক রচনার সময়ে যে ভাবনা কবির মনে কাজ করেছিল, খণ্ড কবিতা রচনার সময়েও সেই মানসিকতার পরিবর্তন হয়নি। কয়েকটি সনেটে আছে বিভিন্ন রসের মূর্তিকল্পনা। এতে অমূর্ত ভাব প্রকাশের ভাষা হোয়ে উঠেছে রূপময়; সেটা তাঁর কবিত্বেরই বিশিষ্ট লক্ষণ আর ভারতীয় রসশাস্ত্র সম্পর্কেও যে তাঁর আগ্রহ ছিল তার প্রমাণ। জনৈক সমালোচক বলেছিলেন, সনেটগুলির সার্থকতা ও অসার্থতার মধ্যে কবি মধুসূদনের প্রতিভার মূলসূত্র পাওয়া যেতে পারে।[২৩] মধুসূদনের সনেটগুলিতেও বস্তু-অনুগ-দৃষ্টির পরিচয়

---

২৩ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, মধুসূদন কবি ও নাট্যকার, ৩য় সং, পৃঃ ৯৫

আছে। মহাকাব্য রচনার অনুকূল প্রতিভার চিহ্ন এগুলিতেও বর্তমান। ভাষা ও কল্পনার রাজসিক গৌরব ও ঐশ্বর্যময়তা তাঁর কবিত্বের লক্ষণ, সনেটেও তাই বর্ণনা ও মূর্তিসৃষ্টির ছড়াছড়ি। পুরাণাশ্রিত সনেটগুলিতেও তাই কাহিনী বর্ণনা বা একটি স্থির চিত্র ধরে দেওয়া আছে, মূল ব্যঞ্জনা আভাসিত করার নিদর্শন কম। অনেকগুলি সনেটই বিভিন্ন রূপকের মাধ্যমে উপস্থাপিত; বহু উপমা রূপকও এসেছে প্রাচীন সাহিত্য থেকেই। কাহিনী যেখানে প্রত্যক্ষতঃ পৌরাণিক নয় সেখানেও চিত্রকল্প অনেক সময় পৌরাণিক। বিদ্যাসাগর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরগুপ্ত এঁদের সম্পর্কে প্রশস্তিগুলিতে তার পরিচয়। বাংলাভাষার সৌন্দর্য ও সংস্কৃতের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিচার করতে গিয়ে বলেছেন—'শকুন্তলা তুমি, তব মেনকা জননী'; জোনাকিদল দেখে তাঁর মনে হয় 'রাজসূয় যজ্ঞে যথা রাজাদল চলে, রতন মুকুট শিরে'। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। নিজের মনের ব্যর্থতার বেদনা নিয়ে সাহিত্যজগৎ থেকে বিদায় নেবার সময়েও মনে হয়—'এবে ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূরে বনে।'

লক্ষণীয় যে আগের নাটক কাব্যগুলিতে নানা পুরাণের প্রসঙ্গ এসেছে কাহিনী ও প্রকাশভঙ্গিতে, কিন্তু সনেটে রামায়ণ মহাভারতের প্রসঙ্গই প্রধান; ভাগবতের ব্রজলীলা-প্রসঙ্গ কয়েকবার আছে, তবে সেগুলি রাধাকৃষ্ণের প্রচলিত লৌকিক কাহিনীর সংস্কার থেকেই এসে থাকতে পারে। রামায়ণ মহাভারতের ক্ষেত্রেও মূল সংস্কৃত মহাকাব্যের চেয়ে চিরসঙ্গী কৃত্তিবাস কাশীরামের ওপরেই বেশি নির্ভর। স্থানাভাবে এখানে উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা সম্ভবপর হোলো না কিন্তু কথাটি সত্য। বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে আর আগের মতো চর্চা হয়নি। মনের মধ্যে যে কাহিনী ও চিত্র গেঁথে ছিল, ধর্মভক্তি আদর্শ বা মননশীলতা ছাড়াই সহজ ভঙ্গিতে এসে গেছে সেগুলি। চকিতে উঠে এসেছে এক একটি চিত্রকল্প। কালিদাসও মিশে ছিলেন কবির মজ্জায়, তার পরিচয়ও আছে কিছু, যেমন আছে মায়াকানন নাটকে।

॥ ৩ ॥

কাহিনী বিন্যাস, চরিত্রচিত্রণ, কাব্যদেহের গঠনশিল্প এবং মূল প্রেরণায় অবশ্যই মধুসূদন অনেকাংশে পাশ্চাত্ত্য আদর্শ ও ভাবধারার অনুবর্তক, সে আলোচনা বর্তমান নিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ভারতীয় 'আদর্শ' এবং জাতিগত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার তাঁর মর্মমূলে নিহিত ছিল। প্রায় সব রচনারই বিষয় দেশীয় সাহিত্য-পুরাণ থেকে নেওয়া—এটুকুই শুধু লক্ষ্য করেছি। মহাকবির উপযুক্ত যে বাণী-মূর্তি তিনি সৃষ্টি করলেন, তাতে এই উত্তরাধিকার কতটা ক্রিয়াশীল সেটিও বিচার্য। প্রকাশরীতি বা স্টাইল, যার মধ্যে কবিব্যক্তিত্ব ধরা পড়ে তা তো বিষয়বস্তু

থেকে 'অপৃথক্ যত্ননির্বত্য' ; তাই প্রকাশমাধ্যম আলোচনাতেও তাঁর স্বকীয়তা বা অভিনবত্ব ধরা পড়বে।

কাব্যভাষাতে (ক) লেখকের শব্দ ব্যবহারের বিশিষ্টতা, (খ) শব্দসমষ্টির ঝংকার অর্থাৎ ছন্দ ও শব্দালংকার, (গ) ব্যাকরণ ও বাক্‌ভঙ্গিমা, (ঘ) অর্থালংকারের মাধ্যমে গভীরতর তাৎপর্য সৃষ্টি, (ঙ) বক্তব্যকে বিস্তৃতি দেবার জন্য অনুষঙ্গ ব্যবহার—এইসব দিক বিচার করলে কবির প্রবণতা ও চিন্তাভঙ্গিমা বুঝতে পারা যায়। স্টাইল বা শৈলী বিষয়ে মধুসূদন ছিলেন সচেতন শিল্পী, হয়তো বা কিছু বেশি সচেতন। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা পরিবর্তন দিয়ে তিনি নিজের রচনাকে সার্থক সুন্দর ও ভাবপ্রকাশের উপযোগী কোরে তোলবার চেষ্টা করেছেন। ভাষা ছন্দ শব্দ চিত্র সব দিকেই এই পরিমার্জন হয়েছে। তাঁর কাব্যকে কোন্ কোন্ দিক দিয়ে বিচার কোরে দেখতে হবে সে বিষয়ে তিনি কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলীকে লিখেছিলেন[২৪]—
In reading over my poem, you must look—1st to the imagery; 2nd to the language in which those images and thoughts are expressed, 3rd to the *individual* flow of each verse. Do not care for the *general effect*.…if there is good poetry in the book, expressed in elegant and choice language and if each verse is musical, then my friends need not be troubled on my account.

তাঁর মতে সুনির্বাচিত কাহিনীর আধারে ভাবকল্পনার রূপায়ণ যদি সার্থক হয়, ভাষা যদি হয় সৌষ্ঠবপূর্ণ, ছন্দ প্রবাহ হয় মধুর সংগীতগুণান্বিত এবং চিত্রকল্প সার্থক, তবেই কাব্য অমরত্ব লাভ করে। এজন্যই রাজনারায়ণ বসুকেও লিখেছিলেন—
You must weigh every thought, every image, every expression, every line,[২৫]। কবির ভাবকল্পনা স্বতঃই উপযুক্ত বাণীবিন্যাস নিয়ে আসে সে বিশ্বাসও ছিল তাঁর। The thoughts and images bring out words with themselves.[২৬] কাব্যকায়ার বিশ্লেষণে ঐতিহ্যানুসরণের পরিমাণ নির্ণয়ের ফলে তাই মধুসূদনের কবিআত্মার স্বরূপ ধরা পড়বে।

তাঁর তৎসম এবং অনেকাংশে অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা সুবিদিত। অধরা নিরবয়ব ভাবের চেয়ে কাহিনী ও চরিত্রনির্ভর বিষয়কেই এই ক্লাসিকপন্থী-তন্ময়রীতির কবি ব্যবহার করেছেন, তাই ধ্বনিবহুল আড়ম্বরপূর্ণ শব্দের ব্যবহারে বক্তব্যকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—প্রায় স্পর্শবেদ্য মূর্তি দিতে চেয়েছেন। শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয়ই তাঁর বেশি প্রখর, বর্ণাঢ্য চিত্র এবং মধুর গম্ভীর বিচিত্র

২৪ পত্রের তারিখ নেই, সম্ভবতঃ ১৮৫৯/৬০-তে।
২৫, ২৬ রাজনারায়ণ বসুকে লেখা পত্র দুটিতে তারিখ নেই।

ধ্বনিময় শব্দ ব্যবহার তাঁর কবিধর্মেরই তাগিদে। ধ্বনিগুণ সমন্বিত গালভরা সংস্কৃত শব্দ, সন্ধিসমাসের সুপ্রচুর ব্যবহার, সংস্কৃত ব্যাকরণের নানা রীতির প্রয়োগ, সংক্ষিপ্তির জন্য নামধাতুর অতি-প্রয়োগ—এসব দেখে বুদ্ধদেব বসুর মনে হয়েছিল বাংলা-ভাষার প্রকৃতি সম্পর্কেই মধুসূদনের ধারণা ছিল না। ইংরেজি বাক্‌ভঙ্গি যেমন তিনি নানা স্থানে ব্যবহার করেছেন, তেমনি খাঁটি বাংলা ভঙ্গিমাটিও কিন্তু প্রয়োজন-বোধে এনেছেন অনেক জায়গাতেই (প্রহসন দুটির ভাষা এবং বিভিন্ন কাব্যেও এই প্রয়োগ লক্ষণীয়)। চলতি রীতিকে তিনি কাব্যভাষারূপে স্বীকৃতি দিতে চাননি, ভাষারীতিতে আর্যমাহাত্ম্য নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন ; সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিমহিমা সংগীতগুণ ও সংহতি আর অভিজাত-গৌরব নিয়ে এসে তাঁর বিশিষ্ট অভিপ্রায়টিকেই অভিনবভাবে সঞ্চারিত কোরে দিয়েছেন। প্রমীলার যুদ্ধযাত্রা বা রাবণের সমরায়োজনের আড়ম্বর তাঁর শব্দ ব্যবহারের ফলেই চাক্ষুষ হোয়ে উঠেছে। অথচ সীতার গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনীতে সে ভাষাই মৃদু-কোমল ; মেঘনাদের সৎকার বর্ণনায় অনলংকৃত ছোটো ছোটো বাক্যে দীর্ঘশ্বাসের আভাস। সংস্কৃতের আর খাঁটি বাংলার বাক্‌রীতি আয়ত্ত ছিল বোলেই প্রয়োজনানুসারে ভাষাভঙ্গিমা বেছে নিতে তাঁর অসুবিধা হয়নি।

মধুসূদনের এই স্টাইলের পিছনে নূতনসৃষ্ট সাহিত্যিক গদ্য ভাষারীতির ঐতিহ্যকেও অস্বীকার করা যায় না। একদিকে লৌকিক বাক্‌ভঙ্গিমাসমন্বিত কবিওয়ালাদের ভাষা, অপরদিকে মদনমোহন তর্কালংকারের বাসবদত্তা বা পাঁচালী প্রভৃতির কৃত্রিম আলংকারিক ভাষা—কোনোটিই আদর্শ ভাষারীতি ছিল না। ভারত-চন্দ্রের রচনায় সচেতন শিল্পপ্রয়াস থাকলেও বিষয়ের সঙ্গে প্রাণের যোগ না থাকায় সে ধারা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। যুগোচিত মননের গদ্যভাষা তৈরি হোতেও সময় লেগেছে। প্রথম যুগের গদ্যভাষাকে আচার্য সুনীতিকুমার বলেছিলেন doubly artificial language ; বিদ্যাসাগরই প্রথম যথার্থ শিল্পীর মন এবং দৃষ্টি নিয়ে লৌকিক বাংলাভাষাকে আভিজাত্য দিয়েছিলেন—কেবল চিন্তার সুশৃংখল বিন্যাসকে রামমোহন অক্ষয় দত্তের মতো প্রাধান্য দিয়ে নয়, কল্পনার ও কথাসাহিত্যের উপযোগী করার প্রয়োজনে অলংকারে ও সুনির্বাচিত তৎসম শব্দ ব্যবহারে ধ্বনিগম্ভীর ও সুললিত কোরে। ইংরেজি গদ্যের সঙ্গে গভীর পরিচয়ের ফলে যতিচিহ্নের প্রচুর ব্যবহারে অর্থসম্পন্ন বাক্যাংশের ইঙ্গিত সঞ্চারিত কোরে, ধ্বনিতরঙ্গের উত্থানপতনে ছন্দঃস্পন্দের আভাস এনে, অনুচ্ছেদ রচনার দ্বারা অর্থমণ্ডল তৈরি কোরে তিনি সংস্কৃত গদ্যভঙ্গিকেই আধুনিক রূপ দিয়েছিলেন। গদ্যের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর যা করেছেন, পদ্যে তা-ই করলেন মধুসূদন। তাঁর বিস্তারধর্মী ভাষার ধ্বনিগৌরব, সুদীর্ঘ অলঙ্কৃত বাক্য ব্যবহারে ভাবের সঙ্গে ভাষারও উদাত্ত গাম্ভীর্য এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের rhythm-টি ধরিয়ে দেবার জন্য প্রচুর যতিচিহ্নের ব্যবহার সে কথাই প্রমাণ করে। উভয়েই যে বঙ্গভাষার জননী সংস্কৃতের কাছে বিশেষভাবে

ঋণী তাতে সন্দেহ নেই। মাতৃভাষার অনন্ত ভাণ্ডার বিষয়ে মধুসূদন অবহিত ছিলেন। ভাষার শ্রুতিমাধুর্য বৃদ্ধির জন্য অনুপ্রাসের প্রচুর ব্যবহার এবং পরোক্ষ বস্তুকে প্রত্যক্ষবৎ করার জন্য ধ্বন্যুক্তি ব্যবহার করেছেন; যমক ব্যবহারও কম নয়। তবে শ্লেষে বুদ্ধির খেলাই প্রধান বোলে তার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। এই সব রীতি সংস্কৃত সাহিত্য-ভাষা থেকেই পাওয়া, সেকথা বলা বাহুল্য। ইংরেজিতে alliteration ভাষাপ্রকৃতির সঙ্গে সংগতিশীল নয়।

কল্পনায় এবং কাঠামোতে মধুসূদনের পাশ্চাত্ত্য প্রথানুসরণ যতোই থাকুক, প্রকাশের ভাষা ও ভঙ্গিটি যে প্রধানতঃ প্রাচ্য তার আর এক প্রমাণ আলংকারিকদের নির্দেশিত প্রায় সব অলংকারের বহুল ব্যবহার। তা বোলে অলংকারই কাব্যের আত্মা এমন প্রত্যয় তাঁর ছিল, একথা ঠিক নয়। অলংকার যখন ভাবেরই প্রতিমূর্তি বা চিত্রকল্প হোয়ে ওঠে তখন তা আর বহিরঙ্গ আভরণমাত্র থাকে না। অর্থালংকার প্রধানতঃ তুলনামূলক, সাদৃশ্যের অনুপাত অনুযায়ী বিভিন্ন অলংকার হয়। বিরোধ-মূলক অলংকারগুলিও আসলে সাদৃশ্যেরই আভাস আনে। মধুসূদনের উপমানগুলি সর্বদাই সাবয়ব, ভাবকে তিনি বস্তুরূপে দেখেন। অলৌকিক বিষয়ের বর্ণনা দিতেও পার্থিব জগৎ থেকেই উপমান সংগ্রহ করেন—ফলে রূপকল্প কেবল অনুভূতি-সাপেক্ষ না থেকে যেন স্পর্শবেদ্য হোয়ে ওঠে, তখনই সৃষ্টি হয় প্রতিমা। কেশব গাঙ্গুলীকে লেখা পূর্বোদ্ধৃত পত্রে চিত্রকল্পকেই (images) সর্বপ্রথম বিবেচ্য বোলে উল্লেখ করেছেন। কেবল লৌকিক বা বাস্তব জগৎ থেকে উপমান আহরণ কোরে তাঁর মন তৃপ্ত হয়নি, পুরাণ মহাকাব্য থেকে তুলনা সন্ধান করেছেন। অনুষঙ্গগুলিও চিত্রকল্পেরই নামান্তর। C. Day Lewis-এর 'try to be presise and you are bound to be metaphorical,'[২৭] অথবা 'poetic image is a word charged with emotion or passion'[২৮]—একথা মধুসূদন সম্পর্কে সত্য। একটি বিশেষণ, একটি তুলনা বা একটি অনুষঙ্গ দিয়েই তিনি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে পারতেন এবং সেই পরিমণ্ডলটি প্রায়শঃ পৌরাণিক। তাঁর চিত্রকল্পের সংখ্যা বিচারে হয়তো বাস্তবের চেয়ে পৌরাণিকের সংখ্যা কম, কিন্তু বাস্তব বা লৌকিককে বর্জন করলে তো কাব্য বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তিভূমিই হারাবে। পৌরাণিক রূপক-অনুষঙ্গ ব্যবহারের অনুপাত বুঝবার জন্য আমরা দু একটি অংশ বিশ্লেষণ কোরে দেখতে পারি। প্রথম কাব্য তিলোত্তমাসম্ভবের প্রথম পঞ্চাশ পঙ্‌ক্তিতে যেমন তাঁর ভাষা ব্যবহারের সবগুলি বিশিষ্ট লক্ষণই দেখা যাবে, তেমনি এতে আছে শিবের চারটি চিত্রকল্প, সমুদ্রমন্থনের চিত্রকল্প, অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং তার ফল-প্রাপ্তি সম্পর্কে মহাভারতীয় কাহিনীর উল্লেখ আর সগর রাজবংশের কাহিনী।

২৭ C. Day Lewis, The Poetic Image, P. 19

২৮ তদেব

পুরাণনির্ভর ক্লাসিক্যাল কল্পনারীতির পরিচয় নিয়েই তাঁর বাংলা কাব্যজগতে প্রথম প্রবেশ।

মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গটি কিছু ভিন্ন সুরে বাঁধা। মানবসমাজের সংগ্রাম-উন্মাদনা থেকে দূরে ধৈর্য ও ক্ষমার প্রতিমা বৈদেহীর শান্ত সংহত স্মৃতি-চারণের ভাষা কোমল, চিত্রগুলি স্থির, গার্হস্থ্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে উপমাগুলি গৃহীত। তবু পঞ্চবটিবন-চিত্র থেকে আরম্ভ কোরে ঐ সর্গের শেষ পর্যন্ত রামায়ণ-কাহিনীর মধ্যেও পুরাণ-সম্পর্কিত উপমা উল্লেখ, বিশেষণ ব্যবহার আছে এগারোবার এবং সীতা স্বয়ং 'বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে।' কাল্পনিক আখ্যান চরিত্র ও তাদের মূল্যবোধকে উপজীব্য কোরে একদিকে আধুনিক যুক্তি-নিষ্ঠ মনের কাছে বিশ্বাসযোগ্য কোরে তোলা, আধুনিককালের মূল্যবোধের দ্বারা তাদের নবরূপায়ণ ঘটানো, আবার অবলম্বিত বিষয়বস্তু ও চরিত্রের সুদূরতা বজায় রাখার এই উপায় সত্যই অভিনব।

কখনও কাহিনীর বিস্তৃতির জন্য পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যেই অন্য পুরাণের কাহিনী অথবা ঐ পুরাণেরই অন্য কাহিনী এনে, কখনও তুলনার জন্য পুরাণ কাহিনী এনে, কখনও একটি স্থিরচিত্রের আভাস দিয়ে, কখনও একটি বিশেষণে কাহিনী-ব্যঞ্জনা সৃষ্টি কোরে, বা পাত্রপাত্রীর বিশিষ্ট নামের সার্থক প্রয়োগে কাহিনীর আভাস সঞ্চারিত কোরে মধুসূদন পৌরাণিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। সে প্রয়োজনে তাঁর রচনাশৈলীতে রামায়ণের কাহিনী, মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী, বিবিধ পুরাণের কাহিনী, প্রাচীন বাংলা কাব্য ও কাহিনীর ছবি এসেছে। আর কালিদাসের রচনা থেকেও এসেছে বহু চিত্র। বিভিন্ন পুরাণের কাহিনী মহাভারতে আছে, আবার কালিদাসের কাব্যেও রামায়ণ মহাভারত বা পুরাণের কাহিনী আছে। মধুসূদন কোথা থেকে কোন্‌টি নিয়েছেন বলা সম্ভব নয়, তবে কত প্রসঙ্গই না এসেছে। লক্ষ্মী-বিষ্ণু-ব্রহ্মা-চণ্ডী-ইন্দ্রের নানা রূপ ও কাহিনী; রাহু, মন্বন্তর-কালীন প্রলয়, অনন্তনাগের কাহিনী ও রূপক; কার্তিকেয় জন্মকথা; ঊষা-সূর্য প্রসঙ্গ; নন্দন-কল্পতরু-মন্দাকিনীর কাহিনী; যক্ষ, ধন্বন্তরী-সরস্বতীর রূপ-চরিত্র; উর্বশী-হেমকূট, জগদ্ধাত্রী, ভানুবিলাসিনী ছায়া, অশ্বিনীকুমার—পুরাণের কত ছোটোবড়ো কাহিনী বা চরিত্রই তাঁর কল্পনাকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে। শিবের চরিত্র ও চিত্রকল্প দেখা দিয়েছে বিচিত্রভাবে, রাধাকৃষ্ণ কাহিনীও বহুবার উত্থাপিত হয়েছে। পুরাণের সমুদ্রমন্থন মধুসূদনের প্রিয় প্রসঙ্গ, প্রত্যক্ষ পরোক্ষ বা আংশিকভাবে এই কাহিনী বা চিত্রকল্প এসেছে। এই কাহিনী এবং এরই সঙ্গে যুক্ত রাহুর চন্দ্রসূর্যগ্রাসের কাহিনীর বিশাল পটভূমি ও চমৎকারিত্ব তাঁর রাজসিক কল্পনার অনুকূল। মহাভারতের অসংখ্য খুঁটিনাটি ঘটনার উল্লেখ বিস্ময়কর বোধ হয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে রামায়ণের ক্ষেত্রে যেমন বাল্মীকির মূলকাব্যের ভাষা বা কাহিনীর যথাযথ অনুসরণ আছে, ব্যাসের কাব্যের তেমন নয়। ঐ অতি-

কিন্তু কাব্যের নিত্যব্যবহারযোগ্যতা নেই, তার ভাষাও তেমন কাব্যময় বা কাহিনী সুডোল নয়। তবু বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা বর্ণনায় ব্যাসের অনুসরণ একেবারে নেই তা-ও নয়। কাশীরামের ওপরে তাঁর নির্ভর বেশি।

ইয়োরোপীয় প্রাচীন বা আধুনিক সাহিত্যের আদর্শ এবং আধুনিক কালের ভাব ও জীবনাচরণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের সার্থক সম্মিলনে মধুসূদন প্রকৃত অর্থেই বাংলার রেনেসাঁস যুগের কবি-সাধক। এই কথাও স্মরণ করতে চাই যে, তাঁর সব কাব্যের প্রচ্ছদপটেই তাঁর সাহিত্য সেবার মূলমন্ত্র 'শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্য্যং বা সাধয়েয়ম্' এই বাক্য উৎকলিত থাকত। আর থাকত ঐ মন্ত্রের দ্যোতক একটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রতীক হস্তী ও সিংহের মধ্যে কাব্যপ্রতিভারূপ সূর্য বঙ্গসাহিত্য-শতদলকে করছে সমুদ্ভাসিত। তাঁর মৃত্যুর পরে আর প্রকাশকেরা এগুলি রাখেননি। মধুসূদন অকারণে এই চিত্র বা পঙ্‌ক্তিটি ছাপাননি; তাঁর ভাবজীবনেরই প্রতীক এটি, নিজের কবিধর্ম সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না তিনি॥

বঙ্গেতর ভারতীয় সাহিত্যে মধুসূদনের প্রভাব

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-নিষ্ণাত মধুসূদনের প্রবর্তনায় বাঙলা সাহিত্যে যে বিচিত্রমুখী অভিনবত্বের প্রতিষ্ঠা হয়, বঙ্গেতর ভারতীয় সাহিত্যে তার প্রভাব বিস্তারের প্রকৃতি, পরিমাণ ও কালসীমা অভিন্ন নয়। তাছাড়া অমিত্রাক্ষর ছন্দ, মহাকাব্য, সনেট, পত্রকাব্য ও নাটক—সাহিত্যের এই বিবিধ রূপ ও প্রকরণ সকল ভাষায় সমান গুরুত্ব লাভ করে নি।

হিন্দী সাহিত্যে রেনেসাঁসের প্রথম প্রতিনিধি ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের (১৮৫০-৮৫) যুগে—যার ব্যাপ্তিকাল ১৮৭০-১৯০০—নাটক অনূদিত হয়েছে মুখ্যত সংস্কৃত, বাঙলা ও ইংরেজী থেকে। এবং বাঙলা থেকে সর্বাধিক অনুবাদ হয় মধুসূদনের। ১৮৭৮ থেকে ১৮৯৯ এই দুই দশকের মধ্যে বালকৃষ্ণ ভট্ট, রামচরণ শুক্ল, রামকৃষ্ণ বর্মা এবং পণ্ডিত ব্রজনাথ পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী এবং একেই কি বলে সভ্যতা-র বিভিন্ন অনুবাদ প্রকাশ করেন। অল্প কিছু পরে বিংশ শতকের গোড়ায় পাওয়া যায় বাপু নরসিংহ ভাবে কৃত কৃষ্ণকুমারী (১৯০২) ও পদ্মাবতী (১৯০৩) নাটকের মারাঠী অনুবাদ।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহারে ও মহাকাব্য রচনায় মধুসূদনের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায় সর্বপ্রথম অসমীয়া ভাষায়। কলকাতার কয়েকটি অসমীয়া ছাত্র ও যুবকের উদ্‌যোগে ১৮৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'জোনাকী' মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে অসমীয়া সাহিত্যে নবযুগের সূচনা বলে মনে করা হয়। তার আগেই কিন্তু দু'জন কবি মধুসূদনের অনুসরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দে মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হন। প্রথম কবি রমাকান্ত চৌধুরী (১৮৪৬-৮৯) যিনি মাইকেল প্রবর্তিত "বাঙলা অমিত্রাক্ষর" ছন্দকেই আদর্শ রূপে গ্রহণ করে ১৮৭৫ সালে প্রকাশ করেন "অভিমন্যু বধ" (প্রথম খণ্ড)।[১] প্রথম খণ্ডে তিনটি সর্গ—করুণরসাশ্রিত অভিশাপ সর্গ, বীররসাশ্রিত বলহারী সর্গ এবং আদিরসাশ্রিত মিলন সর্গ। পাঠক সমাজে কাব্যটির উপযুক্ত সমাদর না হওয়ার ফলেই বোধ করি লেখক দ্বিতীয় খণ্ড রচনায়/প্রকাশে উৎসাহ বোধ করেন নি। কাব্যের নাম অভিমন্যু বধ হলেও উত্তরা অভিমন্যুর মিলনেই (তুলনীয় প্রমীলা মেঘনাদ মিলন) প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি। অভিমন্যুবধে সম্পূর্ণ মাইকেল ঠাট অনুসরণের চেষ্টা ছিল না। এর ভাষা অনেকটা ঘরোয়া, এতে অপ্রচলিত আভিধানিক তৎসম শব্দের ব্যবহার খুবই কম। ছন্দের সাবলীল গতি ও নামধাতুর

জন্য লক্ষণীয় এই কাব্যটিতে কবি কামরূপের কথ্য ভাষা ব্যবহারেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি।[২]

"সীতাহরণ" কাব্য রচয়িতা ভোলানাথ দাসও (১৮৫৮-১৯২৯) প্রাক-জোনাকি যুগের কবি। তাঁর "কবিতামালা" (প্রথমভাগ ১৮৮১) গ্রন্থে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত না হলেও নামধাতুর প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়। 'কবিতামালা' (দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮২) গ্রন্থের অন্তর্গত 'কাউর ও শিয়াল' (কাক ও শৃগাল) নামক কবিতায় ভোলানাথ দাসের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম মুদ্রিত রূপ।[৩] আদ্যন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত ও সাতটি সর্গে সমাপ্ত সীতাহরণ কাব্য ভোলানাথের প্রধান কীর্তি। কলকাতায় ছাত্রজীবনেই তিনি মাইকেলের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৮৭৮ সালে এই চিত্রধর্মী বর্ণনাবহুল কাব্য রচনায় হাত দেন। মেঘনাদবধের মতো সীতাহরণ কাব্যেও আভিধানিক তৎসম শব্দের প্রতি ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থাকারে প্রকাশ (১৯০২) বহু বিলম্বিত হলেও উক্ত কাব্যের প্রথম সর্গটি "আসাম বিলাসিনী" নামক মাসিক পত্রিকায়[৪] ছাপা হয় ১৮৮৩ সালে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই কাব্যের ভাষা ও ছন্দ নিয়ে কঠোর সমালোচনা প্রকাশিত হয় ঐ একই পত্রিকায়। সমালোচনার উত্তরে কবির উক্তি বেশ কৌতুকাবহ—

কি লেখিছে সেইজন
করি ভাষা অশোভন ?
অমিত্র অক্ষর ছন্দে কি করে রচন ?
নোহে পদ্য নোহে গদ্য
কিবা লেখে মূর্খ অদ্য
অনুকরি বাঙ্গালার শ্রীমধুসূদন ॥[৫]

সীতাহরণ কাব্য অসমীয়া সাহিত্যের অনুপম সৃষ্টি বলে বিবেচিত। মধুসূদন যেমন মেঘনাদবধের চতুর্থ সর্গ শুরু করেছেন বাল্মীকি-বন্দনা দিয়ে, সীতাহরণ কাব্যের প্রারম্ভে মধুসূদন সম্পর্কে প্রায় অনুরূপ উল্লেখ।[৬] ভোলানাথের অসম্পূর্ণ "জয়দ্রথবধ"-এ[৭] এবং অন্যান্য কবিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার দেখে মনে হয় এইটিই ছিল তাঁর প্রিয় ছন্দ, মিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যতিক্রম। সম্পাদকীয় 'পাতনি'-তে বলা হয়েছে : "ছন্দশিল্পের কারুকার্যে ভোলানাথ মধুসূদনের যোগ্য উত্তর সাধক হলেও চরিত্র-অঙ্কনে তিনি গুরুর কাছাকাছি যেতে পারেন নি।···মাইকেল ছিলেন হিন্দুধর্মের সকল সংস্কারমুক্ত। ভোলানাথ চেষ্টা করেও মধুসূদনের স্তরে উঠতে পারেন নি। সাহিত্যের কলাকৌশলে নতুনত্বের উপাসক হলেও তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু। বদ্ধমূল হিন্দু সংস্কার নিয়ে তিনি বিপ্লবী, কিন্তু সীমিত অর্থে।"

অর্ধ শতাব্দী ধ'রে ওড়িয়া কাব্য সাহিত্যের প্রধান পুরুষ রাধানাথ রায় (১৮১৮-১৯০৮) পৃথ্বীরাজ-জয়চাঁদের কলহ ও ভারতে বৈদেশিক শক্তির অনুপ্রবেশ নিয়ে রচিত অসম্পূর্ণ মহাকাব্য "মহাযাত্রা"য় অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন :

পংকজ বাসিনী, দেবী উৎকল ভারতী
সারলে, কি কলে, কহ কবুচূড়ামণি
শুনিলে যে কালে বীর বার্তাবহ মুখে
প্রভাসে যাদবংকর জ্ঞাতিক্ষয়কারী
মহাদেব, ধীরমণি ধৈর্য ধরি আহা,
কেমন্তে শুনিলে সেহি কারুণ বারতা ?[৮]

সপ্তম সর্গে পৃথ্বীরাজের প্রথম যুদ্ধ বর্ণনার পরে বাকী অংশ কবি শেষ করে যেতে পারেন নি। "মহাযাত্রা" "উৎকলপ্রভা" মাসিকপত্রে ১৮৯৩ সালে এবং গ্রন্থাকারে ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত। ১৯০১ সালে ছাপা হয় অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত রাধানাথের ক্ষুদ্র কাব্য "দশরথ বিয়োগ"। নামধাতু, parenthesis ইত্যাদির প্রয়োগে ওড়িয়া-কাব মধুসূদনের হুবহু অনুগামী।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও মেঘনাদ বধের প্রভাব অসমীয়া-ওড়িয়াতেই সর্বাপেক্ষা অধিক। হিন্দী-মারাঠী-গুজরাতী-পাঞ্জাবীতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার ও মহাকাব্য রচনা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে মধুসূদনের কাব্যের অনুবাদ নিয়ে কিছু বলা আবশ্যক। কাব্যানুবাদ প্রথম শুরু হয়—হিন্দীতে নয়, মারাঠীতে। মেঘনাদবধের মারাঠী রূপান্তর (১৯০৫) করেন কবি মাধবানুজ (কবির আসল নাম কাশীনাথ হরি মোডক, ১৮৭২-১৯১৬)। বইটি তখন 'দক্ষিণা প্রাইজ' নামে একটি পুরস্কার লাভে সমর্থ হয়। এ ছাড়া তিনি বীরাঙ্গনারও অনুবাদক। উভয় কাব্যের অনুবাদে কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরিবর্তে সমিল দ্বিপদী (couplet) ব্যবহার করেন।[৯]

মারাঠীতে মধুসূদনের দ্বিতীয় অনুবাদক একনাথ পাণ্ডুরঙ্গ রেন্দালকর (১৮৮৭-১৯২০)।[১০] রেন্দালকরের নির্বাচিত কবিতা সংগ্রহের সম্পাদকীয় থেকে জানা যায় যে তিনি 'বিরহিনী রাধা' (১৯১৬) নামে ব্রজাঙ্গনা কাব্যের অনুবাদ ছাড়া বীরাঙ্গনারও অনুবাদ করেন ; এবং তাঁর অনুবাদ (বিশেষত সুর্পণখার প্রণয় পত্রিকা) মাধবানুজের অনুবাদের তুলনায় উৎকৃষ্ট। রেন্দালকর ১৯১০ সাল থেকে (অর্থাৎ 'প্রণয়পত্রিকা'র বা বীরাঙ্গনার অনুবাদের সময় থেকে) 'নির্যমক' (মিলহীন) কবিতা লেখা শুরু করলেও মধুসূদনের অনুবাদে তিনি মারাঠীর বহু প্রচলিত 'সযমক' (সমিল) দ্বিপদী ব্যবহার করেছেন।[১১]

মারাঠী কাব্যে মাধবানুজ বা রেন্দালকরের যে স্থান তার তুলনায় হিন্দীতে অনেক উচ্চতর স্থল মৈথিলীশরণ গুপ্তের (১৮৮৬-১৯৬৪)। 'জয়দ্রথবধ' (১৯১০) 'ভারত ভারতী' (১৯১২) প্রভৃতি মৌলিক কাব্যে খ্যাতিলাভের পরে 'মধুপ' ছদ্মনামে (নামটির তাৎপর্য লক্ষণীয়) তিনি অনুবাদও প্রকাশ করেন 'বিরহিনী ব্রজাঙ্গনা' (১৯১৪) এবং তার তের বছর পরে একই সালে (১৯২৭) পরপর প্রকাশ

করেন বীরাঙ্গনা ও মেঘনাদবধ। মৈথিলীশরণ তখন কেবল লব্ধপ্রতিষ্ঠ নন, খড়ীবোলী হিন্দীর সর্বাগ্রগণ্য কবি। 'বিরহিনী ব্রজাঙ্গনা'র ভূমিকা থেকে জানা যায় যে তৎপূর্বে বাংলা ভাষার অনেক গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত হলেও ১৯১৪ সালের আগে পর্যন্ত কোনো 'পদ্যাত্মক' পুস্তকের হিন্দী অনুবাদ ছাপা হয়নি। ব্রজাঙ্গনার অনুবাদ প্রশংসা পেলেও গুপ্তজীর দুঃসাহসিক প্রয়াস বীরাঙ্গনা ও মেঘনাদবধের অনুবাদ। এ সম্পর্কে হিন্দী বিদ্বৎমণ্ডলী একমত যে বাংলা থেকে হিন্দীর কাব্যানুবাদে মৈথিলীশরণ সর্বপ্রথম। তাঁর মেঘনাদবধ কেবল যে একখানি উৎকৃষ্ট অনুবাদ গ্রন্থ তাই নয়, বাংলা কাব্যের অনুবাদে পরবর্তী হিন্দী কবিদের দৃষ্টি আকর্ষণের কৃতিত্বও এই গ্রন্থের।[১২]

মৈথিলীশরণের আগেই যে বাংলার ১৪ অক্ষরী পয়ার ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র তাঁর 'প্রাত সমীরণ' (১৮৭৬)[১৩] কবিতায় প্রথম প্রয়োগ করেন এবং পরবর্তীকালের কোনো কোনো গৌণ কবি যে ১৪ অক্ষরের অমিত্রাক্ষর ছন্দে কিছু কিছু মৌলিক কবিতা লেখারও চেষ্টা করেন সেকথা হিন্দী সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসকার রামচন্দ্র শুক্লের আলোচনা থেকে জানা যায়।[১৪] হিন্দী কাব্যে মধুসূদনের প্রভাব প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় কাশী নাগরী প্রচারিনী সভা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাসিক পত্র "সরস্বতী"র (প্রথম প্রকাশ ১৯০০) প্রসিদ্ধ সম্পাদক মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী (১৮৬৪-১৯৩৮)[১৫] যিনি হিন্দী কাব্যে নতুনত্ব সঞ্চারের উদ্দেশ্যে নবীন কবিদের পরামর্শ দিতেন দোহা, চৌপাঈ, সোরঠা প্রভৃতি মাত্রিক ছন্দ এবং ঘনাক্ষরী, দ্রুপ্রয়, সবৈয়া প্রভৃতি 'বর্ণিক' ছন্দ বর্জন করে নতুন নতুন ছন্দের ব্যবহার ও 'তুক' বা মিলের বন্ধন ত্যাগ করতে। দ্বিবেদীর এই মনোভাব যে মধুসূদনের প্রভাবের ফল তা বোঝা সহজ হবে যদি আমরা মনে রাখি যে 'সরস্বতী'র সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেই দ্বিবেদীজী মধুসূদনের জীবন ও সাহিত্য সাধনার উপর সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন ১৯০৩ সালের জুলাই ও আগস্ট সংখ্যায়।

"হিন্দী সাহিত্যের রবীন্দ্র' বলে অভিহিত জয়শংকর প্রসাদের (১৮৯০-১৯৩৭) কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—যিনি বাংলা পয়ার, অমিত্রাক্ষর, সনেট ইত্যাদি নিয়ে নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ১৯১৩-১৪ সালে লিখিত "প্রেমপথিক" ও "মহারাণা কা মহত্ত্ব" নামক কবিতা দুটির ছন্দ অমিত্রাক্ষর। প্রায় একই সময়ে (১৯১৪) প্রকাশিত খড়ীবোলী হিন্দীর প্রথম মহাকাব্য বলে পরিচিত "প্রিয়প্রবাস"-এর কবি অযোধ্যা সিংহ উপাধ্যায় (উপনাম হরিঔধ) (১৮৬৫-১৯৪৭) ৫৮ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকায় 'অতুকান্ত' বা মিলহীন ছন্দে রচিত বাংলার মেঘনাদবধের প্রশংসা করে এবং হিন্দীর অনুরূপ প্রয়াসের নিন্দা করে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য মালিনী, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি 'বর্ণিক বৃত্ত'ই 'অতুকান্ত' কবিতার পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

অন্যদিকে, বীরাঙ্গনা ও মেঘনাদবধের ভূমিকায় অনুবাদক মৈথিলীশরণের বক্তব্য

এই যে, মূল বাংলা অমিত্রাক্ষর ছন্দ ১৪ অক্ষরের হলেও হিন্দীর উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্যের জন্য বাংলার অনুরূপ ১৪ অক্ষরের পঙ্‌ক্তি হিন্দী কবিতায় গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় তিনি ঘনাক্ষরী ছন্দের অর্ধরূপ মিতাক্ষরী ব্যবহার করেছেন—যার প্রতিটি পঙ্‌ক্তির অক্ষর সংখ্যা পনেরো। মৈথিলীশরণের ভাষায়—"বাংলায় সপ্তমী বিভক্তি হলে অক্ষর বাড়ে না, হিন্দীতে বাড়ে। যেমন, 'সম্মুখ সমর' এবং 'সম্মুখ সমরে' এই দুটি পদগুচ্ছে অক্ষরের হেরফের ঘটে নি। কিন্তু হিন্দীতে 'সম্মুখ সমর' ও 'সম্মুখ সমর মে" এই দুটি পদগুচ্ছে একটি অক্ষরের বেশকম হল। এইজন্য অনুবাদের ছন্দে একটি অক্ষর বেশি হলেও মূল ছন্দ থেকে বেশি বলা যায় না।"[১৬]

এই তো গেল ছন্দের কথা। মধুসূদন সম্পর্কে মৈথিলীশরণের দৃষ্টিভঙ্গী চমৎকার ফুটে উঠেছে অনুবাদকের অপর একটি মন্তব্যে: "অনুবাদে যথাসম্ভব মূলানুগামী হওয়ার চেষ্টায় স্থানে স্থানে দুরাম্বয়, কষ্ট কল্পনা, অনুপযুক্ত উপমা, ব্যাকরণবিরুদ্ধ প্রয়োগ ইত্যাদি পাওয়া যাবে। মেঘনাদবধের কবির উচ্ছৃংখল প্রকৃতির বিলক্ষণ পরিচয় রয়েছে তাঁর কাব্যে। যে শব্দ (বারুণী) কন্যা অর্থে প্রযোজ্য, তাকে পত্নী অর্থে প্রয়োগ করা উচ্ছৃংখলতার চরম সীমা। অনুবাদকের এতটা হিম্মৎ নেই বলে কবি মধুসূদনের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।...পাপী রাক্ষসদের প্রতি মধুসূদনের পক্ষপাত দেখে মনে হয় লংকার রাজকবিও মেঘনাদবধে বর্ণিত ঘটনা এই ভাবেই বর্ণনা করতেন। আমরা ভারতীয় কবিদের বর্ণিত রামচরিত অনেক পড়েছি ও শুনেছি। রাক্ষসদের কবিকৃতিও তো আমাদের দেখা দরকার।" বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মৈথিলীশরণ মধুসূদনের অনুবাদে (হিন্দী সমালোচকদের মতে) আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিলেও মৌলিক কবিতার ক্ষেত্রে তিনি কিন্তু বাঙালি কবিকে অনুসরণ করেন নি।

পতি-বিরহে রাণী রাজ কাউরের সৎসঙ্গ প্রাপ্তি এই বিষয়টি অবলম্বন করে রচিত প্রথম পাঞ্জাবী মহাকাব্য "রাণা সুরত সিংহ" (১৯০৫)-এর ভূমিকায় পাঞ্জাবী সাহিত্যের রেনেসাঁসের প্রবর্তক কবি ভাই বীরসিংহ (১৮৭২-১৯৫৭) বলেছেন যে, তাঁর কাব্য কুড়ি মাত্রার 'সিরখণ্ডী' (শ্রীখণ্ডী) ছন্দে রচিত, যার প্রথম বিরাম একাদশ মাত্রায়, দ্বিতীয় বিরাম পরবর্তী নবমে। মধুসূদনের নামোল্লেখ না করে কবি দাবি করেছেন, এই ছন্দ পাশ্চাত্ত্য ব্ল্যাংক ভার্সের সগোত্র।

মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ বিপ্লবী বিনায়ক দামোদর সাভারকর (১৮৮৩-১৯৬৬) 'মহারাষ্ট্রভাট' এই ছদ্মনামে প্রকাশ করেন তাঁর মারাঠী মহাকাব্য "সোমাণ্ডক" (১৯২৪)। পর্তুগীজদের আমল থেকে শুরু করে পেশোয়াদের পূর্ণ সমৃদ্ধির যুগ পর্যন্ত কোঁকনের রাজনৈতিক 'মর্ম' বিশদ করবার জন্য পরিকল্পিত এই কাব্যের পূর্বার্ধে সমিল অনুষ্টপ ছন্দ ব্যবহৃত। উত্তরার্ধ সম্পর্কে প্রস্তাবনায় কবির বক্তব্য:

"উত্তরার্ধের বৃত্ত মহারাষ্ট্রীয়দের কাছে অপরিচিত। ইংরেজীতে যাকে ব্ল্যাংক ভার্স বলা হয় সেই ছন্দ এবং বাংলায় প্রচলিত মধুসূদন দত্তের অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেভাবে পড়া হয়, এই ছন্দও তেমনি ভাবে পড়তে হবে।" কবির নামানুযায়ী সাধারণত এই ছন্দ 'বৈনায়ক বৃত্ত' নামে প্রচলিত হলেও কোনো কোনো সমালোচক এই ছন্দের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—মিলহীন প্রবহমাণ ধারারাহিক পদ্য। সাভারকরের পরে এই ছন্দে কবিতা লিখে খ্যাতিলাভ করেছেন নাগপুরের মারাঠী কবি না. গ. জোশী।

গুজরাতী ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক বলবন্ত রায় ঠাকোর (১৮৬৯-১৯৫২) মধুসূদন দত্তের রচনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন কিনা বলা যায় না, তবে বাঙালী কবির মারাঠী অনুবাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকা কিছু অস্বাভাবিক নয়। তিনি ব্ল্যাংক ভার্স-এর অগেয়তা, প্রবহমাণতা ও যতি-স্বাতন্ত্র্য—এই তিনটি লক্ষণের উল্লেখ করে বলেছেন যে গুজরাতী ভাষায় এই ছন্দ রচনার উপযোগী বৃত্ত 'পৃথ্বী' (বাংলায় যেমন অক্ষরবৃত্ত)।

দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার খুব বেশি হয়নি। নবীন ভারতীয় আর্যভাষার কবিতায় মিল থাকে চরণের শেষে, দ্রাবিড় ভাষাগুলির কবিতায় মিল দেওয়া হয় চরণের প্রথমে—যা 'আদিপ্রাস' বা 'দ্বিতীয় ক্ষর প্রাস' নামে পরিচিত। দক্ষিণী ভাষাগুলির পক্ষে এই মিল বা প্রাস বর্জন করা সহজ নয়। ইংরেজী কবিতার অনুবাদেও দক্ষিণী কবিরা অন্ত্যপ্রাসের কথা না ভেবে আদি প্রাস সম্পর্কে মনোযোগী ছিলেন। এমন অবস্থায় প্রায় একই সময়ে (১৯১০ সালের কাছাকাছি) প্রাস বর্জনের সাহস দেখিয়েছিলেন তেলুগু ও কন্নড ভাষার দু'জন কবি—গুরজাডা বেংকট আপ্পা রাও (১৮৬২-১৯১৫) এবং মঞ্জেশ্বর গোবিন্দ পৈ (পাই) (১৮৮৩ ১৯৬৩)। গুরজাডার কাব্যসংকলন 'মুত্যাল সরালু'-র (মুক্তার হার, ১৯১০) বিরুদ্ধে চিরাচরিত ছন্দোরীতি পরিত্যাগের অভিযোগ উত্থাপিত হলে তেলুগু কবি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য মধুসূদনের নামোল্লেখ করে বলেছিলেন যে, বাঙালি কবি তাঁর মহাকাব্যে প্রাস বর্জন করেও বাংলা ভাষার অগ্রণী কবিরূপে সম্মানিত। গুরজাডাও তদনুসরণে প্রাসবর্জন ও অর্থানুযায়ী 'যতি' বা শ্বাসবিরতির স্থান পরিবর্তন করে কিছু অন্যায় করেন নি বলে যুক্তি দিয়েছিলেন।

গুরজাডা যেমন মধুসূদনের প্রভাব স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করেছিলেন, কন্নড কবি গোবিন্দ পাই-এর ক্ষেত্রে তেমন কোনো স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় না। ১৯১১ সালে "স্বদেশাভিমানী" পত্রিকায় প্রকাশিত "হোলেয়নু ইয়ারু" (হরিজনকে) নামক কবিতায় গোবিন্দ পাই সর্বপ্রথম প্রাস বর্জন করেন। অতঃপর তিনি যীশুখৃস্টের জীবনের শেষ দিনটির কাহিনী অবলম্বনে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করেন "গোলগাথা" নামের

খণ্ড কাব্য[১৭] (সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ ১৯৩১ সালে, গ্রন্থাকারে ১৯৩৭ সালে)। গোবিন্দ পাই-এর অমিত্রাক্ষর ছন্দের উল্লেখযোগ্য ব্যবহার পাই কুঞ্ঞেন্ পিং (কে. বি. পুট্টপ্পা, জন্ম ১৯০৪) রচিত বৃহৎ কাব্য "শ্রীরামায়ণ দর্শনম্"-এ (১৯৫১)।[১৮] তামিল ও মালয়ালম্ ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার হয়েছে বলে জানা নেই।

অপ্রধান ভাষাগুলির মধ্যে মৈথিলী ও মণিপুরী সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। মৈথিলী ভাষায় মধুসূদনচর্চা প্রসঙ্গে দুটি নাম উল্লেখযোগ্য—১) গৌরীশঙ্কর ঝা, এবং (২) চন্দ্রনাথ ঝা। গৌরীশঙ্কর ঝা-কৃত মেঘনাদবধ কাব্যের মৈথিলী অনুবাদে (১৯৪১) মূলের সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য রক্ষার যথাসাধ্য প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মৈথিলীর স্মরণীয় মহাকাব্য হল মেঘনাদবধ কাব্যের প্রভাবে রচিত তন্দ্রনাথ ঝায়ের মৌলিক গ্রন্থ 'কীচকবধ' (১৯৩৮)। এই গ্রন্থে ভীম কর্তৃক কীচক বধের কাহিনী অমিত্রাক্ষর ছন্দে নয়টি সর্গে বিধৃত। তন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন যে, মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যপাঠের ফল কীচকবধ। দ্রৌপদীকে অনেকটা প্রমীলার আদর্শে চিত্রিত করা হয়েছে। 'আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?' প্রমীলার এই উক্তিই যেন দ্রৌপদীর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত যখন তিনি কীচকের উদ্দেশে বলেন 'শার্দূলী কী কখনহু পাবএ বাস জম্বুকক ?'

মণিপুরী ভাষায় মধুসূদনের অনুসরণে কোনো মৌলিক কাব্য রচিত হয়নি, তবে যে তিনজন কবি মেঘনাদবধের আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেছেন, তাঁরা হলেন (১) লৌরেম্বম্ ইবোয়াইমা সিংহ, (২ নবদ্বীপচন্দ্র সিংহ এবং (৩) অশংবাম্ মীনকেতন সিংহ। ইবোয়াইমা মধুসূদনের কাব্যপাঠ ও অনুবাদ করেই নিরস্ত হননি, বাংলা চিঠিপত্র রচনায় তাঁর গদ্যরীতিতে মধুসূদনের ভাবভঙ্গি অনু-সরণের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। তিনি মেঘনাদবধ ও বীরাঙ্গনার পূর্ণ অনুবাদ করেছেন। তাঁর অনুবাদের নমুনা হিসাবে 'সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি' অংশটি উদ্ধৃত হল ঃ

> মায়োন্দনা তুরদুনা বীর বীরবাহু
> যমপুর য়োখৎবদা, বাল রৌদ্রগুদা,
> হায়্, দেবী বীনাপাণি, অমৃত বাণীনা,
> সেনাপতি বরিদুনা বীরেন্দ্র কনাবু
> থাকি লাম্দা অমুক্হন্না রঘুবীরবৈরী
> রাবন্না ?

সনেট রচনার ক্ষেত্রে অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষার কবিরা ছাড়া অন্য কোনো ভারতীয় কবি মধুসূদন থেকে কোনো প্রেরণা পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। অসমীয়া সাহিত্যে 'নবন্যাস' বা রোমান্টিসিজমের অন্যতম প্রবক্তা হেমচন্দ্র গোস্বামীর (১৮৭২-

১৯২৫) "প্রিয়তমার চিঠি" ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয় "জোনাকী" পত্রিকায়।—

সৌন্দর্য্যর বুকুর কাঁচলি উদঙাই
প্রকৃতির চো-ঘর চালোঁ পিতপিত ;
কুকুরা-ঠেঙীয়া এই আখর কিটিত
যি অমিয়া ঘহা আছে, কতো আরু নাই।

এইটিই প্রথম অসমীয়া 'ছনেট' বা চৈধ্য ফ'কীয়া (চৈধ্যপদী) কবিতা। প্রায় এক দশক পরে প্রকাশিত হয় প্রথম ওড়িয়া সনেট ও সনেট-সংকলন "বসন্তগাথা" (১৯০১)। কবি মধুসূদন রাও ভূমিকায় জানিয়েছেন যে, এই চতুর্দশপদী কবিতা-গুলির অধিকাংশ বসন্তকালে রচিত বলে কাব্যটিব নাম "বসন্তগাথা"। বেশ কিছু সংখ্যক কবিতা সাতটি দ্বিপদীর সমষ্টি হলেও ব্যতিক্রম হিসাবে "শ্রীপঞ্চমী" কবিতার প্রথম চার পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

মধু জন্মতিথি মধুময়ী শ্রীপঞ্চমী,
যার আগমনে জাগে ধরণী উলাসে,
শত পুষ্প বিকশই বিশ্বপ্রাণ রমি,
বহই মলয়, গাত্র কোকিল উচ্ছ্বাসে।

এই প্রসঙ্গে মধুসূদন দত্তের "শ্রীপঞ্চমী" কবিতাটি স্মরণীয়।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নয় যে, বঙ্গেতর ভারতীয় ভাষায় মধুসূদনের নাটকের প্রভাব ব্যাপক হতে পারে নি যেমন হয়েছে পরবর্তী কালে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের। অসমীয়া ও ওড়িয়া বাদ দিলে অন্যান্য ভাষায় সনেটের রূপকল্প গৃহীত হয়েছে ইংরেজী থেকে, মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী থেকে নয়। আমাদের মনে হয় ভারতীয় সাহিত্যে মধুসূদনের স্মরণীয় দান অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন। কবির দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, আজ হোক কাল হোক এ দেশে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যাপক ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। কালক্রমে তাঁর সেই বিশ্বাস বাস্তবরূপ গ্রহণ করেছে। অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষায় এই ছন্দের প্রচলন হয় উনিশ শতকেই, অন্যান্য ভাষায় বর্তমান শতকে। দীর্ঘকাল অনুশীলনের সুযোগ পেলে ভারতীয় কবিরা এই ছন্দে যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারতেন তা ব্যাহত হল রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী গীতাঞ্জলি প্রকাশে। গীতাঞ্জলির প্রভাবে গদ্য ছন্দে কবিতা রচনার প্রবণতা অমিত্রাক্ষর ছন্দের শ্রমসাধ্য অনুশীলনে শৈথিল্য এনে দেয়।

তার চেয়েও বড় কথা, মধুসূদনের অনুগামী ভারতীয় কবিরা তাঁর কাব্যের বাহরঙ্গেই মুগ্ধ হয়ে ছিলেন, কবির অন্তর্লোকে প্রবেশের চেষ্টা করেন নি। হয়ত সে শক্তিও তাঁদের ছিল না। হিন্দী কবি মৈথিলীশরণ তো আপনার ভীরুতার জন্য মধুসূদনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। অসমীয়া কবি ভোলানাথ দাস সম্পর্কে অতুলচন্দ্র বরুয়ার মন্তব্যও এখানে স্মরণীয়। ছন্দশিল্পের কারুকার্যে ভোলানাথ

মধুসূদনের যোগ্য উত্তরসাধক হলেও চরিত্র অংকনে তিনি গুরুর কাছাকাছিও যেতে পারেন নি। সাহিত্যের কলাকৌশলে নতুনত্বের উপাসক হলেও তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু। বন্ধমূল হিন্দু সংস্কার নিয়ে তিনি বিপ্লবী, কিন্তু সীমিত অর্থে। আমাদের মনে হয়, কেবল ভোলানাথ নন, মধুসূদনের অনুগামী সকল ভারতীয় কবি সম্পর্কেই কথাটি প্রযোজ্য।

নির্দেশিকা

(১) অভিমন্যুবধ কাব্য/প্রথম খণ্ড/রচক/শ্রীরমাকান্ত চৌধুরী/শকাব্দ ১৭৯৭। প্রকাশক ঃ জোনাকী প্রকাশ, গুয়াহাটী। অতুলচন্দ্র হাজারিকার সম্পাদনায় বইটি গৌহাটির জোনাকী প্রকাশ কর্তৃক ১৫ পৃষ্ঠার "জোরণি" সহ ১৯৭১ সালে পুনমুদ্রিত। শ্রী হাজারিকার মতে অভিমন্যুবধ আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের প্রথম অসমীয়া মহাকাব্য।

(২) আহা যেন আজি
অশোক বনত কিবা রাঘবর প্রিয়া
সংজাত হুইয়া বন্দী বনপক্ষী প্রায়,
কাঁদি মনোদুঃখে, সুঁবরিলা রাঘবক,
কিম্বা পতিপরায়ণা প্রমীলা সুন্দরী
যেতিয়া গইলা রণে মেঘনাদ বলী
কান্দিলা পালংকে উঠি পতিধন লাগি

(তৃতীয় সর্গ থেকে)

(৩) কিবা অপরূপ রূপ হে বায়সপতি
তোমার! বসিয়া তুমি আম্রবৃক্ষডালে
শোভিছানা, যেন হয়ে নন্দের নন্দন
গোপীগণ মনোহারী, কদম্বের বৃক্ষে।
(অতুলচন্দ্র বরুয়া সম্পাদিত ও গৌহাটি অসম প্রকাশন পরিষদ প্রকাশিত 'ভোলানাথ দাস রচনাবলী" ১৯৭৭, পৃ ৬২-৬৩)।

(৪) আসাম বিলাসিনী (১৮৭২-৮৩)। অসমীয়া প্রবন্ধ সাহিত্যের সূচনা মিশনারী পরিচালিত "অরুণোদয়" পত্রিকায় (১৮৪৬-৮২) এবং সমালোচনা সাহিত্যের সূচনা "আসাম বিলাসিনী"তে।

(৫) ভোলানাথ দাস রচনাবলী (পৃ. ১৬০-১৬১), চিন্তাতরঙ্গিনীর অন্তর্গত কবিতা "ইটোসিটো"।

(৬) সেই রামায়ণ গীত

গাইবে বাঞ্ছিছো আমি মূঢ় অকিঞ্চন

অমিত্র অক্ষর ছন্দে, হে মাতঃ বাগ্‌দেবি !

যে ছন্দে গাইলা বহু মধুময় গীত

তব অনুগ্রহে অতি প্রিয় পুত্র তব

শ্রীমধুসূদন বঙ্গকবিকুলমণি !

—প্রথম সর্গ, পঙ্‌ক্তি ৮-১৩

(৭) ভোলানাথদাস রচনাবলী, চিন্তাতরঙ্গিণী (২য় ভাগ)।

(৮) রাধানাথ গ্রন্থাবলী (১৯৬২), কটক ট্রেডিং কোম্পানী।

শারলাদেবীর মন্দির মহানদীর অদূরবর্তী ঝংকড় গ্রামে অবস্থিত। ওড়িশায় এই দেবী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রীরূপে পূজিত।

(৯) কা. হ. মোডক য়াঁচী কবিতা, চন্দ্রকুমার ডাংগে এবং বি. ম. কুলকর্ণী সম্পাদিত, ১৯২৪ (২য় সংস্করণ ১৯৬৫)। এই নির্বাচিত কবিতা সংগ্রহে "তারেচী প্রণয়পত্রিকা" (প্রকাশ ১৯১২) এবং "শকুন্তলেচী প্রণয়পত্রিকা" (প্রকাশ ১৯১৩) সংকলিত। কাশীনাথ হরি মোডকের রচনার নিদর্শন স্বরূপ দুটি পঙ্‌ক্তি (মূল ও মারাঠী অনুবাদ) দেওয়া হল।

কে সে মনঃচোর মম হায় কে বা আমি !

ভুলি ভূতপূর্ব কথা, ভুলি ভবিষ্যতে !

মনশ্চোর মম কবণ অসে তো ? নারী মী করণ ?

ভূত ভবিষ্যৎয়াঁচী ন কধী‌ হোতো আঠবণ !

তারার প্রণয় পত্রিকার শেষে অনুবাদকের সংযোজিত শেষ দ্বিপদী—

লিহিলী তারা প্রণয়পত্রিকা বঙ্গজ কবিরত্নে

মাধবানুজে রূপ মরাঠী তীস দিলে যত্নে।

(১০) (ক) রেন্দালকরাচী কবিতা (প্রথম খণ্ড), ১৯২৪ (২য় সং ১৯৪০)।

(খ) "উঘাড়ি নয়ন" (রেন্দালকরের ১০১টি নির্বাচিত কবিতা) ভবানীশংকর শ্রীধর পণ্ডিত সম্পাদিত, ১৯৬৪। এই সংকলনে কেবল সূর্পনখা প্রণয় পত্রিকাটি (প্রকাশ ১৯১৫) স্থান পেয়েছে।

(১১) কে তুমি বিজন বনে ভ্রম হে একাকী

বিভূতিভূষণ অঙ্গ ? কি কৌতুকে, কহ,...

কোণ সাংগ তূ ভ্রমসি একলা য়া নির্জন কাননী, ?

ঝালে রেডী বিভূতিভূষণ তনু তব হী পাহুনী !

(১২) হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, অষ্টম খণ্ড (১৯৭২) এবং দশম খণ্ড (১৯৭১)।

(১৩) মন্দ মন্দ আরৈ দেখো প্রাতসমীরণ
করত সুগন্ধ চারো ওর বিকীরণ।
গাত সিহরাত তন লাগত সীতল
রৈন নিদ্রালস জন-সুখদ চঞ্চল।

একে বাংলা মতে বিশুদ্ধ পয়ার বলা চলে।

(১৪) রামচন্দ্র শুক্ল, হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস, ১৯৪২ সং, পৃ ৬৭৮।

(১৫) সরস্বতী পত্রিকার সম্পাদকরূপে মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীর কার্যকাল ১৯০৩-১১। এই যুগ হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে দ্বিবেদী-যুগ নামে পরিচিত।

(১৬) 'দশরথের প্রতি কৈকেয়ী'র অনুবাদ থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি—
কিন্তু বৃথা বাক্যব্যয় করনে সে লাভ ক্যা ?
চাহে জো করো, তুম্হেঁ হৈ কৌন রোক সকতা ?
তুম হো নরেন্দ্র। কৌন পানী কে প্রবাহ কো
লৌটা সকতা হৈ ভলা ? পক্ষিয়োঁ কে জাল মেঁ
কৌন বাঁধ সকতা হৈ সিংহ ?

(২৭) "গোল্‌গাথা"র প্রারম্ভিক অংশের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি—
কোলি মুরনেয় বারি কুগি য়েসুর কোল্ল
নেলসিদ য়োহ্যদর মনস্ সাক্ষিয়ো লু সুক্ষ্ম
নাগে, কায়গণকট নডসিদ রিচারণেয়
কট্টনীতিগে হেসি বেলুগাদিরনিল্লি রোগে···

(১৮) "শ্রীরামায়ণদর্শনম্"-এর অযোধ্যা সম্পুটম্-এর চতুর্থ সঞ্চিকে "ঊর্মিলা" থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি (৫৬০-৫৬৭)—
নীরব ধ্যানবধু হে ঊর্মিলা দেরি,
সৌমিত্রিয়র্ধাংগি, হেলু নীনেল্লিদে
কভেদ কডলোলয়োধ্যানগরির মসগিদা
ক্লান্তিদিনদন্দু ? নিন্নেদের্ণুরিনা রেখে
জগুলদুদিল্লরে তুল্‌কি নেত্র শতপত্রদিম্ ?

মধুসূদনের লিরিক প্রতিভা

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী

মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব নানান আপাতবিরোধী প্রবণতায় জটিল ও রহস্যময়। মাইকেল এম. এস. ডাট্-এর সঙ্গে 'সুবর্ণদেউটি যথা তুলসীর মূলে' নিহিত চিরন্তন বাংলার জন্য নিবিড় নস্ট্যালজিয়া-বিহ্বল কবি মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের সাযুজ্য সন্ধান করতে গেলে বস্তুত আমরা এক আশ্চর্য রহস্য-জটিল ব্যক্তিপুরুষের মুখোমুখি হই। মধুসূদনের ব্যক্তিত্বে এই 'অ্যাম্বিভ্যালেন্স' (ambivalence) বা দ্বৈততার প্রবণতা তাঁর সমগ্র কাব্যপ্রবাহেও সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। আর সম্ভবত এ জন্যই মেঘনাদবধকাব্য লিখেও তিনি নিরঙ্কুশ নিশ্ছিদ্র এক এপিক কবিরূপে নিঃশেষিত হলেন না, আবার ব্রজাঙ্গনা, বিশেষত, চতুর্দশপদী লিখেও বিশ শতকীয় আধুনিক বাংলা লিরিকের যথার্থ পূর্ব-সূরীর আসন পেলেন না। তা তোলা রইল বিহারীলালের জন্য। এর কারণ, একদিকে মেঘনাদবধকাব্যের এপিক-গাম্ভীর্য ও সাবলিমিটির তলায় তলায় বয়ে চলে গূঢ় অন্তর্বেদনার গোপন গীতিপ্রবাহ—'a tendency in the lyrical way', অন্যদিকে চতুর্দশপদীর লিরিক-প্রবণতার সূক্ষ্ম মৃদু মূর্ছনাকে ছাপিয়ে থেকে থেকেই বেজে ওঠে এপিক-এর দূর-প্রসারিত গম্ভীর-মন্দ্র কণ্ঠস্বর।

এখানেই কথা উঠতে পারে, অব্জেকটিভ ও সাব্জেকটিভ কবিতার মধ্যকার যথার্থ সীমারেখা নির্ধারণের প্রশ্ন নিয়ে কিংবা দৃষ্টান্ত তোলা যেতে পারে ভার্জিল-ট্যাসো-মিলটনের,—যাঁরা মহাকাব্যের স্রষ্টা হয়েও গীতিকবিতার অনুশীলন করেছেন। আর এই সব প্রসঙ্গ তুলে হয়ত কেউ বলবেন যে, দ্বৈততার প্রশ্ন তাহলে তো কেবল মধুসূদনের একার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে নয়, এপিক ও লিরিক রচয়িতাদের অনেকেরই কাব্য-সৃষ্টির ইতিহাসের সঙ্গে এই প্রশ্ন আমূল জড়িত।

কথাটা ভেবে দেখার মত, সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্তমান নিবন্ধের সীমিত ও সুনির্দিষ্ট আয়তনে কবিতার স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য নিয়ে এ ধরনের বিস্তৃত তাত্ত্বিক আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমরা কেবল এই সীমাবদ্ধ পরিসরে মধুসূদনের কবি-ব্যক্তিত্বে এপিক-লিরিকের মিশ্র প্রবণতার স্বরূপ-সন্ধানের কিছুটা চেষ্টা করতে পারি। আর তা করতে হলে, প্রথমে দেশকালের বিশেষ প্রেক্ষিতে মধুসূদন ও তাঁর কবিতাকে দেখা প্রয়োজন। কিন্তু একথাও এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মধুসূদনের যে প্রবণতা, তা কেবল পুরনো কাব্য-ঐতিহ্যের ধারানুসারী নয়, তাঁর ব্যক্তিজীবনের তথা ব্যক্তিত্বের মধ্যেই তাঁর কাব্যপ্রবণতার স্বরূপ অনেকখানি খুঁজে পাওয়া যাবে।

বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকীয় রেনেশাঁসের চেতনাদীপ্ত কবি মধুসূদনের মধ্য দিয়ে যেমন দু'টি আপাত-বিপরীত প্রবণতা - ক্লাসিক ও রোম্যাণ্টিক কিংবা বলিতে পারি, এপিক ও লিরিক প্রবণতা আত্মপ্রকাশ করেছিল, ইউরোপে কিন্তু ওই কালে ঠিক তেমনটি ঘটেনি। বস্তুত ওই সময়ে পাশ্চাত্য সাহিত্যে এপিক-এর দিন শেষ হয়ে গেছে। ইংরেজী সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই জানেন, উনিশ শতকে রোম্যাণ্টিক লিরিক-প্রবণতা আশ্চর্য শিল্পরূপ পেয়েছে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কীটস-এর হাতে। কিন্তু একটিও স্মরণযোগ্য এপিক রচিত হয় নি।

আসলে মধ্যযুগের অবসান-লগ্নে প্রতীচ্যে যে রেনেসাঁসের জন্ম, তার প্রভাবে সেই পর্বে একদিকে প্রাচীন গ্রীক ল্যাটিনের অনুসারী ক্ল্যাসিক্যাল এপিকধর্মী সাহিত্য, আবার তারই পাশাপাশি ব্যক্তিচৈতন্যের স্বকীয়তায় উজ্জ্বল রোম্যাণ্টিক লিরিক কবিতাও দেখা দিয়েছিল। অর্থাৎ ইউরোপে রেনেসাঁস-পর্বে যে দুটি ধারা পাশাপাশি চলছিল, বহুদিনের ব্যবধানে, উনিশ শতকে বঙ্গীয় রেনেসাঁস পর্বে বাংলা সাহিত্য-অঙ্গনে সেই দুটি ধারাই আবার যেন ফিরে আসতে চাইল ঃ সেই এপিক ও রোম্যাণ্টিক লিরিকের প্রবণতা। আর তার প্রকাশ ঘটল এখানে আশ্চর্যভাবে একই কবি-ব্যক্তিত্বের মধ্যে। তিনি মধুসূদন।

বলা বাহুল্য, লিটারারি এপিক-সৃষ্টির ক্ষেত্রে মধুসূদন নিঃসংশয়ে এক অনন্য প্রতিভা। এপিকের গঠন বিন্যাসে, কাব্যভাষা সৃষ্টিতে, ছন্দোনির্মাণে সেই প্রতিভার বিস্ময়কর আত্মপ্রকাশ। কিন্তু একদিকে তাঁর ব্যক্তিজীবনের আকাশস্পর্শী কামনা ব্যাহত হওয়ার যন্ত্রণা-বেদনা প্রকাশের রোম্যাণ্টিক আর্তি অর্থাৎ তাঁর গূঢ় ব্যক্তি চেতনাকে অভিব্যক্তি দানের ইচ্ছা, অন্যদিকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে ইউরোপের, বিশেষত ইংরেজি সাহিত্যে রোম্যাণ্টিক লিরিকের পরিব্যাপ্ত প্লাবন—মধুসূদনের চিত্তকে বারে বারেই এপিকের ঋজু-কঠিন ব্যক্তিনিষ্ঠ ফ্রেম থেকে বাইরে আনতে চাইছিল। আর কবির সেই চাওয়া, সেই সারস্বত বাসনা একদিকে পরিস্ফুট অভিব্যক্তি পেল ব্রজাঙ্গনায়—বিশেষত চতুর্দশপদীর বিশিষ্ট রূপবন্ধে, অন্যদিকে তার অনতিস্ফুট তির্যক উদ্ভাসন ক্ষণে ক্ষণে চোখে পড়ল মেঘনাদবধ-বীরাঙ্গনাকাব্যের ক্লাসিক-চেতনার দিগন্ত সীমায়।

মধুসূদনের কাব্যসৃষ্টিকে অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে, বলতে পারি সমগ্রতার দৃষ্টিতে, দেখলে চোখে পড়ে- ঋজু কঠিন এপিকধর্মী কাব্য-ভঙ্গিমায় যাঁর পথ-পরিক্রমার সূচনা, সনেটের মন্ময়ী মেদুর লিরিক চেতনায় তাঁর সেই পরিক্রমার অবসান।

অবশ্য মধুসূদনের নিষ্ঠাবান পাঠকমাত্রেরই একথা জানা যে, তাঁর কাব্য-ভুবনে যে লিরিক-প্রবণতার প্রকাশ—তা কোন আকস্মিক প্রস্তুতিহীন উদ্ঘাটন নয়—তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলী নিছক কোন লিরিকধর্মী কাব্যরূপের সৌখীন 'এক্স-পেরিমেণ্ট' মাত্র নয়, এটি মধুসূদনের আত্মচেতনার প্রকাশ-ব্যাকুলতারই প্রত্যাশিত শিল্পরূপ। প্রত্যাশিত, কেননা এর সম্ভাবনা নিহিত ছিল তাঁর কাব্যসৃষ্টির প্রায়

সূচনাপর্বেই—মেঘনাদবধের জগতে। লিরিক চেতনা কীভাবে মেঘনাদবধ বীরাঙ্গনার মধ্যে নিহিত সম্ভাবনারূপে এবং ব্রজাঙ্গনাকাব্যে, চতুর্দশপদীতে ও দু' একটি বিচ্ছিন্ন গীতিকবিতায় মোটামুটি পরিস্ফুটরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল—তার অন্বেষণ মধুসূদনের গীতিকবি স্বভাবের উন্মোচনের দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মনে করি।

১৭৬০ থেকে ১৮৬৬—এই একান্ত সীমিত সময়ের পরিসরে মধুসূদনের কাব্যগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময়-পরিধি এমন বিস্তৃত নয় যার মধ্য দিয়ে কবির কোন বিশেষ মানসদৃষ্টির বিবর্তনের ধারাকে পুরোপুরি অনুসরণ করা যায়। তাছাড়া মধুসূদনের কবি-প্রতিভার মধ্যে নিয়ম-রীতি ভাঙার সহজাত প্রবণতা ছিল। যার ফলে তাঁর পক্ষে তিলোত্তমাসম্ভব ও মেঘনাদবধের মতো আখ্যানকাব্য ও এপিক রচনার সমকালে ব্রজাঙ্গনাকাব্য লেখা সম্ভব হয়েছিল; এবং যার ফলেই এপিকের মধ্যে স্পষ্টত ব্যক্তি-চৈতন্যের প্রকাশ এবং সনেটের মধ্যে মহাকাব্যোচিত প্রবণতার অভিব্যক্তি আদৌ দুর্লক্ষ্য নয়। আসলে মধুসূদনের কবি-প্রতিভার মৌল স্বরূপই এই। এই মিশ্র প্রবণতা—ক্ল্যাসিকাল অবজেকটিভ দৃষ্টি ও রোম্যাণ্টিক আত্মপ্রবণতা। বর্তমান নিবন্ধে আমাদের অন্বেষণের বিষয় মধুসূদনের কাব্যে ওই শেষোক্ত আত্ম-ভাবমূলক লিরিক চেতনা। একে আমরা যদি কবির কাব্যরচনার কালক্রম অনুসারে অনুসন্ধান ও আলোচনা করতে যাই, তবে হয়ত বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। কারণ তিলোত্তমা ও মেঘনাদের মাঝখানে পাই ব্রজাঙ্গনার সৃষ্টিপর্বকে। সে জন্য নিছক কালক্রম অনুসারে নয়, বরং দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রবণতা অনুযায়ী আমাদের আলোচনার স্তর বিন্যাস করা যেতে পারে। প্রথম স্তরে—রোম্যাণ্টিক ও আত্মভাবমূলক সৃষ্টি, যেমন ব্রজাঙ্গনা, চতুর্দশপদী ইত্যাদি।

মেঘনাদবধ কাব্যের স্রষ্টা রূপেই মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে অচলপ্রতিষ্ঠ। অর্থাৎ এপিক রচয়িতারূপে, ক্ল্যাসিকাল শিল্প-সুষমার সফল রূপকার হিসাবেই বাংলা কাব্যে তাঁর অমরত্বের আসন। কিন্তু আগেই বলেছি, মধুসূদনের কবি-ব্যক্তিত্ব চিরদিনই মিশ্র প্রবণতার দুই আপাত-বিরোধী রঙে রাঙানো। সাহিত্য-সাধনার একেবারে আদিপর্বে, যখন তিনি ইংরেজি কবিতা লিখছেন, তখনও চোখে পড়ে King Porus, The Upsori বা Captive Ladie-র মতো আখ্যানকাব্যের পাশে পাশে সনেট ও অন্যান্য খাঁটি লিরিকের দীর্ঘ প্রবাহ।

এরপর কবির আবির্ভাব বাংলা কাব্যজগতে। রচিত হল প্রথমে তিলোত্তমাসম্ভব ও কিছু পরে মেঘনাদবধ। প্রথমটি আখ্যানকাব্য, দ্বিতীয়টি মহাকাব্য। ইংরেজি কবিতা রচনাকালে যেমন আখ্যানকাব্যের পাশাপাশি যথার্থ লিরিক রচনার ধারা অব্যাহত ছিল, এক্ষেত্রে ঠিক তেমনটি রইল না। অবশ্য এখানেও আত্মমুখী

অনুভবের প্রকাশ ঘটল—তবে একটু তির্যক পথে। কবি তাঁর নিভৃত সত্তার কণ্ঠস্বরকে রুদ্ধ করে বস্তুমুখী কল্পনার রঙে রাঙিয়ে দিতে চাইলেন তাঁর কবিতার আকাশ। কিন্তু সে সংকল্প পুরোপুরি সিদ্ধ হ'ল না। তিলোত্তমার পরেই তাঁকে লিখতে হ'ল ব্রজাঙ্গনা—খাঁটি অর্থে লিরিক না হলেও যার মধ্যে কবির গীতিধর্মী রোম্যাণ্টিক ভাবকল্পনা ভাষা পেয়েছে। তিলোত্তমা নিছক আখ্যানধর্মী কাব্য—সেখানে কবির ব্যক্তিগত অনুভবের বিক্ষিপ্ত স্পর্শ সামান্য থাকলেও, তা প্রগাঢ় নয় কোথাও। তাই হয়ত ব্রজাঙ্গনার মধ্যে কবির রোম্যাণ্টিক সত্তা আত্মপ্রকাশের কিছুটা সুযোগ খুঁজেছিল। কিন্তু মেঘনাদবধে দেখা দিল প্রত্যাশিত অথচ বিস্ময়কর এক ব্যাপার—কবি দৃষ্টির সেই মিশ্র-প্রবণতা। কাব্যটির দৃঢ়-সংহত বস্তুনিষ্ঠ এপিক চেতনার অপরূপ অভিব্যক্তির নেপথ্যে ভেসে আসে অনতিস্ফুট অথচ সুনিশ্চিত এক কণ্ঠস্বর—এক বিহ্বল বিক্ষত হৃদয়ের করুণ স্বর। বলা বাহুল্য, সেটি স্বয়ং কবির।

একদিকে চোখে পড়ে মেঘনাদবধে পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যের বিভিন্ন লক্ষণের আশ্চর্য শিল্পিত প্রকাশ—এর স্বর্গমর্ত্য পাতালব্যাপী বিশাল প্রেক্ষাপটের সংবেদন, এর বিবৃতি ও বর্ণনায় বস্তুনিষ্ঠা, এর বিষয়বস্তুর সঙ্গে ভাষা-ছন্দ ও অন্যান্য প্রকরণের সামঞ্জস্যপূর্ণ সুমিত সংহতি এবং মেঘনাদের প্রবল শৌর্য ও রাবণের স্পর্ধিত ব্যক্তিত্বের সমবায়ে গঠিত বীরধর্ম।

কিন্তু এহ বাহ্য। স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বর পরাক্রান্ত যে রাবণের কাছে কামনার স্বর্গলোক প্রায় করায়ত্ত হয়েও শেষ অবধি স্খলিত হয়ে গেল। সেই নিয়তি-নিগৃহীত পুত্রশোক-বিহ্বল গভীর ট্র্যাজিক যন্ত্রণায় আক্রান্ত রাবণের হৃদয়-দর্পণে প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষী কবিচিত্তের ব্যাহত কামনার আর্তি ও তজ্জনিত ক্ষুব্ধ বিদ্রোহ-বাসনা বিম্বিত হয়েছে। মেঘনাদের মৃত্যুর পর সমুদ্রতীরে শ্মশানে দাঁড়িয়ে শোকাহত রাবণ যে মর্মস্পর্শী উক্তি করেছে, যে অশ্রুবর্ষণ করেছে, তার মধ্যে মধুসূদনের বিহ্বল সমব্যথী চিত্তের নিরুচ্চার হাহাকার গোপন থাকে নি। আর রাবণের জীবন-পরিণামের সঙ্গে কবিচিত্তের এই গূঢ় একাত্মতার অনুভবের মধ্য দিয়ে মেঘনাদবধ-কাব্যের সূক্ষ্ম লিরিক-ব্যঞ্জনা আভাসিত হয়েছে। এই নিবিড় দুঃখচেতনার মধ্য দিয়ে মহাকাব্যে লিরিক-আভাস জাগিয়ে তোলার প্রবণতা পূর্ববর্তী কোন পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যে এমন তীব্র ও গভীর হয়ে ওঠেনি। হোমার-ভার্জিল মিল্টন (ইলিয়ডের সমাপ্তি অংশের কথা মনে রেখেও), কোথাও না।

মেঘনাদবধে মধুসূদনের লিরিক প্রবণতার আর এক উন্মোচন চতুর্থ সর্গে। মধুসূদনের জীবনে যে প্রশান্ত প্রেম-স্বপ্নের রোম্যাণ্টিক আর্তি ছিল, কবি-হৃদয়ের সেই অনায়ত্ত স্বপ্নের লিরিক-প্রতিমার ক্ষণিক উদ্ভাসন চোখে পড়ে চতুর্থ সর্গের সীতা চরিত্রকে ঘিরে কবির অনতিব্যক্ত দীর্ঘশ্বাসে।

বীরাঙ্গনা কাব্য এপিক নয়, কিন্তু এর বিন্যাসে বস্তুনিষ্ঠ আখ্যানকাব্যের আদল

কতকটা চোখে পড়ে। এই কাব্যে বিভিন্ন পৌরাণিক নারীচরিত্র তাদের জীবনের এক বিশেষ নাটকীয় মুহূর্তে অনুভব ও আবেগকে ব্যক্ত করেছে পত্রের আকারে। এই আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে বিগত দিনের অনেক নাটকীয় সিচুয়েশনের স্মৃতিচারণার মাধ্যমে। সেদিক থেকে এই কাব্যের নিহিত আখ্যান-ধর্ম ও নাট্যলক্ষণ অবশ্যাস্বীকার্য। কিন্তু মধুসূদনের কবিচিত্তের সহজাত লিরিক প্রবণতা বারেবারেই কবিতার বস্তুধর্মকে অতিক্রম করে ব্যক্তি-হৃদয়কেন্দ্রিক চেতনা উপলব্ধির সংবেদনে পৌঁছুতে চেয়েছে। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। তাই 'dramatic monologue' অভিধায় চিহ্নিত এই কাব্যে 'dramatic' লক্ষণকে ছাপিয়ে উঠেছে বীরাঙ্গনাদের 'monologue—নায়িকাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উদ্দীপ্ত হৃদয়ের গূঢ় গভীর আবেগ-অনুভব। হারানো দিনের স্মৃতিবেদনা, অনাগত দিনের স্বপ্ন-বাসনা, কিংবা ঈর্ষা, ক্ষোভ, হতাশা, অন্তর্জ্বালা—নায়িকা-হৃদয়ের এমনি বহুবিচিত্র লীলারূপ উৎকীর্ণ হয়ে আছে এই পত্রকাব্য-পটে, ললিত-মধুর অমিত্রাক্ষর ছন্দের আধারে। নায়িকাদের নিভৃত ব্যক্তি-হৃদয়ের এই অপরূপ উন্মোচনের শিল্পমহিমায় বীরাঙ্গনাকাব্যের লিরিক-সৌন্দর্য বিভাসিত হয়েছে। কিন্তু কবির সৃষ্ট নারীচরিত্রের হৃদয়বেদনা উন্মোচনের সূত্রেই যে এই কাব্যের গীতিকাব্যিক মূল্য, তা নয়, রেনেসাঁস পর্বের কবি মধুসূদনের আপন অন্তরের স্বাধিকার-সচেতন বিদ্রোহ-চেতনার রোম্যান্টিক যন্ত্রণাবোধ 'বীরাঙ্গনা'র আপাত-'ন্যারেটিভ' কাব্যরূপের কাঠামোয় এক মন্ময়ী মাত্রা যোজনা করেছে, সন্দেহ নেই।

এবারে ব্রজাঙ্গনা কাব্য-প্রসঙ্গ। সময়ের স্রোতে কিছুটা এগিয়ে এসেছি আমরা, আবার একটু পিছিয়ে যেতে হবে। যেতে হবে তিলোত্তমাসম্ভব ও মেঘনাদবধ রচনার মধ্যবর্তীকালে। সেটিই ব্রজাঙ্গনাকাব্যের সৃষ্টিপর্ব। মনে রাখতে হবে, অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিন্যস্ত দু'টি আখ্যানধর্মী বস্তুমুখী কল্পনাশ্রিত কাব্যরচনার মধ্যকালে যার আত্মপ্রকাশ, সেই ব্রজাঙ্গনায় কিন্তু কবির প্রবণতা সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী। মহাকাব্যোচিত সংক্ষোভ-সংঘর্ষের প্রবল নির্ঘোষ এখানে নেই, কবিকণ্ঠ এখানে মৃদু, ও বিরহবেদনায় বিষণ্ণতায় করুণ-মধুর। ব্রজাঙ্গনার বিষয় আত্মমুখী কল্পনাশ্রয়ী—রাধাবিরহ। মধ্যযুগের পদাবলী সাহিত্যে এই রাধাবিরহ অবলম্বন করে মহাজন পদকর্তাদের কণ্ঠ থেকে এক ধরণের গীতিকবিতা উৎসারিত হয়েছিল। বিরহিনী রাধাচিত্তের মর্মস্পর্শী বেদনা সেখানে ব্যক্ত হয়েছিল অপরূপ নৈপুণ্যে। কিন্তু যে পদাবলী কবির সাধনার সোপান, যার সমগ্র আবহে অধ্যাত্ম-রূপকের প্রচ্ছদটি সুস্পষ্ট, সেখানে পদকর্তা কবির ভূমিকার স্বাতন্ত্র্য নিতান্ত সীমিত। পদকর্তা ওই ধর্মীয় কবিগোষ্ঠীর একজনমাত্র, রাধাকৃষ্ণ কাহিনীতে তাঁর কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই, তিনি আস্বাদনরসিক দ্রষ্টা 'লীলাশুক মাত্র।' ঊনিশ শতকের বাংলাদেশের ধর্মের অতিরেক মুক্ত "হিউম্যানিস্ট' পরিবেশে ওই মধ্যযুগীয় রাধাবিরহকথা যখন পরিবেশিত হ'ল, তখন

স্বভাবতই সেখানে কিছু যুগোপযোগী নূতন প্রকরণ ও প্রবণতা চোখে পড়ল। প্রথমত কবি মধুসূদনের চোখে রাধা ঈশ্বরের হ্লাদিনী শক্তি ন'ন, কোন অধ্যাত্ম-চেতনার অপার্থিব জ্যোতির্বলয়ে তিনি অধিষ্ঠিত ন'ন, তিনি একান্ত মানবী—'Mrs. Radha'। সেই মানবী প্রেমিকার বিরহ বেদনার আবেগকে কবি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন বর্ষা-বসন্ত, ফুল পাখী নদী ঊষা-গোধূলির মত বিচিত্র উপকরণের রোম্যাণ্টিক নিসর্গপটে। শুধু তাই নয়, রাধাবিরহের এই পুরনো বিষয়বস্তু নিয়ে একালের কবি লিখতে চাইলেন পশ্চিমী ছাঁদের 'ওড্'-শ্রেণীভুক্ত একগুচ্ছ গীতিকবিতা। যদিও ব্রজাঙ্গনায় 'ওড্'-এর যথার্থ অবয়বটি ফুটে ওঠেনি, তবু রাধার আত্মগত ভাবাবেগ ও ব্যাকুলতাকে অর্থাৎ একটি ব্যক্তির অন্তর্লোকের চিত্রকে এক বিশেষ প্যাটার্নে রূপান্বিত করার প্রয়াসে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে কবির লিরিক-প্রবণতা।

কিন্তু তবু বলবো, ব্রজাঙ্গনায় কবির লিরিক প্রবণতার সুষ্ঠু নান্দনিক প্রকাশ ঘটেনি। এখানে রাধার হৃদয়-বেদনার মধ্যে কবিচিত্তের নিজস্ব প্রতিকৃতির তেমন প্রগাঢ় প্রতিফলন ঘটেনি। প্রকৃতপক্ষে এই কাব্যের কবিতাগুচ্ছে রাধার হৃদয়-বেদনা তীব্র-গভীর কোন মাত্রা পায় নি। বিরহ-ব্যথা রাধাকে তন্গতচিত্ত করেনি, গূঢ় অন্তর্জ্বালা তার জীবনকে তেমন প্রবলভাবে আলোড়িত করেনি, যার ফলে তার কল্পনাদৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি রূপান্তরিত হয় এক অপার্থিব ভাবলোকে। ফলে কোন কবিতারই আবেদন পাঠকের মননস্তর পার হয়ে কল্পনাশ্রিত আবেগের রসলোকে উত্তীর্ণ হয় না। তবু ওরই মধ্যে গভীরতার অভাব সত্ত্বেও ভাবগত ও অবয়বগত সঙ্গতি ও সংহতি-বিচারে কয়েকটি কবিতার লিরিক-সৌন্দর্য পাঠককে আকৃষ্ট করে। প্রতিধ্বনি, গোধূলি, বসন্তে (দ্বিতীয় কবিতাটি) ইত্যাদি কবিতা এদিক থেকে স্মরণযোগ্য।

মধুসূদনের বিভিন্ন কাব্যে নিহিত লিরিক-প্রবণতার কথা বলা হ'ল। কিন্তু নিছক ইতস্ততঃ বিকীর্ণ প্রবণতার সীমিত ইঙ্গিত-আভাসেই কবির লিরিক-চেতনা নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। তাঁর এই মানস প্রবণতার অনিষ্ট ছিল লিরিকের 'যথার্থ' এক শিল্প-অবয়ব। কিন্তু ওই 'যথার্থ' লিরিক প্রতিমা দীর্ঘদিন ধরে কবির কাছে অধরা থেকে গেছে। কবিজীবনের একেবারে সূচনাপর্বে ইংরেজিতে রচিত কোন কোন কবিতায় লিরিকের ভাবসৌন্দর্য, তার ব্যঞ্জনাগর্ভ আত্মচেতনার চকিতদীপ্তি চমক এনেছিল পাঠকচিত্তে—'My thoughts, my dreams, are all of thee,/Though absent still thou seemest near ;/Thine image every where I see—/Thy voice in every gale I hear,' [দ্র. মধুসূদন রচনাবলী (১৯৭৭)—সম্পাদক ক্ষেত্র গুপ্ত, পৃ. ৪৪১]।

কিন্তু তারপর বাংলা কবিতার জগতে এসে লিরিকের সেই পলাতকা সত্তার পিছনে কবি সতৃষ্ণ ব্যাকুল চিত্তে ধাবমান হয়েছেন। শেষে সেই স্বপ্নসাধ কবির

মিটেছে জীবনের উপান্তপর্বে পেঁছে। স্বদেশে নয় প্রবাসে, ইউরোপে। বলতে পারি কবির প্রবাসী মনের 'নস্ট্যালজিক' অনুভব থেকে প্রেরণা জেগেছে আত্মউন্মোচনের নিগূঢ় ইচ্ছার—স্মৃতির সমুদ্র আলোড়িত করে এভাবেই জেগে উঠেছে 'যথার্থ'' লিরিকের কয়েকটি মনোহর কুসুম। কিন্তু মধুসূদনের পাঠকমাত্রেই জানেন, এগুলি সাধারণ স্বচ্ছন্দ, মুক্তগতি লিরিক নয়, এগুলি সনেটজাতীয় 'চতুর্দশপদী কবিতা', যার মধ্যে নিহিত বন্ধন ও মুক্তির দ্বৈতলীলারূপ। মধুসূদনের কবি-স্বভাবের সেই পূর্বোক্ত মিশ্রপ্রবণতার—ক্ল্যাসিক্যাল ও রোম্যান্টিক লিরিক-চেতনার সমবায়ী রূপ এখানে ঈষৎ পৃথক ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। মেঘনাদবধ কাব্যে দেখেছি 'এপিক' কাঠামোর তলে তলে লিরিকের অন্তর্বাহী কুণ্ঠিত মৃদু স্রোত। কিন্তু সেখানে এপিক-এর দেশকালে-দূরপ্রসারী সৌন্দর্যই চিত্তকে অধিকার করে রাখে। কবির আত্মচেতনার অভিব্যক্তি সেখানে সীমিত। আর, 'চতুর্দশপদী'তে পেলাম সনেটের সংহত স্ফটিক-কঠিন বন্ধনের মধ্যে বিধৃত কবির আত্মগত ভাব ও ভাবনার অকুণ্ঠ ঐকান্তিক অভিব্যক্তি। যে একশ' দুই-টি সনেট নিয়ে মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী', বলা বাহুল্য তার অধিকাংশের মধ্যেই কবির আত্মচেতনার কোন পরিস্ফুট প্রকাশ নেই। সেখানে সনেটের বাইরের রূপবন্ধটি অক্ষুণ্ণ আছে ঠিকই, কিন্তু আত্মগত অনুভবের অভাবে সেগুলি লিরিক চেতনায় একান্ত দীন, রিক্ত। মাত্র চল্লিশ-বিয়াল্লিশটি কবিতা বস্তুত এই অর্থে যথার্থ লিরিকধর্মী রচনা। আর তাই এই কবিতাগুচ্ছই আমাদের আলোচনার মুখ্য আশ্রয়ভূমি। বাকী প্রায় ষাটটি সনেটের মধ্যে এমন অনেক কবিতা আছে, যার বিষয় মহাকাব্য, বিষয়ও মহাভারত থেকে আহৃত। সে সব সনেটে অনিবার্যভাবেই কবির স্বাভাবিক এপিকসুলভ বিশাল বিস্তৃতিধর্মী বস্তুমুখী কল্পনার প্রকাশ ঘটেছে, এবং বলা বাহুল্য, অনেকক্ষেত্রেই প্রবহমান ছন্দে বিধৃত সেই কল্পনা সনেটের প্রত্যাশিত লিরিক সংবেদন সৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গোগৃহে রণ, গদাযুদ্ধ, কুরুক্ষেত্র, দুঃশাসন ইত্যাদি কবিতা উল্লেখ্য।

কিন্তু যে চল্লিশ-বিয়াল্লিশটি কবিতায় কবির আত্মচেতনার, তার অন্তর্মুখী প্রবণতার নিশ্চিত প্রকাশ ঘটেছে, প্রশ্ন হ'ল সেগুলিতে কবির অন্তশ্চেতনার কোন্ কোন্ দিক ব্যক্ত হয়েছে, এবং সেই অভিব্যক্তি লিরিকশিল্পের মাপকাঠিতে কতটা উত্তীর্ণ?

বস্তুত এই কবিতাগুচ্ছের সবচেয়ে পরিস্ফুট প্রবণতা স্মৃতিচারণার। সেই স্মৃতি স্বদেশের—স্বদেশের নিসর্গপট, সাহিত্য-সংস্কৃতি, পূজাপার্বণ, সবকিছুর। সুদূর সমুদ্রপারের দেশ থেকে যে মাতৃভূমির কথা তিনি ভাবছেন, সে অতীতের এক স্মরণমধুর জগৎ, সেখানে আছে শৈশবে-দেখা কপোতাক্ষ নদ, আছে দেবদোল, বিজয়া দশমী, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা ; আর কবিকঙ্কণ, জয়দেব, ভারতচন্দ্রের মতো স্বদেশের শ্রেষ্ঠ কবিকুলের সৃষ্টি—কল্পনার অনুপম এক মায়াবী স্বর্গ। মাতৃভূমির এই স্মৃতির মেদুর সৌরভে আবিষ্ট এক আবহে প্রবাসী কবি আত্মমগ্ন থাকতে চেয়েছেন। বৈষ্ণব

পদাবলীর হারানো দিনগুলির জন্য বিষণ্ণ ব্যাকুলতা এমনি একটি সনেটে ('ব্রজবৃত্তান্ত') কবি হৃদয়ের স্নিগ্ধ লিরিকচেতনাকে উন্মোচিত করেছে : "আর কি কাঁদে, লো, নদি তোর তীরে/বসি মথুরার পানে ব্রজের সুন্দরী ?/ আর কি পড়ে লো এবে তোর জলে খসি/অশ্রুধারা ; মুকুতার সম রূপ ধরি ?/"

কবির আত্মচেতনার অভিব্যক্তির আরেক ক্ষেত্র প্রেম-অনুভব। 'পরিচয়' শীর্ষক সনেট-যুগলে এবং 'নিশা' ও 'প্রফুল্ল' কমল যথা……'র মতো আরো দু'একটি সনেটে কবি তাঁর আপন প্রেমিক-সত্তাকে উন্মোচিত করতে চেয়েছেন। অবশ্য প্রেমের মতো এক আশ্চর্য অনুভবের আত্মপ্রকাশের তীব্রতা ও গাঢ়তার বিচারে লিরিক হিসাবে কবিতাগুলি আমাদের চিত্তকে তেমন আবিষ্ট করে না।

মধুসূদনের লিরিকচেতনার এক অনন্য লক্ষণ হল যে, তাঁর কোন কোন সনেটে শুধু হৃদয়াবেগের প্রকাশ নয়, মননধর্মী জিজ্ঞাসা ও তজ্জনিত মানসদ্বন্দ্বের শিল্পশোভন বিন্যাস ঘটেছে। বিহারীলাল প্রদর্শিত বাংলা গীতিকবিতায় যে একান্ত আবেগ-কল্পনার প্রবল পথরেখা, পূর্বসূরী মধুসূদন তাঁর কোন কোন কবিতায় তা' থেকে নিঃসংশয়ে স্বতন্ত্র এক পথ পরিক্রমা করেছিলেন। 'কল্পনা,' 'সৃষ্টিকর্তা,' 'ভূতকাল' ইত্যাদি কবিতায় কবির সেই মননদীপ্ত জিজ্ঞাসু চিত্তের আন্তরিক অনুভবের সুনিশ্চিত স্বাক্ষর আছে :

পাশে যে প্রবাহ-বাহ অকূল সাগরে,/ফিরি কি সে আসে পুনঃ পর্বত-সদনে/……
বর্তমান তোরে, কাল, যে জন আদরে,/তার তুই। গেলে তোরে পায় কোন্ জনে ?/
[ভূতকাল]

মধুসূদনের লিরিক্যাল আবেগ কল্পনা অনেকাংশে সার্থক বাণীরূপ পেয়েছে আপনচিত্তের অন্তর্লীন বেদনা ও বিষাদের অনুষঙ্গে। আকাঙ্ক্ষার অমেয়তায় যাঁর আশা ও কল্পনা ছিল আকাশস্পর্শী, জীবনের বাস্তবভূমিতে তাঁকে মুখোমুখি হতে হয়েছে নিদারুণ ব্যর্থতাবোধের সঙ্গে। সব চেষ্টা ও আয়াস সত্ত্বেও এক অনিবার্য নিষ্ফলতার অমোঘ-চেতনা কবিসত্তাকে ভারাক্রান্ত করেছে। হতাশ্বাস উদাস কবি-হৃদয়ের সেই অন্তরঙ্গ বিষণ্ণ অনুভব প্রাণের সহজ ভাষায় নির্বাচিত চিত্রকল্পে চতুর্দশপদীর সবশেষের সনেটটিতে ('সমাপ্তে') শুধু নয় এর আগেকার দু'একটি কবিতাতেও ('আত্মবিলাপ' ও 'বঙ্গভূমির প্রতি') লিরিক সৌন্দর্যের যে প্রতিমা নির্মাণ করেছে, তার চিত্তস্পর্শী আবেদন কোনদিনই বিস্মৃত হবার নয় :

'আত্মবিলাপ' ও 'বঙ্গভূমির প্রতি'—এই কবিতা দু'টি মধুসূদনের কাব্যভুবনে বিশুদ্ধ লিরিক রচনার দু'টি বিচ্ছিন্ন অথচ অনেকাংশে সার্থক প্রয়াস হিসাবে স্বতন্ত্র-ভাবে স্মরণীয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্য লেখা আত্মবিলাপ কবিতায় ছলনাময়ী আশার কুহকে বিভ্রান্ত মানুষের জীবনের আত্যন্তিক নিষ্ফলতা-প্রকাশের মধ্য দিয়ে কবির তাত্ত্বিকমনের পরিচয় মেলে ঠিকই, কিন্তু একথাও অবশ্য স্বীকার্য যে, 'স্থূল' তাত্ত্বিকতাকে অতিক্রম করে কবিতাটিতে কবির ব্যক্তিহৃদয়ের আর্ত অনুভব পাঠকের

চেতনায় ঈষৎ মর্মরিত হয়ে ওঠে : 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়/তাই ভাবি মনে। /জীবন-প্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে ধায়/ফিরাব কেমনে?—আর সেই অনুভবটুকু সঞ্চার করাতেই এই কবিতার প্রকৃত লিরিক্যাল মাধুর্য। অবশ্য 'আত্মবিলাপ' কবিতায় ব্যক্তিহৃদয়ের অনুভূতির স্পর্শ যে তেমন নিবিড় নয়, বরং এখানে কবির নিজস্ব অন্তর্বেদনার চেয়ে অন্যতর বৈশিষ্ট্য যে কবিতাটির শিল্পমূল্যকে সুচিহ্নিত করেছে, সেটা অস্বীকার করা চলে না। কবিতাটির সেই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল, কয়েকটি সুনির্বাচিত উপমার প্রয়োগ—যে উপমাগুলি বিভিন্ন স্তবকে রূপান্বিত হয়ে বিচিত্র চিত্রশিল্পের সৌন্দর্য বিস্তার করেছে—'ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার,/পথিকে ধাঁধিতে!' কিংবা 'জলন্ত পাবকশিখা-লোভে তুই কাল ফাঁদে/উড়িয়া পড়িলি?/পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি অবোধ হায়,'—পাঠকের মানসদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত এই গূঢ় তাৎপর্যবাহী 'ইমেজ'গুলিই কবিহৃদয়ের ব্যর্থতাবোধের বিষণ্ন স্পর্শে যে লিরিকের সার্থক বাতাবরণ রচনা করেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

বিদেশযাত্রার প্রাক্-মুহূর্তে রচিত 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটিতেও উপমা-চিত্রকল্পের প্রয়োগ নিতান্ত বিরল নয়। কিন্তু কবিতাটিতে কবির ব্যক্তিহৃদয়ের অন্তর্বেদনার স্পর্শ আরও আন্তরিক ও গভীর। ফলে ওই উপমাগুলি স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন কোন সৌন্দর্য বিকিরণ না ক'রে জননীরূপা জন্মভূমির কাছে সন্তানের* হৃদয়-অনুভব প্রকাশের মর্মস্পর্শী ব্যাকুলতার সহজ স্বচ্ছন্দ স্রোতের সঙ্গে অনেক পরিমাণে একাত্মতা লাভ করে : 'রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।/সাধিতে মনের সাধ,/ঘটে যদি পরমাদ,/মধুহীন করো না গো তব মনঃ-কোকনদে।'

তবু বলবো সূক্ষ্ম নান্দনিক বিচারে বাংলা লিরিকের যথার্থ পথিকৃৎ ন'ন মধুসূদন। বস্তুত প্রকরণ-জ্ঞান ও প্রবণতা সত্ত্বেও তিনি আধুনিক গীতি-কবিতার উৎস গহন উৎসমুখটি উন্মোচিত করতে পারেন নি। মধুসূদনের জন্মের আগেই যদিও ইংরেজি সাহিত্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ-শেলি-কীটসের হাতে রোম্যান্টিক-লিরিক কবিতার এক বিস্ময়কর জগৎ অপরূপ সৌন্দর্যে উন্মোচিত হয়েছে, এবং এটা সহজেই অনুমেয় যে, মধুসূদনের কাছে এই জগতের দ্বার অনুদ্ঘাটিত ছিল না, তবু লিরিকের সেই মহৎ উত্তরাধিকারকে বাংলা কাব্যভাষায় প্রত্যাশিত রূপ দিতে পারলেন না মধুসূদন, একথা অস্বীকার করা চলে না। একথা ঠিক যে বাংলা কাব্যপাঠকের মনে পাশ্চাত্ত্য লিরিকের অবয়বের পরিস্ফুট ধারণা তিনিই প্রথম এনেছিলেন, কিন্তু তবু এই প্রশ্ন অনিবার্য যে, যে-অনির্বচনীয়তার ব্যঞ্জনা লিরিকের কাব্যভাষার অর্ধস্ফুট ইশারায় মর্মরিত হয়ে ওঠে পাঠকের অন্তর্লোকে, সমৃদ্ধ পৃথিবীর ওপারের যে অমর্ত্য আলোয় কবিচেতনা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, পূর্বসূরী শ্রেষ্ঠ ইংরেজ রোম্যান্টিক কবিগোষ্ঠী কিংবা উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যার আশ্চর্য রূপায়ণ, সেই ব্যঞ্জনা, সেই দূরস্পর্শী লোকোত্তর আলোর আভাস, কীট্‌স-কথিত সেই 'negative

Capability'-র অভিজ্ঞান মধুসূদনের কবিতায় কতটুকু ফুটেছে? মধুসূদনের অধিকাংশ সনেটে 'পোয়েটিক ডিকশন', উপমা ও চিত্রকল্পে যে ক্লাসিক-ধর্মী স্পষ্টতঃ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষতা ফুটে ওঠে, তাতে ভাস্কর্য শিল্পে কবির দক্ষতার পরিচয় মেলে ঠিকই, কিন্তু রোম্যাণ্টিক লিরিকের উপযুক্ত অনির্দেশ্যতার চেতনা বা সুদূরযানী ব্যঞ্জনা তাতে কোথায়? সেই ব্যঞ্জনা-গূঢ় কবিতার জন্য বাঙালী পাঠককে অপেক্ষা করতে হ'ল আরও কিছুকাল। বিহারীলালের আবির্ভাব পর্যন্ত। বিহারীলালের মধ্যেই প্রথম ব্যক্তিহৃদয়ের সেই নিগূঢ় রোম্যাণ্টিক বাসনা ও বিষাদ অনির্দেশ্য ইশারায় ফুটে উঠল লিরিক-শিল্পের মায়াবী প্রচ্ছদে।

মেঘনাদবধ ঃ কাব্যনাট্যের সম্ভাবনা

অশ্রুকুমার সিকদার

এক

লক্ষ্য করলে দেখি কোন কোন কবির রচনায় নাটকীয় লক্ষণ প্রকট, আবার কোন কোন নাটকাবলীর মধ্যেও গীতিকবিতার সুর স্পষ্ট। মহাকাব্য যে কালে কবিসমাজের আয়ত্তের অতীত হয়ে গেছে এবং সাধনারও লক্ষ্য নয়, সেই যুগে কোন কবির প্রতিভা নাট্যধর্মী এবং কোন কবির প্রতিভা লিরিকধর্মী—এমন একটা শ্রেণীভাগ স্বচ্ছন্দে করা চলে। পৃথিবীর প্রসিদ্ধতম নাট্যকার শেকস্‌পীয়র মহাকবি, তাঁর শব্দ নির্বাচন, উপমা ব্যবহার সঙ্গীত ও চিত্র বিন্যাসের মধ্য দিয়ে সে স্বীকৃতি তিনি চিরকালের জন্য অর্জন করেছেন। কিন্তু কবি হিসেবে তাঁর বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর কবি স্বভাব সম্পূর্ণরূপে নাট্যলক্ষণের দ্বারা আক্রান্ত। জীবনের সমস্ত কিছুকে তিনি নাট্যকারের বিস্ফোরক এবং সচল দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখেছেন। ভিক্টোরীয় যুগের দুই প্রধান কবির মধ্যে কবিস্বভাবের এই দুই মেরুর সুন্দর উদাহরণ পাই। টেনিসনের স্বভাব গীতিময়, শব্দের সজ্জার মধ্য দিয়ে পলাতক সঙ্গীতকে আয়ত্ত করার দিকে তাঁর সমস্ত প্রবণতা; অথচ নাটকাবলী রচনায় তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত—নাট্যপ্রতিভার দাক্ষিণ্য এই কবির উপর বর্ষিত হয়নি। অপর পক্ষে ব্রাউনিঙের গীতিকবিতার মধ্যেও তাঁর নাটকীয় কবি-স্বভাবের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। তাঁর বিখ্যাত নাটকীয় স্বগতোক্তিগুলি, কণ্ঠস্বরের অনুবর্তী ভাঙ্গা পঙ্‌ক্তি নিয়ে, সচল জীবনের শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে, তাঁর সবিশেষ নাট্যপ্রতিভার সাক্ষী হয়ে থাকবে। বর্তমান শতাব্দীতে কাব্যনাট্যের লক্ষণ, উপকরণ ও প্রকরণ সম্বন্ধে যিনি সর্বাধিক চিন্তিত—সেই এলিয়টও স্বীকার করেছেন যে, যদি কোন কবিতাকে নাটকীয় অভিধায় চিহ্নিত করা যায় তবে সেই কবিতা নিঃসংশয়ে ব্রাউনিঙের। স্বয়ং এলিয়টের গীতিকবিতার মধ্যেও নাটকীয় লক্ষণ লিভিস্ প্রমুখ সমালোচকগণ আবিষ্কার করেছেন। এলিয়টের কাব্যসংগ্রহের প্রথম কবিতা প্রুফ্রকের প্রেমসঙ্গীত একটি নাটকীয় স্বগতোক্তি। এই নাট্যগুণ ওয়েস্ট্ ল্যান্ড্-এও লক্ষ্য করা যায় নানা জনের কথোপকথনের মধ্যে এবং সুইনি কবিতাবলীতে। এই সমস্ত কবিতার মধ্যে যে সম্ভাবনা বীজাকারে নিহিত ছিল তাই পরবর্তীকালে এলিয়টের কাব্যনাট্যকলায় পূর্ণাঙ্গরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। যে ব্ল্যাংক ভর্স শেকস্‌পীয়রের আমলের পর বিশেষত মিল্টনের নেতৃত্বে নাট্যলক্ষণহীন, কবিতার পৌনঃপুনিক ব্যবহারের ফলে

নাটকে প্রয়োগের অনুপযুক্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই ব্ল্যাংক ভর্সকে বর্তমান জীবনের নাটকীয় রূপটিকে ধারণের উপযুক্ত বাহন করা যায় কিনা, সেই নিদ্রালু ব্ল্যাংক ভর্সে সজীব নাটকীয় টান আমদানী করা যায় কিনা, তার ক্রমান্বয় অনুসন্ধানই এলিয়টের পরবর্তী কাব্যজীবনের ইতিহাস।

অপর একজন খ্যাতনামা কাব্যনাট্যরচয়িতা ইয়েটস-এর কাব্যজীবনে গীতিধর্ম ও নাট্যধর্মের মধ্যে দোলাচল লক্ষ্য করি। প্রথম যুগে ইয়েটস্-এর কবিতাবলী, ফরাসী প্রতীকবাদী ও নব্বুয়ের দশকের কবিদের সাধনার স্বর্গ গীতময়তার উত্তরাধিকার এবং কেল্‌টিক গোধূলির রক্তিম-ধূসর ছায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন, যার লালিত্যের মধ্যে আবেগের কঠিন গতিবেগ এবং শব্দের মেদবিরল পেশীবাহুল্য নেই অর্থাৎ যার মধ্যে নাটকীয় শব্দ সমূহ প্রায় সর্বাংশে অনুপস্থিত। ফলে, লক্ষ্য করি, প্রথম আমলে রচিত ইয়েটস্-এর কাব্যনাট্যগুলি যে পরিমাণে কাব্য সে পরিমাণে নাটক নয়। পরবর্তী জীবন তিনি ব্যয় করেছেন নাটকের সঙ্গত আবেগময় অথচ ভাবালুতামুক্ত ভাষার সন্ধানে। সমকালীন শিক্ষিতের খবরের কাগজে সংকর অপভাষার প্রতি নিদারুণ অবজ্ঞা তিনি প্রকাশ করেছেন—যে ভাষা ধূলোর মত বিশুষ্ক এবং যে ভাষার মাধ্যমে ভাবালু না হয়ে বিস্ফোরক আবেগ বা জীবন্ত ক্রিয়াকাণ্ডকে উপস্থিত করা চলে না কোন মতে। পরবর্তী জীবনের কাব্যনাটকগুলিতে একদিকে তিনি নাট্যোপযোগী ভাষা করায়ত্ত করেছেন, অপরদিকে তিনি ঘটনাসমূহের মধ্যে যে নাটকীয় কেন্দ্রটি তাকে অনেকাংশে আবিষ্কার করতে পেরেছেন। এবং বিস্মিত হয়ে তখনই আমরা দেখি যে, ইয়েটস্-এর এই সময়ের অন্য কবিতাও সরল পেশল শব্দসম্ভারে এবং নাটকীয় বিন্যাস প্রণালীর উপস্থিতিতে নাট্যগুণান্বিত হয়ে গেছে। ইয়েটস্-এর প্রথম যুগের অন্য কাব্যের লিরিক ধর্ম প্রথম যুগের নাটকাবলীকেও ঐ ধর্মে আচ্ছন্ন করেছে, আবার পরবর্তী যুগে নাট্য প্রতিভার সার্থক উদ্বোধনের সমকালে দেখি গীতিকাব্যও নাট্যধর্ম অর্জন করেছে। এলিয়ট যেমন গীতিকবিতার মধ্যে নাট্যগুণ সঞ্চার করতে গিয়ে সুইনি-প্রমুখ চরিত্র সৃষ্ট করেছেন, তেমনি ইয়েটস্ পরবর্তী কাব্যে পাগ্‌লি জেন প্রমুখ চরিত্র সৃষ্টি করে গীতিকাব্যেও নাটকীয় দূরত্ব ও নির্লিপ্ততা দান করেছেন।

কবিপ্রতিভার চরিত্রের মধ্যে এমন স্বাতন্ত্র্য যে থাকে এবং তারই ফলে এক বিশেষ চরিত্রযুক্ত প্রতিভাধরের পক্ষে অন্য চরিত্রের রচনায় সফল হওয়া সব সময়ে যে সম্ভব হয়ে ওঠে না—তার সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্বাহরণ বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ, যিনি বিরল কবি-প্রতিভার অধিকারী হয়েও নাট্যরচনায় বহুল পরিমাণে ব্যর্থ হয়েছেন। অন্য সমালোচকের বলার অপেক্ষা রাখেন নি, রবীন্দ্রনাথ নিজেই উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর নাটকগুলির মধ্যে লিরিকের বাড়াবাড়ির কথা। তাঁর নাটক সমূহে এত গানের প্রাচুর্য কবি হিসেবে তাঁর প্রবণতার স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়। ওথেলো নাটকে ডেসডিমোনার বা হ্যামলেটে ওফেলিয়ার গান নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ, গানগুলি বাদ দিয়ে নাটকের

অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের নাটকে গানের ব্যবহারে যে তেমন কোন অনিবার্যতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিল না তা সম্প্রতি কোন লেখক সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। শেকস্‌পীয়র কবি হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু ঘটনাঘূর্ণির মধ্যে নাটকীয় কেন্দ্রটিকে অভ্রান্তভাবে ধরতে পারতেন, সেই কারণেই তিনি শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথ, এই মহৎ গীতিকবি, ঘটনাবর্তের মধ্যে সেই নাটকীয় কেন্দ্রবিন্দুকে কোনক্রমে ধরতে পারেন নি বলে, একই কাহিনী অবলম্বনে বারবার নাটক রচনা করেছেন, অথচ নাটকটির প্রাক্ পরিবর্তন রূপটিকে অস্বীকার করেন নি। পরিবর্তনপূর্ব ও পরিবর্তিত দুই রূপই পাশাপাশি প্রচলিত রেখে রবীন্দ্রনাথ যেন প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছেন যে ঠিক কোন্ রূপটিতে নাট্যকেন্দ্র ধরা পড়েছে সে সম্বন্ধে তিনি নিজেও নিশ্চিত নন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন রূপেই সেই দৃষ্টি-এড়িয়ে পালিয়ে যাওয়া পলাতকা ধরা দেয় নি।

মধুসূদনের কবি-প্রতিভার চরিত্র রবীন্দ্রনাথের একেবারে বিপরীত মেরুর। রবীন্দ্রনাথ গদ্যনাটক লিখেছেন এবং কাব্যনাট্য লিখেছেন, কিন্তু কোন দিনই তৃপ্তিকর-ভাবে নাটক রচনা করতে পারেন নি। তাঁর প্রতিভার প্রবণতা সেই দিকে ছিল না। কিন্তু মধুসূদন কবি হলেও তাঁর প্রতিভার প্রবণতা নাটকের দিকে এবং তাঁর কবিপ্রতিভার মধ্যে বহুলাংশে নাট্যগুণের সংমিশ্রণ ছিল। এবং মেঘনাদবধ কাব্যই এই উক্তির যথেষ্ট সমর্থনে সক্ষম বলে আমার বিশ্বাস। মধুসূদনের কবি-চরিত্রের এই প্রবণতা যেমন অন্তরঙ্গ তেমনি বহিরঙ্গ প্রমাণের সাহায্যেও দেখানো যেতে পারে। মেঘনাদবধ কাব্যের নাটকীয় উপাদান বিশ্লেষণের আগে মধুসূদনের নাটকীয় প্রবণতার বহিরঙ্গ প্রমাণগুলি আমি উপস্থিত করতে চাই।

দুই

মধুসূদনের চিঠিপত্রে বারবার লক্ষ্য করি, এই কবি জাতীয় রঙ্গালয়ের স্বপ্ন দেখছেন, যে জাতীয় রঙ্গালয় একটি বিরাট সৌধমাত্র নয়, যার ভিত্তি হবে কয়েকটি জাতীয় নাটক। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজী অনুবাদের দায়িত্ব পড়ে মধুসূদনের উপর। সেই থেকে তাঁর আগ্রহ জন্মায় মৌলিক নাটক রচনায়। সেই আগ্রহের আদিফল 'শর্মিষ্ঠা'। তারপর মধুসূদন 'পদ্মাবতী' ও 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনা করেন; রচনা করেন বিখ্যাত দুটি প্রহসন। শুধু নাটক রচনা নয়, তৎকালের নানা সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়ের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকায় অভিনয়ের নিতান্ত বাস্তব সুবিধা-অসুবিধার দিকগুলি সম্পর্কেও তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। কে কোন্ ভূমিকার যোগ্য, অতিরিক্ত নারী চরিত্রের অসুবিধা, এ সমস্ত বিষয়ে তাঁকে চিঠিপত্রে বিস্তারিত আলোচনা করতে দেখি। কিন্তু পাঁচটি

গদ্য নাটক রচনা করা সত্ত্বেও (আমি বিলাত যাত্রার পূর্বের কথা আলোচনা করছি,-চতুর্দশপদী কবিতাবলী বাদ দিলে তখনই তাঁর সাহিত্য-জীবন অস্তঃগমিত মহিমা) আমার মনে হয় মধুসূদনের গদ্যনাট্যে তাঁর নাটকীয় প্রতিভার স্ফুরণ যত, কাব্যগুলিতে সেই শক্তির প্রকাশ আরও বেশি। কারণ অনেক,—তাঁর গদ্যের জড়ত্ব, অসাড়ত্ব, এইটিই সম্ভবত সব চেয়ে বড় কারণ। ভাষার সঙ্গে নাটকীয় চরিত্রের সম্পর্ক এতোই নিবিড় যে এই নাটকগুলির অসচ্ছন্দ ভাষার জন্য চরিত্রগুলিও পরিণত হয়েছে অনড় যন্ত্রচালিত কাষ্ঠপুত্তলিকায়। তিনি কবি অথচ নাট্যকার, সুতরাং নাট্যপ্রতিভা বিকাশের একমাত্র পথ ছিল কাব্যনাট্য রচনার মাধ্যমে। গদ্যনাট্য তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত বাহন নয়। কাব্যনাট্য রচনা করতে গেলে যে ছন্দের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন সে ছন্দও তৈরী হয়েছিল তাঁরই হাতে, এমন ছন্দ যা প্রবাহিত হতে পারে তরঙ্গের মত, সুনিয়মিত বন্ধন যাকে বাঁধেনা, প্রয়োজনের বশে যে যথাস্থানে থেমে যেতে পারে। কথোপকথনের মতই যে ছন্দ যতির প্রয়োগে সময়ে স্বল্পবাক্, সময়ে বহুভাষী হতে পারে। এবং লক্ষ্য করি, মধুসূদনের হাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিকাশের ইতিহাস তাঁর নাটকীয় ক্ষমতার ক্রমান্বয় শ্রীবৃদ্ধির ইতিহাসের সমান্তরাল। রবীন্দ্রনাথের অনেক বহুচরিত্র-সমন্বিত নাট্যকাব্যের মধ্যে যে নাটকীয়তা নেই, মধুসূদনের বীরাঙ্গনার স্বগতোক্তিগুলির মধ্যে সেই নাটকীয়তা পাই। বীরাঙ্গনার পরবর্তী পদক্ষেপই ছিল অমিত্রাক্ষর ছন্দে পরিপূর্ণাঙ্গ কাব্যনাট্য রচনা—যার মধ্যে মধুসূদনের নাট্যপ্রবণ কবিস্বভাব মুক্তি পেত। কিন্তু রাবণের মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী চঞ্চলা কমলার মত কাব্যলক্ষ্মী মধুসূদনের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে গেল সেই চরিতার্থতার পূর্বাহ্নে। পরবর্তীকালে প্রতিভার ক্ষণপ্রভায় তিনি এক একটি চতুর্দশপদী রচনা করেছেন বটে, কিন্তু অল্পাধিক পরিমাণে স্থায়ী যে প্রতিভার প্রয়োজন দীর্ঘ পরিকল্পিত কোন কাব্যনাট্য রচনার ইন্ধন জোগাতে, সেই স্থায়ী প্রতিভার অগ্নি বিলাতফেরৎ মধুসূদনের জীবনে জ্বলে নি।

বাজি রেখে অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্ম দেওয়ার ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙালী পাঠকমাত্রেই পরিচিত। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে লেখা পত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, অধঃপতিত বাংলা নাটকের দুরবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে মধুসূদন বলেন—"no real improvement of the Bengali Drama could be expected until Blank Verse was introduced in to it" মধুসূদনের এই একটি উক্তির মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়, তিনি বাংলা নাটকের উন্নতিচেষ্টা সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তিত ছিলেন এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের নাটকীয় সম্ভাবনা তিনি তার জন্মেরও পূর্বে উপলব্ধি করেছিলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে নাটকীয় সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে পারা মধুসূদনের পক্ষে আশ্চর্যের, কারণ মিল্টন ব্ল্যাংক ভর্সকে বর্ণনামূলক কাব্যে ব্যবহার করেছিলেন এবং সেই ধারাক্রমে ইংরেজী কাব্যে চলে আসছিল। সুতরাং এই মিল্টন-ভক্ত কবি, যিনি মিল্টনের রচনাকে কাব্যে পরাকাষ্ঠা বলে গণ্য করতেন, তাঁর পক্ষে

ব্ল্যাংক ভর্সে নাটকীয় শক্তি আবিষ্কার তীক্ষ্ন দর্শিতার পরিচয় দেয়। সম্ভবত এই কথা বলার সময় শেক্‌সপীয়রের নাটকাবলীর ব্ল্যাংক ভর্সের কথা তাঁর স্মরণলোকে বর্তমান ছিল। পদ্মাবতী নাটকের প্রথম অঙ্কে কঞ্চুকীর মুখে মধুসূদন প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করলেন—অর্থাৎ এই ছন্দের সঙ্গে নাটকীয়তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছন্দের জন্মকালে স্বীকৃত হলো।

কিন্তু প্রথম যে কাব্যটি সম্পূর্ণত অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত হলো সেই তিলোত্তমা সম্ভব বর্ণনামূলক, তার মধ্যে মধুসূদনের বিস্ফোরণ দূরে থাক, বিচ্ছুরণও নেই। তার কারণ, এখনো পর্যন্ত নবাবিষ্কৃত এই ছন্দের গোপন সামর্থ্যকে কবি অনুমান করলেও প্রকাশ করতে পারেন নি, যতিস্থাপনের প্রধান রহস্য এখনো কবির আয়ত্তে আসেনি, অথচ যতিস্থাপনের স্থিতিস্থাপকতার ফলেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ নাট্যোপযোগী হয়। এই ছন্দকে নাটকে বা নাটকীয় উপাখ্যানে প্রয়োগ করতে গেলে তার মধ্যে যে পরিমাণ সর্বত্রগামী ক্ষমতা দরকার সে ক্ষমতা এখনো মধুসূদন আবিষ্কার করতে পারেন নি বলে তিনি পরীক্ষামূলকভাবে ছন্দটিকে ব্যবহার করেছেন এই বর্ণনামূলক কাব্যে। এই কাব্যে যে সামান্য সংলাপ আছে তাও নাটকীয় গুণে বঞ্চিত।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিবর্তনের ইতিহাসে পরবর্তী পদক্ষেপ মেঘনাদবধ কাব্য। এই কাব্যের আভ্যন্তরীণ নাটকীয় উপকরণ সমূহের বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী অংশে করবো। ইতিমধ্যে লক্ষ্য করি যে, কাব্যপ্রকাশের পনেরো বৎসর পর ১৮৭৫ সালে বেঙ্গল থিয়েটারে মেঘনাদবধ কাব্যের নাট্যরূপ প্রদর্শিত হয়, এবং আমরা জানতে পারি যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের সংলাপে আর কোন বাংলা নাটক ইতিপূর্বে অভিনীত হয় নি। এই অভিনয় ঘটনার দ্বারা অনুমান করা চলে যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ রঙ্গমঞ্চে ব্যবহারের অযোগ্য নয় এবং মেঘনাদবধ কাব্যকে অভিনয়যোগ্য কাব্যনাট্য হিসাবে দেখা চলে। সমসাময়িক কালে লিখিত কৃষ্ণকুমারী নাটকের মঙ্গলাচরণে নাট্যকার মধুসূদন বলেছেন,"অমিত্রাক্ষর পদ্যই নাটকের উপযুক্ত পদ্য। কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য এখনো এদেশে এতদূর প্রচলিত হয় নাই যে তাহা সাহসপূর্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি।" একদিকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভবিষ্যৎ বিকাশের পথ যে ক্রমবর্ধমান নাটকীয়তার দিকে—তা তিনি এই উক্তির মধ্যে স্পষ্টতই বলেছেন, এবং অপরদিকে উপলব্ধি করেছেন যে, কাব্যনাট্য লিখতে গেলে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যতীত পন্থা নেই। কিন্তু কৃষ্ণকুমারী নাটকে এ সত্ত্বেও তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করলেন না, তার কারণ, মধুসূদন বলেছেন, এই ছন্দের অপ্রচলনজনিত পাঠকের অনভ্যাস। কিন্তু আসল কারণ, একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্যনাট্যে ব্যবহৃত হবার পূর্বে এই ছন্দের আরো চর্চার আবশ্যকতা। চর্চার মাধ্যমে এই ছন্দের সাহায্যে মহত্তম ও তুচ্ছতম মনোভাব প্রকাশের যোগ্যতা আরো বেশি করায়ত্ত করার প্রয়োজন

ছিল। যখন মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী নাটকের মঙ্গলাচরণে এই উক্তি করেছেন তখন তারই নিকটবর্তী কালে তিনি মেঘনাদবধ কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সেই প্রয়োজনীয় নাটকীয়তা একে একে আবিষ্কার করছেন।

মেঘনাদবধ কাব্যেও অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে মধুসূদনের শেষ কথা বলা হয়নি—এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি 'সিংহল বিজয়' নামে এক কাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন। সাহিত্য পরিষদ্ সংস্করণ বীরাঙ্গনার ভূমিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্য পাই, "সম্ভবতঃ উক্ত narrative বা আখ্যানমূলক কাব্যে (সিংহল বিজয়) অমিত্রচ্ছন্দের পরিণতি প্রদর্শনের সুযোগ না পাইয়াই মধুসূদন তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহার জন্য dramatic বা নাটকীয় বিষয়বস্তুর প্রয়োজন মধুসূদন অনুভব করিয়াছিলেন।" একথা ঠিক যে মেঘনাদবধ কাব্যে ছন্দোবিকাশের অসামান্য অগ্রগতির পর যদি সিংহলবিজয় কাব্য বর্ণনার কাজে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হতো, তবে তার অর্থ হতো পশ্চাদ্‌গতি, তার অর্থ হতো তিলোত্তমাসম্ভবে ফিরে যাওয়া। নাটকীয় বিষয়বস্তুর সন্ধানে বীরাঙ্গনার পত্রকাব্যগুলি মধুসূদন রচনা করলেন। যদিও আপাতদৃষ্টিতে এইগুলি দয়িতের উদ্দেশে রচিত নায়িকার পত্র, কিন্তু আসলে এগুলি নাটকীয় স্বগতোক্তি—জীবনের দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন নারীদের নাটকীয় কণ্ঠস্বর তার মধ্যে আমরা স্পষ্ট শুনতে পাই। আবেগ-সমূহকে রূপ দেবার যে ব্যাকুলতা ব্রাউনিঙের নাটকীয় স্বগতোক্তিগুলির মধ্যে লক্ষ্য করি, সেই ব্যাকুল ঔৎসুক্য বীরাঙ্গনার পত্রাবলীর মধ্যেও কম্পমান। বীরাঙ্গনার সোমের প্রতি তারা, দশরথের প্রতি কৈকেয়ী, নীলধ্বজের প্রতি জনা—পত্রিকার সমকক্ষ নাটকীয় কাব্য বাংলায় বেশি আছে বলে মনে হয় না। যখন মধুসূদন স্বাচ্ছন্দ্যহীনভাবে নাটকে গদ্য ব্যবহার করতেন তখন তাঁর নাটকে হতো নাট্যগুণের অভাব, সৃষ্ট চরিত্রগুলি হতো যান্ত্রিক, নিষ্প্রাণ এবং যখন উপযুক্ত ভাষা তিনি খুঁজে পেয়েছেন, সেই ভাষায় স্বচ্ছন্দ চলাচলের অবকাশ পেয়েছেন সুসঙ্গত ছন্দের উচ্চৈঃশ্রবায়, তখন কাব্য একদিকে যেমন নাটকীয় হয়ে উঠেছে, তেমনি অন্যদিকে চরিত্রগুলিও হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত।

নাটকীয় স্বগতোক্তিমূলক কাব্য সম্বন্ধে এ্যালয়ট অভিযোগ করেছেন যে, ছদ্মবেশী কবি নানাজনের পোশাক বা মুখোশ ধার করে ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক চরিত্রের জবানীতে কথা বলেন বটে, কিন্তু যে কণ্ঠস্বর আমরা শুনতে পাই সে স্বর স্বয়ং কবির। এই অভিযোগ ব্রাউনিঙের রচনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সত্য হলেও মধুসূদনের বীরাঙ্গনা সম্বন্ধে সত্য নয়। আর এই অভিযোগ সর্বত্র সত্য হলে নাটকীয় স্বগতোক্তি-গুলিকে প্রকৃতপক্ষে নাট্যগুণান্বিত বলা চলতো না। কেননা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের মত নাট্যকারও সৃষ্ট চরিত্র সম্বন্ধে নির্লিপ্ত এবং সর্বত্র তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করা

গেলেও সমগ্রভাবে তাঁকে কোন একটি চরিত্রে পাওয়া যায় না। যে কবি সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে অবলম্বন করে নিজেই কথা বলেন, তিনি কবি হতে পারেন, তিনি নাট্যকার নন। কিন্তু যে কবি একই সঙ্গে ডেসডিমোনা ও ইয়াগোকে সৃষ্টি করতে পারেন, যিনি নির্লিপ্ত দূরত্বে দাঁড়িয়ে প্রতিভার স্পর্শে চরিত্রটিকে তার সঙ্গত জীবন ও পরিণতি দিতে পারেন সেই কবি নাট্যপ্রতিভাসম্পন্ন। বীরাঙ্গনার একাদশটি নায়িকার কেউই মধুসূদনের মুখপাত্রী নয়, তাদের স্বর মধুসূদনের কণ্ঠস্বর নয়, স্রষ্টার দূরত্ব বজায় রেখে তিনি নায়িকাদের আবেগকে রূপদান করেছেন। স্বামীকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে চায় যে জনা, আর যে দুঃশলা ও ভানুমতী নিজেদের স্বামীকে যুদ্ধ থেকে বিরত হবার ভীরু পরামর্শ দেয়—সেই চরিত্রসমূহের স্রষ্টা মধুসূদনের মধ্যে নাট্যপ্রতিভা ছিল বলেই এমন বিরোধী চরিত্র ও আবেগ তাঁর পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে অংকন করা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং এলিয়টের অভিযোগ অন্তত মধুসূদনের বীরাঙ্গনা সম্বন্ধে খাটে না।

এই খ্রীস্টান যুবক কাব্যরসাশ্রিত হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে একটির পর একটি কাব্য রচনা করেছেন। তিনি মুসলমানী কাহিনী অবলম্বনেও সাহিত্য রচনা করতে চেয়েছেন। একথা সত্য যে অন্য ধর্মের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ঐতিহ্য অবলম্বন করে সার্থক সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়। কিন্তু তবু মধুসূদনের মধ্যে সেই বাসনা দেখা দিয়েছিল যে কারণে তা বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মধুসূদন মুসলমানী উপাখ্যান অবলম্বনে সাহিত্য রচনা করতে চেয়েছিলেন তার কারণ ঐ ধর্মাবলম্বী নরনারীর, বিশেষত নারীর মধ্যে, তাঁর মতে, নাটকীয় উপাদান বেশি। তাঁর কোন কোন বন্ধু শেকসপীয়রের সঙ্গে তুলনায় তাঁর নাটকে আবেগ, গতিবেগ ও সংঘাতের অভিযোগ করায় সেই অভিযোগের যাথার্থ্য তিনি মেনে নিয়েছেন, কিন্তু সেই দুর্বলতার দায়িত্ব তিনি চাপিয়েছেন হিন্দু জাতির দুশ্চিকিৎস ব্রীড়া ও কোমল স্বভাবের উপর। এ দেশীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে নাটকীয় তীব্রতার সেই অভাব অনুভব করে তিনি অতৃপ্তি বোধ করেছিলেন এবং সেই কারণে কৃষ্ণকুমারী রচনার পর তিনি অভিনেতা বন্ধু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখেন, "We ought to take up Indo-Mussulman subjects. The Mahomedans are a fiercer race than ourselves, and would afford splendid opportunity for display of passion. Their women are more cut-out for intrigue than ours." ভাষা ও ছন্দকে ক্রমেই কাব্যনাট্যের গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত করে নিয়ে এসেছেন, নাট্যসম্ভাবনাযুক্ত বিষয়বস্তুর লক্ষণ সম্বন্ধেও সচেতন হয়েছেন এবং প্রকৃত নাট্যকারের মত এও তিনি এখন জানেন যে ছাপা নাটকই যথেষ্ট নয়, অভিনেয় এবং অভিনীত হওয়ার মধ্যেই নাটকের সার্থকতা, মুদ্রিত নাটক যতই পাঠযোগ্য হোক না কেন, প্রকৃত নাটকের সার্থকতা বিচারের মাপকাঠি অভিনয়। তাই দেখি, কৃষ্ণকুমারী নাটক সম্বন্ধে তিনি কেশবচন্দ্রকে লিখছেন, "I am not particularly

interested in the question of getting the work printed. This I took upon as a secondary matter. What I want is to have it acted...... ,"
কিন্তু যার জন্য দুরূহ প্রস্তুতি সেই প্রত্যাশিত কাব্যনাট্যটি চিরকালের জন্য অ-লিখিত এবং অনভিনীত রয়ে গেল।

তিন

মধুসূদনের কবিপ্রতিভার প্রবণতা যে নাটকীয়, তার অনেকগুলি বহিরঙ্গ প্রমাণ ইতিপূর্বে উপস্থিত করেছি। এই অংশে আমার মূল বক্তব্য হলো, সেই অ-লিখিত নাট্যকাব্যের, যার জন্য মধুসূদন প্রস্তুত হচ্ছিলেন, সমস্ত নাটকীয় সম্ভাবনা মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে বিরাজমান। এই গ্রন্থ কাব্যাকারে লিখিত হলেও কাব্যনাট্য হিসেবে তার আলোচনা ও বিচার সম্ভব।

শ্বেতভুজা ভারতীকে সম্বোধন করে মধুসূদন কাব্য আরম্ভ করেছেন, কাহিনীর প্রারম্ভে এই অংশকে সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা বা নান্দীমুখের সঙ্গে তুলনা করা চলে। নান্দীমুখের স্বস্তিবাচনের আশীর্বাদ প্রার্থনার পর নাট্যারম্ভ হতো, মেঘনাদবধ কাব্যেও সরস্বতীর আশীর্বাদ কবির প্রার্থিত। কখনও কখনও প্রস্তাবনায় কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার সূত্রাকারে বলে দেওয়া হতো—যেমন শকুন্তলার প্রস্তাবনায় নটীর গানে কোমল-মধুর শিরিষপুষ্প কৃষ্ণভ্রমর কর্তৃক চুম্বিত হবার বর্ণনার মধ্য দিয়ে শকুন্তলা-দুষ্যন্তের বৃত্তান্ত ইঙ্গিতে বোঝানো হয়েছে। এই কাব্যেও দেবীর আশীর্বাদ ভিক্ষার ছলে বীরবাহুর মৃত্যু, ইন্দ্রজিতের সৈনাপত্য গ্রহণ, লক্ষ্মণ কর্তৃক তার বধ-কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হয়েছে।

কাব্যের মূল কাহিনী যেখান থেকে আরম্ভ হলো তার চেয়ে কাহিনীর আর বেশি কি নাটকীয় সূত্রপাত হতে পারে? ঘটনাচক্রের মাঝখানে পর্দা সরে দৃশ্যপট উদ্‌ঘাটিত হলো। বীরবাহুর মৃত্যু থেকে আরম্ভ হলো কাব্যনাট্যের কাহিনী, পিছনে থাকলো সীতাহরণ, ভবিষ্যতের গর্ভে থাকলো মেঘনাদের মৃত্যু। এক মুহূর্তে আমরা ঘটনাজালে জড়িত হয়ে পড়ি, ঘটনার আবর্ত নিরুশ্বাসনিশ্বাস পাঠককে ভাসিয়ে নিয়ে চলে। সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটকীয় ঘটনাবস্তুকে গতি দেবার পূর্বে যেমন স্থানকাল-পাত্রের বিবরণ দেওয়া হয় তেমনি এখানেও স্থানকাল-পাত্রের বর্ণনা পেলাম—সিংহাসনে উপবিষ্ট দশানন, চতুর্দিকে সভাসদ-পরিচারক-পরিচারিকা, করজোড়ে দণ্ডায়মান ভগ্নদূত মকরাক্ষ, আর ঐশ্বর্যচিহ্নমণ্ডিত সভাগৃহ। বীরবাহুর মৃত্যুর মর্মান্তিক সংবাদটি যবনিকা ওঠার আগেই ভগ্নদূত বলেছে—রাবণের বিলাপোক্তি শুনতে পেলাম আমরা, শুনতে পেলাম সচিবশ্রেষ্ঠ সারণের সান্ত্বনা-বাক্য ও তার উত্তরে রাবণের উক্তি। রাবণ আদেশ করলো দূতকে সমরে অমরত্রাস বীরবাহুর পতন

মধুসূদন—১৩

কাহিনী বলতে, দূত রাজাজ্ঞা পালন করলো। দূতের মুখে ভয়ংকর যুদ্ধের বর্ণনা শোনার পর রাবণ উৎসাহ-উদ্দীপনা ফিরে পেলো এবং সভাসদগণের সঙ্গে প্রাসাদ শিখরে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র অবলোকনের প্রস্তাব করলো। লক্ষণীয় যে, সংলাপের মধ্য দিয়ে ঘটনাবস্তু এই কাব্যে এগিয়ে চলেছে, নাটকে যেমন হয়। আর অপ্রয়োজনীয় বর্ণনাও বর্জিত হয়েছে। সংলাপ-প্রাধান্য শুধু প্রথম সর্গে নয়, অষ্টম সর্গ বাদ দিলে, সমস্ত সর্গেরই এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। মধুসূদনের মতে অষ্টম সর্গ "Intellectual Excercise"। সর্গটি কাব্যের মধ্যে বোঝার মত অনড় হয়ে আছে, কাব্য-সৌন্দর্যের কোন শ্রী তাতে বৃদ্ধি হয়নি। আসলে কাব্যের মধ্যে মাত্র এই সর্গটিতেই নাট্যগুণের সুনিশ্চিত অভাব বলে নাট্যরসাশ্রিত এই কাব্যে এই সর্গ কাব্যগুণে একেবারেই বঞ্চিত।

শুধু সংলাপের জন্য এই কাব্য যে নাট্যময় হয়ে উঠেছে তা নয়। কেননা যদিও কাব্যের মাধ্যম শব্দ, কিন্তু নাটকের মাধ্যম কুশীলবের আচরণ-ভঙ্গিমা এবং তাদের ব্যবহৃত শব্দ। তাই বোধ হয় নাট্যকার যেমন কুশীলবদের প্রতি নির্দেশ নাটকে লিপিবদ্ধ করেন, তেমনি পাত্রপাত্রীর গতিবিধির বহু নির্দেশ মধুসূদন এই কাব্যের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং সেইগুলির ভিত্তিতে আমরা সহজে পাত্র পাত্রীকে কোন এক মানসিক রঙ্গমঞ্চের উপর চলে ফিরে বেড়াতে দেখি। কানে শুনি শব্দ ও বাক্যবন্ধ, দেখি গতি এবং ক্রিয়া। মন্ত্রী সারণ 'কৃতাঞ্জলিপুটে উঠি নতভাবে' সান্ত্বনা বাক্য উচ্চারণ করে, রাজা 'দূত পানে চাহি' আদেশ দেয়, ভগ্নদূত 'প্রণাম রাজেন্দ্রপদে করযুগ জুড়ি' যুদ্ধের অপূর্ব কাহিনী বলতে আরম্ভ করে, বর্ণনাশেষে পোশাক খুলে দেখায় তার বক্ষঃস্থল ক্ষত, 'পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।' যখন রাবণ বলে—চল সবে,—

চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদগণ
কেমনে পড়েছে রণে বীরচূড়ামণি—

তখন অত্যন্ত সুন্দর ও স্বাভাবিকভাবে একটি দৃশ্যের অন্তে পাত্র-পাত্রীর প্রস্থানের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। সভায় কথোপকথন হয়, মৃণালভুজা কিংকরী চামর দোলায়, সভাদ্বার দিয়ে দেখা যায় ভীষণ মূর্তি দৌবারিকের পদচারণা—এই দৃশ্যপট স্থানু নয়, বরং নাটকীয় দৃশ্যের মতই জীবন্ত। অভিনেতার প্রতি নাট্যকারের মত নির্দেশ দেবার আর একটি চমৎকার উদাহরণ পাই ষষ্ঠ সর্গে। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে আহত লক্ষ্মণ অচৈতন্য, ইন্দ্রজিত তার অসি বা ধনুক বা তূণ ছিনিয়ে নিতে গিয়ে বারবার মায়ার প্রভাবে যখন ব্যর্থ হলো তখন সে ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে দ্বারের দিকে তাকালো। সেই মুহূর্তে ছায়া পড়লো দরজায়—নাটকীয় ভাবে "ভীমতম শূল হস্তে, ধূমকেতু সম, খুল্লতাত' বিভীষণ প্রবেশ করলো। আর একটি নাটকীয় প্রস্থানের উদাহরণ পাওয়া যায় প্রথম সর্গে—সখীপরিবৃতা চিত্রাঙ্গদার প্রস্থান। "হায় নাথ নিজ কর্মফলে, মজালে রাক্ষসকুল, মজিলা আপনি"—বলে যখন সে

চলে গেল তখন এই শোকার্ত রমণীর কণ্ঠনিঃসৃত দৈববাণীতে যেন রাবণের গগনচুম্বি প্রাসাদের ভিত্তি শিথিল হয়ে গেল।

এ সব ছাড়াও নাটকের আরো কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ এই কাব্যে বর্তমান। নাটকীয় সংশয় ও অনিশ্চয়তাকেও মধুসূদন এই কাব্যে ব্যবহার করেছেন। একটি সুন্দর উদাহরণ ষষ্ঠ সর্গে পাই—লক্ষ্মণ যজ্ঞাগারে অগ্নি উপাসনারত মেঘনাদের সামনে সশস্ত্র অবস্থায় উপস্থিত হয়েছে। অগ্নিধ্যানে একমনা ইন্দ্রজিৎ মনে করেছে এ বুঝি অগ্নি। দর্শক যেহেতু আগের দৃশ্যাবলীর সঙ্গে পরিচিত সেই কারণে লক্ষ্মণের পরিচয় ভেবে সংশয়িত নয়, সে সংশয়িত ইন্দ্রজিতের পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে; যখন সে জানতে পারবে তাকে নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করবার জন্য লক্ষ্মণ এসেছে,—সে তার বরদাতৃ উপাস্য অগ্নি নয়। এবং এই কাব্যের সর্গগুলিকে কাব্যের আকারের কোন প্রকার বিকার না ঘটিয়ে দৃশ্যে এবং অংকে বিভক্ত করা সম্ভব। প্রথম সর্গের আলোচনা করে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করা যায়। প্রথম দৃশ্যে রাজসভা, দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রাসাদ-শিখর—যেখান থেকে সপার্ষদ রাবণ যুদ্ধের দৃশ্য অবলোকন করেছে, তৃতীয় দৃশ্যে পুনরায় সভাগৃহে, যে দৃশ্যে বিদ্যুৎবল্লরীর মত চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ, চতুর্থ দৃশ্যে সমুদ্রতলে বারুণী ও মুরলার কথোপকথন, পঞ্চম দৃশ্যে মুরলা ও কমলার কথোপকথন, নগর ভ্রমণ ও যুদ্ধের প্রস্তুতি দর্শন এবং শেষ দৃশ্যে ছদ্মবেশী লক্ষ্মীর মুখে খবর পেয়ে প্রমোদকানন থেকে মেঘনাদের লংকায় প্রত্যাবর্তন ও সৈনাপত্য গ্রহণ। যেন প্রথম সর্গের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম অংকের সমাপ্তি হলো, মেঘনাদের সৈনাপত্য গ্রহণের দ্বারা নাট্যকাব্যের কেন্দ্রীয় ঘটনাকে উপস্থিত করা হলো। অবশ্য এই দৃশ্যগুলির কোন কোনটি চলচ্চিত্রের চঞ্চল দৃশ্যের মত অতি-সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তাদের নাটকীয়তা অনস্বীকার্য।

এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে কতগুলি সাধারণ নাটকীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতিকল্প আমরা যে মেঘনাদবধে পাচ্ছি শুধু তাই নয়, মনে হয় উপরন্তু কিছুও পাচ্ছি। পাত্রপাত্রী কথা বলছে, মুখর দেহভঙ্গিমায় তারা জীবন্ত হয়ে উঠছে, বাক্য ও ভঙ্গিমা সমস্তই যেন কোন এক অন্তর্লীন সত্তার বহিঃরূপায়ণ, পৃথক অথচ এক—মঞ্চের উপর দৃশ্যপট, বাক্য, ভঙ্গিমা সব ঐকতানে মিলে ফুটে উঠেছে যেন একটি পূর্ণাঙ্গ ইমেজ। এমন এক-একটি বিচিত্র উপাদান-রচিত ভাস্বর ইমেজই নাটকের সিচুয়েশন; এবং কবিতা যেমন ইমেজের পর ইমেজে গ্রন্থিত হয়ে সশরীর হয়ে উঠে, তেমনি সিচুয়েশনের পর সিচুয়েশন সাজিয়ে নাটকের অগ্রগতিই হয়, ঘটনার জালে গ্রন্থি পড়ে এবং ক্রমে সেই গ্রন্থি মোচন হয়। বাক্যভঙ্গি দৃশ্য সমন্বিত হয়ে যে দৃশ্যমান সিচুয়েশন বা নাটকীয় ইমেজ সৃষ্টি করে, তাই ঘটনাবস্তুকে গতি দেয়, সক্রিয় করে তোলে—রাবণ বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে মৃত পুত্রের বীরত্ব ও রণকৌশলে উদ্দীপনা অনুভব

করে,প্রসাদশিখর থেকে বিশ্বাসঘাতক সমুদ্রকে দেখে, চিত্রাঙ্গদা-কর্তৃক তিরস্কৃত হয়ে ক্রুদ্ধ হয়, স্বয়ং যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়, এমন সময় ছদ্মবেশী লক্ষ্মীর মুখে সংবাদ পেয়ে ইন্দ্রজিৎ রণনেতৃত্ব গ্রহণ করে। ইন্দ্রজিতকে সৈনাপত্যে বরণ করানোই ঘটনার অগ্রগতির লক্ষ্য এবং সেই অগ্রগতি কবির বর্ণনার মধ্য দিয়ে আমরা পাইনি, পেয়েছি চলন্ত দৃশ্যের দর্পণে উপস্থিত মানস-রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যাদৃশ্যান্তরের মধ্য দিয়ে।

গীতিকাব্যের কাল চিরবর্তমান—একটি অক্ষয় মুহূর্তে শব্দাবলীর অমর বিন্যাসের মধ্য দিয়ে চিরকালের জন্য পুষ্পিত হয়ে থাকে। মহাকাব্যের কাল অতীত, প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে লুক্কায়িত কিংবদন্তীর কাল। আর নাটকের কাল ক্রমান্বয় ভবিষ্যৎ—নাটকে বর্তমানের ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তটি প্রতি পলে ভবিষ্যতের দিকে টলে পড়ে। নাটক অতীতের রোমন্থন করে না, বর্তমানকে স্থায়িত্ব দান করে না, নাটকের কালগতি ভবিষ্যতের দিকে চলমান। গীতিকাব্যের সঙ্গে কাব্যনাট্যের পার্থক্যের প্রধান কারণ প্রকরণ বা ছন্দে নিহিত নেই, সেই পার্থক্যের কারণ নাটকের এই ভবিষ্যৎমুখী প্রবণতা। নাটক যে ঘটনাকে উপস্থিত করে তা লব্ধ পরিণাম নয়, সে ঘটনা তখনো পরিণামের প্রত্যাশায় অসম্পূর্ণ—তাৎক্ষণিক, অপরিণত সেই ঘটনা পরিণাম লাভের আশা করে ভবিষ্যতের খনির গোপন অন্ধকার থেকে, যে অন্ধকার নাটকের ঘটনাচক্রের অগ্রগতির সঙ্গে ক্রমে ক্রমে আলোকিত স্পষ্টতা পায়। যা ঘটেছে, সর্বদাই মনে হতে থাকে, তার অন্তরালে আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে আরো কোন বৃহত্তর, আরো কোন তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা—সেই বৃহত্তর ঘটনার সঙ্গে কালগত দৈবগত বা কার্য-পরম্পরাগত সম্পর্ক আছে বলেই বর্তমানের সামান্য ঘটনাও অসামান্য তাৎপর্যে মণ্ডিত মনে হয়। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বর্তমানের তুচ্ছও ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে। "This tension between past and future, the theatrical 'present moment,' is what gives to acts, gestures, and attitudes the peculiar intensity known as dramatic quality."[১] মেঘনাদবধ কাব্যও সেই চঞ্চল বর্তমান কালের রূপায়ণ, যে বর্তমান প্রতিমুহূর্তে ভবিষ্যতের দিকে নির্দেশ করছে, ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে—এবং এই কালগত কারণেও মধুসূদনের এই কাব্যের মধ্যে গূঢ় নাটকীয়তার পরিচয় পাই। প্রথম সর্গে বীরবাহুর মৃত্যুর সংবাদে শোকাহত রাবণের দীর্ঘ ভাষণটি বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করি, বীরবাহুর মৃত্যুর বর্তমান শোকের মুহূর্তে একত্র ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে অতীত ও ভবিষ্যৎ। বীরবাহুর মৃত্যুর জন্য বর্তমান শোক প্রকাশের মধ্যে 'শূলী শম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ'-র মৃত্যুর অতীত শোকের কথা এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু বর্তমান মৃত্যু শুধু অতীতের সঙ্গে যুক্ত হয়েই ক্ষান্ত হলো না, আসন্ন ভবিষ্যতের ভয়াবহ

১ The Third Voice—Denis Daueghue.

বিপদের ছায়াও সে সম্পাত করলো।

কুসুমদাম সজ্জিত, দীপাবলী তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;—

রঙ্গমঞ্চের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উপমার মধ্য দিয়ে বর্তমানের আঘাতে শোকরত রাবণ ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের ইঙ্গিত জানিয়ে দিলো নিজেরও অজ্ঞাতসারে। এই শোকভাষণ বীরবাহুর মৃত্যুর জন্য মূল্যবান, ভবিষ্যতের নির্দেশক বলে আরও বেশী তাৎপর্যময়। বীরবাহুর মৃত্যু ভবিষ্যতের মহত্তর মৃত্যুর, মেঘনাদের মৃত্যুর ভূমিকা রচনা করে।

নাটকের তিনটি মৌলিক লক্ষণের কথা কোলরিজ বলেছিলেন—নাটকীয় ভাষা, আবেগ ও চরিত্র। কিন্তু ভাষা ও আবেগের প্রশ্ন স্বতন্ত্র নয়, আসলে এ দুটি একই প্রশ্ন। সঙ্গত ভাষার বাইরে আবেগের অস্তিত্ব নেই, প্রকৃত প্রস্তাবে যতটুকু আমরা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি, ঠিক ততটুকু আমরা অনুভব করতে পারি। প্রকাশিত হলে অনুভূতি বা আবেগ সত্তা পায়। আবেগে যদি তীব্রতা না থাকে তবে যতই অলংকৃত কবিত্বময় ভাষার প্রয়োগ করা যাক না কেন, তার তুচ্ছতা দীনতা ঢাকা পড়বে না। ফলে ভাষাও হয়ে উঠবে বৃথা বাগাড়ম্বর! অপরপক্ষে আবেগ যতই প্রবল হোক না কেন, নাট্যকারের ভাষা যদি তাকে রূপায়িত করার শক্তিতে অক্ষম হয়, তবে সেই আবেগ যে প্রকৃতই প্রবল ছিল তা জানার সুযোগ পাওয়া যাবে না। প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত, ভাষায় ভঙ্গিতে রূপ লাভ না করা পর্যন্ত আবেগের অস্তিত্ব দর্শকের শ্রোতার জানার কোন উপায় নেই। সুতরাং নাটকের ভাষা ও আবেগের প্রশ্নটি একত্র বিচার করাই সমীচীন।

এলিয়ট এক জায়গায় দাবী করেছেন যে, ঘটনাবর্ত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ভাবেও ভাষা নাটকীয় হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু এই দাবী মেনে নেওয়া যায় না। ঘটনার সম্মুখীন হয়েই আবেগের জন্ম এবং আবেগেরই সঙ্গত প্রকাশের নাম নাটকীয় ভাষা। সুতরাং ঘটনার গতি-প্রবাহের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন কোন নাটকীয় বাক্‌বিন্যাসের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। বিশ্বের রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে যতগুলি বিখ্যাত নাটকীয় ভাষণ আছে তাদের মধ্যে নাটকীয়তার জীবন্ত অস্তিত্ব আমরা অনুভব করি। তার কারণ, যে সমস্যাসঙ্কুল অবস্থায় ঐ বাক্যাবলী উচ্চারিত হয়েছিল, সেই সমস্যাময় ঘটনাবর্তের স্মৃতি আমাদের মন থেকে মুছে যায়নি। যখন ম্যাকবেথ স্বীয় দুর্গে পদচারণরত অবস্থায় নিজেকেই এই কথাগুলি বলে—'If it were done when't is done, then 'twere well. It were done quickly'…তখন আমরা বুঝি এই অবিনশ্বর পঙ্‌ক্তিগুলির নাটকীয়তা শুধু শব্দবিন্যাস বা ধ্বনিবিন্যাসের মধ্যে নেই, আছে

অতীতের কিছু স্মৃতিপুঞ্জের মধ্যেও, ডাইনীদের ভবিষ্যৎবাণী, নিজের অন্তরের উদগ্র উচ্চাশা, ধর্মভীরুতা, এবং স্ত্রীর নির্মম পরামর্শে ; আর আছে ভবিষ্যতের ভয়াবহ শাস্তিলাভের সম্ভাবনার মধ্যে, যে-শাস্তিলাভ 'even-handed justice'-এর হাতে তার প্রাপ্য। এই সমস্ত পরিপ্রেক্ষিতের জটিলতা আমরা জানি এবং ভুলি না বলেই ম্যাকবেথের স্বগতোক্তিটি মনে হয় আপনা-আপনিই নাটকীয়। একটি তুচ্ছ কথাও কত নাটকীয় হতে পারে অবস্থা বিবেচনায় তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ ওথেলো নাটকে ইয়াগোর 'Ha ! I like not that' উক্তিটি। প্রাসাদশিখর থেকে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রাবণের সেই বিখ্যাত ভাষণটি 'কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে প্রচেতঃ' নিতান্ত শূন্যগর্ভ বক্তৃতায় পরিণত হতো যদি অবস্থার পরিবেষ্টন ও আবেগের চাপ তাকে নাটকীয় করে না তুলতো। দৃশ্যটি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই, প্রাসাদশিখর থেকে রাবণের দৃষ্টির পরিধি ক্রমে প্রসারিত হচ্ছে—প্রথমে তার চোখে পড়েছে রাজপ্রাসাদের চারিদিকে কাঞ্চন-সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা নগরীর দিকে, তারপর চোখ পড়েছে নগর প্রাচীরের বাইরে শিবাকুল গৃধিনীর চিৎকারে মুখর রণক্ষেত্রের দিকে যেখানে বীরবাহু শয়ান—দৃষ্টির প্রথম বৃত্ত এবং দ্বিতীয় বৃত্তের মধ্যে প্রতিতুলনা করা হয়েছে এবং সুখের সদনের পাশেই কেন এই মৃত-পরিকীর্ণ শ্মশান তারই কারণ অনুসন্ধান করতে চেয়ে রাবণ আরো দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়েছে। তখনই দেখতে পেয়েছে সে সেই বিশ্বাসঘাতক সমুদ্রকে, যে সমুদ্র এতদিন ছিল তার রাজ্যের রজত প্রাচীর, আর যে আজ শত্রুকে পথ দেখিয়ে এনেছে। এই সব উপকরণ ঐ উক্তিটিকে রচনা করেছে বলেই উক্তিটি নাটকীয় গুণান্বিত।

মেঘনাদবধ কাব্যকে কাব্যনাট্য হিসাবে দেখতে গেলে একটি আপত্তি বারবার উঠতে থাকবে। বলা হবে, এ ভাষা মুখের ভাষা নয়, প্রাণের ভাষা নয়, এ ভাষা বক্তৃতামঞ্চের ভাষা, নাট্যমঞ্চের নয়। এই প্রশ্নের মীমাংসার আগে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া দরকার যে, কাব্যনাট্যের ভাষা কেমন হবে। নাটকে পদ্য ব্যবহারের বিরুদ্ধতা করেছেন ইবসেন, তাঁর মতে নাটকে পদ্য ব্যবহার মানেই হলো বাগ্মিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া, একথা মানলে গদ্যই নাটকের একমাত্র ভাষা হয়ে উঠে—অথচ আধুনিক কালে গদ্যকে ইয়েট্‌স্‌ আত্মার স্পর্শহীন বিশুদ্ধ সাংবাদিক অপভাষা বলে চিহ্নিত করেছেন। দ্বিতীয় পথ, এলিয়টের পথ, যিনি কাব্যনাট্য লিখেছেন, নাটকে পদ্য ব্যবহার করলেন, কিন্তু সমকালীন যুগের প্রচলিত কথোপকথনের ভাষার সঙ্গে যতদূর সম্ভব সেই পদ্যের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিলেন। তিনি আশা করলেন যে, শ্রোতারা এই গদ্যের নিকট-আত্মীয় পদ্যকে পেয়ে শ্রবণকালে পার্থক্য বুঝতে পারবে না, যদিও পঙ্‌ক্তিগুলি তাদের বাক্য-প্রতিক্রিয়া গোপনে গোপনে অবশ্যই করে যাবে। নাটকে স্বভাব পন্থার প্রভাবেই জুলিয়াস সীজার নাটক আলোচনাকালে মার্কিন সমালোচক বলেন,' *Julius Caesar is more rhetoric than poetry, just as its persons*

are more orators than men[২]। একথা অবশ্য সত্য যে, কোন ভাষা কাব্যনাট্যে ব্যবহৃত হতে গেলে সেই ভাষায় শুধু উঁচু তারের কথা বলার শক্তি থাকলেই হবে না, নিচু সুরের কথা বলারও শক্তি তাতে থাকা দরকার, শুধু আবেগকম্পিত কণ্ঠে মহৎ কথাটি উচ্চারণের যোগ্য হলে চলবে না, নিতান্ত তুচ্ছ কথাও স্বাভাবিক কণ্ঠে তাতে বলতে পারা চাই। তুচ্ছ কথা, সামান্য কথা, সাধারণভাবে বলার ক্ষমতা তাঁদের কাব্যনাট্যে ছিল না বলেই, এলিয়ট মনে করেন, ওয়ার্ডস্বোয়ার্থ, বা শেলী বা কীট্‌স-এর কাব্যনাট্য নাটক হতে পারে নি। অথচ স্বভাবের অন্ধ দাসত্বেও নাটকের মোক্ষ নেই। স্বভাবপন্থী নাটকের লক্ষ্য 'illusion of reality'—কিন্তু এই পন্থার পথিকগণ বোঝেন না যে কথাটার মধ্যেই আইরনি লুকিয়ে আছে—স্বভাবের সন্ধান আসলে মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবন এবং নাটকে এই দাসত্বেরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রতীক নাটকের জন্ম হয়েছিল। ইবসেন, যাঁকে স্বভাবপন্থী নাটকের জন্মদাতা বলা হয়, তিনিও পরে প্রতীক নাটক রচনাতে মনোনিবেশ করেছিলেন, নাটকে কাব্যগুণের অভাব পূরণ করতে চেয়েছিলেন প্রতীকের সাহায্যে। এবং এলিয়ট, যিনি স্বভাবের দাবী মেনে নিয়ে নাটকে পদ্য ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতীকী স্তরকেও করায়ত্ত করতে পেরেছেন, তিনি স্বীকার করেছেন, "It is a function of all art to give us some perception of an order in life, by imposing an order upon it."[৩] আর বিশৃঙ্খল জীবনের উপর শিল্পের শৃঙ্খলা আরোপ করা মানেই স্বভাবের অনুকরণ থেকে শিল্পদৃষ্টির মুক্তি এবং নাটকও যেহেতু শিল্প সেইজন্য তার দ্বারা শৃঙ্খলার উপলব্ধি অর্জন করতে গেলে নাট্যকারের দৃষ্টির মুক্তি চাই। স্বভাবের দাসত্ব তার জন্য নয়, অন্যত্র এলিয়ট স্বীকার করেছেন যে, যখন আমরা শাশ্বত ও সার্বভৌমকে প্রকাশ করতে চাই তখনই ছন্দে আত্মপ্রকাশের তাড়না বোধ করি। শিল্পের শৃঙ্খলা নাটকে আনতে গেলে স্বভাবের দাসত্ব থেকে মুক্তি চাই—এই দুইটি সূত্রকে যদি স্বীকার করে নিই, তবে কাব্যনাট্যের ভাষা ছন্দোময় হবে শাশ্বতের সন্ধিৎসায় এবং কাব্যনাট্যের পদ্য যে গদ্যের মত সর্বদাই স্বভাবের অনুকরণ করবে তাও নয়। প্রয়োজনমত অকিঞ্চিৎকর উক্তি তাতে করা চলবে, আবার প্রয়োজন হলে জীবন-মৃত্যু-প্রেমের এমন সত্যকে তার মাধ্যমে প্রকাশ করা যাবে যার নিকটবর্তী প্রদেশেও কোনদিন গদ্য যাবার প্রত্যাশা করতে পারে না। সেই কারণে লিয়ার, ম্যাকবেথ, টিমনের অনেক উক্তি মহৎ নাটকীয় উক্তি, অথচ গদ্যে সেই সমস্ত উক্তি করা যেতে পারে তা কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না।

আধুনিক নাটকে ও কাব্যনাট্যে গদ্যের নিকটবর্তী ভাষা ব্যবহারের প্রবণতার কারণ বোধ হয় "Our scale is not the forum, but the small room"। কিন্তু জুলিয়াস সিজারে তার বিপরীত, সেখানে পাত্রপাত্রীর জীবননাট্য কোন

---

২ Shakespeare—Mark Van Doren.

৩ Poetry and Drama—Eliot.

ছোট কক্ষের মধ্যে অভিনীত হচ্ছে না, সুতরাং আজকের মাপকাঠি দিয়ে সেই উক্তিগুলিকে বাগ্মিতা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মেঘনাদবধেও যে উক্তি-প্রত্যুক্তিগুলি পাই সেগুলি আধুনিক কালের ড্রইংরুমের সীমাবদ্ধ দেওয়ালের মধ্যে উচ্চারিত হয়নি, হয়েছে বিরাট রাজসভায়, বিরাট যজ্ঞশালায় বা বিস্তীর্ণ সমুদ্র-প্রান্তরের যুদ্ধক্ষেত্রে। অবরুদ্ধ কক্ষের বাতায়নের দিকে তাকিয়ে বললে যে-কথা বাগাড়ম্বর বলে অনুভূত হত, প্রাসাদশিখর থেকে আকাশ মাথায় নিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে সে কথা বললে বাগাড়ম্বর থাকে না। দ্বিতীয়ত, এমন এক সুদূর দেশ ও সুদূর কালের বিষয়বস্তু অবলম্বনে এই কাব্য রচিত যে, তৎসম-শব্দবহুল প্রচলিত ভাষা থেকে স্বতন্ত্র মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা তার নাটকীয়তাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি, বরং সেই ভাষাই তার নাটকীয়তার পক্ষে অনেকাংশে যোগ্য হয়েছে। কাব্যনাট্যের পাঠক মাত্রই জানেন এলিয়টের 'মার্ডার ইন দা ক্যাথেড্রাল' ও 'ককটেল পার্টি'' নাটকের ভাষা এক নয়। স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে দুটি ভাষাই সঙ্গত হয়েছে। সেখানেও কালগত ব্যবধান ভাষাগত এই ব্যবধানের জন্য দায়ী। তাছাড়া গীতি-কবিতার ভাষাও তো কবির ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবনের ভাষা নয়, তবু গীতিকবিতার ভিতরে তাঁর হৃদয়ের স্বর নির্ভুল শুনতে পাই। নাটকের ভাষাও তখনই সঙ্গত যখন তা আবেগে জান্তব, তার স্পর্শে চরিত্র জীবন্ত হয়ে ওঠে, যখন ভাষায় চরিত্রের হৃদয়ের স্বর শুনতে পাই। যেমন চিত্রাঙ্গদার—

> কোথা মম অমূল্য রতন ?
> দরিদ্রধন রক্ষণ রাজধর্ম ; তুমি
> রাজকুলেশ্বর ; কহ, কেমনে রেখেছ,
> কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে !

অথবা রাবণের—'বিলাপের কাল, দেবী চিরকাল পাবে।'—এই সমস্ত উক্তির মধ্যে।

নাটকীয় উক্তি তখনই বাগাড়ম্বরে পরিণত হয় যখন বক্তা-চরিত্রটি অন্য চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা না করে দর্শককে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। চরিত্র যখন ভাবালুতার দ্বারা নির্লিপ্ত দর্শককে দর্শকের অপক্ষপাত আসন থেকে অপসারিত করার চেষ্টা করে তখন আমরা বৃথা বাগ্‌বিস্তারের সম্মুখীন হই। মেঘনাদবধে এমন নিদর্শন খুব দুর্লভ নয়, যদিও বিপরীত দৃষ্টান্তও যথেষ্ট। কিন্তু কখনও কখনও এমন বাগাড়ম্বর মধুসূদন সৃষ্টি করেছেন স্বেচ্ছায়, যেমন সপ্তম সর্গে রাবণকে বাধাদানকারী সুগ্রীবের বীরত্বের আস্ফালনে—বাগাড়ম্বরের মধ্য দিয়ে তার বীরত্ব আস্ফালনের শূন্যগর্ভতা প্রমাণের জন্য। অথচ পাশেই রাবণের উক্তি নাটকীয় চরিতার্থতায় প্রোজ্জ্বল—

ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারাকারা রূপে ;
তারে ছাড়ি কেন হেথা রথীকুল মাঝে
তুই, রে কিষ্কিন্ধ্যানাথ ? ছাড়িনু, যা চলি
স্বদেশে ! বিধবা দশা কেন ঘটাইবি
আবার তাহার মূঢ় ? দেবর কে আছে
আর তার ?

যে কবি ভগ্নদূতের মুখে যুদ্ধের সমস্ত মত্ততা ও কোলাহল ফুটিয়ে তুলতে পারেন—

শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জনে ;
সিংহনাদে, জলধির কল্লোলে, দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন—
পথে ; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড টংকারে—

এই পঙ্ক্তিগুলির মাধ্যমে এবং পুত্রঘাতী লক্ষ্মণের দিকেধাবমান ক্রুদ্ধ দিক্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্য রাবণের মুখে যিনি সুগ্রীবের উদ্দেশ্যে এই তিক্ত বিদ্রূপ ও তুচ্ছাতিতুচ্ছের উপেক্ষা বসাতে পারেন, তিনি কাব্য-নাট্যের ভাষার অনেক সমস্যাই সমাধান করে এনেছিলেন—একথা বিশ্বাস করা যায়। আর একটি চমৎকার উদাহরণ সপ্তম সর্গে, বহু অনুসন্ধানের পর ক্ষিপ্ত রাবণ যখন লক্ষণকে খুঁজে পেয়েছে। 'এতক্ষণে, রে লক্ষণ, এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে'—এই উক্তির মধ্যে এক দিকে হিংস্র উল্লাস এবং অপর দিকে ভাগ্যের এই অসামান্য প্রসন্নতায় রাবণের অবিশ্বাস ফুটে উঠেছে। যারা যারা লক্ষ্মণকে রক্ষা করতে এসেছিল, কিন্তু দুর্নিবার রাবণকে বাধা দিতে পারেনি, প্রতিশোধের অবশ্যম্ভাবী চরিতার্থতার মত্ত উল্লাসে, রাবণ তাদের নামের তালিকা দিয়েছে। লক্ষ্মণকে বলেছে সুমিত্রা ও উর্মিলার নাম স্মরণ করতে। আত্মবিশ্বাসী রাবণ দিব্যদৃষ্টিতে যেন দেখতে পাচ্ছে লক্ষ্মণের মাংস মাংসাহারী জীবেরা ভক্ষণ করছে, 'রক্তস্রোতঃ শুষিবে ধরণী।' শেষ তিনটি লাইনে লক্ষ্মণের অপরাধের গুরুত্ব স্তরে স্তরে বুঝিয়ে দেওয়া হলো—প্রথমত সে সমুদ্র পার হয়েছে, দ্বিতীয়ত সে ছদ্মবেশে রাজপুরীতে প্রবেশ করেছে এবং তৃতীয়ত 'হরিলি রাক্ষস রত্ন—অমূল জগতে।' নানা বিচিত্র রসে পরিপূর্ণ, আশা ও অবিশ্বাসে মিশ্রিত, অতীত বর্তমান ভবিষ্যতে গ্রথিত এটি একটি আশ্চর্য নাটকীয় উক্তির উদাহরণ।

নাট্যপ্রতিভার উপস্থিতি-বিচারের আর একটি মানদণ্ড নাট্যকারের নির্লিপ্ত চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা। কাব্যনাট্য রচয়িতা যখন স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেন এবং তার মুখে চরিত্র-সঙ্গত ভাষা দিতে পারেন তখনই এলিয়টের ভাষায় তৃতীয় স্বরের কাব্য জন্ম নেয়। যখন কবি নাটকীয় চরিত্র সৃষ্টি

করেন তখন তিনি এক চরিত্রের মুখ দিয়ে অপর কাল্পনিক চরিত্রের উদ্দেশে এমন কথা বলান যা নিজের স্বরে কখনও তিনি বলতেন না। চরিত্রগুলি তাদের ভঙ্গিমায় আচরণে ভাষণে নির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে, নাট্যকারের প্রতিভা অপক্ষপাতিত্বের সঙ্গে সমস্ত চরিত্রকেই সঙ্গত মর্যাদা দান করবে। কোন একটি চরিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্মতা অর্জন তার পক্ষে চলে না—কোন একটি চরিত্রের মুখে যদি কবিকণ্ঠের প্রতিধ্বনি শুনি, তবে অনুমান করা যায় অন্য চরিত্রসমূহ যথেষ্ট অপক্ষপাত বিচার পায় নি। মধুসূদন মিল্টনের কাব্য সম্বন্ধে বলেছেন—'Milton is Satan himself.' তারই প্রতিধ্বনি করে বলা হয় স্বয়ং মধুসূদনই রাবণ। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ স্বীকার করা যায় না। চিত্রাঙ্গদা যখন তিরস্কার করেছে, সীতা যখন তার দুঃখের বিবরণ সরমাকে বলছে, ইন্দ্রজিৎ যখন বিভীষণকে ধিক্কার দিয়েছে তখনও তাদের মধ্যে এই কাব্যনাট্যের স্রষ্টাকে আমরা পাই। নাটকীয় নানা চরিত্রের সঙ্গেই সময় বিশেষে মধুসূদন একাত্ম, শুধু রাবণের সঙ্গে নয়।

রাবণ যে স্বয়ং মধুসূদন নয়, তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ রাবণের দম্ভ, তার বিলাস, তার ভোগবাদী জীবনদর্শন ও ন্যায়-অন্যায়-চিন্তামুক্ত জীবনবোধের প্রতি আকর্ষণ ও সমবেদনা সত্ত্বেও তিনি তাকে সমর্থন করতে পারেন নি। অপরাধের জন্য যে সে শাস্তি পাচ্ছে একথা রাবণ বিশ্বাস করে না, কেননা তার মনে অপরাধবোধ নেই। সে পুনঃ পুনঃ আঘাতের জন্য দায়ী করে অদৃষ্টকে, কিন্তু মধুসূদন জানেন তার অপরাধের জন্যই তার এই শাস্তি। চিত্রাঙ্গদার মুখ দিয়ে স্পষ্ট বলানো হলো সীতাপহরণই তার অপরাধ। কিন্তু অস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হলো অপরাধ তার আরও গুরুতর। চিত্রাঙ্গদা স্বল্পদিন সুখভোগের পর পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্টের মত রাবণের অন্তঃপুরের অন্ধকারে স্থান পেয়েছে—আজ তার পুত্র হারানোর হাহাকারের সঙ্গে মিশে গেছে পরিত্যক্তার জীবনব্যাপী শূন্যতার বেদনা এবং তার শূন্যতার বেদনার সঙ্গে মিশে গেছে অনুরূপ অন্য বহু অন্তঃপুরিকার দীর্ঘশ্বাস। সীতার দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে একত্রিত হয়েছে এই সমস্ত ব্যর্থ-জীবন ব্যর্থ-যৌবন রমণীর দীর্ঘশ্বাসের অভিশাপ। হংসপদিকার গানের মধ্য দিয়ে এমনই ইঙ্গিত কালিদাস শকুন্তলা নাটকেও দিয়েছিলেন। তাছাড়া দ্বিতীয় সর্গে হোমারের অনুকরণে পার্বতীকে মোহিনী-বেশে পাঠানো হলো যোগাসন পর্বতে মহাদেবকে পক্ষান্তরিত করবার জন্য, কিন্তু দেখা গেল এত চক্রান্তের জালপাতার কার্যত কোন প্রয়োজন ছিল না, কেননা ইতিমধ্যেই মহাদেব মনস্থির করে ফেলেছেন—'পরম ভকত মম নিকষানন্দন ; কিন্তু নিজ কর্মফলে মজে দুষ্টমতি !' চতুর্থ সর্গেও সীতার স্মৃতি-রোমন্থনের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট করে দেওয়া হল যে, কপোত-কপোতীর মত উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে যারা সুখে দম্পতি-জীবন যাপন করছিল তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে রাবণ যে নিষাদ-বৃত্তি করেছে তারই জন্য তার শাস্তি। সুতরাং দেখতে

পাই, মহাদম্ভী দেবস্পর্ধী রাবণের প্রতি সমবেদনা সত্ত্বেও মধুসূদন স্রষ্টার নির্লিপ্ততা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেন নি। স্বয়ং মধুসূদন রাবণ হয়ে যান নি।

কিন্তু একথাও ঠিক যে রাবণ চরিত্র মধুসূদনের কল্পনাকে যতটা উদ্দীপিত করেছে এমন কোন চরিত্র তাঁকে আর করে নি, যে মেঘনাদের নামে কাব্যের নামকরণ, যে ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর বর্ণনা করিতে গিয়ে তাঁকে অশ্রুপাত করতে হয়েছিল—সেই ইন্দ্রজিৎ-মেঘনাদও নয়। কিন্তু এ ঘটনার দ্বারা কবি-প্রতিভায় নাটকীয়-প্রবণতার লাঘবতা প্রমাণ হয় না। বরং মহৎ কাব্যনাট্যে প্রায়ই দেখা যায় চরিত্র তাদের স্বতন্ত্র স্বরে কথা বলতে বলতে এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছোয়—যেখানে মনে হতে থাকে স্রষ্টা এবং সৃষ্ট চরিত্র একই সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে কথা বলছে। যখন হ্যামলেট 'To be or not to be' বা ম্যাকবেথ 'To-morrow and to-morrow and to-morrow'—এই স্বগতোক্তি উচ্চারণ করে তখন একদিকে তাদের অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত এই উক্তিগুলির একটি স্বতন্ত্র অর্থ থাকে বটে, কিন্তু তাদের ছাপিয়ে ওঠে সমগ্র জীবন সম্বন্ধে নাট্যকারের উপলব্ধির ব্যাপক তাৎপর্যটি। একই ভাষণ, একই আচরণের তখন দুটি স্বতন্ত্র স্তরের অর্থ পাওয়া যায়। প্রসপেরো যখন যাদুদণ্ড ভেঙে ফেলে দেয় তখন সন্দেহ হয় শেষ নাটক রচনার পর নাট্য-প্রতিভার যে যাদুদণ্ড এতদিন শেকস্‌পীয়র রাজচক্রবর্তীর মত ধারণ করেছিলেন, এই ভাঙার মধ্য দিয়ে তাকে যেন চিরকালের জন্য বিদায় দিলেন।

মধুসূদনকেও রাবণ এমন করে অভিভূত করেছিল যে এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে কবির অচেতন সত্তা, তাঁর কামনা, আশা ও ব্যর্থতা যেন রূপ পেয়েছিল। কারণ স্বর্ণলংকা তো সেই অ্যালবিয়ন যার জন্য তিনি যৌবনে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন, রাবণের অপরিমিত ভোগের জীবন তাঁরও কাম্য ছিল, তাঁরও মধ্যে প্রতিভার ছিল সর্বজয়ী স্পর্ধা। আর যখন "a character which succeeds in interesting its author may elicit from the author latent potentialities of his own being.[8] রাবণ-চরিত্র তাঁকে এমনভাবে আকর্ষণ করেছিল বলেই বোধ হয় জীবনের ভয়াবহ পরিণতির ব্যর্থ হাহাকারের ভবিষ্যৎ যে সম্ভাবনা তাঁর নিজের সত্তার গভীরে লুকিয়েছিল, তাই শ্মশানে বিশদ বস্ত্র বিশদ উত্তরী পরিধানকারী রাবণের বর্ণনার মধ্য দিয়ে মধুসূদন মূর্তিমান করে তুলতে পেরেছেন। যে রাবণের হাত থেকে করায়ত্ত সিদ্ধি স্খলিত হয়ে পড়েছে, সেই রাবণের মধ্যে মধুসূদন নিজের ভবিষ্যতকে যেন কোন এক অচেতন শক্তির অলৌকিক আলোয় দেখতে পেয়েছিলেন। রাবণ তাই শুধু নির্লিপ্ত সৃষ্টির আনন্দে রচিত চরিত্র নয়, সে হয়ে উঠেছে উইলসন নাইট যাকে বলেছেন, 'Symbol of a poetic vision'। তাই মধুসূদন একদিকে

8 The Three Voices of Poetry—Eliot

যখন নিজের নানা চরিত্র সৃষ্টিতে স্রষ্টার নির্লিপ্ততা বজায় রেখেছেন এবং অন্যদিকে যখন নিজের সত্তার গোপন সম্ভাবনা একটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত করেছেন—তখন কোন অবস্থাতেই চরিত্র সৃষ্টির ব্যাপারে কাব্য নাট্যকারের সীমা বা শক্তি তিনি লঙ্ঘন করেন নি।

জীবন সম্বন্ধে যদি কোন নিজস্ব জীবনদর্শন এই কবির থাকে—সে জীবন-দর্শন কী—সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে: ভবিতব্যবাদ? ধর্মের অবশ্যম্ভাবী প্রতিষ্ঠা?—সেই জীবনাদর্শও মেঘনাদবধ কাব্যে কবির বা কবির প্রতিনিধিস্থানীয় কোন চরিত্রের মুখ দিয়ে প্রকাশিত হয় নি, তাকে প্রদর্শন করা হয়েছে দৃশ্য হিসেবে ঘটনা সংঘাতের মাধ্যমে। ত্রিলোকব্যাপী ঘটনার আবর্ত, চরিত্র সমূহের সংঘাতের মধ্য দিয়ে সেই জীবনদর্শন রূপ লাভ করেছে, প্রকৃত কাব্যনাট্যে যেমন হওয়া উচিত। কাব্যনাট্যে জীবন সম্বন্ধে রচয়িতার দিব্যদৃষ্টি কোন অংশ-বিশেষে থাকে না, কোন বিশেষ পাত্র-পাত্রীর মুখে উচ্চারিত হয় না, কোন প্রবক্তার মুখ থেকে যদি তা জানতে হয় তবে সেই দিব্যদৃষ্টি কাব্যনাট্যের বহিরঙ্গ উপকরণে পরিণত হয়, অন্তরঙ্গতার মর্যাদা না পেয়ে অবান্তর হয়ে যায়।

মোহিতলাল-প্রমুখ অনেক সমালোচক মেঘনাদবধ কাব্যকে ট্র্যাজেডী বলেছেন। ট্র্যাজেডী বলা সঙ্গত কিনা আপাতত সে প্রশ্ন স্থগিত রেখেও অনুমান করা চলতে পারে, বারবার যখন এতজন সমালোচকের মেঘনাদবধ কাব্যকে ট্র্যাজেডী বলে মনে হয়েছে তখন নিশ্চয়ই এই কাব্যের মধ্যে নাট্যগুণ প্রকট-ভাবে বর্তমান। কেননা, ট্র্যাজেডীর রস বর্ণনার মধ্য দিয়ে মেলে না—মূর্তিমান রূপায়নের মধ্য দিয়ে, ঘটনার সক্রিয় সচল উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে সে রসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ট্র্যাজেডীর পরিণামে যে ক্যাথারসিস, যে শুদ্ধি—মেঘনাদবধ কাব্যের পরিণামে তা সম্পূর্ণ অর্জন করা যায়নি—মধুসূদন শেষ পর্যন্ত বাঙালী চরিত্রের ভাবালুতার দুর্লক্ষণ থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। রাজা ঈডিপাস নাটকের বাহুল্যবর্জিত স্তব্ধতা এখানে নেই—কিন্তু 'বিশদ বস্ত্র বিশদ উত্তরী' পরিধান করে 'ধুতুরার মালা যেন ধূর্জটির গলে' রাজা রাবণ যখন 'বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে' লঙ্কায় ফিরে এলো তখন আমরা ট্র্যাজিক রসের নিকটলোকে উত্তীর্ণ হলাম। অন্ধ ঈডিপাস বেঁচে রইলো, সর্বহারা রাবণও বেঁচে রইলো—সোফোক্লিসের কোরাসের শেষ মন্তব্য দুজন সম্বন্ধেই খাটে—

> Call no man fortunate that is not dead
> The dead are free from pain.

চার

এলিয়ট বুঝেছিলেন সাহিত্যে কোন আঙ্গিককে আবিষ্কার করা, তাকে গ্রহণ করার মত পাঠকরুচি তৈরী করা, সঙ্গে সঙ্গে সেই আঙ্গিকের চরম ও সার্থক পরিণতি দান করা মহত্তম প্রতিভার পক্ষেও সম্ভব নয়। সুতরাং মধুসূদনের রচনাবলীর মধ্যে যে দুর্বলতা থাকবে তা প্রত্যাশিত। বাংলায় অনেক আঙ্গিকেরই তিনি জনক, যাদের লালন-পালন করে সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছে দেবার সৌভাগ্য তিনি পান নি। কিন্তু তাঁর প্রতিভার প্রবণতা ছিল নাটকের দিকে। অনভ্যস্ত আড়ষ্ট গদ্যে সেই নাটকীয় প্রতিভা মুক্তি পায় নি, মুক্তি পেয়েছে বাংলা কাব্যনাট্যের যোগ্য বাহন মধুসূদনেরই আবিষ্কৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কাব্যের মধ্যে মধুসূদনের নাটকীয় প্রতিভা শুধু যে ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়েছে তা নয়,—এই ছন্দের বিশিষ্ট চরিত্রই নাটকীয় এবং পূর্ণাঙ্গ কাব্যনাট্যের মধ্যেই তার পূর্ণতম বিকাশ সম্ভব। ইয়েটস্ এক জায়গায় বলেছেন, নাটকের চর্চায় তিনি পৌরুষের ও সুস্পষ্ট রেখার সন্ধানী। এই নাটকীয় পৌরুষের সাধনা মধুসূদনের ছিল, কিন্তু পরিপূর্ণ কাব্যনাট্য রচনার অবকাশ অদক্ষিণা প্রতিভা তাঁকে দিলো না।

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের প্রতিভার কোন উত্তরাধিকারী নেই। তার কারণ এই নয় যে, মধুসূদন বাংলা জানতেন না বা বাংলা ভাষার চরিত্র বুঝতেন না। যাঁরা গীতিকবি, তাঁদের সমালোচনা, তাঁদের কাব্যপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র বলে মধুসূদনের প্রতিভার প্রতি সুবিচার করতে পারেন নি। মধুসূদনের উত্তরাধিকারী নেই, তার কারণ মধুসূদন কাব্যের মধ্যে নাট্যকল্পনার যে বিকাশ ঘটিয়েছেন পরবর্তীকালের কবিদের মধ্যে প্রায় কারো সেই নাট্যপ্রতিভা ছিল না। মধুসূদনের সত্যিকার উত্তরাধিকারী হতে গেলে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যনাট্য রচনা করতে হত। যে ইঙ্গিত তিনি রচনাবলীর মধ্যে রেখে গেছেন, পরিণতি দিতে পারেন নি, তার সার্থক পরিণাম দেবার দায়িত্ব হত সেই উত্তরাধিকারীর। কিন্তু মধুসূদনের পর অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা করলেন হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র। কিন্তু এই অক্ষম উত্তরাধিকারীদ্বয় দুর্ভাগ্যবশত কবি ছিলেন না—তাঁরা আবিষ্কার করতে পারলেন না অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরবর্তী পরিণতির পথ। তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা পিছিয়ে গেল তিলোত্তমাসম্ভবের যুগে, অপকৃষ্ট রচনার প্রশ্ন না তোলাই ভালো। বর্ণনামূলক কাব্য রচনা দিয়ে যে অমিত্রাক্ষরের জন্ম, মেঘনাদবধ-বীরাঙ্গনায় নাটকীয় আত্মপ্রকাশের কিশোর-শক্তি যে অর্জন করেছিল, সে পুনরায় শৈশবে ফিরে গেল। কাব্যনাট্যের মধ্য দিয়েই যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের মুক্তি, একথা বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তার প্রমাণ চিত্রাঙ্গদা

নাট্যকাব্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লিরিক প্রতিভা নাট্যকল্পনাকে কখনও সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতে পারে নি। তাই অসামান্য লিরিক-প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথ এই নাট্য-ছন্দটির চর্চা করলেন না। অমিত্রাক্ষর ছন্দে যে মহৎ কাব্যনাট্য রচনার জন্য মধুসূদন নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের হাতে সেটি রচিত হতে পারতো, কেননা তিনি সেই সম্ভাবনার কথা উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রতিভার চরিত্র নাটকীয় না হওয়ায় সেই কাব্যনাট্য আজও অ-রচিত রয়ে গল।

বাঙালী প্রতিভাই প্রধানত লিরিকধর্মী। নানা ধর্মসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আজ ধর্মনিরপেক্ষ লিরিকে তার প্রতিভার সে প্রবণতা প্রকাশ পাচ্ছে। মঙ্গলকাব্য—চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলির মধ্য দিয়ে বাঙালীর সাহিত্য প্রতিভার অপর যে অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রবণতাটি, তা সম্ভবত আধুনিক কালে উপন্যাসের নামে বড় গল্প ও ছোট গল্পে প্রকাশ পাচ্ছে। এবং আজো সেই দ্বিতীয় ধারা গীতি-কবিতার ধারার তুলনায় দুর্বলতর হয়ে আছে! শুধু নাটকের দিকে বাঙালীর সাহিত্য-প্রতিভার পরিণতি ঘটে নি। নাটক কিছু রচিত হলো কিন্তু প্রথম শ্রেণীর নাটক হলো না; কবিরা রঙ্গমঞ্চের সর্ত পূরণে কোনদিনই রাজী হলেন না বলে কাব্যনাট্য একেবারেই রচিত হলো না। নাট্যকারেরা সচরাচর নাটকই লিখে উঠতে পারলেন না, কোন এক গূঢ় কারণে নাট্যগুণান্বিত প্রতিভা বাঙালীর মধ্যে ভর করলো না। অপরপক্ষে কাব্যের সর্ত এবং রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকের দাবী,—এই দুইটি সমভাবে পূরণ করতে পারেন, মধুসূদনের মত তেমন সম্ভাবনাযুক্ত কবি আবির্ভূত হলেন না। মধুসূদনের তাই উত্তরাধিকারী কেউ নেই। রবীন্দ্রনাথ নাটক রচনা করলেন, রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করালেন, কিন্তু তিনি দুই সর্তকে সমান মর্যাদা দিলেন না; তাঁর কাব্যনাট্যে নাটকের সর্ত কাব্যের সর্তের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তাই বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের বংশ লোপ ঘটেছে। ভবিষ্যতে যদি কোন কবি নাটকের সম্পূর্ণ সর্ত এবং কাব্যের সমস্ত দাবী পূরণ করার সামর্থ্য নিয়ে কাব্যনাট্য রচনা করেন তবেই বোঝা যাবে মধুসূদনের বীজ ব্যর্থ হয় নি, সে শতবর্ষকাল আপাত-বন্ধ্যভূমিতে অংকুরোদ্গমের অপেক্ষায় ছিল।*

* বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মধুসূদন ও উত্তরকাল' থেকে লেখকের অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।
—সম্পাদক।

জননীর কোলে শিশু

শিশিরকুমার দাশ

অসংখ্য দৃশ্য, অপরিচিত ঘটনা, বহুব্যাপ্ত অভিজ্ঞতার প্রবাহ থেকে শেষ পর্যন্ত স্মরণীয় হয়ে থাকে কয়েকটি, কবির চিরসঙ্গী হয়ে ওঠে এই রকম কয়েকটি ছবি, কয়েকটি মুহূর্ত, কয়েকটি অভিজ্ঞতা। কবির রচনায় তারা বারবার নানা রূপে ফিরে আসে। এলিঅট বলেছিলেন যে, কবির বাক্‌প্রতিমার আংশিক উৎস তাঁর পড়াশুনো, তাঁর অধ্যয়ন ; কিন্তু তাঁর মূল উৎস তাঁর নিজের জীবন, নিজের অনুভূতি। শুধু কবি কেন, যে কোন অনুভূতিশীল মানুষই লক্ষ্য করেছেন যে, তাঁদের মনে কয়েকটি ছবি, কয়েকটি প্রতিমা বারবার ফিরে আসে 'একটি পাখির গান, হঠাৎ একটি মাছের লাফ, একটি কোন বিশেষ কালে বিশেষ স্থানে, একটি ফুলের সৌরভ, জার্মানীর পাহাড়ী পথে একটি বৃদ্ধা, কিংবা ছোট ফরাসী রেলজংশনে তাস খেলায় মত্ত দুটি গুণ্ডাকে রাত্রে ট্রেন থেকে দেখা...এই সব স্মৃতির একটা প্রতীকী মূল্য আছে। কিন্তু কিসের প্রতীক তা আমরা জানিনা, তারা অনুভূতির দুর্মেয় গভীরতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" তারা জীবনের গভীর মুহূর্তের অভিজ্ঞান।

মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য পড়তে পড়তে চোখে পড়ে এই রকম একটি প্রতিমার, এইরকম একটি স্থায়ী অভিজ্ঞতার বারবার আনাগোনা। সেই প্রতিমার উৎস আমাদের অতি পরিচিত, জন্মের প্রথম মুহূর্ত থেকে সঞ্চিত, শৈশবের স্নিগ্ধতায় লালিত। বয়সের ক্রমপ্রসরমান দূরত্ব সেই অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ উপভোগ থেকে আমাদের বঞ্চিত করে, কিন্তু সম্ভবত আমাদের স্মৃতির পরিধি-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রমশই ধূসরাভ হয়ে যায় না, স্মৃতি তাকে সযত্নে রক্ষা করতে চায়, সত্তার মধ্যে তা ধীরে ধীরে ভাবমূর্তিতে পরিণতি পায়। সেই অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত রূপ, মাইকেলের ভাষায়, 'জননীর কোলে শিশু।' এটি এমন একটি দৃশ্য, এমন একটি অভিজ্ঞতা যা শুধু আকাশ বাতাস আলো জলের মতই সহজ, প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্টই নয়, মানুষের চেতনা ও অনুভূতির ইতিহাসে প্রকৃতির মতই আদিম ও চিরন্তন। মাতৃস্নেহের বন্দনায় মানুষের কণ্ঠ কোনদিনই ক্লান্ত হয়নি। তার কারণ শুধুমাত্র মানবসন্তানের কৃতজ্ঞতাবোধই নয়, তার মধ্য দিয়ে সে চিরন্তন প্রকৃতিকে, জন্মের উৎসলোককে সে বন্দনা করেছে, জন্মের মহিমাকে স্বীকার করেছে জননীকে মহিমান্বিত করে। জননী ও শিশুর যুগল রূপের মূর্তিতে প্রাথমিক আকর্ষণ তার আদিমতা,

যে আদিমতায় মিশে আছে সংস্কারাতীত সারল্য। কিন্তু তার ব্যঞ্জনা প্রায় সীমাহীন—সুখের আশ্রয়, নির্ভর নিরাপত্তা, তর্কাতীত বিশ্বাস ও নির্ভরতা, পাপহীন পুণ্যহীন ভালোবাসা, আরম্ভ ও অবসান, বোধন ও বিজয়ার দ্বন্দ্বহীন অবস্থিতি। লৌকিক অভিজ্ঞতার থেকে আধ্যাত্মিক অনুভূতির জগতে একই মূর্তি বারবার দেখা দিয়েছে। বৈষ্ণবের গান থেকে খ্রীস্টানের ম্যাডোনার মূর্তিতে; মাতৃদেবী থেকে দেশমাতায়, স্নেহাতুর, ভীতকম্পিত অসহায় দরিদ্রা মা থেকে তেজস্বিনী বিদ্রোহী নায়িকা মাতায়, যেমন গর্কির উপন্যাসে, আবার অশ্রুআঁখি, দুঃখাতুরা জননী পরিণত হয় মর্ত্যভূমিতে, বসুন্ধরায়; যে আদি জননীর—

> সকলি রহস্যপূর্ণ নেত্র অনিমেষ
> বিস্ময়ের শেষতল খুঁজে নাহি পায়
> এখনো তোমার বুকে আছি শিশুপ্রায়
> মুখপানে চেয়ে।

এই আদিম অভিজ্ঞতা ও প্রাথমিক স্মৃতিটি নানাভাবে, নানারূপে মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। জননী ও সন্তানের সম্পর্ক চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যেও একাধিকবার দেখা দিয়েছে, কখনও স্বল্পোচ্চারিত অনুদাত্ত স্বগতোক্তির মতো, যেমন সরস্বতীতে; কখনও তির্যকভাবে, যেমন বিজয়াদশমীতে, আবার কখনও আরো ঋজু, প্রত্যক্ষ, বেদনার তীব্রতায়, যেমন সমাপ্তে। কিন্তু সনেটে গঠনের মধ্যে কবির ব্যক্তিপুরুষের সঙ্গে জগতের সম্পর্কের প্রকাশ স্বভাবতই নির্বাধ ও ক্ষিপ্র; আত্মকথনের উত্তাপ ও নিবিড়তায় যে কবিতার সিদ্ধি, সেই কবিতায় একটি ভাব, একটি অনুভূতির বারংবার আবির্ভাব তাৎপর্যময় সন্দেহ নেই,—কিন্তু মহাকাব্যের কাহিনীর ঘটনাবিন্যাসে, চরিত্রের বিচিত্র বিকাশে, বিভিন্ন নরনারীর, প্রকৃতি-মানুষের সম্পর্ক রচনায় কবি যেখানে সচেষ্ট, আত্মকথনের পরিসর সেখানে সীমাবদ্ধ এবং অপ্রয়োজনীয়; অতিকায়, অপরিমিত বিশাল ব্যাপ্ত স্থান কাল যেখানে কাব্যকে ঘিরে রেখেছে, বিশালতার বোধ সৃষ্টিতে যার সিদ্ধি, সেখানেও একটি অনুভূতির, একটি দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি কবির মনের একটি বিশেষ স্থায়ী এবং মূল্যবান স্মৃতিখণ্ডের দিকে পাঠককে আকৃষ্ট করে। আর সেই স্মৃতি যখন পাঠকের মনে সঞ্চিত অনুরূপ স্মৃতিটিকে উজ্জ্বলতর করে তোলে তখন কবি ও কবিতা-পাঠকের যোগ হয় সম্পূর্ণ। 'জননীর কোলে শিশু' সেই রকম একটি প্রতিমা, আপাতসহজ, সরল; প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় বিবর্ণ, কিন্তু শান্তশ্রী পৃথিবীর ক্ষণিক কম্পনের মত তার অন্তঃশায়ী বিপুল শক্তি হঠাৎ বিকীর্ণ হয়ে ওঠে শতমুখে; সামান্য প্রতিমা প্রাত্যাহিকতার সীমা ছাড়িয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যায় মানুষের যুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতার বিশাল আকাশে।

কিন্তু কবির মূল্যবান অভিজ্ঞতার রূপ-চিত্রটির সঙ্গে মানুষের ইতিহাসের কোন

তাৎপর্যময় অভিজ্ঞতার মিলনই কবিতার সিদ্ধি নয়; ব্যক্তিগত অনুভূতির সঙ্গে মানুষের সামগ্রিক অনুভূতির কাব্যের কোন স্তরের ঐক্যস্থাপনই কবিতার লক্ষ্য নয়; কবির বিশিষ্ট অনুভূতিটি সামগ্রিকতার পক্ষে কতটা অপরিহার্য, কাব্যের সামগ্রিক পরিকল্পনার মধ্য থেকেই তার উদয় কতটা অনায়াস, তার অস্তিত্ব কাব্যলোকের কোন গভীরতায় এ কথা যদি জানা যায়, তবে কাব্যের সামগ্রিকতার সঙ্গে সেই অনুভূতির বিশিষ্টতাকে মিলিয়ে দেখতে পারি। নিতান্ত সত্য ও মহৎ কথার পুনরাবৃত্তিতে কাব্য মহত্ব পায় না; সত্যের উপলব্ধি যখন রূপ হয়ে ধরা দেয় তখন তাকে কাব্য বলে চিনি।

দুই

মেঘনাদবধ কাব্যের জগৎ অন্ধকার। এক মৃত্যুতে যার আরম্ভ আর এক মৃত্যুতে তার অবসান। এক গোধূলি থেকে আর এক গোধূলি পর্যন্ত কাব্যের বিস্তার—মধ্যবর্তী সমস্ত কালই মৃত্যুর নেপথ্যভূমি। প্রথম সর্গের সমাপ্তি দিনের শেষে। তারপর চারিটি সর্গকে গেঁথে রেখেছে একটি রাত্রি। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সর্গ নিশিভোরের কাহিনী। মেঘনাদের মৃত্যুর পর সপ্তম সর্গ আবার শুরু হয়েছে একটি প্রভাতের আরম্ভে—'উদিলা আদিত্য এবে উদয় অচলে'। সপ্তম সর্গে লক্ষ্মণের মৃত্যুর পর আবার নেমে এসেছে অন্ধকার। অষ্টম সর্গের আরম্ভ অন্ধকার—'শত শত অগ্নিরাশি জ্বলিল চৌদিকে রণক্ষেত্রে।' সেই অন্ধকারে কাহিনীর স্থান ব্যাপ্ত হয়েছে মর্ত্যলোক থেকে প্রেতপুরীতে। লক্ষ্মণের প্রাণ ফিরে আসার পর শুরু হয়েছে নবম সর্গ, শেষ সর্গ। আবার এক দিনের আরম্ভ। আর সেই সর্গের শেষ—সমস্ত অবসানের পর আবার নেমে এসেছে অন্ধকার, বিসর্জনের শূন্যতা। কাব্যের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি প্রধান সুর, অবিচ্ছিন্ন, একমুখী, ক্ষিপ্রগতি। সেই সুর বিসর্জনের, অবসানের, অপচয়ের। এর মধ্যে আর যা কিছু আছে, যা কিছু ঘটনা, যা কিছু বর্ণনা, সবই হয় সেই অবসানকে ত্বরান্বিত করেছে, কিংবা প্রলম্বিত করেছে; হয় সেই অবসানের প্রস্তুতি, নয় সেই অবসানের অনিবার্যতাকে ক্ষণিক বিরত করেছে শুধু সেই অবসানের বেদনাকে আরো বিস্তারিত, আরো বিশাল করে দেবার জন্য। মা ও সন্তানের ছবিগুলি, কিংবা মা ও সন্তানের প্রসঙ্গ কখনও এই সর্বাতিশায়ী অপচয়ের বেদনাকেই আরো তীব্র করে তুলেছে, কখনো বা অবসান ও পরাজয়ের পটভূমিকায় মানুষের ইতিহাসের সেই আদিম ও চিরন্তন অভিজ্ঞতাটি দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

জননী ও শিশু এই যৌথমূর্তির পশ্চাদ্‌পটে এক বিশ্বজননী ও চিরন্তন শিশুর ছায়া—সেই ছায়ায় লীন হয়ে আছে শুধু মানব জগৎ নয়, সমস্ত প্রাণীজগৎ। সমস্ত

প্রাণের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তার পশ্চাদ্ধাবন করেছে মৃত্যু। এই মৃত্যু থেকে প্রাণকে রক্ষা করেছে জননী। সে জননী কখনও মানবী, কখনও হিংস্র বাঘিনী, কখনও পক্ষীমাতা, এবং শেষ পর্যন্ত মাটি, পৃথিবী। কল্পনার যে আদিমতা আমরা লক্ষ্য করি মহাকাব্যে, এবং মধুসূদন মহাকাব্যের প্রাণ সৃষ্টির জন্য যে কল্পনার শরণাপন্ন হয়েছিলেন, সেই কল্পনাকেই তাঁর জননী ও শিশুপ্রতিমার মধ্যে আংশিকভাবে প্রতিফলিত হতে দেখি। কাব্যের মধ্যে জননী ও শিশুর প্রথম উল্লেখ দেখি সুবিস্তীর্ণ রণক্ষেত্রে শত শত বীরের শবদেহ যেখানে লুণ্ঠিত, সেইখানে নিহত বীরবাহুর প্রসঙ্গে।* তার সঙ্গে তুলনা করেছেন মাইকেল ঘটোৎকচের ঃ

হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়
ঘটোৎকচ।

জননী ও শিশুপ্রতিমা কাব্যে প্রথম ধরা দিল আরেকটি মহাকাব্যের কাহিনী-সূত্র ধরে আর পক্ষীমাতার নীড়ে পালিত পক্ষীশিশুর রূপে। বীরবাহুর জননী চিত্রাঙ্গদা তারপর যখন কাব্যে প্রবেশ করলেন এই পক্ষীমাতা ও পক্ষীশিশুর প্রতিমাই আবার ফিরে এল ঃ

বীরবাহু শোকে
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা
যবে গ্রাসে কালফণী কুলায়ে পশিয়া
শাবকে। (১।২৩১-৩৪)

মেঘনাদবধকাব্যের প্রত্যেকটি মৃত্যুর পেছনে একটি করে জননীর শোকাকুলা মূর্তি, প্রত্যেকটি বেদনা বা বিপর্যয়ের মুহূর্তে মা ও সন্তানের প্রসঙ্গ। বীরবাহুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীতে সেই প্রসঙ্গের আবির্ভাব। রাজমহিষী চিত্রাঙ্গদা সভায় এসে দাঁড়ালেন শিশুহারা বিহঙ্গিনীর মত। রাবণকে যখন তিনি ভর্ৎসনা করেছেন, সন্তানের শোকে ব্যাকুল হয়ে বিলাপ করেছেন তখনও সেই পক্ষীমাতা ও পক্ষীশাবকের ছবিটিই আবার ফিরে এসেছে ঃ

* এর আগে অবশ্যই জননী ও সন্তান প্রসঙ্গে এসেছে মেঘনাদবধ কাব্যের "অমৃতভাষিণী' দেবীর উদ্বোধনের ক্ষেত্রে ঃ

কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক। (১।২৪-২৬)

কিন্তু কাব্যের মূল কাহিনী অংশে এটি বিচ্ছিন্ন বলে একে পৃথক করে রাখলাম। যদিও যে জননী ও সন্তান প্রসঙ্গ মেঘনাদবধ কাব্যে বার বার ফিরে এসেছে সেই প্রসঙ্গের সঙ্গে কবির বিশেষ মানসিক যোগের প্রমাণ হিসাবে এই অংশের মূল্য কম নয়, যেমন কম নয় চতুর্দশপদী কবিতাবলীর কয়েকটি বিশেষ কবিতা —সরস্বতী, বিজয়াদশমী কিংবা সমাপ্তে। এই জননী ও সন্তান প্রসঙ্গ, স্বভাবতই কবির ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতাজাত। অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী (বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৩৪-৫১) এ সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করেছেন।

দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষা হেতু তব কাছে, রক্ষঃ কুল-মণি
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখী। (১৷৩৪৮—৫১)

একই ছবি আবার দেখেছি মেঘনাদের মৃত্যুর পরে। রাবণের রাজসভায় এবার চিত্রাঙ্গদার পরিবর্তে এসেছেন মন্দোদরী:

হেনকালে সভাস্থলে উতরিলা রাণী
মন্দোদরী, শিশু শূন্য নীড় হেরি যথা
আকুলা কপোতী, হায়। (৭৷৩৩৪—৩৬)

আগেই বলেছি জননী ও সন্তানের প্রসঙ্গ শুধু মানবের Context-এই সীমাবদ্ধ নয়, এই প্রসংগ বিশ্বব্যাপী প্রাণী-জগতের Context-এর সংগে যুক্ত। তাই মানবমাতা পক্ষীমাতার প্রতিমার মধ্য দিয়ে বারবার ধরা পড়েছে। ঠিক সেই রকম কখনও পক্ষীমাতার প্রতিমার পরিবর্তে দেখা গেছে জীবজগৎ থেকে অন্য প্রতিমার আবির্ভাব। ধূর্জটির ধ্যানভংগের পর কামদেবতার ভয়াকুলতা ও পার্বতীর কাছে আশ্রয়ভিক্ষার প্রসংগটি লক্ষ করা যাক:

ভয়াকুল ফুলধনুঃ পশিলা অমনি
ভবানীর বক্ষঃস্থলে, পশয়ে যেমতি
কেশরী-কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী, কোলে। (২৷৩৯৩-৯৫)

পক্ষীমাতা-পক্ষীশাবকের প্রতিমার স্থান গ্রহণ করেছে এবার কেশরিণীর কোলে কেশরী-কিশোর—'জননীর কোলে শিশু'। এই প্রতিমাটি ভিন্নরূপে, আরো গতিশীল, আরো প্রাণময়, আরো উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে পরে। লক্ষ্মণ মেঘনাদকে হত্যা করে দ্রুতপদে ফিরে যাচ্ছেন:

বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে
শার্দুলী অবর্তমানে, নাশি শিশু যথা
নিষাদ পবনবেগে ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে
প্রাণ লয়ে, পাছে ভীমা আক্রমে সহসা
হেরি গতজীব শিশু, বিবশা বিষাদে। (৬৷৭০৪-৭০৮)

হিংস্রতা ও কাপুরুষতার পটভূমিকায় সন্তানহারা বাঘিনীর আকস্মিক আক্রমণের আশংকায় কম্পিত আশ্চর্য চিত্রপট। সন্তানের প্রতিবিধিৎসু 'ভীমা' জননী। অন্যায় যুদ্ধে নিহত 'গতজীব শিশু'র দেহের পাশে দাঁড়িয়ে জননী, যার এক চোখে বেদনার কালো মেঘ, অন্য চোখে প্রতিহিংসার বিদ্যুৎ-রেখা। জননী ও সন্তানের চিরন্তন এই সম্পর্কের—যে সম্পর্ক আশ্রয় দানের, যে সম্পর্ক নির্ভরতার, লালনের ও পালনের সেই সম্পর্কের বিনষ্টির বীভৎসতাও একবার কাব্যের মধ্যে দেখা দিয়েছে। মন্দোদরী বিভীষণ সম্বন্ধে ক্রোধে ও ক্ষোভে বলেছেন:

মত্ত লোভ-মদে
স্ববন্ধু-বান্ধবে মূঢ় নাশে অনায়াসে
ক্ষুধায় কাতর ব্যাঘ্র গ্রাসয়ে যেমতি
স্ব-শিশু ! (৫।৪৭২—৭৫)

তখনও মেঘনাদের মৃত্যু হয়নি। মন্দোদরী তখন বিভীষণকে তুলনা করেছেন কালসর্পের সঙ্গে। কালসর্পের সঙ্গে পাখীর নীড়ের association এই কাব্যের পাঠকের কাছে অপ্রতিরোধ্য। বিভীষণের সঙ্গে তারপরেই আপন সন্তান হত্যাকারী ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের তুলনা করেছেন। বিভীষণ যেন জননী ও শিশুর চিরন্তন সম্পর্কের এক প্রতীকী শত্রু।

তিন

মেঘনাদবধ কাব্যের জননী ও সন্তানের প্রতিমাটির সঙ্গে জননী ও সন্তানের অন্যান্য প্রসঙ্গগুলি এবার যুক্ত করে দেখা যেতে পারে। আগেই বলেছি, মেঘনাদবধ কাব্যে যেখানেই অবসানের কথা, অপচয়ের কথা, আসন্ন, কিংবা বিপর্যয়ের পথ অবধারিত, তখনই জননী ও সন্তানের কথা এসেছে। জননী ও সন্তানের প্রতিমাটির মত এই প্রসঙ্গটিও এত পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হয়েছে যে, কাব্যে এর আবির্ভাব আকস্মিক নয়। কল্পনার যে অখণ্ডতায় কাব্যদেহ অখণ্ড রূপ পায়, কাব্য-পরিকল্পনা যে অখণ্ডতা ও সম্পূর্ণতা লাভ করে, এই প্রসঙ্গ সেই অখণ্ডতার অংশ মাত্র। চতুর্থ সর্গে জটায়ু ও রাবণের যুদ্ধের সময় সীতার উক্তি স্মরণ করা যাক ঃ

আরাধিনু বসুধারে—'এ বিজন দেশে,
মা আমার, হয়ে দ্বিধা, তব বক্ষঃস্থলে
লহ অভাগীরে, সাধ্বী ! কেমনে সহিছ
দুঃখিনী মেয়ের জ্বালা ? (৪।৪৪০-৪৩)

মা ও সন্তানের দু-ধরনের প্রসঙ্গ মেঘনাদবধ কাব্যে আছে। এক ক্ষেত্রে মা ও সন্তান একসঙ্গে কাব্যে উপস্থিত, যেমন মন্দোদরী ও মেঘনাদের ক্ষেত্রে। আর এক ক্ষেত্রে মা অনুপস্থিত, তাঁর উপস্থিতি স্মৃতিতে, তাঁর উপস্থিতি সশরীরে নয়। উদ্ধৃত অংশের জননী ও সন্তান প্রসঙ্গ দ্বিতীয় ধরনের। যে মা চোখের সামনে নেই, যাঁর অধিষ্ঠান নয়নের মাঝখানে, চিত্তের গভীরমূলে, দুঃখের তীব্রতায়, আশ্রয়হীনতার ভয়াবহ অনুভূতির মুহূর্তে, চিত্তের সেই গভীর মূল থেকে, স্মৃতির অন্ধকার থেকে যিনি উঠে আসেন আশ্রয়ের প্রতীক রূপে, দুঃখ অবসানের আশা রূপে—সেই মা-কে স্মরণ করেছেন সীতা। শিশুর চোখে তিনি লৌকিক জননী, ধর্মবিশ্বাসীর কাছে তিনি মাতৃরূপিনী দেবী, আর ধর্মবিশ্বাস-নিরপেক্ষ

মানবের কাছে তিনি আশ্রয় ও বিশ্বাসের প্রতীক। মেঘনাদবধ কাব্য আধ্যাত্মিক কাব্য নয়, লৌকিক কাব্য। তাই মাতৃপ্রসঙ্গ এখানে লৌকিক জননী ও শিশুর আধারে আশ্রয় ও বিশ্বাসের প্রসঙ্গ। যে কাব্যের জগৎ অন্ধকার, রণসঙ্কুল, যে স্বর্ণলংকার ঘরে ঘরে মৃত্যুর ছায়া, যে স্বর্ণলংকার বাইরে সমুদ্র-উপকূল পর্যন্ত রক্তাক্ত, জীবন যেখানে প্রতি মুহূর্তে বিপন্ন, অতর্কিত মৃত্যু যেখানে নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করছে, সেই কাব্যে জননী ও সন্তানের প্রসঙ্গ বারবার ফিরে আসছে কবির চিত্তের কোন্ গাঢ় অভিপ্রায়ে ?

পঞ্চম সর্গে লক্ষ্মণ স্বপ্নে জননীকে দেখলেন। মায়ার আদেশে স্বপ্নদেবী সুমিত্রার বেশে আবির্ভূতা হলেন। মায়া যে কথা বললেন তার জন্য সুমিত্রার বেশ ধারণের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু মধুসূদনের কাব্য-পরিকল্পনায় তার প্রয়োজন ছিল। লক্ষ্মণের উক্তি ঃ

হে জননী…
…দাসের প্রতি কেন বাম এত
তুমি ? দেহ দেখা পুনঃ, পূজি পা দুখানি
পুরাই মনের সাধ লয়ে পদধূলি,
মা আমার। যবে আমি বিদায় হইনু
কত যে কাঁদিলে তুমি, স্মরিলে বিদরে
হৃদয়। (৫।১৪১-৪৭)

লক্ষ্মণকে বিদায় দিতে গিয়ে তার মৃত্যু আশংকায় রাম স্মরণ করেছেন 'সুমিত্রা-মাতা'কে (৬।১৩৮-১৪১)। আর তার মৃত্যুর পরে আবার মনে পড়েছে ঃ

তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূ তীরে। (৮।৫৩-৫৪)

সুমিত্রা কাব্যে অনুপস্থিত। মন্দোদরী উপস্থিত। মৃত্যুর পূর্বে মন্দোদরী মেঘনাদকে বিদায় দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

কেমনে বিদায় তোরে করি রে বাছনি।
আঁধারি হৃদয়াকাশ, তুই, পূর্ণশশী
আমার। (৫।৪৬৮-৭০)

অবসানের যে বিশাল অন্ধকার শুধু মন্দোদরী নয়, সমগ্র কাব্যের আকাশে ঘনিয়ে আসছে সেই অন্ধকারের সূচনার মুখে জননীর অশ্রুভারনত চোখের দিকে তাকিয়ে কবি স্বয়ং মন্তব্য করেছেন ঃ

হায়রে মায়ের প্রাণ, প্রেমাগার ভবে
তুই, ফুলকুল যথা সৌরভ-আগার,
ভক্তি মুকুতার ধাম, মণিময় খনি। (৬।৪৫০-৫২)

কাব্যের শেষে আর একবার এসেছে মা ও সন্তানের কথা। এবার প্রমীলার মুখে।

চিতারোহণের আগে প্রমীলা তাঁর সহচরীকে বলছেন :

> "কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
> বাসন্তি ! মায়েরে মোর"—হায়রে বহিল
> সহসা নয়ন জল ! নীরবিলা সতী
> কাঁদিল দানববালা হাহাকার রবে ! (৯।৩৫২-৫৫)

মৃত্যুর আগে, সমস্ত সমাপ্তির আগে মাতৃপ্রসঙ্গের স্মরণ মাত্রেই প্রমীলার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এসেছে। এর পরের কথা নয়নের জলে উচ্ছলিত, হাহাকার-মর্মরিত। মধুসূদনের প্রমীলা এর পরেও বাক্য সমাপ্ত করেছেন, কিন্তু কথা অসমাপ্ত থেকে গেছে।

চার

এই প্রসঙ্গের অনুসরণে এরই সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি চিত্রের কথা উল্লেখ করব, তবেই জননী ও শিশু প্রতিমাটির পরিমণ্ডল সম্পূর্ণতা পাবে। এই চিত্রগুলিও জননী ও শিশুকেন্দ্রিক, এবং এরাও কাব্যে বারবার ব্যবহৃত। দ্বিতীয় সর্গের আরম্ভে সন্ধ্যার বর্ণনা। নিদ্রাচ্ছন্না পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে কবির মনে এসেছে অতি পরিচিত ছবি :

> ক্লান্ত শিশুকুল
> জননীর ক্রোড়নীড়ে লভয়ে যেমতি
> বিরাম। (২।১০-১২)

আবার পার্বতীর মোহিনীমূর্তি ধারণের পূর্বে যখন স্বর্গীয় সুরে পৃথিবী মোহিত, তখন :

> স্বপনে শুনিয়া শিশু সে মধুরধ্বনি
> হাসিল মায়ের কোলে, মুদিত নয়ন (২।২৫৮-৫৯)

আবার এরই বিপরীত রূপ যখন প্রমীলার সখীদল 'আগ্নেয় তরঙ্গ'-এর মত চলেছেন লংকা প্রবেশ করতে :

> জননীর কোলে শিশু জাগিল চমকি (৩।৫১৭)

ষষ্ঠ সর্গে দেখি স্নেহময়ী জননী ও শিশুকে :

> জননী যেমতি
> খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে
> করপদ্ম সঞ্চালনে (৬।৬০৮-১০)

তারপরই আবার :

> মাতৃকোলে নিশায় কাঁদিল
> শিশুকুল আর্তনাদে (৬।৬৩৮-৩৯)

কিংবা

কোলে করি শিশুকুলে কাঁদিছে জননী
ভয়াকুলা (৭।৪৫৫-৫৬)

জননী ও শিশুর দুই ছবি। কত শিল্পীর হাতে এই দুই ছবিরই রূপ দেখেছি —দেখেছি আনন্দময় শিশু কোলে সুখ পরিতৃপ্ত জননীকে, রাফায়েল-এর 'সিস্তিন মাদোনা'-য়, কিংবা লেওনার্দো দা ভিঞ্চির 'কুমারী ও শিশুতে' ; আবার চিরনিদ্রিত পুত্রকে কোলে নিয়ে উদাস অসহায়া বেদনা-করুণ জননীকে দেখেছি মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর 'পিএতা'য়। মাত্র একবারই বাংলা কাব্যে এই দুই ছবি একত্রিত হয়েছে, সেই কাব্য মেঘনাদবধ। এই কাব্যের যুদ্ধ ও শান্তি, ন্যায় ও অন্যায়, দুর্বল ও দুর্জয়কে আচ্ছন্ন করে আছে একটি আদিম ও সনাতন : নিরাভরণ ও অসীম ব্যঞ্জনাময় প্রতিমা, জননীর কোলে শিশু।*

"I have a brave heart and mean to fight my battles bravely. I would sooner reform the poetry of my country than wear the imperial diadem of all the Russians."

—২৪ শে এপ্রিল, ১৮৬০ তারিখে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মধুসূদনের পত্রাংশ।

* মধুসূদন জন্ম-সার্ধশত ও মৃত্যু শতবার্ষিকী সংখ্যা বৈশাখ, ১৩৮০, 'চতুষ্কোণ' থেকে লেখকের অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত—সম্পাদক।

বিশ্রি-বন্দী রাবণ

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

মাইকেল মধুসূদন যখন মেঘনাদবধকাব্যের প্রথম সর্গটি লিখে ফেলেছেন তখন বন্ধু রাজনারায়ণকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে তাঁর খুবই ইচ্ছে হয়, গ্রীক পুরাণের অসাধারণ সৌন্দর্যময় অংশগুলিকে আমাদেরই পৌরাণিক কাহিনীর জগতে নিয়ে এসে দৃঢ় ও গভীরভাবে রোপণ করেন। আপাতত, মেঘনাদবধকাব্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁর উদ্ভাবনী শক্তিকে নিজের খুশিমতো প্রয়োগ করতে তাঁর খুবই ইচ্ছে জাগছে, এবং বাল্মীকির কাছ থেকে যথাসম্ভব কম ঋণ করাই তাঁর পক্ষে ভালো বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তার পরেই বন্ধুকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এই বলে যে, এতে চমকে যাবার মতো কিছু নেই। মহাকাব্যের অহিন্দু চরিত্র নিয়ে অভিযোগ করতে হবে না বন্ধুকে। কারণ গ্রীক কাহিনী থেকে সরাসরি ধার করবেন না তিনি, তবে চেষ্টা করবেন, একজন গ্রীক যেমন করে লিখতেন সেইভাবে লিখতে।

একথা ঠিকই যে, বেশ কিছু গ্রীক দেব-দেবী থেকে শুরু করে গ্রীক সাহিত্যের অখণ্ড সৌন্দর্যদৃষ্টি, পূর্ব সংস্কার-মুক্তি, মানবিক রসবোধ, ভারসাম্যময় ঋজুদৃষ্টি, এমনকি, কিছু গ্রীক বীরত্ব পদ্ধতি ও সামাজিক সংস্কারকে পর্যন্ত মাইকেল মেঘনাদবধকাব্যের কাহিনীর হিন্দুসংস্কারের সঙ্গে চমৎকারভাবে মিশিয়ে নিতে পেরেছেন। এই মিশ্রণের সূত্রে তিনি ভাষারীতি, শব্দ ও শব্দবিন্যাস, ছন্দ, অলংকার এবং বিষয়বস্তুকেও কতখানি যত্নের সঙ্গে দেশীয় করতে চেয়েছেন তার প্রমাণ তাঁর চিঠিপত্রে যথেষ্ট আছে।

কিন্তু উনিশ শতকের দুটি সংস্কৃতির সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে মানবিক বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে রামায়ণ কাহিনীর আভ্যন্তরীণ মূল্যবোধের যে পরিবর্তন মাইকেল ঘটাতে চেয়েছিলেন তার মূল কথাটি হলো, রাম এবং তাঁর বানরসৈন্যবাহিনীকে গৌণ ক'রে রাবণের মাহাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া, যেহেতু রাবণের চরিত্র তাঁর মনকে উন্নত করেছে। এই নতুন মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতেই মেঘনাদবধের রাম ও রাবণ— এই দুটি পরস্পর-বিপরীত পক্ষকে মাইকেল নতুন ক'রে বিন্যাস করার চেষ্টা করেছেন।

এই বিন্যাসের ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতায় গ্রীক দৈবের অমোঘ নিয়মকে মেনে মাইকেল রাবণ ও মেঘনাদের আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিগত দক্ষতা দেখিয়েছেন গ্রীকদের হিরোয়িক কোড বা বীরত্ববিধি অনুযায়ী। অথচ আমাদের দেশীয় সংস্কারে ও

সমকালীন মানবিকবোধে সেই দৈববন্দী মানুষের অহংকারী বীরত্ব-প্রকাশ মোটেই বিসদৃশ বলে ঠেকে নি। অন্তত সমকালীন কোনো সমালোচক এই রাম-রাবণের নতুন বিন্যাসকে তেমন তীব্রভাবে ধিক্কার দেন নি।

কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলে মনে হয়, যে দৈবকে বিরূপ দেখে মেঘনাদবধকাব্যের রাবণ শত্রুপক্ষ বিনাশে উদ্যোগী হয়েছেন, তা পূর্বনির্দিষ্ট দৈব বা বিধি অথবা রাবণের নিজেরই কর্মফল এ ব্যাপারে কবির একটু দ্বিধা ছিল এবং সেই দ্বিধার ফলেই রাবণ-মেঘনাদের সর্বনাশের ব্যাপারে মূল কারণ ব্যাখ্যায় তিনি পূর্বাপর সঙ্গতি রাখেন নি। এই সঙ্গতি না থাকার ফলে বিধির কাছে রাবণ তাঁর পাপের মূল কারণ সূচক যে প্রশ্নগুলি সমগ্র কাব্যব্যাপী বারবার করে গেছেন তার নৈতিক ভিত্তি কতখানি সে সম্পর্কে সন্দেহ থেকেই যায়।

প্রথম সর্গে বীরবাহুর পতনের পর গভীরভাবে আহত রাবণ বিলাপ করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,/হরিলি এ ধন তুই?' আসন্ন বিপদের কথা ভেবে তিনি বলেছিলেন, 'বনের মাঝারে যথা শাখা দলে আগে/একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে/নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ এ দুরন্ত রিপু/তেমনি দুর্বল, দেখ, করিছে আমারে/নিরন্তর! হব আমি নির্মূল সমূলে/এর শরে!' এবং শাখাহীন-বৃক্ষ-রূপ রাবণ এবার 'কাঠুরিয়া'র শেষ মর্মান্তিক ঘা খাবেন এই আশংকাতেই বোধ হয় নিজের পাপের স্বীকারোক্তি করে বলেছিলেন, 'হায় সূর্পণখা,/কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,/কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা/এ ভুজঙ্গে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)/পাবকশিখারূপিনী জানকীরে আমি/আনিনু এ হৈম গেহে? হায়, ইচ্ছা করে,/ছাড়িয়া কনক লংকা, নিবিড় কাননে/পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!' এই উচ্চারণের মধ্যে রাবণের নিজকর্ম দোষের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি ছিল, সর্বনাশের কারণটিকে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলেছিলেন, এবং মনের জ্বালায় তিনি যে নৈতিক দিক থেকে ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বীরবাহুর মৃত্যুতে চিত্রাঙ্গদা যখন শোকে-অভিমানে বিলাপ করেছেন রাবণের কাছে এসে, তখন রাবণ কিন্তু নিজের পাপ কর্মের কথা একবারও উচ্চারণ করেন নি। কেবল বলেছেন, 'গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি?/হায় বিধি বশে, দেবি, সহি এ যাতনা/আমি!' শুধু এই কথা নয়, নিজের পাপকর্মের কথা অনুচ্চারিত রেখে পুত্র-পরাক্রমে যে বংশগৌরবই বেড়েছে চিত্রাঙ্গদাকে তা-ই বোঝাতে গেছেন। ফলে চিত্রাঙ্গদার মুখ থেকেই কঠিন কথাটি শুনতে হয়েছে রাবণকেঃ 'কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি/লংকাপুরে? হায় নাথ, নিজ কর্মফলে,/মজালে রাক্ষস-কুলে, মজিলা আপনি!'

কিন্তু প্রথম সর্গে রাবণ ওই একবারই নিজের পাপকর্মের কথা বলেছেন এবং

তার মর্মজ্বালায় জ্বলছেন বলে বনবাসী হতে চেয়েছেন। পরে মেঘনাদের সৎকার পর্যন্ত আর কখনোই তিনি নিজের কর্মদোষের কথা স্বীকার করেন নি। সপ্তম সর্গে মেঘনাদের মৃত্যুর পর যখন তিনি যুদ্ধে যাচ্ছেন তখন পুত্রশোকে কাতর মন্দোদরী এসে রাবণের চরণে পড়লে রাবণ বলেছেন: 'বাম এবে রক্ষঃ-কুলেন্দ্রানি,/আমা দোঁহা প্রতি বিধি! তবে যে বাঁচিছি/এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে/মৃত্যু তার!' রাক্ষসদের সামনেও বলেছেন, 'কিন্তু দেবনরে পরাভবি, কীর্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে/বৃথা! নিদারুণ বিধি, এতদিনে এবে/বামতম মোর প্রতি; তেঁই শুখাইল/জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে।' নবম সর্গে লক্ষ্মণ যখন নতুন প্রাণ পেলেন তখনও রাবণ বলেছিলেন, 'বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে?' এবং মেঘনাদের চিতার সামনে রাবণ যে-অন্তিম শোক প্রকাশ করেছেন তাতে বলেছেন, তাঁর আশা ছিল মেঘনাদের সামনেই তাঁর মৃত্যু হবে। মেঘনাদকে রাজ্যভার সমর্পণ ক'রে তিনি মহাযাত্রা করবেন।—'কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে/তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে!' চতুর্থ সর্গে সীতার স্বপ্নের মধ্যে রাবণের মুখেও বিধির বিরূপতার কথাই শোনা গেছে। এবং প্রমীলাকে মেঘনাদের চিতায় আরোহণ করতে দেখে একটু নতুন কথা বলেছেন তিনি। সে হলো 'পূর্বজন্মফল'—নিছক বিধি নয়, নিজ কর্মদোষও নয়। সুতরাং রাবণের উক্তি থেকেই আমরা মেঘনাদ-রাবণের সর্বনাশের তিন রকম কারণ পাচ্ছি: কখনো নিজকর্মদোষ, কখনো বিধি, কখনো পূর্বজন্মফল।

দুই

এখন মেঘনাদবধ কাব্যের অন্যান্য চরিত্র রাবণের সর্বনাশের কী ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা দেখা যাক। দ্বিতীয় সর্গে দেখি, ইন্দ্রদেব যখন শচীর সঙ্গে বসে আছেন তখন লক্ষ্মী এসে ইন্দ্রকে বললেন, রাবণের ভক্তিতে ও সেবাযত্নে তিনি বহুকাল স্বর্ণলংকায় অবস্থান করছেন কিন্তু 'হায়, এতদিনে/বাম তার প্রতি বিধি। নিজকর্ম-দোষে,/মজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে/না পারি ছাড়িতে, দেব! বন্দী যে, দেবেন্দ্র,/কারাগার-দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু/পারে সে বাহির হতে?' কাজেই লক্ষ্মীর দৃষ্টিতে রাবণের নিজকর্মদোষে বিধি বাম হয়েছে। অবশ্য রাবণের ওপর তার কর্মদোষের শাস্তি চাপাতে বিধিকে 'বাম' করবার জন্যে তিনিই নিজে এগিয়ে গেছেন প্রথম। ষষ্ঠ সর্গেও মায়াদেবীকে লক্ষ্মী রাবণের কর্মদোষের কথাই বলেছেন। ইন্দ্র গিয়ে উমাকে বলেছেন, 'পরম-অধর্মাচারী নিশাচর-পতি-/দেবদ্রোহী! আপনি, হে নগেন্দ্রনন্দিনি,/দেখ বিবেচনা করি। দরিদ্রের ধন/হরে যে দুর্মতি, তব কৃপা তার প্রতি/কভু কি উচিত মাতঃ?' এখানে ইন্দ্রকেও দেখছি রাবণের পাপকর্মকেই ধিক্কার দিয়ে উমাকে কৃপা করতে বারণ করছেন। ইন্দ্রপত্নী শচীও বলছেন, 'আপনি না

দিলে দণ্ড, কে দাঁড়িবে দেবি,/এ পাষণ্ড রক্ষোনাথে ?' শেষ পর্যন্ত সকলেরই সমবেত চেষ্টায় মহেশ্বর বললেন, 'পরমভকত মম নিকষানন্দন ;/কিন্তু নিজকর্মফলে মজে দুষ্টমতি।/বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,/মহেশ্বরি ! হায়, দেবি, দেবে কি মানবে ;/কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি !' কাজেই দেখতে পাচ্ছি, লক্ষ্মী থেকে শুরু করে ইন্দ্র শচী উমা ও মহেশ্বর পর্যন্ত সকলেই বিধি বা প্রাক্তনের অন্তর্গত হয়েও বলেছেন, বিধি বাম এবং প্রাক্তনের গতিরোধ করার সাধ্য কারো নেই, কারণ, রাবণ নিজের কর্মফলেই তার সর্বনাশ আনছেন ! যাই হোক, দেব-দেবী সকলেই কর্মফলের জন্যেই রুষ্ট হয়ে প্রাক্তনের অবধারিত গতিকে জানিয়ে দিচ্ছেন। অর্থাৎ দেব-দেবীর দৃষ্টিতে নিছক বিধি নয়, কর্মফলই বিরূপ বিধি হয়ে আসছে।

অন্যদিকে তৃতীয় সর্গে লক্ষ্মণ যখন মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধে যাচ্ছেন তখন জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রকে তিনি অভয় দিয়ে বলেছেন : 'অধর্ম কোথা কবে জয়লাভে ?/অধর্ম-আচারী এই রক্ষঃ-কুলপতি ,/তার পাপে হতবল হবে রণ-ভুমে/মেঘনাদ ; মরে পুত্র জনকের পাপে।' এবং বিভীষণও লক্ষ্মণের কথাই সমর্থন করে বলেছেন, 'নিজ পাপে মজে, হায়, রক্ষঃ-কুল পতি !' এখানেও রাবণের কর্মদোষ বা পাপকর্মকেই দায়ী করা হয়েছে। জটায়ুও চতুর্থ সর্গে (সীতার পূর্বস্মৃতি রোমন্থনের মধ্যে) মৃতুর সময় রাবণকে বলে গেছেন : 'কে তোরে রক্ষিবে, রক্ষঃ ? প'ড়্'ল সংকটে/লংকানাথ, করি চুরি এ নারী রতনে ?' ষষ্ঠ সর্গে বিভীষণ মেঘনাদকে আত্মপক্ষ সমর্থনে বলেছেন, 'পরদোষে কে চাহে মজিতে ?' এ-সমস্ত কথাই প্রমাণ করে রাবণ নিজকর্মদোষে তাঁর সর্বনাশকে ডেকে এনেছেন।

কিন্তু দেব-দেবী বা সাধারণভাবে মানব-মানবীর চোখে যদিও রাবণের সর্বনাশ রাবণই ডেকে এনেছেন, নিজের ভাগ্য নিজেই সৃষ্টি করেছেন, তবু অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে রাবণের এই অন্যায়কেও 'পূর্বজন্মফল' বা 'পূর্বনির্দিষ্ট বিধি' বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ, রাবণের এই পাপও যেন আগে থেকেই বিধি-নির্দিষ্ট ছিল। অর্থাৎ গ্রীক দৈবের মতোই এই অন্যায়েরও পূর্ব-নির্দিষ্ট ভুমিকা ছিল যাকে ভারতীয় দৃষ্টিতে পূর্বজন্মের কর্মফল বলে ব্যাখ্যা করে আমরা সান্ত্বনা পাই। কর্মদোষে যে ভাগ্য বিরূপ হয় তার একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকে, কিন্তু কর্মদোষও যদি আগে থেকেই নির্দিষ্ট থেকে থাকে তাহলে মানুষের সমস্ত কর্মপন্থার ওপর আয়ত্তের অতীত এক শক্তির কথা ধরে নিতে হয়, যার হাতে মানুষ একেবারেই অসহায়। এইরকম অসহায় শক্তির হাতে রাবণ যে ক্রীড়নক তার প্রথম ইঙ্গিত পাই চতুর্থ সর্গে সীতার স্বপ্নদর্শনে বসুন্ধরার উক্তিতে : 'বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে/রক্ষোরাজ ; তোর হেতু স্ববংশে মজিবে/অধম ! এ ভার আমি সহিতে না পারি,/ধরিনু গো গর্ভে তোরে লংকা বিনাশিতে !/যে কুক্ষণে তোর তনু ছুঁইল দুর্মতি/রাবণ, জানিনু আমি, সুপ্রসন্ন বিধি/এতদিনে মোর প্রতি , আশীষিনু তোরে।' বসুন্ধরার

এই উক্তি থেকে মনে হয়, রাবণের সীতাহরণ যেন বিধির পূর্বনির্দিষ্ট বিধান। এ বিধানের কাছে রাবণ যেন অসহায়। এই চতুর্থ সর্গেই আরেকবার পূর্বনির্দিষ্ট বিধানেই যে সীতাহরণ হয়েছে এমন ইঙ্গিত রয়েছে সরমার উক্তিতে। বসুন্ধরার উক্তিকে সমর্থন করেই সরমা বলেছেন: 'কিন্তু সত্য যা কহিলা/বসুধা। বিধির ইচ্ছা, তেঁই লংকাপতি/আনিয়াছে হরি তোমা; সবংশে মরিবে দুষ্টমতি।' প্রথম সর্গে রাবণ যে বলেছিলেন, 'কি কুক্ষণে…পাবকশিখারূপিনী জানকীরে আমি আনিনু এ হৈমগেহে'—সেই 'কুক্ষণ' শব্দটির মধ্যেও হয়তো পূর্বনির্দিষ্ট বিধানের ইঙ্গিত থাকতে পারে। নবম সর্গে রাবণ যে দূতকে পাঠিয়েছেন রামের কাছে মেঘনাদের সৎকারের জন্যে সময় চেয়ে, সেই দূতের মুখেও এই পূর্বনির্দিষ্ট বিধানের ইঙ্গিত আছে। অনেক মিনতি করে সে বলেছে: 'কুক্ষণে ভেটিলে দোঁহা দোঁহে রিপুভাবে!/ বিধির নির্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে?/যে বিধি, হে মহাবাহু সৃজিলা পবনে/ সিন্ধু-অরি; মৃগ-ইন্দ্রে গজ-ইন্দ্র রিপু;/খগেন্দ্র নাগেন্দ্র বৈরী; তার মায়াছলে/ রাঘব রাবণ-অরি-দোষিব কাহারে?' অর্থাৎ যে মৌলিক বা প্রাকৃতিক কারণে জড় ও জীবজগতে শাশ্বত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি, সেই শাশ্বত দ্বন্দ্বেরই একটি রূপ রাম-রাবণের শত্রুতা।

লক্ষণীয় যে, রাবণ যেমন নিজের পাপকর্মের কথা খুবই কম বলেছেন, পূর্বজন্মের কর্মফলের কথাও বোধ হয় একবারই বলেছেন, এবং অধিকাংশ সময়েই বিরূপ ভাগ্যের কথা বলে গেছেন, তেমনি অন্যদিকে, দেবদেবীরা রাবণের ঔদ্ধত্য ও পাপকর্মের কথাই বারবার বলেছেন এবং অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে লক্ষ্মণ, বিভীষণ এবং জটায়ুও ওই পাপকর্মের কথাই পুনরাবৃত্তি করেছেন। কিন্তু বসুন্ধরার মুখেই অনায়ত্ত ও পূর্বনির্দিষ্ট সেই অপ্রতিবিধেয় বিধানেরই প্রথম স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে, সরমার মুখে তার সমর্থন আছে এবং শেষ সর্গে রাবণের দূতের মুখে সেই অপ্রতিবিধেয় বিশ্ববিধানের স্বরূপটি পরিষ্কার হয়েছে। প্রথম থেকেই অনায়ত্ত শক্তির হাতে রাবণ যে অসহায় ক্রীড়নক একথা বারবার রাবণের মুখে বলালে বোধ হয় রাবণের প্রতিশোধ-সংকল্পের জোর কমে যায় ভেবেই মাইকেল অনায়ত্ত শক্তির কথা আভাসে তাঁর মুখে বলিয়েছেন। এমন কি, নিজের কর্মদোষের কথাও একবারই বলিয়েছেন তাঁর মুখে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের জ্বালার কথাও। বসুন্ধরা, সরমা এবং দূতের মুখে তিনবার মাত্র সেই অনায়ত্ত শক্তির কথা বলিয়ে হয়তো রাবণের বীরোচিত সংকল্প ও আশু কর্তব্যকেই বড় ক'রে মাইকেল দেখাতে চেয়েছেন, এবং একেবারে শেষ সময়ে মেঘনাদের চিতায় প্রমীলাকে উঠতে দেখেই 'পূর্বজন্মফল' বলে সমস্ত চেষ্টার ব্যর্থতায় রাক্ষসলক্ষ্মীর উদ্দেশে হাহাকার করেছেন। ইসকাইলাসের নাটক আগামেমনন-এর সূচনায় ট্রয়ের সর্বনাশের আভাস থাকা সত্ত্বেও তো আগামেমননের কর্মদোষ দেখিয়ে 'চরিত্রই নিয়তি' এই কথা

প্রমাণিত হয়েছে। পূর্বনির্দিষ্ট নিয়তির বিধান থাকা সত্ত্বেও যেমন চরিত্রের কর্মদোষ দেখাবার অদ্ভুত প্যারাডক্স: প্রাচীন গ্রীক জীবনদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ঠিক সেই দৃষ্টিভঙ্গি রাবণের পরিণতির মধ্যেও কাজ করছে, 'পূর্বজন্মফল' বলে তাকে মাইকেল দেশীয় সাজ পরাবার যতই চেষ্টা করুন না কেন। এক জন্মেই কর্মদোষ ঘটিয়ে তো দেবতারা তাঁকে শাস্তি দিয়ে দিলেন। অন্যদিকে প্রধানত বিধিরূপ বিধির কথা বলে বলেই রাবণ আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুর 'প্রতিবিধিৎসায়' বীরোচিত লড়াই করে শূন্য স্বর্ণলঙ্কায় ফিরলেন! তাঁর প্রতিশোধ-স্পৃহার মূলে কোন নৈতিক সমর্থন ছিল না বলেই তা নিছক প্রতিশোধ-স্পৃহা! রাবণের স্রষ্টা একটু বেশি clevated হয়েছিলেন বলেই প্রতিশোধ-স্পৃহাই তাঁর অস্ত্র। নইলে হয়তো বিশ্ব-বিধানের হাত থেকে রাবণকে মুক্ত করে 'চরিত্রই নিয়তি'—এই বাক্যটির তাৎপর্যে মাইকেল অন্য মাত্রা আনতে পারতেন।

"He is not committed to a single tradition or to a single model; he mastered his material and technique through a close acquaintance with many traditions and many models...Virgil had Homer and Tasso and Milton had Homer and Virgil. Michael looked to them all and added Valmiki and Kalidas. Those who think or believe they think that the result of such variety of influences has been an artificial poem are probably misled by such judgements as Spenser wrote no language or the language of *Paradise Lost* is not English."

—R. K. Dasgupta—Nostra Divina Lingua. [From 'Michael Madhusudan Datta', University of Delhi, 1967.]

প্রমীলার উৎস

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের জাতীয় মহাকবি মধুসূদন একজন জবরদস্ত লেখকই শুধু ছিলেন না, একজন দুর্ধর্ষ পাঠকও ছিলেন। সৎ লেখককে পরিশ্রমী পাঠকও হতে হবে, নবযুগের বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনই বোধ হয় সর্বপ্রথম হাতে-কলমে এই সংস্কারের সূত্রপাত করেন। দেশী-বিদেশী বিচিত্র উৎস থেকে তাঁর মহাকাব্যে এবং অন্যত্রও তিনি যত সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন, জনৈক সমালোচকের মন্তব্যে তা চুম্বকে এইভাবে পরিবেশিত হয়েছে—'মধুসূদনের কাব্যগুরু ছিলেন বাল্মীকি, ব্যাস, হোমার, ভার্জিল, কালিদাস, দান্তে, ট্যাসসো এবং মিলটন।'[১] আবার মাদ্রাজে বাসকালে তিনি সম্ভবত জৈন রামায়ণের সংস্পর্শেও এসেছিলেন এমন অনুমানও কেউ কেউ করেছেন।[২] মধুসূদনের কাব্যোপাদানের সম্পূর্ণ উৎস-নির্ণয় তথাপি আজো বোধ হয় সম্ভব হয়নি। ক্লাসিক কাব্যের কাছে মধুসূদনের এই বিষয়ে ঋণের বৃত্তান্ত বিষয়ে আলোচনা অনেকটা বিস্তৃত হলেও, লৌকিক উৎসের কাছে মধুসূদনের ঋণের প্রসঙ্গ আজো যথেষ্ট আলোচিত নয়। এমনকি চন্দ্রাবতীর রামায়ণের বিষয়বস্তুর সঙ্গে মেঘনাদবধের চতুর্থ সর্গের প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য সম্পর্কে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন যে আলোকপাত করেছিলেন, পরবর্তী মধু-সাহিত্যসমালোচনা সে বিষয়েও যথেষ্ট অবহিত কিনা, বোঝা কষ্টকর। অথচ মধুসূদন যে শ্রেণীর অনুসন্ধিৎসু পাঠক ছিলেন তাতে লৌকিক শাখার রত্নভাণ্ডারের দিকে তিনি উপাদান চয়নের প্রয়োজনে কখনো দৃষ্টিপাত করবেন না, এমন ধারণা নিতান্ত অসঙ্গত।

স্বল্পকালের মাদ্রাজ-বসবাসপর্বে মধুসূদন যদি দাক্ষিণাত্যের হেমচন্দ্রের রামায়ণ এবং তেলেগু ভাষায় রচিত কম্বা রামায়ণ দেখে থাকেন, তবে লৌকিক কাব্যশাখায় মধুসূদনের আগ্রহের সেইটেই কি মস্ত বড় প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায় না?

একথা যদিও ঠিক যে, মধুসূদনের কাব্যে বহিরাগত এইসব উপাদান তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবনী-শক্তির যোগে প্রায়শই নবকলেবর পেয়েছে, তথাপি সতর্ক অনুশীলনে মূলের

১। ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা, ১৩১

২। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, ১৩৭১ সং, পৃষ্ঠা, ১০৭

চন্দ্রাবতীর প্রভাব সম্পর্কে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন আলোচনা করেছেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের, সপ্তম সংস্করণে, ৪৪১ পৃষ্ঠায়।

অস্তিত্ব ক্ষীণ হলেও ধরা যায়। আর তখন পাঠক-মধুসূদনের প্রতি আরও একবার সবিস্ময় শ্রদ্ধা জানাতে ইচ্ছা করে। বর্তমান প্রবন্ধে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রমীলার চরিত্র-পরিকল্পনার পেছনে প্রভাবরূপে ক্রিয়াশীল কোনো লৌকিক শাখার সাহিত্যকৃতির সম্পর্কে আমরা উল্লেখ করেছি। সমালোচক-মহলে প্রচলিত সাধারণ ধারণা অনুযায়ী প্রমীলা চরিত্র মধুসূদনের স্বকপোলকল্পিত বলেই মনে করা হয়। কারণ বাল্মীকিতে এই চরিত্র নেই, কৃত্তিবাসে নেই। এবং প্রমীলা নামটিও সম্ভবত মধুসূদন কাশীরাম দাস থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু বাদবাকী চিত্রণের সমগ্র কৃতিত্বটুকুই যে কবির অপূর্ব-বস্তু-নির্মাণক্ষমা-প্রজ্ঞার, অদ্যাপি বিদ্যমান ধারণা সেইরকম। তথাপি এই ধারণা সম্ভবত সত্য নয়, এমন কথারই মধ্যযুগীয় লৌকিক সাহিত্যভাণ্ডার থেকে যথোপযুক্ত উদাহরণযোগে বর্তমান প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করতে চেয়েছি।

রাবণপুত্র মেঘনাদ বাল্মীকি অথবা কৃত্তিবাসের কাব্যের নায়ক ছিলেন না, তাই মেঘনাদপত্নীর কল্পনা তাঁদের পক্ষে আবশ্যিক ছিল না। কিন্তু মধুসূদন গ্রীক তথা পাশ্চাত্ত্য রীত্যনুযায়ী লিখতে চেয়েছিলেন বলে নায়ককে সম্পূর্ণতা দেবার জন্যে তাঁকে নায়িকা প্রমীলার চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়েছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পূর্বসূরী কবিদের দিকে তিনি সাহায্যলাভের আশায় এইজন্য হাতও বাড়িয়েছিলেন। প্রমীলা নামটির জন্য তিনি কাশীরাম পর্যন্ত দৌড়েছিলেন, একথা যদি সত্য বলে স্বীকার করতে হয় তবে সমকালে প্রচলিত রামায়ণকাহিনীর সবগুলিই যে তিনি অন্ততঃ দেখেছিলেন, তাও অবশ্যই মানতে হয়। কিন্তু মধুসূদন উপেক্ষা না করলেও আমরা অন্তত উপেক্ষা করেছি এইরূপ একটি রামায়ণ-কথাকে। যার ফলে আমাদের এমন ধারণা হয়েছে যে, প্রমীলা চরিত্র মধুসূদনের একান্ত স্বকপোলকল্পিত এবং পূর্বসূত্রহীন। কারণ মধুসূদন-পূর্ব বাঙলা সাহিত্যে প্রমীলার সমধর্মী, কোমলে-কঠিনে-প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে ভাস্বর, জনৈক মেঘনাদ-পত্নীর প্রথম আত্মপ্রকাশ এই রামায়ণকাহিনীতেই সূচিত হয়েছিল। এর সঙ্গে সঙ্গে এই রামায়ণখানির প্রাসঙ্গিক অংশে দৃষ্ট হয় বর্ণনা এবং পরিস্থিতি-সৃজনের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য, পরবর্তীকালে মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্যে যার পুনঃ পরিবেশন আমাদের চমৎকৃত করে।

উল্লিখিত এই রামায়ণখানি হল ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে সম্পূর্ণ, জগদ্রামী-রামপ্রসাদী 'অদ্ভুতরামায়ণ।'[৩] জগৎরামের জ্যেষ্ঠপুত্র রামপ্রসাদ যেহেতু এই রামায়ণের লংকা-কাণ্ড এবং উত্তরাকাণ্ডের লেখক ছিলেন তাই সংকীর্ণ বিচারে মধুসূদনের কাব্যে তাঁর রচনারই প্রভাব পড়েছে বলতে হবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে জগদ্রামের পুঁথির যে সংগ্রহ আছে তার থেকে এই গ্রন্থ যে সেকালের সমাজে

৩। ডঃ সুকুমার সেন—বা. সা. ই. ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ২য় সং, পৃষ্ঠা ৪১২

বেশ জনপ্রিয় ছিল তা বোঝা যায়। এই কাব্যের অন্তত দুটি ছাপা সংস্করণ পরবর্তী-কালে বেরিয়েছিল দেখা যায়।'[৪] এই জগদ্রামী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে বর্ণিত মেঘনাদপত্নীর যে চরিত্র আছে, আমাদের ধারণা, সেটিই প্রমীলা চরিত্রের উৎস বলে পরিগণিত হবার যোগ্য।

প্রশ্ন হতে পারে, জগদ্রাম এবং মধুসূদন কি ঐ বিষয়ে অদ্ভুতরামায়ণ[৫] বা অধ্যাত্ম-রামায়ণের[৬] সাধারণ ভাণ্ডার থেকে ঋণ নিয়েছিলেন? এর উত্তর নেতিবাচক। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের অংশ বলে কথিত, পরিসরে নাতিদীর্ঘ অধ্যাত্মরামায়ণে মেঘনাদ-প্রসঙ্গ থাকলেও তার স্ত্রীর কোনো পরিচয় নেই। আর আরো সংক্ষিপ্ত কাব্য অদ্ভুতরামায়ণে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রাবণপুত্রগণের বিস্তৃত তালিকায় মেঘনাদেরও নাম নেই। কাজেই মেঘনাদবধকাব্যের প্রমীলা চরিত্রে জগদ্রামী রামায়ণের মেঘনাদপত্নীর যে ছায়া আছে তা ঐ কাব্য থেকেই মধুসূদন প্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে ধারণা করতে হবে।

জগদ্রামী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে মেঘনাদ-এর একজন সহধর্মিণীর চিত্র আঁকা হয়েছে। তার নাম দেওয়া হয়েছে 'সুলোচনা'। মেঘনাদ-পূর্ব বাঙলা কাব্যে মেঘনাদ-পত্নীর এই একটিই স্বাধীন চরিত্র চিত্রিত হয়েছে যার পরিণতিও প্রমীলার পরিণতির অনুরূপ—পতির সঙ্গে চিতারোহণ। এটা কৌতূহলোদ্দীপক যে, মধুসূদনের কাব্যে অন্তত তিনবার প্রমীলাকে বোঝাতে 'সুলোচনা' নামটি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমত মেঘনাদবধকাব্যের তৃতীয় সর্গে যুদ্ধসাজে সজ্জিতা প্রমীলার বর্ণনায়—

৪। (ক) কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং কালিকাপুর, বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত।

(খ) অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, অদ্ভুত অষ্টকাণ্ডে সম্পূর্ণ রামপ্রসাদী-জগদ্রামী রামায়ণ, ৩য় সং, ১৩০৭ সাল, এন্, ব্যানার্জি এণ্ড সন্স, রামমোহন সাহা লেন। সুলোচনা উপাখ্যান ছাপায় যা আছে, সেই পাঠ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা পুঁথি বিভাগের ৫৯৬৩ সংখ্যক পুঁথির ১১৭-১২৯ পৃষ্ঠায় আছে। তাছাড়া জগদ্রামের প্রাচীনতম পুঁথি বলে কথিত পানাগড়ের হাঁসুয়া গেটের শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর রায়ের নিকট রক্ষিত পুঁথিতেও ঐ পাঠ আছে ১৯২-১৯৮ পৃষ্ঠায়। মধুসূদন যদিও পুরুলিয়াবাসী হয়েছিলেন মহাকাব্য রচনার অনেক পরে, তথাপি মানভূম অঞ্চলের সঙ্গে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি পূর্বেও ছিল। সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে জানতে পেরেছি যে, মধুসূদন রাণীগঞ্জের শিহাড়শোলের রাজবাড়ীতে মধ্যে মধ্যে আসতেন। রাজবাড়ীতে অনুসন্ধান করে এই তথ্য আমাকে দিয়েছেন রাণীগঞ্জ কলেজে আমার সহযোগী অধ্যাপক, ডঃ আবদুস সামাদ। কাজেই এতদঞ্চলে সুপরিচিত জগদ্রামের কাব্যের সঙ্গে তাঁর যে পরিচয় ছিল এই পারিপার্শ্বিক প্রমাণ সেই তথ্যকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করছে। সম্প্রতি আরও জানতে পেরেছি যে, রাণীগঞ্জে কাজোড়া অঞ্চলে আজোও নাকি জগদ্রামের (রামপ্রসাদ-রচিত) লঙ্কাকাণ্ড গান করা হয়ে থাকে। কাজোড়া স্কুলের সহকারী প্রধানশিক্ষক, আমার ছাত্র শ্রীমান মধুসূদন চক্রবর্তী এম-এ (ডাবল্) আমাকে ঐরূপ জানিয়েছেন। কাজেই মধুসূদন ঐ ব্যাপার কানেও শুনে থাকতে পারেন।

৫। অধ্যাত্মরামায়ণ, তৃতীয় সং, ১৩০৭ সাল, বঙ্গানুবাদ পঞ্চানন তর্করত্ন

৬। অদ্ভুতরামায়ণ-মূল সহ বঙ্গানুবাদ—রামশরণ বিদ্যাবাগীশ-সরস্বতী যন্ত্রে মুদ্রিত, শকাব্দ ১৮০৮, ঊনবিংশতি সর্গ, পৃষ্ঠা ৮৪ দ্রষ্টব্য।

…উচ্চ কুচ আবরি কবচে
সুলোচনা, কটিদেশে যতনে আঁটিলা
বিবিধ রতনময় স্বর্ণসারসনে।…১২১ পঙ্‌ক্তি

দ্বিতীয়ত ঐ সর্গেই হনুমান ও প্রমীলার নিম্নোক্ত কথোপকথনে—

…হনুমান আমি
রঘুদাস, দয়াসিন্ধু রঘুকুলনিধি।
তব সাথে কি বিবাদ তাঁর সুলোচনে ?…২৩১ পঙ্‌ক্তি

তৃতীয়ত পঞ্চম সর্গে বৈতালিকের গানে—

হে কৃত্তিকে হৈমবতী, শক্তিধর তব
কার্তিকেয় আসি দেখ তোমার দুয়ারে,
সঙ্গে সেনা সুলোচনা।…৪৩২ পঙ্‌ক্তি

জগদ্রামী রামায়ণের স্মৃতিই কি এর কারণ ? নাকি এহো বাহ্য ? কিন্তু জগদ্রামের লংকাকাণ্ডে সুলোচনার সাধারণ রূপ, গুণ, সাহসিকতা, স্বামীপ্রেম, গৌরববোধ ইত্যাদির সঙ্গে প্রমীলা-চরিত্রের যে স্বভাবগত সাদৃশ্য তাকে কিছুতেই কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পাশাপাশি এই দুটি চরিত্রকে রেখে দেখলে এদের উভয়ের ব্যক্তিত্বের, সহমরণগত পরিণতির এবং তৎ-সংশ্লিষ্ট কতিপয় পরিস্থিতির অন্তর্গত মৌল সাদৃশ্য পাঠকের কাছে বিস্ময়কর বলে ঠেকে। অবশ্য প্রমীলার বীরত্ব সুলোচনায় দৃষ্ট হয় অতি অল্পমাত্রায়। কারণ জগদ্রাম লিখেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ভক্তিকাব্য এবং মধুসূদন লিখেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বীরকাব্য। তাই জগদ্রামের উপাদান মধুসূদনের কাব্যে যথোপযুক্ত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন লাভ করেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অমিত্রাক্ষরের বীরছন্দের অন্তরালবর্তী পয়ারের ভিতটার মতোই প্রমীলা চরিত্রের ঔজ্জ্বল্যের পশ্চাদ্‌বর্তী সুলোচনার একমেটে রূপটিও জগদ্রামের পাঠক-এর অগোচর থাকে না। তবে জগদ্রাম সম্পূর্ণ মহাকাব্য লিখেছিলেন বলে সুলোচনার প্রসঙ্গ সেখানে সংক্ষেপে একটি মাত্র ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, আর মধুসূদনের কাব্যের মেঘনাদই মুখ্য পুরুষ বলে তিনি প্রমীলার চরিত্রকে বিভিন্ন সর্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নিয়েছেন। তথাপি বর্ণনার মিল থেকেই গেছে। সুলোচনার সাধারণ বর্ণনায় আসা যাক। জগদ্রামে সুলোচনার ছবিটি নিম্নবৎ চিত্রিত হয়েছে—

সুলোচনা নাম ইন্দ্রজিতের রমণী।
নাগকন্যা অতি ধন্যা সতী শিরোমণি।
বয়সে যুবতী তাহে অতি রূপবতী।
সুকামিনী দামিনী জিনিয়া দেহদ্যুতি॥
চম্পকবরণা সে চম্পক দোলে কেশে।
বদনচন্দ্রমাতে মদন মোহে হাসে॥
মধ্যদেশ ক্ষীণ পীনোন্নত পয়োধর।

দাড়িম্ব বিজিত দন্ত সুবিম্ব অধর ॥

... ...

কমল মৃণাল ভুজ উরু রম্ভা তরু।
নীলাম্বরে সম্বৃত নিতম্বদেশ চারু ॥[৭]

পুনরায়

স্বর্ণসিংহাসনে বসি আছে সুলোচনা।
বিদ্যাধরী নারী সেবা করে কতজনা ॥
ইন্দ্রপুর জিনি তার অন্তঃপুরী শোভা।
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণীকে নিন্দিয়া বৈসে কিবা ॥
রাবণের বধূ ইন্দ্রজিতের রমণী।
তার ভোগবিলাস বর্ণিতে কিবা জানি ॥[৮]

উপরোক্ত বর্ণনার পাশে মেঘনাদবধের তৃতীয় সর্গের প্রমীলার সাধারণ বর্ণনাকে রেখে দেখলে উভয়ের ঐশ্বর্যভাব ও অন্তরস্থ গৌরববোধের সাদৃশ্য অনুভূত হবে—

...পরিলা দুকূলে
রতনময় আঁচল, আঁটিয়া কাঁচলি
পীনস্তনী ; শ্রোণীদেশে ভাতিল মেখলা।
দুলিল হীরার হার, মুকুতা-আবলী
উরসে ; জ্বলিল ভালে তারা-গাঁথা সিঁথি ;
অলকে মণির আভা, কুণ্ডল শ্রবণে।
পরি নানা আভরণ সাজিলা রূপসী।
... ...
...স্বর্ণাসনে বসিলা দম্পতি।
গাইল গায়ক-দল ; নাচিল নর্তকী :
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী ত্রিদশ আলয়ে—যথা :

বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য জগদ্রামের—'রাবণের বধূ ইন্দ্রজিতের রমণী', এবং প্রমীলার 'রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী' এই উক্তিদ্বয়ের প্রকট সাদৃশ্য। এ ছাড়াও এই সুলোচনা-উপাখ্যানে মেঘনাদপত্নীর সাধারণ সাহসিকতা এবং শোকবিধুর অথচ দীপ্ত ব্যক্তিত্ব যেভাবে ফুটে উঠেছে তাতে তাকে স্বাভাবিকভাবেই প্রমীলা-চরিত্রের পূর্বসূত্র বলে বোধ হয়। সুলোচনার কাহিনীটি এইখানে চুম্বকে বলা দরকার। মেঘনাদের যুদ্ধ-গমনোদ্যোগে সুলোচনা প্রত্যাশিত কাতরতা প্রকাশ করলে মেঘনাদ তাকে অভয় দিয়ে বললো যে, সে সাধারণ যোদ্ধার অবধ্য। তবে যদিই তার আদৌ

৭। অজিতকুমার সম্পাদিত জগদ্রামী রামায়ণ, পৃষ্ঠা ৩৩০
৮। ঐ, ঐ

মৃত্যু ঘটে, তবে তার কাটা হাত দুটি এসে সেই তথ্য সুলোচনাকে লিখে জানিয়ে যাবে। সত্য সত্যই মেঘনাদের মৃত্যু ঘটলে তার কাটা হাত দুটি সত্যরক্ষার্থে সুলোচনার দ্বারে এসে পৌঁছোলো। সখীমুখে সেই সংবাদ পেয়ে স্বামীর প্রতি অচল আস্থাবশত সুলোচনা সেই সংবাদ প্রথমে হেসেই উড়িয়ে দিলো—

হেন বাণী শুনি হাসি কয় সুলোচনা।
মোর নাথে বাঁধিতে আছয়ে কোন্‌জনা ॥[৯]

পরে দ্বিতীয় দাসীর মুখে একই সংবাদ পেয়ে এবং কিছু দুর্লক্ষণ প্রত্যক্ষ করে সুলোচনা ম্রিয়মাণ হোলো—

বসন ভূষণ কেশ বিচলিত হৈছে।
মন্দগতি ত্যেজি নিরানন্দে দ্রুত যেছে ॥[১০]

মেঘনাদের মৃত্যুকালে প্রমীলারও এমনতরো অনুভূতি হচ্ছিল। বিশেষ করে জগদ্রামের—

দক্ষ অঙ্গ নাচয়ে নাচয়ে দক্ষ আঁখি।[১১]

এর যেন প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় মধুসূদনের কাব্যের ষষ্ঠ সর্গের বর্ণনার ভাষায়—

প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল।

এর পরে প্রকৃত সত্য অবগত হলে সুলোচনা ভেঙে পড়লো এবং কাটা হাত দুটি নিয়ে গৃহত্যাগ করল। এখানে প্রাসঙ্গিক বর্ণনার বহুলাংশ মেঘনাদবধের নবম সর্গের প্রাসঙ্গিক বর্ণনার অনুরূপ। জগদ্রাম লিখেছেন—

গৃহ ছাড়ি সুলোচনা চলিল যখন।
হাহাকার করি কান্দে পুরবাসীগণ ॥
বন্ধু বান্ধবেতে সবে উচ্চরবে কান্দে।
দাস দাসীগণ কেউ কেশ নাহি বান্ধে ॥
... ...
যার পদ চন্দ্রসূর্য দেখিতে না পায়।
হেন সুলোচনা সে নগরে চলে যায় ॥
পুরজন পরিজনে দোলা ধরি যায়।
নানা বাদ্য বাজে গুণিগণে গীত গায় ॥[১২]

মধুসূদনের কাব্যে প্রমীলার নগর ত্যাগের বর্ণনা এর সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্য-সম্পন্ন—

...অবিরল ঝরে অশ্রুধারা
তিতি বস্ত্র, তিতি অশ্ব, তিতি বসুধারে।

৯। ঐ, পৃষ্ঠা-৩৩১ ১০। ঐ, ঐ ১১। ঐ, ঐ ১২। ঐ, পৃষ্ঠা' ৩৩৩,

উচ্ছ্বাসিছে, কোন বামা ; কেহ বা কাঁদিছে
নীরবে ; চাহিছে কেহ রঘুসৈন্যপানে

এবং

দুলাইছে চামর চৌদিকে
কিংকরী চলিছে সঙ্গে বামাব্রজ কাঁদি
পদব্রজে ; কোলাহল উঠিছে গগনে।

এবং

ছড়াইছে খই, কড়ি, স্বর্ণমুদ্রা আদি
অর্থ, দাসী, সকরুণে গায়িছে গায়কী ;
পেশল উরস হানি কাঁদিছে রাক্ষসী।

এবং

সকরুণ গীতে গীতি গাহিছে কাঁদিয়া
রক্ষ দুঃখে ! স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইছে কেহ।

(মেঘনাদবধ, নবম সর্গ,)

স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে জগদ্রামের সুলোচনা শোকাবেশে—

কাঁদিতে কাঁদিতে সুলোচনা ঘরে গেল।
ধন, ধেনু, বসন, ভূষণ দান কৈল ॥
বীতরাগ জনে যেন বিষয়ে বিরাগ।[১৩]

মধুসূদনের মহাকাব্যের নবম সর্গে, চিতারোহণকালে—

···প্রমীলা সুন্দরী
খুলি রত্ন-আভরণ, বিতরিলা সবে।

শুধু এইটুকুই নয়, সুলোচনার সহমরণ-সংশ্লিষ্ট কতগুলি বিশিষ্ট পরিস্থিতিও মেঘনাদবধ কাব্যে কখনো একইভাবে কখনো বা ভিন্নভাবে বিন্যস্ত দেখতে পাচ্ছি। যেমন উল্লেখ করা যায় রামের সঙ্গে মেঘনাদপত্নীর সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ। জগদ্রামের কাব্যে মেঘনাদের কাটামুণ্ডু রাম-সন্নিধানে গমন করলে সুলোচনা তার উদ্ধারের জন্য রামের সাক্ষাৎপ্রার্থিনী হন, এমন বর্ণনা আছে। খুব সম্ভব মেঘনাদবধকাব্যের তৃতীয় সর্গে রাম-সন্নিধানে প্রমীলার গমনের পরিকল্পনা মধুসূদন এইখান থেকেই নিয়ে থাকবেন। উভয় কবির কাব্যে পরিবেশগত কারণে এই ঘটনাটি ঈষৎ ভিন্ন ভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। কিন্তু তথাপি আলোচ্য অংশে সুলোচনা চরিত্রের প্রেমে, শোকে এবং শংকাহীনতায় পরবর্তীকালের প্রমীলার পূর্বাভাষ সূচিত হয়েছে বলে বোধ হয়। রামের কাছ থেকে স্বামীর মাথাটি উদ্ধারের জন্য সুলোচনা প্রথমে রাবণের সহায়তা প্রার্থনা করলো, কারণ সে গুরুজন-লঙ্ঘন করবে না। রাবণ এলোমেলো উত্তর দিলো

১৩। ঐ, ঐ

সুলোচনা জানালেন মন্দোদরীকে। সেখানে বিফল হয়ে তিনি শেষে মনে মনে ভাবলেন—

কুলশীল লাজ ভয়ে কি কাজ করিব।
মাগিতে স্বামীর মাথা রাম কাছে যাব॥
এ ভাবি সবার পদে করিয়া প্রণাম।
দোলা ধরি যান যথা আছেন শ্রীরাম॥
দশহাজার রাজার রাণীরা যায় সঙ্গে।
লাজ ভয় পাশরিল শোকের তরঙ্গে॥[১৪]

এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে একাধিক ছোটোখাট পরিস্থিতিগত সাদৃশ্যও উভয়ের কাব্যে দেখতে পাওয়া যায়। মেঘনাদবধে প্রথমে হনুমান, দূতী এবং প্রমীলার সঙ্গে দেখা করলো, পরে সবিভীষণ রামচন্দ্র তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। জগদ্রামের কাব্যে প্রথমে জাম্বুমান সুলোচনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো, তার পরে সবিভীষণ রামচন্দ্র তার প্রার্থনা পূরণ করলেন। এই প্রসঙ্গে সুলোচনার প্রথম আবির্ভাবে কপিসেনার বিস্ময়বোধ, মেঘনাদবধে প্রমীলা-দর্শনে হনুমানের এবং দূতীদর্শনে কপিসেনার বিস্ময়বোধের অভিব্যক্তির সঙ্গে প্রকট সাদৃশ্যযুক্ত। জগদ্রামের বর্ণনা—

আগে আগে বিভীষণ পিছে সুলোচনা।
দুভিতে দাঁড়ায়ে দেখে যত কপিসেনা॥
একে রাজবধূ আরে বয়েসে যুবতী।
অতি রূপবতী তাহে পতিব্রতা সতী॥
সুর্যসম তেজ অঙ্গ বিজলীর ছটা।
রূপে আঁখি মিলিতে না পারে কপিঘটা॥[১৫]

মধুসূদনের মহাকাব্যে প্রমীলার দূতীর সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গ…

আগে আগে চলে হনু পথ দেখাইয়া।
চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে।
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশাকালে
হেরি অগ্নিশিখা ঘরে; হাসিলা ভামিনী
মনে মনে। একদৃষ্টে চাহে বীর যত
দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে। (তৃতীয় সর্গ)

জগদ্রামের বর্ণনার অলংকার—'সুর্যসম তেজ অঙ্গ বিজলীর ছটা', মধুসূদনের প্রাসঙ্গিক বর্ণনা—'ক্ষণপ্রভা-সম বিভা খেলিছে কিরীটে। শোভিছে বরাঙ্গে বর্ম্ম, সৌর-অংশু-রাশিতে পর্যন্ত প্রতিফলিত হয়েছে দেখতে পাচ্ছি।

১৪। ঐ, পৃষ্ঠা-৩৩৪ ১৫। ঐ, পৃষ্ঠা-৩৩৭

উভয় কাব্যে সদৃশ এমন আরো কয়েকটি পরিস্থিতির উল্লেখ করি। মেঘনাদবধের নবম সর্গে দেখছি রাবণ তাঁর পুত্রের সৎক্রিয়ার জন্য রামের কাছে সাতদিনের যুদ্ধ-বিরতির আবেদন জানালেন। জগদ্রামের রামায়ণেও এই পরিস্থিতিটি বিদ্যমান। সেখানে সুলোচনা স্বয়ং রামকে বললো—

মো অভাগী লাগি প্রভু শরণ তারণ।
রণ কর নিবারণ আজিকার দিন ॥
রাম কন আজি রণ নিবারণ কৈল।[১৬]

জগদ্রামের কাব্যের একদিনের যুদ্ধবিরতি, মধুসূদনের কাব্যে কেবল সাত দিনে দীর্ঘায়িত হয়েছে। মেঘনাদবধের আরেকটি পরিস্থিতিতে পাচ্ছি, অঙ্গদ রামের প্রতিনিধি-স্বরূপ দশ শত রথী নিয়ে মেঘনাদের শেষকৃত্যে যোগদান করলো—

দশ শত রথী সাথে চলিলা সুরথী
অঙ্গদ সাগরমুখে (নবম সর্গ)

জগদ্রামের রামায়ণেও সুলোচনার অনুরোধে স্বয়ং শ্রীরাম মেঘনাদের শেষকৃত্যে সদলবলে যোগদান করলেন—

একভিতে রাক্ষস সহিত দশানন।
একভিতে কপিসাথে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥[১৭]

পরিশেষে প্রমীলার সহমরণের বৃত্তান্ত দিয়ে আলোচনা শেষ করি। জগদ্রামের সুলোচনার সহমরণের বিবরণের সঙ্গে এক্ষেত্রেও বেশ সাদৃশ্য আছে। জগদ্রামের সুলোচনা চিতারোহণের পূর্বে—

শ্বশুর শ্বাশুড়ী পদে প্রণাম করিল।
... ...
নতি করি বলে সতী না করি এ ভয়।
এই বলি চিতাপাশে করিল বিজয় ॥
রাম রাম বলি সতী চিতায় চাপিল।
পতি হস্ত মস্তক আপন কোলে নিল ॥
এ সময়ে দশানন বলয়ে রাক্ষসে।
চিতায় ঢালহ ঘৃত কলসে কলসে ॥
... ...
হেথা সুলোচনা বসি চিতার উপরে ॥
শ্যামল সুন্দর রূপ দেখিয়া দেখিয়া।
ঘনে ঘনে বদনেতে রাম নাম লিয়া ॥
নিজ করে অগ্নি লইয়া চিতায় লাগাল।
পর্শমাত্র বহ্নিশিখা গগনে উঠিল ॥

১৬। ঐ, পৃষ্ঠা-৩৩৯ ১৭। ঐ, পৃষ্ঠা-৩৪০

সময়ে উচিত ক্রিয়া কৈল লঙ্কেশ্বর।
সবান্ধবে উচ্চৈস্বরে কান্দি গেল ঘর॥

মেঘনাদবধে সহমরণের দৃশ্যে প্রথমে 'কহিল বাহকে। সুগন্ধ চন্দনকাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে।' এবং তার পরে প্রমীলা—

প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী
চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন)।
বসিলা আনন্দমতি পতি পদতলে ঃ
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী প্রদেশে।
বাজিল রাক্ষসবাদ্য ; উচ্চে উচ্চারিল
বেদ বেদী ; রক্ষনারী দিল হুলাহুলী ;
সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে
হাহারব, পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে।
বিবিধ ভুষণ, বস্ত্র। চন্দন। কস্তুরী
কেশর, কুঙ্কুম আদি দিল রক্ষবর
যথাবিধি ;

(নবম সর্গ)

জগদ্রামী রামায়ণের সুলোচনা এবং তৎসংশ্লিষ্ট কিছু পরিস্থিতির সঙ্গে মধুসূদনের প্রমীলা চরিত্রের এবং তৎসংশ্লিষ্ট কিছু পরিস্থিতির যে সাদৃশ্য আমরা বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে এতক্ষণ আলোচনা করে দেখলাম, বৈজ্ঞানিক সমালোচনায় একে কাকতালীয় বলা চলে না। ভিন্ন যুগের স্বতন্ত্র পটভূমিকায় রামপ্রসাদ এবং মধুসূদন একই প্রসঙ্গে দুটি সদৃশ চরিত্র এবং কতকগুলি সদৃশ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে সৃষ্টি করেছিলেন, তাহলে এমন অদ্ভুত ধারণারই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। তাই উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে একথাই বরং স্বীকার করে নিতে হয় যে, মহাকাব্য রচনার পূর্বে মধুসূদন অন্যান্য সাহিত্যকর্মের সঙ্গে জগদ্রামী রামায়ণও অবশ্যই পড়েছিলেন এবং 'সুলোচনাই' প্রকৃতপক্ষে 'প্রমীলার' উৎস।

অবশ্য প্রচলিত মধু-সাহিত্য-সমালোচনায় এই সিদ্ধান্তের ফলে কিছুটা পরিবর্তনকে স্বীকার করতে হবে। কারণ এতদিন প্রমীলাকে পূর্বসূত্রহীন 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি' বিকশিত ধরে নিয়ে কবির আপন মর্মগত দার্শনিকতার সঙ্গে তার যে সংযোগ স্থাপনের প্রয়াস চলে আসছে এর ফলে তার তাৎপর্য কিঞ্চিৎ খর্ব হতে বাধ্য। তবে এই সূত্র-সন্ধানের ফলে একটি নগদ লাভ হচ্ছে এই যে, আধুনিক বাঙলা কাব্যে রেনেসাঁসের প্রেরণাদীপ্ত নারী-মুক্তির বাণীবাহক মধুসূদন কেন প্রমীলার সহমরণ দেখালেন, এই একটি অস্বস্তিকর প্রশ্নের সরল উত্তর আমাদের হাতে এসে যাচ্ছে। তা হল এই যে, প্রভাবস্বরূপ জগদ্রামের কাব্য থেকে তিনি এটি পেয়েছিলেন এবং বৈচিত্র্যের খাতিরে আর ত্যাগ করতে পারেন নি।*

১৮। ঐ, পৃষ্ঠা-৩৪০, ৩৪১

* লেখকের অনুমতিক্রমে ৬ মার্চ ১৯৮২ সংখ্যা, 'দেশ' পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত।—সম্পাদক।

সংযোজন ও সম্পাদকীয় মন্তব্য ঃ

৩রা মার্চ ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত উক্ত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর ঐ পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে 'প্রমীলার উৎস' সম্পর্কে বিদগ্ধ মহলে বিতর্ক শুরু হয়। বিতর্কের সূত্রপাত করেন অধ্যাপিকা গার্গী দত্ত ৫ জুন ১৯৮২-র 'দেশ' পত্রিকায়। ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দের ৫ জুন তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় অধ্যাপক ক্লিন্টন সীলিও এ আলোচনায় যোগ দেন। শ্রীমতী গার্গী দত্তের উত্তর দেন অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ তারিখে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত আর একখানি পত্রে। অতঃপর ১৮ ডিসেম্বর ১৯৮২-র 'দেশ' পত্রিকায় উক্ত বিষয়ে মৎ-লিখিত একটি দীর্ঘ পত্র প্রকাশিত হয়। নিম্নে সে বিতর্ক এবং আমার অভিমতের একটি চুম্বক দেওয়া হল ঃ

অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের প্রতিবাদে শ্রীমতী গার্গী দত্ত অধ্যাপক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিম্নোক্ত অভিমত নজির হিসেবে উল্লেখ করেন ঃ 'আধুনিক কালের ইংরেজীয়ানার কবি মাইকেল মধুসূদন তাঁর পূর্ববর্তী শতাব্দীর বর্ধমানের এক অজ্ঞাত পরিচয় গ্রাম্য কবির পুঁথি পড়েছিলেন বলে মনে হয় না।' [বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ৩য় সংস্করণ, ১৩৭৮/পৃঃ ৩১২-১৩]। উক্ত নজিরের উল্লেখ ছাড়াও শ্রীমতী দত্ত অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের প্রতিবাদে যে যুক্তি উপস্থিত করেন তা এরূপ ঃ ১। মধুসূদন জগদ্রামী রামায়ণের হস্তলিখিত পুঁথি পড়েছিলেন কিংবা পুঁথি পড়ায় অভ্যস্ত ছিলেন এমন কোন প্রমাণ নেই। ২। রাণীগঞ্জের শিহাড়শোল রাজবাড়ীতে এই কাব্যপাঠ শুনে মধুসূদনের পক্ষে কাহিনী ও বর্ণনাগত এত detail মনে রাখা সম্ভব নয়। ৩। মহাভারতের প্রমীলা কাহিনীর সঙ্গে হুবহু মিল না থাকলেও কাশীরাম দাস ও মধুসূদনের প্রমীলা চরিত্রের অন্তর্নিহিত মিল খুব বেশী। এ ছাড়া শ্রীমতী দত্ত মনে করেন, জগদ্রাম ও মধুসূদনের বর্ণনায় যে মিল দেখা যায় তা জগদ্রামের প্রভাবজনিত নয়—আপতিক। পুরাণাশ্রিত কাব্যে পরিমণ্ডল সৃষ্টির জন্য মধুসূদনও জগদ্রামের মত ধরাবাঁধা কতগুলি রীতি অনুসরণ করেছিলেন। প্রমীলা-প্রসঙ্গে মধুসূদন যে তিনবার 'সুলোচনা' শব্দের প্রয়োগ করেছেন তা জগদ্রামের প্রভাবে নয়, মধুসূদন-ব্যবহৃত 'সুলোচনা' শব্দটি প্রমীলার চক্ষুর সৌন্দর্যজ্ঞাপক। মধুসূদন জগদ্রামের কাব্যপাঠ শুনেছিলেন এটা ধরে নিলেও 'সুলোচনাই প্রকৃতপক্ষে প্রমীলার উৎস'—বিশ্বনাথবাবুর এই সিদ্ধান্তকে শ্রীমতী দত্ত সমীচীন মনে করেন না। আলোচনার সমাপ্তিতে শ্রীমতী দত্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য নানা উত্তরাধিকারের সঙ্গে যুগোচিত ভাবনা

এবং তাঁর নিজস্ব কল্পনার মিশ্রণে প্রমীলার সৃষ্টি—সেই কাজে জগদ্রামী রামায়ণের সুলোচনাও কিছু উপাদান সংযোগ করে থাকতে পারে—এর চেয়ে বেশী ধরে না নেওয়াই হয়তো সংগত।'

উক্ত আলোচনার সূত্র ধরে অধ্যাপক ক্লিন্টন সীলি প্রমীলার বীরত্বের উৎস মূলত মহাভারত—এই সিদ্ধান্ত অসংগত নয় বলে মন্তব্য করেছেন। বিশ্বনাথবাবুর প্রবন্ধে যে বর্ণনা ও উদ্ধৃতি দেওয়া আছে তা দেখলে মধুসূদন প্রমীলা চরিত্র সৃষ্টির পূর্বে জগদ্রামী রামায়ণ হয়তো পড়েছিলেন বা শুনেছিলেন—এমন অনুমান অসংগত নয় বলে তিনি মনে করেছেন।

শ্রীমতী দত্তের উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে উক্ত চিঠিতে বিশ্বনাথবাবু মন্তব্য করেছেন : জগদ্রামের রামায়ণের সঙ্গে মধুসূদনের সম্পর্কটি দুদিক থেকে দেখা উচিত : প্রথম, জগদ্রামের কাব্যের বিষয়বস্তু ও পরিস্থিতি মধুসূদনে আছে কিনা, দ্বিতীয়, মধুসূদন ঐ কাব্যের সংস্পর্শে এসেছিলেন কিনা। শ্রীমতী দত্ত ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে নজির দেখিয়েছেন তার সমালোচনায় বিশ্বনাথবাবু মন্তব্য করেছেন : শিহাড়শোলের (রাণীগঞ্জ) রাজা বিশ্বেশ্বর মালিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে মধুসূদন রাজবাড়ীতে এলে তিনি জগদ্রামী রামায়ণের পাঠ শুনতে পারেন। জগদ্রাম বর্ধমানের পশ্চিমাঞ্চলে জনপ্রিয় কবি ছিলেন। সুতরাং এই জনপ্রিয় কবির সঙ্গে অনুসন্ধিৎসু মধুসূদনের পরিচয় অসম্ভব ছিল মনে হয় না। বিশ্বনাথবাবুর ধারণা, মধুসূদনের মত পরিশ্রমী ভাষাবিদ্ কবির পক্ষে এ কাব্য শুধু শোনা নয়, পুঁথি সংগ্রহ করে অবসর সময়ে পাঠ করাও অসম্ভব নয়। মাদ্রাজ প্রবাসকালে মধুসূদন যদি হেমচন্দ্রের সংস্কৃত রামায়ণ এবং তামিল ভাষায় আঞ্চলিক কম্বা রামায়ণ পড়তে পারেন, তবে প্রয়োজনবোধে তিনি জগদ্রামী রামায়ণের সংক্ষিপ্ত লঙ্কাকাণ্ড পড়তে পারেন—এমন অনুমান অহেতুক নয়। সে রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের পাঠ শুনে অসামান্য শ্রুতিধর মধুসূদনের পক্ষে সে কাব্যের খুঁটিনাটি স্মরণে রাখাও সম্ভাব্যের সীমা অতিক্রমী বলে মনে হয় না। মধুসূদন প্রয়োজনবোধে যে কোন উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে দ্বিধা করেন নি। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর জগদ্রামের ভক্তিকাব্যকে পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত করে বীরকাব্যে পরিণত করা মধুসূদনের মত গ্রাহকু কবির পক্ষে অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। শ্রীমতী দত্ত-কথিত 'টেকচুয়েল' প্রমাণের ভিত্তিতেও প্রমীলা চরিত্র সৃষ্টিতে জগদ্রামের নিকট মধুসূদনের ঋণ গ্রহণ অসম্ভব নয় বলে বিশ্বনাথবাবু মনে করেন। রাজসভা বর্ণনায়ও মধুসূদন জগদ্রাম থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন বলে বিশ্বনাথবাবুর বিশ্বাস। সুলোচনা শব্দটিও জগদ্রাম থেকে আহৃত বলে বিশ্বনাথবাবুর ধারণা। বিশ্বনাথবাবু আরও মনে করেন, চিতারোহণের পর ট্র্যাজিক রস-বিরোধী মেঘনাদ-প্রমীলার স্বর্গগমনের দৃশ্যটিও মধুসূদন সংগ্রহ করেছিলেন জগদ্রামী রামায়ণ থেকে। বিশ্বনাথবাবু এই বলে তাঁর বক্তব্যের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন,—মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবনের তথ্যাবলী যখন সম্পূর্ণ

প্রমাণভিত্তিক নয়, সে অবস্থায় জগদ্রামের রামায়ণের সুলোচনা প্রসঙ্গের সঙ্গে মধুসূদনের প্রমীলা প্রসঙ্গের আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখে কবি মধুসূদন যে ঐ চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন—এমন অনুমান একেবারে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

মেঘনাদবধ-এর প্রমীলা চরিত্র সৃষ্টি সম্পর্কে বিশ্বনাথবাবুর বক্তব্যের সারবত্তা স্বীকার করেও এ প্রসঙ্গে শ্রীমতী গার্গী দত্তের সিদ্ধান্তই আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত মনে হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য নানা উত্তরাধিকারের সঙ্গে সুগোচিত ভাবনা এবং নিজস্ব কল্পনা মিশ্রণে মধুসূদন প্রমীলা চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন—শ্রীমতী দত্তের এই ধারণা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। প্রাচ্য উপাদানের মধ্যে জগদ্রামের সুলোচনাও মধুসূদনের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করতে পারে—এর চাইতে অতিরিক্ত কিছু ধারণা না করাই সংগত বলে তিনি যে মন্তব্য করেছেন—তা খুবই সমীচীন বলেই আমাদের বিশ্বাস। মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসুও মন্তব্য করেছেন,—দেশী-বিদেশী বহু বীরধর্মী নারী চরিত্র—যেমন, ভার্জিলের ক্যামিলা,• ট্যাসোর ক্লরিন্ডা, গিল্ডিপ, এরমিনিয়া, ইলিয়াডের রণসজ্জায় সজ্জিত এথিনী, অশ্বারোহণ-নিপুণা সসঙ্গিনী কেমিলা, কাশীরাম দাসের বীরাঙ্গনা প্রমীলা, রঙ্গলালের পদ্মিনী, সিপাহী যুদ্ধের অশ্বারোহিণী বীরাঙ্গনা ঝাঁসির রাণী প্রভৃতি অনেকেই মধুসূদনের প্রমীলার দেহ নির্মাণোপযোগী উপকরণ জুগিয়েছিলেন। এ সমস্ত নারী চরিত্রের বীরধর্মের সংগে কুলবধূর কোমলতা, পতিপ্রাণার আত্মবিসর্জন, এবং বীরাঙ্গনার শৌর্যের সংমিশ্রণে মধুসূদন প্রমীলা চরিত্রের যে স্বাতন্ত্র্য দান করেছিলেন তা তাঁর মৌলিক কবি-প্রতিভার দান।

প্রমীলা চরিত্রের উৎস সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জগদ্রাম-রামপ্রসাদের সুলোচনা চরিত্রের পরিণতির সংগে মধুসূদনের প্রমীলা-চরিত্রের পরিস্থিতিগত সাদৃশ্য দেখে সুলোচনাই প্রমীলা চরিত্রের উৎস বলে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন—তা সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। প্রমীলা চরিত্র-পরিকল্পনায় দুই যুগের কবির• মধ্যে পরমাশ্চর্য সাদৃশ্য দেখে মধুসূদন তাঁর পূর্বসূরী স্বল্প-পরিচিত কবির কাব্য থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন—এমন অনুমান অসংগত নয়। কিন্তু জগদ্রাম-অঙ্কিত সুলোচনাকেই প্রমীলার উৎস রূপে মনে করার অর্থ রেনেসাঁস-প্রভাবিত মধুসূদনের বীরধর্মী-নারীচরিত্র সৃষ্টির মৌলিকতাকে অস্বীকার করা ছাড়া কিছু নয়। শ্রীমতী গার্গী দত্ত তিন স্থানে মধুসূদন-ব্যবহৃত সুলোচনা শব্দের অর্থ 'চক্ষুর সৌন্দর্যজ্ঞাপক' বলেছেন—তাও অযৌক্তিক মনে হয়

না। তবে প্রমীলার চিতারোহণের পরবর্তী মেঘনাদ-প্রমীলার দিব্যদেহ ধারণ করে স্বর্গে যাওয়ার চিত্রটি একমাত্র জগদ্রামী রামায়ণের বিষয়ীভূত বলে মধুসূদন সে চিত্র জগদ্রামী রামায়ণ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন—বিশ্বনাথবাবুর এই দাবী খুবই সঙ্গত। মোটের ওপর, মধুসূদনের মৌলিক সৃজন-প্রতিভার কথা মনে রেখেও প্রমীলার চরিত্র ও আনুষঙ্গিক কোন কোন ঘটনা সৃষ্টিতে মধুসূদন জগদ্রামী রামায়ণের অনুসরণ করেছিলেন বলে বিশ্বনাথবাবু যে 'টেকচুয়েল' প্রমাণ উপস্থিত করেছেন, তার অভ্রান্ততা অস্বীকার করা শক্ত। অকাট্য যুক্তি প্রয়োগের সাহায্যে প্রমীলা চরিত্রের অন্যতম উৎস হিসেবে জগদ্রামের সুলোচনাকে উপস্থিত করে বিশ্বনাথবাবু মধুসূদন গবেষণায় নতুন মাত্রার সংযোগ করলেন বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না।

অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রমীলার উৎস' সন্ধানে আরও গবেষণাকার্য চালিয়ে নিম্নোক্ত তথ্য আমার নিকট পাঠিয়েছেন। ভবিষ্যৎ গবেষকদের বিবেচনার জন্য এই অংশটিও তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

"পূর্ববর্তী আলোচনায় বলে দেওয়া হয়নি যে, জগদ্রাম সুলোচনা-বৃত্তান্ত কোথা থেকে পেয়েছিলেন। পরবর্তী অনুসন্ধানে জানতে পারা গেছে যে, জগদ্রাম তুলসীদাস থেকে ঐ উপাদান পেয়েছিলেন। জগদ্রামী রামায়ণের এতৎ-সংশ্লিষ্ট পূর্ণ বিবরণই তুলসীদাসের বিশ্বস্ত অনুসরণ। কিন্তু তুলসীদাসের নামে প্রচলিত ঐ অংশ অনেক পণ্ডিত প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন। আমার কাছে গোরখপুরের গীতা প্রেস থেকে শ্রীযুক্ত হনুমানপ্রসাদ পোদ্দার সম্পাদিত ও প্রকাশিত ২০১৫ সংবতের যে শ্রীরামচরিতের দশম সংস্করণ আছে, তাতে ঐ অংশ নেই অর্থাৎ পরিবর্জিত। আবার আমার কাছে বম্বের ভেংকটেশ্বর প্রেস থেকে শ্রীযুক্ত ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস প্রকাশিত এবং পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদ মিশ্র পরিশোধিত তথা সম্পাদিত শ্রীরামচরিত মানসের যে সংস্করণ আছে তাতে সুলোচনার উপাখ্যান আছে, যদিও তাকে প্রক্ষিপ্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে যে, মধুসূদন কি তাহলে তুলসীদাস থেকে সরাসরি ঐ উপাখ্যান পেয়েছিলেন? তা সম্ভব নয় এই যুক্তিতে যে, বিশপ্‌স্‌ কলেজে এবং তারও পরে মধুসূদন যেসব ভাষা বিশেষভাবে শিখেছিলেন বলে বিবিধ জীবনীগ্রন্থে পাওয়া যায়, তার মধ্যে হিন্দীর কথা কোথাও নেই। তাছাড়া তুলসীদাস যে 'অবধী'তে তাঁর কাব্য লিখেছিলেন তা অল্প সল্প হিন্দীজ্ঞানীর পক্ষে বোধ্য নয় আদৌ। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ক্লিন্টন সীলির মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, মধুসূদন রামলীলা থেকে সুলোচনা-বৃত্তান্ত পেয়েছিলেন কিনা, তা অনুসন্ধানযোগ্য। একথা সত্য যে, দিল্লীতে যে রামলীলা দেখান হয় তাতে সুলোচনা-বৃত্তান্ত থাকে। কিন্তু জগদ্রামের রচনাংশের সঙ্গে মধুসূদনের রচনাংশের স্থানে স্থানে যে পরিস্থিতিগত এমনকি বর্ণনার বাক্যগত সাদৃশ্য বর্তমান তা রামলীলাদর্শনের ফলে আগত বলে মনে করতে অসুবিধে হয়। তাই অন্ততঃ এ পর্যন্ত আমাদের পূর্ব ধারণা পরিবর্তনের কোন সঙ্গত কারণ পাওয়া যাচ্ছে না। রামলীলার সুলোচনা-বৃত্তান্ত আসলে তুলসীদাস থেকে গৃহীত বলেই আমাকে ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন হিন্দীসাহিত্যের অধ্যাপক বলেছেন।"

মধুসূদনের সনেট প্রসঙ্গে

বাণী রায়

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের স্থান পথিকৃৎ রূপে। বিভিন্ন দেশের সাহিত্য থেকে আঙ্গিক ও ভাবধারার গ্রহণ মৃতপ্রায় ভাষার অঙ্গে নূতন প্রাণজোয়ারের সঞ্চার তাঁর স্মরণীয় অবদান। তিনি বঙ্গসরস্বতীর মানসপুত্র, তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের সঙ্গে একাত্ম।

মহাকাব্য, সনেট, অমিত্রাক্ষর ছন্দ, প্রহসন, বিয়োগান্ত ও ঐতিহাসিক নাটিকা, গীতিকবিতা, প্রেমপত্রিকা-কাব্য ইত্যাদি নানা অভিনব সংযোজনে তিনি মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। এখানে আলোচ্য মাত্র,—সনেট।

মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' তাঁর সাহিত্য জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা। অমিত্র ছন্দে বৈচিত্র্যের অবকাশ সীমাবদ্ধ। কিন্তু সনেট বা চতুর্দশপদী রচনায় আঙ্গিক বা টেকনিকের বৈচিত্র্যের অবকাশ আছে। সনেটের ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক প্রচলিত ছিল এবং মধুসূদন সেইসব আঙ্গিক গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই অনবদ্য গীতি-কবিতার বিশিষ্ট আঙ্গিকে কবি ছিলেন স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। তাঁর আত্ম-উন্মোচনে কতকগুলি কবিতা ভাস্বর। প্রখ্যাত সমালোচক শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন : 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী মধুসূদনের আপন মনের গান।'

সুদূরে সমুদ্রপারে গভীর বিরহে কবি নিজের জন্মভূমিকে স্মরণ সহ দেশের গাছ-পালা, নদী, দেবদেবী, দেউল, মঠ, মহাজন প্রভৃতিকে সনেট কবিতায় অর্চনা করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন বিদেশযাত্রা করেন এবং সেখানে পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহন করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশের ভের্সাই নগরে কবি শতাধিক সনেট রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে ১০২টি কলিকাতায় প্রেরিত ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পরে আরও ৭টি যুক্ত করে ১০৯টি সনেটে মধুসূদনের আত্মনিবেদন।

কবির ব্যক্তিগত জীবনের ছোটখাটো কথা যথা, 'নূতন বৎসরে'; 'কোজাগর লক্ষ্মী-পুজার' দিনে কবিজনের অভিব্যক্তি; পুরাতন স্মৃতি, যথা, 'কপোতাক্ষ নদ'; বিভিন্ন হিন্দু উৎসব, নিসর্গ সৌন্দর্য, ব্যঙ্গাত্মক উক্তি যথা, 'কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া'; প্রেম ভালবাসা প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে সনেট-প্রাচুর্য বিস্ময়কর। মহাকাব্যের

পরিধির মধ্যে মানুষটির তেমন দেখা মেলে না—এখানে তিনি অনেকখানিই ধরা দিয়েছেন।

সনেট গীতিকবিতার এক বিশেষ রূপ। বাঁধাধরা কাঠামোতে একটি সম্পূর্ণ ভাবপ্রকাশ সনেটের ধর্ম। সনেটের আঙ্গিকের বিশেষ রূপ :—কখ খক, কখ, খক, গঘঙ, গঘঙ (abba, abba, cde, cde)। চতুর্দশ লাইনের চতুর্দশ অক্ষরের কবিতা সনেট। প্রথম আট লাইনে একটি ভাবের সমাপ্তি (Octave বা অষ্টক)। দ্বিতীয় ছয় লাইনে নূতন ভাববিন্যাস (Sestet বা ষষ্টক)।

সনেটের জন্ম ইতালী দেশে বলে খ্যাত। Guiotony নামক ব্যক্তি সনেটের জন্মদাতা। দান্তে ও পেত্রার্কের হাতে সনেটের চরমোৎকর্ষ।

১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে 'মেঘনাদবধ' রচনার সময়ে মধুসূদন ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় দক্ষ হলেও ফরাসী ও ইতালী ভাষা ভাল শিক্ষা করেন নি। ইতালীয় কাব্যের অনুবাদ পাঠে বিমোহিত কবি অতঃপর এক পত্রে ভার্সেই থেকে বন্ধু গৌরদাস বসাককে জানান (১৮৬৫)—"I have been lately reading Petrarca—the Italian poet and seribbling some 'sonnets' after him."

এই পত্রের সঙ্গে মধুসূদন গৌরদাস বসাককে চারটি সনেট পাঠান। যথা, 'কপোতাক্ষনদ', 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি', 'সায়ংকাল', 'জয়দেব'। 'চতুর্দশপদী কবিতা-গুচ্ছের প্রারম্ভে পেত্রার্ক ও ইতালীকে বন্দনা করে দুইটি সনেট সন্নিবিষ্ট (উপক্রম)। পত্রাদি ও উপরোক্ত সনেট দুইটি পড়ে স্পষ্টই বোঝা যায়, ইতালীয় ভাষায় পেত্রার্কীয় সনেটই মধুসূদন দত্তকে প্রেরণা দিয়েছিল।

কিন্তু কেবলমাত্র ইতালীর প্রভাব নয়, ইংলণ্ডের প্রভাবও দত্তকবিকে অতি তীব্রভাবে আশ্রয় করে। তাই কবির সনেট বিচারে কেবল দান্তে ও পেত্রার্কের উল্লেখ নয়। তাঁদের বন্দনা তো যে-কোন সনেটীয়ারের অবশ্যকর্তব্য কর্ম।

মধুসূদন বাল্যকাল থেকে ইংরেজিভাষায় সনেট লিখতে যথেষ্ট অভ্যস্ত ছিলেন। ইংরেজি সনেটের রূপ প্রথমাবধি তাঁর পরিচিত ও প্রিয় ছিল। বাংলা ভাষায় 'চতুর্দশপদী' নাম দিয়ে সনেটের আদি প্রবর্তক তিনি। হিন্দী দোঁহা, চতুষ্পদী নামের দৃষ্টান্তে এই নাম রাখা হয়।

বিশুদ্ধ ইতালীয় চতুর্দশপদীর rhyme-scheme বা মিলের পরিকল্পনা অনুযায়ী মধুসূদন বহু সনেট রচনা করেন। 'কমলে কামিনী' সনেটটির ছক পাওয়া যায় কখ খক, কখ খক, গঘঙ, গঘঙ। এখানে ষষ্টক ও অষ্টকের পরিষ্কার ভাগ আছে।

'সায়ংকালের তারা' সনেটের ছক—কখ খক, কখ খক, গঘঙ, গঘঙ। ষষ্ট বা অষ্টকের ভেদরেখা এখানে সুস্পষ্ট। কীট্‌স, ওয়ার্ডসোয়ার্থ, মিসেস ব্রাউনিং প্রভৃতি সনেট লেখকেরা এই শেষোক্ত কাঠামোতে সনেট রচনায় বেশী অভ্যস্ত ছিলেন।

উপরোক্ত দুইটি পদ্ধতি ইতালীয়। কিন্তু মধুসূদনের সনেটের পর্যালোচনায় আমরা দেখি মধুসূদন কেবলমাত্র পেত্রার্ক ও ইতালীয় আদর্শে সনেট লেখেন নি। ইংরেজি ভাষায় সনেটের বিভিন্ন রূপান্তরও তিনি তাঁর চতুর্দশপদীতে দেখান।

'English Sonnet'-এর বিশিষ্ট নামটি ওয়াট, সারে, স্পেন্সার, সিডনি, ড্রামন্ড, শেক্সপীয়র, কীটস প্রভৃতি কবি আঙ্গিক ও ভাবের বাঁধাধরা ইতালীয় মূর্তি হতে কিছু না কিছু মুক্তি দিয়েছিলেন। সেই সনেটের বিচিত্ররূপ মধুসূদনের কবিকৃতি বিশেষত মিলটনের প্রভাব মধুসূদনের সমগ্র কাব্যসাধনাকে অন্তরঙ্গভাবে স্পর্শ করেছিল। সনেটে এই স্পর্শ সুস্পষ্ট।

কাব্যরসিক মাত্রই অবগত আছেন যে, মিলটন quartet গুলি বা octave ও sestet (অষ্টক-ষটক)-এর মধ্যে ভেদরেখা বর্জন করেছিলেন গভীর স্পন্দন সৃজনের জন্য।

সনেটের অষ্টক ও ষটকের মধ্যে অনতিক্রম ভেদরেখা মধুসূদন বিলুপ্ত করেন মিল্টনের অনুসরণে। ইংরেজি সনেট-নির্মাতাদের প্রভাবও তাঁর মিলবিন্যাসের, বৈচিত্র্য অন্বেষণের ও বিষয়বস্তু নির্বাচনের মধ্যে দেখা যায়। কতকগুলি সনেট খাঁটি ইতালীয় ছাপবর্জিত। ইংরেজি ভাষার পরবর্তী কবিরা, যথা—কীটস্, ওয়ার্ডসোয়ার্থ, মিসেস ব্রাউনিং প্রভৃতি ভেদরেখা বর্জন করেই সার্থক সনেট লিখে গেছেন। 'হরিপর্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু' সনেটের মিলপদ্ধতি—কখকখ কখকখ, গঘগ, গঘগ। এখানে অষ্টক-ষষ্টকের ভাগ বিদ্যমান।

'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি' সনেটের কাঠামো—কখ খক, কখ খক, গঘগ, গঘগ। এতে অষ্টক-ষটকের দ্বিধাবিভাগ আছে। 'জয়দেব' সনেটের খক, কখ কখ, খক খক, গখখ, গকক। এই সনেটে অষ্টক-ষটকের কোনই বিভাগ নেই।

কিন্তু অষ্টক-ষটকের দ্বিধাবিভাগ সম্বন্ধে মধুসূদনের কতটা জ্ঞান ছিল তার প্রমাণ বহু সনেটের দুই অংশের সুনির্দিষ্ট ভেদরেখায় প্রকট ('বঙ্গভাষা' সনেট দ্রষ্টব্য)।

মধুসূদনের কয়েকটি সনেটে ভেদরেখার বিলুপ্তি বোঝায়,—তিনি কেবল সনেটের প্রথম প্রবর্তক নন, সনেটের ভবিষ্যৎ মুক্তিকামী পথিকৃৎ। বৈচিত্র্যের সন্ধান মধুসূদনকে বহু মিল ও বিষয়বস্তুর সন্ধানে উৎসুক করেছে।

কিন্তু কবি ইতালীয় নির্দেশানুযায়ী পাঁচটির বেশী শব্দমিল ব্যবহার করেন নি, যদিও শেক্সপীয়রের মত couplet-এ (যুগ্মক) তিনি কয়েকটি সনেট শেষ করেছেন;—যথা 'বঙ্গভাষা', 'জয়দেব', 'কাশীরাম দাস'। এই সমাপ্তি দু' একটি ইতালীয় সনেটে পাওয়া যায়। সনেটে এপিগ্রামের সুর চলে আসে বলে এ মিল বাঞ্ছনীয় নয়।

ইতালীয় কবিকুলও ইচ্ছাকৃত ভাবে কখনও বা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র অতিক্রম করে সনেটে নূতনত্ব আনেন। সুচারুভাবে ইতালীয় ভাষা জ্ঞাত না থাকলে দত্ত-কবির সনেটের আঙ্গিক বিচার সম্ভবপর নয়।

ইংরেজি সনেট ফরাসী কবি Marot এবং Joachim Du Bellay দ্বারাও অনুপ্রাণিত হয়েছিল। মধুসূদন ফরাসী ভাষা বিশেষ রূপে জানতেন। তবে ফরাসী সনেটের আঙ্গিক লক্ষ্য করে বোঝা যায় যে, মধুসূদন ফরাসী চতুর্দশপদীর বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেন নি।

মধুসূদনের সনেটগুলির ছক বা কাঠামো পরীক্ষা করলে আমরা ইতালীয় ও ইংরেজি উভয় ভাষার সনেটের সংগে তাদের আঙ্গিকের সাদৃশ্য দেখতে পাব। সনেট গীতি কবিতার কোন বিশেষ রূপ। তার বৈশিষ্ট্য বাঁধাধরা আঙ্গিকে। সেখানে ভাষার সংযম ও ভাবের সংহতি অত্যাবশক।

'কমলে কামিনী' ও 'সায়ংকালের তারা' সনেটে আমরা বিশুদ্ধ পোত্রার্কীয় রূপ পাই।

মধুসূদনের প্রথম সনেট 'বঙ্গভাষা' (প্রথম নাম 'কবি-মাতৃভাষা') দেখা যাক। এই কবিতাটি একটি আঙ্গিকের মিশ্রণ। এটির ষট্‌কের অংশের ঢং-এর সঙ্গে মিল্‌টনের লেখা একটি ইতালীয় সনেটের এই অংশের ঢং-এর মিল আছে ঃ কখ কখ, খক খক (ab ab ba ba)। এই কবিতার অষ্টক অংশও দুই-একটি খাঁটি সনেটের অনুসরণ ঃ গঘ ঘগ, ঙঙ (cdde, ee)। ছন্দশাস্ত্রে এই রূপ অগ্রাহ্য হলেও মাতৃভাষায় ইতস্তত চলন বাধা পায়নি।

'কাশীরাম দাস' সনেটের ছক ঃ কখ কখ কখ কখ, গঘঙ গঘঙ।

এটি স্পেন্সারের সনেটের আঙ্গিকের, যদিও সংযুক্ত মিলবিন্যাস (linking rhyme-scheme) নেই, বরঞ্চ এতে ড্রামণ্ড, সিড্‌নি প্রভৃতি কবিদের রূপকর্ম পাওয়া যায়। এটিতে অষ্টক-ষট্‌কের পরিষ্কার ভেদরেখা নেই। কিন্তু এই দৃঢ়নিবন্ধ রূপ পীড়াদায়ক নয়, মিল্টনের সনেটের মত গাম্ভীর্য-বর্ধক। মিল্টনের ভাবের দিক থেকে বিচারে দেখা যায় মধুসূদন ইতালীয় কবি অপেক্ষা প্রিয় মিল্টন দ্বারা অধিক উদ্দীপিত। বিষয়বস্তুর দিক থেকে মধুসূদনের সনেট বহু পরিমাণে ইংরেজি সনেটধর্মী। পোত্রার্কা প্রিয়াঙ্গনাকে উদ্দেশ করে সনেট কবিতা লিখতেন। দান্তের মানসী ছিলেন বিয়াত্রিচে। সেই সব প্রেম-বিহ্বল সনেট-অনুক্রম মধুসূদনে কতটা পাওয়া যায় ?

শেক্সপীয়র প্রেমমূলক সনেট ভিন্ন পৃষ্ঠপোষকদের উদ্দেশে বহু সনেট লিখেছেন। মিল্টনের সনেটগুলি অধিকাংশই নৈর্ব্যক্তিক। মধুসূদনের সনেটের বিচারে এই সকল ইংরেজি সনেটের সঙ্গে তাঁর সনেটের সাদৃশ্য ধরা যাবে।

শুধু বাইরে নয়, অন্তর-প্রকৃতির দিক থেকে মধুসূদনের সনেট বৈচিত্র্যের দাবী রাখে।

প্রেম উপাজীব্য 'লেডি-লাভের' উদ্দেশে সনেটের প্রাদুর্ভাব ইতালীয় ও ইংরেজি

ভাষায় ছিল। মধুসূদন নৈর্ব্যক্তিক সনেটে মিল্টনের পথ অনুসরণে এক মনোহর জগৎ সৃজন করলেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য, দেশের ধর্মজীবন, লোকায়ত কল্পনা, পুরাণকথা-আশ্রিত অপরূপ কলাকীর্তির নিদর্শন মধুসূদনের চতুর্দশপদী। কবির স্বাদেশিকতা ও স্বদেশপ্রেমের প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই সনেটগুচ্ছ।

শৃঙ্গাররসাশ্রিত কামনা-বিহ্বল কয়েকটি চতুর্দশপদীতে অবশ্য কবির প্রেমদগ্ধ হৃদয়ের পরিপূর্ণ প্রকাশ। ফরাসী সুরা ও ফরাসী নারী প্রেমতৃষ্ণাতুর প্রবল-পুরুষচিত্তে অনুপ্রেরণা এনেছিল আদিম দেহস্পর্শাতুর প্রেমে।

কালিদাসের শৃঙ্গার-রসপ্রবণতা মধুসূদন নিজ কাব্য-পরিধির মধ্যে স্বীকার করেছিলেন। সংস্কৃতভাষার কবির অনুসরণে যুবতী-যৌবন ও প্রেম বর্ণনা করেছেন কবি—

"বাঁধলো, সুন্দরি,
নাগপাশে অরি তুমি ; দশগোটা শরে
কাট গণ্ডদেশ তার"—('শৃঙ্গাররস'-মধুসূদন)
"ঘটয় ভুজবন্ধনম্
জনয় বদখণ্ডনম—" ("গীতগোবিন্দম্"-জয়দেব)

মধুসূদনের শৃঙ্গার রসের অন্তর্ভুক্ত নামহীন "নাহি আমি চারুনেত্রা, সৌমিত্রিকেশরী" সনেটের সঙ্গে সঙ্গে পেত্রার্কের "He blames Love" ("To Laura in Life") পর্যায়ের সনেটটি তুলনীয়। প্রেমাস্পদকে 'বীর, জয়ী', প্রেমকে রণ এবং নিজেকে বিজিত বলা হয়েছে।

প্রেমের সনেট মধুসূদন অধিক লেখেন নি। সমগ্র চতুর্দশপদী কবিতাবলী আচ্ছন্ন করে আছে প্রবাসীর প্রেম—বাংলার প্রতি অকপট অনুরাগ, দেশের সৌভাগ্য-কামনা। 'শ্যামা জন্মদার' বর্তমানের স্মরণ ও ভবিষ্যতের কল্যাণ কামনার মধ্যে চির দেশ-প্রেমিককে দেখি। নবীনচন্দ্র সেন মধুবিয়োগে লিখেছিলেন—

"দেশ দেশান্তর থাকি/কে শ্যামা জন্মদে ডাকি
নূতন নূতন তানে মোহিবে শ্রবণ।"

'আমরা' 'ভারতভূমি' ইত্যাদি সনেটে এই গভীর দেশপ্রেম প্রকট। বায়রণের 'ডন্ ইয়ুয়ান' কাব্যের দেশের গৌরবগাথার সঙ্গে তুলনীয়।

বিদেশী আঙ্গিকে ভূষিত প্রবাসীর প্রেমানুভূতির অনুপম নিদর্শন চতুর্দশপদী কবিতাবলী।

দ্বিতীয়া স্ত্রীকে উদ্দেশ করে মিল্টনের সনেটটি মধুসূদনের সহধর্মিনী-প্রতি সনেটটির তুলনায় নীরস। কারণ গাম্ভীর্য ও রাজনৈতিক সচেতনায় মিল্টনের সনেট অপরিসীম গাম্ভীর্যের ভারবাহনের, শব্দ ঝঙ্কারের ঐশ্বর্যে, ছন্দ-স্পন্দনের কৌশলে রাজকীয়। মধুসূদনের সনেট সেখানে উপনীত হয় না। কিন্তু মধুসূদনের সনেটে ভাষার

অধিক কারুকার্য ও কোমলতা পাই। সনেট দুইটি দেখা যাক—

"Her face was veiled, yet to my fancied sight
Love, sweetness, goodness in her person shined
So clear as in no face with more delight," ইত্যাদি। (Milton)

প্রফুল্ল কমল যথা সুনির্ম্মল জলে
আদিত্যের জ্যোতি দিয়া আঁকে স্ব-মুরতি;
প্রেমের সুবর্ণরঙে, সুনেত্রা যুবতি
চিত্রেছ যে ছবি তুমি এ হৃদয়-স্থলে"—ইত্যাদি। (মধুসূদন)

এখানে পুনর্বার স্মরণীয় যে, মধুসূদন ভাষা গঠন করে তবেই সনেটকে পেয়েছিলেন।

শেক্সপীয়রের সনেটের মাধুর্য ও প্রেমপিপাসা মধুসূদনের সনেটে অনুচ্চারিত। মধুসূদনের প্রেম সংস্কৃত কবির প্রেম। সে প্রেম আত্মার পিপাসায় উর্ধ্বমুখী দীপশিখা নয়। প্রেমের সনেট মধুসূদনে অত্যন্ত অল্প, বাঁধাধরা হিসাব-নিকাশের মধ্যে সীমিত। প্রেমজীবনের যন্ত্রণা, বেদনা, হতাশার গভীরতম উপলব্ধি না ঘটলে শেক্সপীয়রের সনেট লেখা যায় না।

শেক্সপীয়রের 'Revolutions' সনেটের সংগে মধুসূদনের 'নূতন বৎসর' সনেটটি কিঞ্চিৎ একাত্ম মনে হলেও শেক্সপীয়রের শেষ দুইটি পঙ্‌ক্তিতে প্রিয়ের উদ্দেশে যে অপরূপ অভিব্যক্তি ফুটেছে, মধুসূদনের সনেটের কবিত্ব-মাধুর্যে দীপ্ত অপূর্ব শেষাংশে সে ভাব কোথায়?

শেক্সপীয়রের 'The World's Way'-র তীব্র বেদনার তুলনায় মধুসূদনের 'সাংসারিক জ্ঞান' সনেট কত আবেগবিহীন। কবি 'মা ভারতীকে' বন্দনা করেছেন শেষ পঙ্‌ক্তিতে। শেক্সপীয়রের শেষ পঙ্‌ক্তি রক্তমাংসের প্রেমাস্পদ-স্মরণে এক মুহূর্তে অনুভূতির প্রগাঢ়তায় অনন্য—

—"Save that, to die, I leave my Love alone"। অবশ্য প্রেমের সনেটকার হিসাবে মহাকবি মধুসূদন খ্যাত নয়। তবু তিনি প্রেমের সনেট রচনায় পারদর্শিতা যথেষ্ট দেখিয়েছেন।

বহু ইংরাজি সনেটকারের অনুপ্রেরণা মধুসূদনে পরিলক্ষিত। কিন্তু সাদৃশ্যের সীমা সুচিহ্নিত। যথা কবির 'সায়ংকাল' ও 'সায়ংকালের তারা' সনেট দুইটি ক্যাম্পবেলের 'টু-দি-ইভনিং স্টার' কবিতা দুইটির তুলনায় এই পার্থক্য সুস্পষ্ট।

মধুসূদনের সনেটের সঙ্গে বহু বিদেশী সনেটের তুলনায় ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিকে আর ভারাক্রান্ত করতে চাইনা। তবে স্বল্প আলোচনায় এ কথাই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান যে, বিদেশী সনেটের সঙ্গে সম্যক পরিচয় ভিন্ন মধুসূদনের সনেটের আলোচনা সম্ভবপর নয়।

মধুসূদন ও লা ফঁতেন

সতীনাথ ভাদুড়ী

অতি পরিচিত ঈসপের গল্পগুলিকেই পরিবর্ত্তিত রূপে আমরা দেখতে পাই মধুসূদনের নীতিগর্ভ কবিতার অধিকাংশগুলির মধ্যে। ইচ্ছা করলে ভারতের নিজস্ব নীতিগল্পগুলি থেকে তিনি আখ্যান ভাগ নিতে পারতেন, কিংবা নিজেও মৌলিক কাহিনী রচনা করতে পারতেন; কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, ঈসপের গল্পগুলিই ছিল তাঁর পছন্দ।

ঈসপের নিজের লেখা কোন গল্প আজও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি; হয়ত তিনি মুখে মুখে গল্প বলতেন। তবে একথা ঠিক যে, তাঁর নামে যে সব গল্প চলে, তাদের মধ্যে কিছু কিছু বিদেশ থেকে আমদানি করা। এই বিদেশী পণ্যের মধ্যে আমাদের বিষ্ণুশর্মার গল্পও বাদ যায় নি।

দুই হাজার বছরেরও আগে থেকে ঈসপের কাহিনীগুলোকে কাব্যরূপ দেবার প্রয়াস আরম্ভ হয়েছে। ইউরোপের সব ভাষাতেই কাব্যে রূপান্তরিত ঈসপের গল্প পাওয়া যায়। ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে মধুসূদন ইংরাজী ছাড়াও গ্রীক, লাতিন, ফরাসী, জর্মন ও ইতালীয় ভাষা জানতেন। গদ্যতে লেখা ইংরাজী ঈসপের কাহিনীই তিনি নিশ্চয়ই সব চেয়ে প্রথমে পড়েছিলেন। তাঁর জানা যে কোন একটা ভাষার পদ্যতে লেখা ঈসপের কাহিনী পড়ে বাংলায় নীতিগর্ভ কাব্য প্রবর্তন করার ইচ্ছা তাঁর হয়ত জাগতে পারত; কিন্তু সম্ভবত ফরাসী কবি La Fontaine-এর কাব্যই তাঁকে ঐরূপ কবিতা লেখার প্রেরণা জুগিয়েছিল। মধুসূদনের 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা' নামক কবিতাটির প্রথম কয়েক পঙ্‌ক্তির সঙ্গে ফরাসী কবির 'ওক গাছ ও নলখাগড়া' (Le Chene et Le Roseav) শীর্ষক কবিতার প্রথম লাইন কয়টির সাদৃশ্যই আমার অনুমানের মূল ভিত্তি।

লা ফঁতেনের জন্ম ১৬২১ খৃষ্টাব্দে, মৃত্যু ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে। তাঁর বাবা বন-বিভাগে কাজ করতেন। তিনি নিজেও কিছুকাল ওই কাজ করেছিলেন। সেই জন্য গাছ-পালা পশু-পাখী সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল বেশ গভীর। এই জ্ঞান তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁর কাব্যের ভিতর। তাঁর নীতিগর্ভ কাব্যের প্রথম সঙ্কলন গ্রন্থ (যার মধ্যে 'ওক গাছ ও নলখাগড়া' কবিতাটি আছে) প্রকাশিত হয় ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে। লা ফঁতেনের কাব্য বালক-বৃদ্ধ সব রকমের পাঠককে সমান

আনন্দ দিয়ে আসছে গত তিনশ বছর থেকে। এই নীতি-উপদেশমূলক কবিতাগুলো পড়ে ছেলেপিলেদের স্বভাবের উন্নতি হয়, না অবনতি হয় তা নিয়েও সে দেশের রথী মহারথীদের মধ্যে মতদ্বৈধ ঘটেছে এক সময়। ফরাসী সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ এই কাব্যের সংগে মধুসূদনের গভীর পরিচয় ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

যে চতুর্দশ লুই প্যারিসের অনতিদূরের ভারসেলস নগরে বিশাল রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করান, তাঁর ছয় বছরের ছেলেকে (যুবরাজ) লা ফঁতেন তাঁর "প্রথম কাব্য-সঞ্চয়ন" গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন। তাঁর 'দ্বিতীয় নীতিগর্ভ কাব্য সঞ্চয়ন' গ্রন্থও উৎসর্গ করা হয় যে মহিলাকে, তিনি ছিলেন রাজার রক্ষিতা। ফরাসী মনস্বী Taine-এর বিশ্বাস ছিল যে, লা ফঁতেনের পশুরাজ ও অন্যান্য জানোয়ারের গল্পগুলো চতুর্দশ লুই ও রাজদরবারের লোকজনকে ঠাট্টা করে লেখা।

ফ্রান্সে অবস্থান কালে মধুসূদন সেই রাজদরবারের শহর ভারসেলসেই থাকতেন। সেখানে থেকেই তিনি কলকাতার প্রেসে বই ছাপাতে দিয়েছিলেন। 'ভারসেলস নগরে রাজপুরী ও উদ্যান' সম্বন্ধে তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাও আছে। ওই সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে সেখানকার যে সমস্ত কবি "বীণার স্বননে, কথারূপ ফুলপুঞ্জ ধরি পুট করে, পূজিত সে রাজপদ"—তাঁদের কথাও মধুসূদনের মনে পড়েছে।

মধুসূদনের নীতিগর্ভ কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র সঙ্গে। তিনি তখন ইউরোপে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের "কথামালা" তখনও প্রকাশিত হয় নি।

১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে প্রথম সংস্করণের 'প্রকাশকদিগের বিজ্ঞাপন' থেকে জানা যায় যে, ফ্রান্সে ভারসেলসে অবস্থান কালেই তিনি নূতন বইয়ের জন্য লেখাগুলো পাঠিয়ে দেন। সেই 'বিজ্ঞাপন'-এর মধ্যে দেওয়া আছে যে কবি…"সুভদ্রার হরণবৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়া সময়াভাবে শেষ করিতে পারেন নাই।…তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য আদ্যন্ত সংশোধন করিবার এবং বিদ্যালয়োপযোগী আর একখানি নীতিগর্ভ পুস্তক রচনা করিবারও মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু সময়াভাবে সেগুলিও শেষ করিতে পারেন নাই, সকলই কিয়দংশ মাত্র লিখিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন।…আমরা উপযুক্ত সুভদ্রাহরণ, তিলোত্তমা ও হিতোপদেশের যে যে অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাহা 'অসমাপ্ত কাব্যাবলী' শিরোনাম দিয়া চতুর্দশপদীর শেষভাগে সংযোজিত করিয়া দিলাম।"…

প্রকাশকরা যাকে হিতোপদেশের অংশ বলেছেন, তার মধ্যে ছিল 'ময়ূর ও গৌরী', 'কাক ও শৃগালী', এবং 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা' নামক কবিতা তিনটি। মনে রাখা দরকার যে, এই গল্পগুলোর সঙ্গে সংস্কৃত 'হিতোপদেশ'-এর কোন সম্বন্ধ নাই। আর কবি 'বিদ্যালয়োপযোগী' কবিতা লেখার সংকল্প করেছিলেন কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। শৃগালীর মুখে 'রাস রসে' মাতবার কথা, কিংবা "…মোহ হে মদন

তুমি ; কি ছার যুবতী !”-র মত উক্তি, অথবা গৌরীমাতার ময়ূরকে উপদেশ “তোষ গিয়া ময়ূরীরে প্রেম আলিঙ্গনে”—ঠিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযোগী নয়।

লা ফঁতেনের ‘প্রথম সঞ্চয়ন’-এর গল্পগুলো ঈসপ থেকে নেওয়া, এ কথা তিনি বইয়ের ভূমিকায় বলেছেন। এই বইয়ের ‘ওক গাছ ও নলখাগড়া’র গল্প ঈসপের অনেক সংস্করণে ‘ওক গাছ এবং উইলো গাছ’ নামে দেখতে পাওয়া যায়। এই কাহিনীগুলোর সঙ্গে তুলনীয় হিতোপদেশের শ্লোক হচ্ছে—

তৃণানি নোন্মূলয়তি প্রভঞ্জনো
মৃদূনি নীচৈঃ প্রণতানি সর্বতঃ।
সমুচ্ছ্রিতানেব তরূন্ প্রবাধতে
মহান মহত্যেব করোতি বিক্রমম্ ॥

চারিদিকে ঝুঁকে-পড়া নমনীয় ছোট ছোট তৃণকে প্রভঞ্জনে উপড়ে ফেলে না, কিন্তু উঁচু গাছগুলোকে সমূলে উৎপাটিত করে, কারণ বড় বড়র কাছেই নিজের বিক্রম প্রকাশ করে।

লা ফঁতেনের ‘ওক গাছ ও নলখাগড়া’ কবিতাটির প্রথম দশ লাইনের অনুবাদ নীচে দেওয়া হল—

ওক গাছ একদিন বলল নলখাগড়াকে ঃ
“তোমার বেশ কারণ রয়েছে
প্রকৃতিকে নিন্দা করবার ঃ
ছোট্ট একটা পাখি (Roitlet)
তোমার পক্ষে ভারী বোঝা।
যে সামান্যতম হাওয়ায়
জলের উপর ঢেউয়ের কাঁপন লাগে কি না লাগে.
তার কাছেও তুমি নতশির হতে বাধ্য ;
আর আমার ককেসাস সদৃশ ললাট
শুধু তপনরশ্মি আটকেই খুশী নয়.
ঝড়ের বেগও প্রতিহত করে।
যা তোমার কাছে উত্তুরে ঝড়,
তা আমার কাছে মলয় বাতাস।”

আর ‘রসাল ও স্বর্ণলতিকা’য় আছে ;—

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে
‘শুন মোর কথা, ধনি ; নিন্দ বিধাতারে !
নিদারুণ তিনি অতি ;
নাহি দয়া তব প্রতি ;
তেঁই ক্ষুদ্রকায়া করি সৃজিলা তোমারে !

মলয় বহিলে হায়
নতশিরা তুমি তায়,
মধুকর-ভরে তুমি পড়লো হেলিয়া ;
হিমাদ্রি সদৃশ আমি
বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া !
কালাগ্নির মত তপ্ত তপন তাপন,—
আমি কি লো ডরাই কখন ?”

সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। নতশির হওয়ার কথা, মলয় বাতাসের কথা, তপন-কিরণের কথা উভয় কবিতার কয়েক লাইনের মধ্যে বিদ্যমান। শুধু এক-কবি প্রকৃতিকে নিন্দা করতে বলেছেন, আর এক কবি বিধাতাকে। ইউরোপের গগনচুম্বী ওক গাছ নিজেকে ককেসাস সদৃশ ভেবে গর্ব করে, আর ভারতের রসাল নিজেকে হিমাদ্রি সদৃশ ভাবে। তফাৎ শুধু এইটুকুতে যে ভারতের রসাল কনকনে উত্তুরে ঝড়ের কথা জানে না, আর ফরাসী দেশের ওক গাছের কালাগ্নির মত তপ্ত তপনের অভিজ্ঞতা নাই। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির আরম্ভের সঙ্গে সংগে উদ্ধার-চিহ্নেরও আরম্ভ, উভয় কবিতাতেই। চিন্তাধারা সাজাবার ক্রমও উভয় ক্ষেত্রেই প্রায়ই এক। অথচ কবিতা দুটো লেখা দুইশত বৎসরের ব্যবধানে।

এইখানে আরও একটা কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ফরাসী কবিতার অনুবাদে যেখানে ঝড়ের বেগ প্রতিহত করবার কথাটা লেখা হয়েছে, সেখানে লা ফঁতেন ফরাসী ভাষায় brave শব্দটা ব্যবহার করেছেন। ইংরেজী brave শব্দের সংগে এর আত্মীয়তা আছে। এই অনুষংগে ‘ডরাই’ কথাটা শেষের পঙ্‌তিতে আসা, সম্ভাবনার ভিতরে।

নলখাগড়াকে স্ত্রীলিংগ বলে ধরে নিলে, বিশেষ মোচড় না দিয়েও ফরাসী ভাষায় লেখা লাইন কয়টিকে এই রকম ভাবে বাংলা কবিতায় অনুবাদ করা যেতে পারে ;—

ওক গাছ কহে উচ্চে নলখাগড়ারে ;—
“শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ বিধাতারে ;—
নিদারুণ তিনি অতি,
নাহি দয়া তব প্রতি,
তেঁই ক্ষুদ্রকায়া করি সৃজিলা তোমারে।
মলয় বহিলে হায়,
নতশিরা তুমি তায়,
বাবুই পাখীর ভরে পড়লো হেলিয়া ;
ককেসাস তুল্য আমি
বন-বৃক্ষ-কুল স্বামী
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া।

তপন তাপন আর ক্রুদ্ধ প্রভঞ্জন,
আমি কি লো ডরাই কখন ?”

এখানে বলে রাখা ভালো যে, প্রথম দশ লাইনের পর কবিতা দুইটির মধ্যে আর বিশেষ কোন সুস্পষ্ট মিল নাই। আর “নিদারুণ তিনি অতি, নাহি দয়া তব প্রতি’র তুল্য কথা কয়টি ফরাসী কবিতার প্রথম দশ লাইনের মধ্যে অনুপস্থিত হলেও, সপ্তদশ লাইনে প্রায় অনুরূপ কথা বলা আছে। সে লাইনটা হচ্ছে—“প্রকৃতি তোমার উপর সুবিচার করেন নি বলেই আমার ধারণা।”

বক্তব্যের উদ্দেশ্য এক হলেও ঈসপের বইয়ে কিন্তু গল্পটাকে সাজান আছে অন্যরকম ভাবে।

লা ফঁতেনের সঙ্গে, ‘রসাল ও স্বর্ণলতিকা’র মত এতটা মিল অবশ্য মধুসূদনের অন্য কোন কবিতায় পাওয়া যায় না। তাই অন্য কবিতাগুলোর উপর লা ফঁতেনের প্রভাব সম্বন্ধে জোর গলায় কিছু বলাও যায় না। তবু বহু স্থানে বিবেচনা করে দেখবার অবকাশ আছে বলে মনে হয়।

মধুসূদনের ‘ময়ূর ও গৌরী’র অনুরূপ কবিতা লা ফঁতেনের Le Pson se plaignant a Junon’ (ময়ূর নালিশ জানাচ্ছে জুনোর কাছে)। ঈসপে এই গল্পের নাম ‘জুনো ও ময়ূর’। ‘ময়ূর ও গৌরী’তে আছে—

“বিবিধ কুসুম কেশে
সাজি মনোহর বেশে
বরেণ বসুধা দেবী যবে ঋতুবরে
কোকিল মঙ্গল ধ্বনি করে।”

ফরাসী কবিতায় আছে—“শুধু একাই সে বসন্ত ঋতুর সব সম্মানটুকু পায়।”

আমার কাছের দুইখানি ঈসপের-গল্পে এই বসন্ত ঋতুর কথাটা নাই। “ময়ূর ও গৌরী”তে আছে—

“আখণ্ডল ধনুর বরণে
মণ্ডলা সু-পুচ্ছ ধাতা তোমার সৃজনে।
সদা জ্বলে তব গলে
স্বর্ণহার ঝলঝলে ”

আর ফরাসী কবিতায় আছে ;—

“শত রকম রঙের রেশমের রামধনু
তোর গলায় ঘিরে।
তুই পেখম যখন খুলিস, তোর ঝলমলে
লেজের শোভা দেখে মনে হয় যেন
জড়োয়া গহনার দোকান দেখছি।”

'ময়ূর ও গৌরী'র শেষের দিকে আছে—

"সদূ-কূলে কোকিল গায়
বাজ বজ্রগতি ধায়"

ফরাসী কবিতাতেও 'ক্ষিপ্রগতি বাজপাখীর' উল্লেখ আছে। অন্তত দুইখানি Aesop's Fables-এ বাজপাখীর উল্লেখ নাই। অন্য কোন সংস্করণে আছে কিনা জানা নাই।

লা ফঁতেনের 'Le Gorbeau et le renard' আর মাইকেলের 'কাক ও শৃগালী'র কাহিনী এক। ঈসপের শৃগাল মধুসূদনের হাতে পড়ে শৃগালী হয়েছে, কারণ কাকের কালো রঙ ব্রজের শ্রীকৃষ্ণের কথা তাঁর মনে পড়িয়েছে। শৃগালকে শৃগালী না করলে তাকে ব্রজগোপীর স্থান দেওয়া যায় না।

মধুসূদনের কাকের মুখে আছে সন্দেশ। ফরাসী কবিতায় কাকের মুখে আছে পনীর। সমগোত্রের জিনিস দুটোই। ঈসপের গল্পে দেখছি,—"a dainty morsel of food" অথবা মাংসের টুকরো।

ফরাসী কবিতায় শৃগাল আসে খাদ্যের গন্ধে আকর্ষিত হয়ে। পনীরের গন্ধ সর্বজনবিদিত। মাইকেলের কবিতাতেও দেখি—"সুখাদ্যের বাস পেয়ে, আইল শৃগালী ধেয়ে।" যদিও আমাদের দেশের সন্দেশের গন্ধ মোটেই সুদূরপ্রসারী নয়।

বাংলার অন্য একজন কবির লেখা, ঈসপ থেকে নেওয়া এই কাক ও শৃগালের উপর কবিতায় দেখি কাকের মুখে ছিল ক্ষীরের মিঠাই। আর শৃগাল এ ক্ষেত্রে মিঠাইয়ের গন্ধে আকর্ষিত হয়ে আসে নি ; সে গাছের নীচেই ছিল আগে থেকে।

"ক্ষীরের মিঠাই চুরি করিয়া হরষে
চঞ্চুপুটে লয়ে কাক বৃক্ষডালে বসে।
তলেতে শৃগাল ছিল,
দেখে লোভ উপজিল।"

ইনি নিশ্চয়ই স্বাধীনভাবে ঈসপের কোন কোন সংস্করণ] থেকে 'আখ্যানভাগ নিয়েছিলেন।

এবার মধুসূদনের 'কুক্কুট ও মণি' শীর্ষক কবিতা দ্রষ্টব্য :

খুঁটিতে খুঁটিতে ক্ষুদ্র কুক্কুট পাইল
একটি রতন ;—
বণিকে সে ব্যাগ্রে জিজ্ঞাসিল ;
"ঠোঁটের বলে না টুটে, এ বস্তু কেমন ?"
বণিক কহিল—"ভাই
এ হেন অমূল্য রত্ন, বুঝি, দুটি নাই !"
হাসিল কুক্কুট শুনি ;—"তণ্ডুলের কণা
বহু মূল্যতর ভাবি ;—কি আছে তুলনা ?"

ঈসপের অন্তত দুইটি সংস্করণে, বণিকের কাছে নিয়ে যাবার কথাটা নাই। ফরাসী কবিতায় বণিকের স্থানে আছে জহুরী।

সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় 'কুক্কুট ও মণি' গল্পটির নীতি-উপদেশ এইরূপ হওয়া উচিত ;—

একজনের কাছে যা বহুমূল্য, আর একজনের কাছে তার কিছুমাত্র দাম নাই। আর জিনিসের দাম যতই হোক, যদি না সেটা আমাদের কোন কাজে লাগে তাহলে তার কোন মূল্যই নাই আমাদের কাছে।

কিন্তু মধুসূদন এই গল্পের শেষে, প্রয়োজনের চেয়েও দৃঢ় ভাষায় যে নীতি-উপদেশটা দিয়েছেন, সেটা একবারে অন্য রকমের।

"মূর্খ যে, বিদ্যার মূল্য কভু কি সে জানে ?
নর-কুলে পশু বলি লোকে তারে মানে ;—
এই উপদেশ কবি দিল এই ভানে।"

'বিদ্যার' কথাটা তোলা এখানে একটু অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়, বণিকের, কুক্কুটের বুদ্ধি সম্বন্ধে হীন ধারণা সত্ত্বেও।

লা ফঁতেনের 'কুক্কুট ও মুক্তা' কবিতাটিতে কিন্তু আলাদা করে কোন নীতি উপদেশ লেখা নাই। শুধু শেষের দিকে আর একটি ছয় লাইনের গল্প যোগ করে দেওয়া আছে।

"এক মূর্খ উত্তরাধিকার সূত্রে
একখানা পুঁথি পেয়ে সেখানাকে নিয়ে গেল
তার প্রতিবেশী পুস্তক বিক্রেতার কাছে।
সে বলল—আমার বিশ্বাস
পুঁথিখানা ভাল ; তবে সামান্য কিছু টাকা পেলে
আমার কাজ হত।

নিজের কবিতার নীতি উপদেশ লেখবার সময়, ফরাসী কবির লেখা উপরের লাইন কয়টা মধুসূদনের মনের মধ্যে ছিলো না তো ?

দুইজন কবির স্বাধীনভাবে একই যায়গা থেকে মাল মসলা নেওয়ার জন্যও মাঝে মাঝে বিবরণে ও চিত্রণে সাদৃশ্য এসে যাওয়া বিচিত্র নয়। ভুললে চলবে না যে, তাঁর নীতিমূলক কবিতা লেখার পদ্ধতি সম্বন্ধে লা ফঁতেন বলে গিয়েছেন (Epitre a Huet) :

"আমার অনুকরণ দাসত্ব নয়, আচার্যদের কাছ থেকে আমি নিই কেবল গল্পের বিষয় ও যুক্তি, নীতি উপদেশ দেবার প্রণালী ও শিল্পের নিয়মগুলো আর তাঁদের লেখার মধ্যে থেকে কোন কোন ভাল জায়গা যা আমার লেখার মধ্যে আনলে বেমানান দেখায় না। আমি চাই তার জন্য লেখায় যেন আড়ষ্টতা না আসে, অথচ চেষ্টা থাকে যাতে সেই পুরনো গন্ধটা বজায় থাকে।"

হ'তে পারে যে ফরাসী কবির দুই নিয়ম মধুসূদনও মেনে চলতেন নীতিগর্ভ কবিতা লেখবার বেলায়।

সে যাই হোক, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, মাইকেল লা ফঁতেনের কাব্য স্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অন্য সব যুক্তি অগ্রাহ্য হলেও, রসাল ও স্বর্ণলতিকার প্রমাণটাকে কিছুতেই বাতিল করা যায় না।

তাই শুধু জানতে ইচ্ছা করে, তিনি বিদেশী গল্পটার ভারতীয় রূপ দেবার সময় স্বর্ণলতিকাকে বাছলেন কেন? ওক গাছ না হয় আমাদের দেশে হয় না; নলখাগড়ার বেলা তো সেকথা খাটে না। স্বর্ণলতিকা লতা নয়—পরগাছা; অন্য গাছের উপরে ছাড়া বাঁচে না। আর রসালই তাঁর বক্তব্যের পক্ষে সব চেয়ে উপযোগী গাছ আমাদের দেশের? আম গাছ কি ওক গাছের জায়গা নিতে পারে? যে গাছ হিমাদ্রি সদৃশ বিশাল, যার শির আকাশ ভেদ করে মেঘলোকে ওঠে, যার ছায়ায় 'কেহ অন্ন রাঁধি খায়, কেহ পড়ি নিদ্রা যায়'—এই সব বিবরণ আম গাছের চেয়ে বট, অশ্বত্থ, পাকুড় প্রভৃতির পক্ষেই বেশি করে খাটে। আম ফলের রাজা; কিন্তু আম গাছ 'বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী' নয়। সংস্কৃতে বৃক্ষ-নাথঃ কথাটার মানে হচ্ছে বটগাছ। মধুসূদন বোধ হয় খুঁজছিলেন মিষ্টিকথা। সম্ভবত কাব্যের পক্ষে রসাল ও স্বর্ণলতিকা শব্দ দুইটির উপযোগিতাই তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল, গল্পের পক্ষে তাদের চেয়েও উপযোগী গাছ চোখের সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও। এরূপ নির্বাচন কিন্তু অসম্ভব ছিল লা ফঁতেনের পক্ষে। আর ফরাসী কবির শিশুর মত সরল কথার আড়ালে দুষ্টুমির হাসিটুকুও মধুসূদনের লেখায় নেই।*

"মধুসূদনের স্বদেশনিষ্ঠা কূর্মবৃত্তি নহে, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া স্বদেশের কুকুরকে পূজা করার হ্রস্বদৃষ্টিপ্রবণতা ইহাতে নাই। মধুসূদনের স্বদেশপ্রেম মানবিকতার মূল্যবোধে মহীয়ান।"

"তাঁহার জীবনের সমস্ত অমিতাচার তাঁহার কাব্যচর্চার উচ্চাদর্শকে কোনদিন ব্যাহত করিতে পারে নাই। পারে নাই যে তাহার কারণ, তাহাদের উভয়ে একই বৃক্ষের ফল—ইউরোপীয় রেনেসাঁস।"

"মধুসূদন ছিলেন তাঁহার যুগে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও অদ্বিতীয় কবি। কাব্য রচনায় তাঁহার অকুতোভয় উচ্চাদর্শ ও অনলস প্রস্তুতি, অনাগত যুগের কবিকুলের নিকট হইয়া থাকিবে অসীম বিস্ময়ের আধার।"

—নীরেন্দ্রনাথ রায়,

॥ সাহিত্য বীক্ষা ॥

---

* 'দেশ' ২৮বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ১৪ জানুয়ারী ১৯৬১-এ প্রথম প্রকাশিত। উক্ত পত্রিকার ২০ আগস্ট ১৯৮৩ তারিখে পুনর্মুদ্রিত। ডঃ গৌতম ভাদুড়ীর সহৃদয় অনুমতিক্রমে এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

—সম্পাদক।

মধুসূদনের নাট্যচিন্তা ও নাট্যাদর্শ

দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

আমাদের আলোচনার বিষয় হল 'কবি মধুসূদনের নাট্যচিন্তা ও নাট্যাদর্শ'। ঊনিশ শতকের বাংলার এই অসাধারণ প্রতিভাবান মানুষটি আমাদের কাছে কবিরূপেই অধিকতর পরিচিত। তাঁর সৃষ্টিশীল কবিসত্তার বিস্ময়কর কীর্তিতে আমরা এমনই অভিভূত যে তাঁর নাট্যরচনায় সাফল্য সম্পর্কে সব সময় সচেতন নই। অবশ্য কবিসত্তাই যে তাঁর প্রতিভার মৌল নিদান এবং তাঁর নাট্যসত্তার ওপরেও তার নিগূঢ় প্রভাব যে সর্বদা ক্রিয়াশীল—একথা অস্বীকার করা যায় না। বাংলার সেই দুর্দিনে নব-জাগৃতির বিশেষ পর্বে পাশ্চাত্ত্যের ভাবধারাকে স্বীয় প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করে কবি মধুসূদন দেশীয় ঐতিহ্যের আধারে কাব্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাব ও রূপের দিক থেকে আধুনিকতার যে বিপ্লবাত্মক রাজপথটি চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন সেকথাও বিস্মৃত হওয়া যায় না। কিন্তু বহুমুখী প্রতিভাধর কবি তাঁর স্বল্পকালীন সারস্বত-সাধনায় নাট্যকার হিসেবে কী করেছিলেন এবং বাংলা নাট্যশিল্পের উন্নতিকল্পে তাঁর চিন্তা-ভাবনা কেমন ছিল—এ সম্বন্ধেও সাহিত্য-রস-রসিক ব্যক্তিমাত্রেরই কৌতূহল থাকা খুবই স্বাভাবিক। মধু-প্রতিভাকে পূর্ণরূপে প্রদক্ষিণ করতে গেলে বা তার স্বরূপ সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে গেলে তাঁর নাট্যসত্তারও মর্মমূলে আলোকপাতের প্রয়োজন আছে। তাছাড়া জগৎ ও জীবন সম্পর্কে উদাসীন আত্মরতিবিলাসী গীতি-কবির ধর্ম তো মধুসূদনের নয়। অতি ঊর্ধ্বগ কবি কল্পনার অধিকারী হলেও জগজ্জীবন সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত বস্তুনিষ্ঠ মহাকাব্যের কবি তিনি। সুতরাং তাঁর প্রতিভা নাট্যরচনার প্রতিকূল হতে পারে না। জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের অনেকেই কাব্য ও নাটক উভয়-ক্ষেত্রেই নিজেদের সৃষ্টি-সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। এক্ষেত্রে মধুসূদনের কৃতিত্বের বিচার অবশ্যই একটি কৌতূহলোদ্দীপক অধ্যায়। তাই নাট্য-চিন্তা ও নাট্যরচনাও মধুসূদনের সর্বতোমুখী প্রতিভার একটি বড় দিক—এই কথা মনে রেখে আমরা এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের দুটি দিক। প্রথম অংশে মধুসূদনের নাট্যচিন্তা। মধুকবি তাঁর নানা পত্রে এবং বন্ধুদের সঙ্গে কথোপকথনে এ সম্বন্ধে যা বলেছেন, সেগুলির আলোকে তাঁর নাট্যচিন্তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাবে। বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট নাটকের অভাব এবং সে-অভাব মোচনের জন্যে তাঁর মানসিক উৎকণ্ঠা ও সক্রিয়

প্রয়াসের পরিচয় এখানে মিলবে। অবশ্য পত্রগুলিতে এবং নানাজনের সঙ্গে আলাপে তাঁর নাট্যাদর্শ সম্বন্ধেও বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু মন্তব্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাঁর নাট্যাদর্শের প্রকৃত-পরিচয় তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যেই রয়েছে। সেইজন্যে এই দুটি দিক সম্বন্ধেই অবহিত থেকে আলোচনায় অগ্রসর হতে হবে।

গোড়াতেই একটা প্রশ্ন মনে জাগে যে মধুসূদন নাট্যচিন্তায় পীড়িত হয়েছিলেন কেন? জীবনের প্রথম দিকে ইংরেজি ভাষায় কবিতা লিখে মহাকবি হওয়ার স্বপ্ন কবি মধুসূদনের মনে ছিল। সুদূর মাদ্রাজে যখন তিনি একরূপ অজ্ঞাতবাস করছেন তখনো বাংলা ভাষা সম্বন্ধে বা বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মনে কোনো দুশ্চিন্তা নেই। একজন জবরদস্ত ইংরেজি ভাষার সাংবাদিকরূপে ও কবিরূপে তখন সেখানে তাঁর খুবই প্রসিদ্ধি। 'ক্যাপটিভ্ লেডি' ও 'ভিসনস্ অব দি পাস্ট' লেখার সময়ও সেই স্বাপ্নিক কবিকেই প্রত্যক্ষ করি। বাংলাভাষার অনুশীলনের জন্যে বন্ধু গৌরদাস বসাকের বারংবার অনুরোধেও তিনি কর্ণপাত করেন নি। 'ক্যাপটিভ্ লেডি' নামক অতিশয় খ্যাত কাব্যটি পাঠ করে বেথুন সাহেব গৌরদাসকে মধুসূদন সম্বন্ধে যে উপদেশ দিলেন—সে কথা জেনে সর্বপ্রথম তাঁর মনে ভাবান্তর উপস্থিত হল। তারপর পিতৃ বিয়োগের পর ঘটনাচক্রে কলকাতায় এসে বন্ধুদের অনুরোধে বেলগাছিয়া নাট্যশালার জন্যে রামনারায়ণ তর্করত্নের অনুবাদিত নাটক 'রত্নাবলী'র ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়েই মধুসূদনের মনে প্রথম নাট্যচিন্তা জাগ্রত হল। শ্রীহর্ষের মূল নাটকটি পাঠ করে তাঁর মনে হল তখনকার দিনের বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার রামনারায়ণ এর বাংলা অনুবাদ ঠিক করতে পারেন নি। বন্ধু গৌরদাসের মুখেও শুনলেন ভালো নাটক বাংলা ভাষায় নেই। বস্তুত মধুসূদনের প্রথম বাংলা নাটক 'শর্মিষ্ঠা'র পূর্বে বাংলার নাট্য-জগতের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। আমাদের সংস্কৃত নাটকের গৌরবময় ঐতিহ্য মুসলমান আমলে প্রায় লুপ্তপ্রায় হয়েছিল। উনিশ শতকে ইংরেজদের রঙ্গালয়ের প্রভাবে এবং ইংরেজি নাটক, সংস্কৃত নাট্য, যাত্রা ও লোকনাট্যের সম্মিলিত আদর্শে বাংলা নাটক রচনার প্রয়াস লক্ষিত হয়। কিন্তু কার্যত কিছু অনুবাদ নাটক, কিছু পৌরাণিক ঘটনাকে নাট্যরূপ দেবার ক্ষীণ চেষ্টা ও দু' একটি মৌলিক নাটক লেখা হয়েছিল। এগুলির মধ্যে যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২), উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবাবিবাহ (১৮৫৬), রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীনকুলসর্বস্ব (১৮৫৪) কালীপ্রসন্ন সিংহের বাবু (১৮৫৩), তারাচরণ শিকদারের ভদ্রার্জুন (১৮৫২ -এর নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' ছাড়া অন্যগুলিতে নাট্যলক্ষণ একরূপ অনুপস্থিত। রামনারায়ণ নবযুগের দর্শকদের সম্মুখে সমাজের একটি দীর্ঘকালাগত ঘৃণ্য সমস্যাকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন—সেই কৌলিণ্য-প্রথার হৃদয়হীনতা ও তার যূপকাষ্ঠে নারীর মর্মান্তিক পরিণতি। কিন্তু উপযুক্ত প্লটের অভাবে, দ্বন্দ্বাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টির অক্ষমতায় এবং নাটকের পাত্র-পাত্রীদের আদ্যন্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ফুটিয়ে তোলার অনবধানতায় তাঁর

এ নাটক সমকালীন অন্যান্য নাটকের তুলনায় শ্রেষ্ঠ হলেও এর শিল্প-সাফল্য দর্শকদের মনে অতি গভীর রেখাপাত করতে পারে নি। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত রামনারায়ণ মূলত এ নাটকে সংস্কৃত নাট্যাদর্শকেই অনুসরণ করেছেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মর্মগত বিরোধে জাতির প্রাণে ও মনে যে নূতন আশা ও বিশ্বাস, যে নূতন সাহস ও শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছিল এবং বিদেশী রঙ্গালয়ে বিদেশী নাটকের অভিনয় দেখে জাতি যে নাট্যরসের প্রত্যাশা করছিল, রামনারায়ণ সে দাবি পুরোপুরি মেটাতে পারেন নি। সমকালীন সমাজ-ভাবনা, জীবনবোধ ও যুগরুচি সম্বন্ধে তিনি সচেতন হলেও সংস্কৃত নাট্যাদর্শের বাইরে বিচরণ করতে তিনি পারেন নি। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু'ও নাট্যরসের দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল রচনা। তারাচরণ শিকদার এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ সম্বন্ধে অবহিত হলেও তাঁদের রচিত নাটকে সে আদর্শকে তেমন গ্রহণ করতে পারেন নি। এইজন্যেই মধুসূদন-পূর্ব বাংলা নাটকে বৈচিত্র্যহীনতা এবং সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটকের বিশেষত সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ-কর্মের দিকে নাট্যকারদের ঝোঁক বেশি লক্ষ্য করা যায়। পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বন করে যে-কয়েকখানি নাটক লেখা হয়েছে সেগুলিতেও দ্বন্দ্বময় বৃত্ত, সার্থক চরিত্র সৃষ্টি বা প্রাণময় সংলাপ কিছুই দেখা যায় না।

১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হওয়ার জন্যে রামনারায়ণের অনূদিত 'রত্নাবলী' নাটকটি রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ কর্তৃক মনোনীত হয়। বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ দর্শকদের জন্যে এর ইংরেজি অনুবাদের দায়িত্ব সেকালের সব চেয়ে ভালো ইংরেজি-জানা ব্যক্তি মধুসূদনের ওপর বন্ধুদের চেষ্টায় ন্যস্ত হয়। বলাবাহুল্য এরই অনুবাদে অগ্রসর হতে গিয়েই তাঁর মনে প্রথম নাট্যচিন্তার উন্মেষ। 'রত্নাবলী'র দুটি অংক অনুবাদের পর বন্ধু গৌরদাস বসাককে তিনি লিখেছিলেন, "ইংরেজি সাহিত্যের নাট্যবিভাগের সঙ্গে তোমার কতদূর পরিচয় জানি না। কিন্তু আমি নিজের চাটুকারিতা নিজেই করছি—দেখতে পাবে বিশুদ্ধ স্যাক্সনী ইংরেজি ভাষায় (যা শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের ভাষা) আমি কেমন রচনা করেছি এবং বাংলা ভাষার ভাবের মধ্যেও কতখানি মৌলিকতা দেখিয়েছি।" ইংরেজি সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ, লাটসাহেব ও তাঁর পত্নী এ নাটকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করে পারেন নি।

এ নাটকটি অনুবাদের সময় শ্রীহর্ষের মূল নাটকটি মধুসূদন গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছিলেন। রামনারায়ণের অনূদিত নাটকটির যখন অভিনয়াভ্যাস চলছিল, তখন তিনি অনুবাদকে অত্যন্ত 'অকিঞ্চিৎকর' বলেছিলেন এবং এই শোচনীয় নাটকটির জন্যে রাজাদের প্রচুর অর্থব্যয়েও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। বন্ধু গৌরদাস জানালেন যে ভালো নাটক বাংলায় থাকলে তাঁরা 'রত্নাবলী'র অভিনয়

করতেন না। মধুসূদন তখন বলেছিলেন, "I wish I had known of it before as I could have given you a piece worthy of your Theatre." গৌরদাস তাঁর এ মন্তব্যে হেসেছিলেন এবং একটি বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করলে তিনি প্রত্যুত্তরে শুধু জানান,—"We shall see, we shall see."। ভালো নাটক বাংলা ভাষায় রচনা করবার প্রতিশ্রুতি একরূপ সেদিনই তিনি দিয়েছিলেন। আর তারই ফল, তাঁর যুগান্তরকারী নাটক 'শর্মিষ্ঠা'। এ নাটক রচনা করতে গিয়ে মধুসূদন যে কেমন প্রস্তুতি নিয়েছিলেন সে-কথা বন্ধু গৌরদাস আমাদের জানিয়েছেন। বন্ধুর সঙ্গে ঐ কথার পরদিনই সকালে এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে তখনকার দিনে প্রচলিত সমস্ত বাংলা নাটকগুলি এবং সংস্কৃত ভাষার প্রসিদ্ধ নাটকগুলি ঐ বন্ধুর সহায়তায় আনিয়ে পড়তে থাকলেন। দুই সপ্তাহের মধ্যেই তিনি 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটির রচনা সমাপ্ত করে রাজাদের ও যতীন্দ্রমোহনকে দেখানোর জন্যে গৌরদাসের হাতে পাণ্ডুলিপিটি দিলেন। এ নাটক লেখার বহুপূর্ব থেকেই মধুসূদন গ্রীক ও ইংরেজি নাটকের সঙ্গে বিশেষত শেক্সপীয়রের নাটকের সংগে খুবই পরিচিত ছিলেন। শুধু সংস্কৃত নাট্য ও বাংলা নাটকের সংগে পরিচয় ছিল না বলে তাঁর এত পরিশ্রম। প্রথম বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করতে যাচ্ছেন বলে বন্ধুদের অনুরোধে তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ নাট্যকার রামনারায়ণের সাহায্য নিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু রামনারায়ণ যে-ভাবে তাঁর নাটক সংশোধন করতে চেয়েছিলেন তাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি বন্ধু গৌরদাসকে যে-পত্র দেন তাতে তাঁর সাহিত্যাদর্শ ও নাট্যচিন্তার প্রতিফলন আছে। তিনি লেখেন, "আর এ বালাই যেন আমার না হয়। আমাকে চলতে হলে আমার নিজের পায়ের ওপর ভর করেই চলতে হবে। রামনারায়ণ আমার বাক্যগুলিকে পরিবর্তিত করুন এ আমি চাইনি—নিশ্চয় না। শুধুমাত্র ব্যাকরণগত ভুলগুলির সংশোধনের জন্য আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম। তুমি জানো, মানুষের রচনারীতির মধ্যে তার মন-প্রাণের প্রতিবিম্বটি পড়ে। তোমাকে বলতে কি, উক্ত ব্যক্তির সঙ্গে এই অধমের কোনো দিকেই কিছু মিল নেই। তবে আমি তাঁর কয়েকটি সংশোধন গ্রহণ করব।"

এই পত্রে তিনি আরো জানিয়েছেন যে তাঁর নাটকে বিদেশী হাওয়া কিছু থাকবেই। "কিন্তু যদি ভাষায় ব্যাকরণগত ভুল না থাকে, ভাব যদি হয় যথোপযুক্ত ও উজ্জ্বল, বস্তু যদি হয় চিত্তাকর্ষক এবং চরিত্রগুলি সুচারুরূপে অঙ্কিত, তাহলে বিদেশী আবহাওয়া তার মধ্যে থাকলেই বা ক্ষতি কি? মুরের কাব্যে প্রাচ্যভাবের আধিক্য বলে, বায়রণের কবিতায় এশিয়ার বাতাস আছে বলে বা কার্লাইলের লেখায় জার্মান ভঙ্গী আছে বলে কি কেউ তাদের অশ্রদ্ধা করে? তাছাড়া মনে রেখো আমি আমার সেই সব দেশবাসীর জন্যে লিখছি যাঁরা আমার মতোই চিন্তা করে এবং যাঁদের মন পাশ্চাত্য ভাবধারায় ও চিন্তায় উদ্বুদ্ধ।"

পত্রখানি একটু দীর্ঘ, কিন্তু এর মধ্যে মধুসূদনের নাট্যচিন্তার মূলসূত্রগুলি

প্রায় সবই ইঙ্গিত করা হয়েছে। রামনারায়ণের মতো সংস্কৃত পণ্ডিতের সঙ্গে নাট্যরচনায় মধুসূদনের মনের মিল হওয়ার কথা নয়। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র এবং কাব্য-নাটক সম্বন্ধে রামনারায়ণের জ্ঞান অতিশয় স্বচ্ছ। তিনি আচার্য ভরত ও বিশ্বনাথের নাট্য সম্পর্কিত নির্দেশকে বিশেষভাবে অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। সমকালীন সমস্যা সম্বন্ধেও তিনি ছিলেন সচেতন। কিন্তু দেশের নব্য যুবকগণের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের যে সঞ্জীবনী রস-পানের আগ্রহ দেখা দিয়েছে, তা. মেটাবার সাধ্য তাঁর ছিল না—কারণ তিনি পাশ্চাত্ত্য নাটকের আদর্শ সম্বন্ধে অবহিত হতে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর 'কুলীনকুলসর্বস্ব'-এর পরবর্তী নাটকগুলিতে এ বিষয়ে কতকটা সচেতনতার পরিচয় মেলে, কিন্তু মধুসূদনের নাট্যরচনার কালে তাঁর সে-প্রবণতা লক্ষণীয় হয় নি। তাই মধুসূদনের নাটকের সংলাপ-পরিবর্তনের বাড়াবাড়িতে যে চরিত্রগুলির সংগতি ক্ষুন্ন হতে পারে এ ধারণা তাঁর ছিল না। সাহিত্যতত্ত্বের এই মূলসূত্র মধুসূদনের জানা ছিল বলেই তিনি বুঝেছিলেন যে নাট্যরচনার ক্ষেত্রে তাঁকে একাকীই পথ চলতে হবে। তাঁকে নিজস্ব চিন্তায় নাট্যাদর্শের পথ স্থির করতে হবে। সংস্কৃতের দাস্যশীল অনুসরণে কোনো লাভ হবে না। তাই বন্ধু রাজনারায়ণকে কিছু পরে লিখেছিলেন অর্থাৎ শর্মিষ্ঠা লেখার পরে—"If I should live to write other dramas, you may rest assured, I shall not allow myself to be bound down by the dicta of Mr. Biswanath of the 'Sahitya-Darpan'. I shall look to the great dramatist of Europe for models". মধুসূদনের ধারণা ছিল (বলাবাহুল্য সে-ধারণা পাশ্চাত্ত্য আলংকারিকদেরই) লেখকের স্টাইলের মধ্যেই তাঁর প্রাণের প্রতিচ্ছবি পতিত হয়। রচনারীতির গুরুতর পরিবর্তনে লেখকের স্বকীয়তা ক্ষুন্ন হয়—তাই রামনারায়ণের আচরণে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর সহায়তা গ্রহণ করতে আর চান নি। অন্ধভাবে সংস্কৃত আলংকারিকদের নির্দেশ অনুসরণ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদেরই দৃষ্টান্ত তাঁর চোখের সামনে রাখতে চান। এর ফলে তাঁর রচিত নাটকে বিদেশী-প্রভাব লক্ষণীয় হয়ে উঠবে, কিন্তু তাতে তাঁর মৌলিকতা কোনোক্রমেই যে নষ্ট হবে না, দৃষ্টান্ত দিয়ে তা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি জোর দিয়েই বন্ধু গৌরদাসকে বলেছেন—'I may borrow a necktie or even a waist-coat, but not the whole suit'. অর্থাৎ ইউরোপীয় আদর্শকেও তিনি হুবহু অনুসরণ করবেন না। কিন্তু এমন একটি নাট্য রচনা করবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যা "will astonish the old rascals in the shape of Pandits." প্রথম নাটক রচনার সময়ে এতো বেশি চিন্তা করলেও তিনি যখন 'শর্মিষ্ঠা' লিখে শেষ করলেন, তখন স্বাধীন পথ ও মতের অনুবর্তী হয়ে সম্পূর্ণরূপে চলতে পারলেন না। তাঁর রচিত নাটক অভিনীত হবে অসংখ্য দর্শকের সামনে। এই সমস্ত দর্শকদের অধিকাংশই পাশ্চাত্ত্য নাট্যাদর্শের সঙ্গে বেশি পরিচিত নন, বরং সংস্কৃত

নাট্যাদর্শের সংস্কার তাঁদের অনেকেরই আছে। আর যে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় তাঁর নাটক অভিনীত হবে সেখানকার রাজাদেরও মতামতের একটা মূল্য আছে— বন্ধুদের পরামর্শকেও একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। মঞ্চসফল 'রত্নাবলীর' তৎকালীন অভিনেতৃগণের কথাও মনে রাখতে হয়েছিল। তাছাড়া নাট্যরচনার সময়ে তাঁর কাব্যপ্রেরণার অনিবার্য প্ররোচনাও আছে। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মতো ইউরোপীয় আদর্শ-নাট্যাকাশে স্বচ্ছন্দ বিচরণের পথে এ সমস্ত পরিস্থিতি মধুসূদনের পক্ষে ভারস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবার মূল নাটক 'রত্নাবলী' পাঠ করতে গিয়ে তাঁর অন্তরাত্মায় শ্রীহর্ষের ভারতীয় সংস্কার গভীরভাবে ছায়া ফেলেছিল। এই দোটানার মধ্যেই মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা রচনা। 'শর্মিষ্ঠা'র 'প্রস্তাবনা'য় তিনি বাংলা ভাষায় কবিতার মধ্য দিয়ে যে-কথাগুলি বলতে চেয়েছেন, তাতে তাঁর বিদ্রোহী সত্তার যে-পরিচয়ই থাক, সমকালীন বাংলা নাট্যের অবস্থা সম্বন্ধে যত বেদনাই প্রকাশ পাক, ভারতীয় শ্রেষ্ঠ কবি-নাট্যকারদের প্রতি শ্রদ্ধারও অন্ত নেই।

"মরি হায়, কোথা সে সুখের সময়,
যে সময়, দেশময় নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময়।
শুন গো ভারতভূমি কত নিদ্রা যাবে তুমি ?
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ, ত্যজ ঘুমঘোর হইল হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস, কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয় ?
অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।"

সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের গৌরবময় সুদিনের কথা স্মরণে রেখে সমগ্র ভারতভূমিকে আলস্য-নিদ্রা ত্যাগ করে পুনরায় জাগ্রত হতে মধুসূদন এখানে আহ্বান করেছেন। বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস ও ভবভূতির মতো কবি ও নাট্যকারদের অভাব-বেদনায় তিনি কাতরতা প্রকাশ করেছেন—সমকালীন বাঙালীর নাট্যরস-পিপাসার কদর্য পন্থায় মর্মান্তিকভাবে পীড়িত হয়েছেন।

খুব ঘটা করে শর্মিষ্ঠার অভিনয় বেলগাছিয়া নাট্যশালায় হয়ে গেল—অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রশংসাও মিলল। বলা হল, এটি বাংলাভাষায় একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, নাটক হিসেবে সম্পূর্ণ সফল, 'a gem truly worthy of the talented, donor রাজনারায়ণ বসু বললেন, এটি বিশুদ্ধ ক্লাসিক্যাল আদর্শে লেখা, অনেক স্থলেই খাঁটি কবিত্বে পূর্ণ এবং "displays considerable knowledge of human nature." অন্যদিকে প্রাচীনতন্ত্রের পণ্ডিতেরা কিন্তু খুশী হলেন না।

সংস্কৃত রীতি অনুসারে এ গ্রন্থ নাট্যপদবাচ্যই হয় নি—রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের সভাপণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ আলংকারিক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ বললেন, "দাগ দিতে গেলে কিছু থাকবে না। তবে কিনা, আমি যে-চোখে দেখছি, সে রকম চোখ আর গোটা দুই লোকের আছে; আমরা ফতে হয়ে গেলে তোমার বই খুব চলে যাবে, বাহবা বাহবা পড়বে।" এ নাটকে মধুসূদন নাট্যাদর্শ বিষয়ে কার্যত খুব বড় ধরনের বিদ্রোহ করেন নি, কিন্তু নানা বাধার মধ্যেও যে-টুকু করেছিলেন তাতে পণ্ডিতেরা সন্তুষ্ট হন নি। তবে প্রেমচাঁদ যুগের প্রবণতাটিকে বুঝেছিলেন বলেই পরবর্তীকালে এ নাটকের নব্যরীতিই যে জয়যুক্ত হবে এর ইঙ্গিত করেছিলেন। এ নাটকে সংস্কৃত নাটকের মতো 'প্রস্তাবনা' নেই—যে প্রস্তাবনা আছে তা সম্পূর্ণ নূতন। সংস্কৃত নাটকের অঙ্করীতিও তিনি গ্রহণ করেন নি। অংকগুলিকে তিনি গর্ভাংকে বিভক্ত করেছেন এবং তাতে স্থান-কালের ঐক্য রক্ষিত হয় নি। সংস্কৃত নাটকের সূচনায় নান্দী নটী এবং সূত্রধরের যে অভিনয় থাকে, তা এখানে নেই। আবার দু' অঙ্কের মাঝখানে বিষ্কম্ভক বা প্রবেশক নিয়ে এসে ব্যাখ্যামূলক অন্তর্দৃশ্য রচনাও করেন নি। সংস্কৃত পণ্ডিতগণের মতে এ নাটকে 'দুঃশ্রব্যত্ব', 'চ্যুত-সংস্কারত্ব', 'নিহিতার্থত্ব' প্রভৃতি অলংকার শাস্ত্রোক্ত বহু দোষ আছে। সংস্কৃতের এই সমস্ত বাহ্য কিছু কিছু নাট্যরীতিকে মধুসূদন বর্জন করলেও সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য-রীতিতে এ নাটক লেখা সম্ভব হয় নি। সংস্কৃত নাট্যের মতো স্বগতোক্তির বহুল প্রয়োগ, এবং বহুস্থলেই অকারণ প্রয়োগ, ঘটনার প্রত্যক্ষ চিত্র অংকন না করে পরোক্ষ-বিবৃতির সাহায্যগ্রহণ, দীর্ঘ প্রকৃতিবর্ণনা, গতানুগতিক বিদূষক চরিত্র অংকন, অলংকৃত বাক্যবিন্যাস—শর্মিষ্ঠায় লক্ষ্য করা যাবে। তাছাড়া এ নাটকে যযাতি, দেবযানী ও শর্মিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে ত্রিভুজ-প্রেমের যে-সমস্যা ও তার সমাধানের কথা বলা হয়েছে, তাও সংস্কৃত নাট্যের ভারতীয় আদর্শসম্মত পন্থা। মধুসূদন শুধু মহাভারতের কাহিনীকে নাট্যকাহিনীতে রূপান্তরণের জন্যে যে গ্রহণ-বর্জন করেছেন তাতে কিছু মৌলিকতা দেখিয়েছেন। কাহিনী বা নাট্যবস্তুকে পঞ্চঅংকে বিন্যস্ত করার মধ্যে এবং শর্মিষ্ঠা চরিত্র-সৃষ্টিতে দু'একটি স্থলে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর আছে এবং তিনি পাশ্চাত্য-রীতির অনুগামী হতে চেষ্টা করেছেন।

যাই হোক, প্রথম নাটক রচনায় যথেষ্ট উৎসাহ পেয়ে মধুসূদন দ্বিতীয় নাটক রচনায় হাত দিলেন। বন্ধু গৌরদাসকে লিখলেন,—"Now, that I have got the taste of blood, I am at it again." ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে-র মধ্যে এর চারটি অংক লেখা যখন শেষ করেছেন, তখন রাজা ঈশ্বরচন্দ্র বেলগাছিয়া নাট্যশালার উপযোগী পারিবারিক ফার্স রচনা করতে তাঁকে অনুরোধ করলেন। 'পদ্মাবতী' নামক যে দ্বিতীয় নাটকটি তিনি লিখছিলেন, তা অসমাপ্ত রেখেই মধুসূদন 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামক ফার্স দুটি

লিখে ফেললেন। এ-দুটির কথায় আমরা পরে আসছি। এখন 'পদ্মাবতী'র কথা। শর্মিষ্ঠায় মধুসূদন মহাভারত থেকে নাট্যকাহিনী গ্রহণ করেছিলেন—এবারে তিনি পুরোপুরি ভারতীয় পুরাণের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চাইলেন না। তিনি গ্রীক-পুরাণের একটি অতি-পরিচিত কাহিনীকে ভারতীয় রূপ দিলেন এবং তার সঙ্গে ভারতীয় পৌরাণিক-কাহিনীর আদর্শকে সংমিশ্রিত করে নাট্যরচনার ক্ষেত্রে বস্তু-রচনায় অধিকতর স্বাধীনতা নিতে চাইলেন। সংস্কৃত নাটকের দোষ-গুণ যা শর্মিষ্ঠায় লক্ষ্য করা যায়, তা 'পদ্মাবতী'তেও বহুলাংশে অনুসৃত, তথাপি কয়েকটি বিষয়ে তাঁর মৌলিকতা ও নৈপুণ্য লক্ষ্য করার মতো। একটি গ্রীক কিংবদন্তীতে আছে যে তিন দেবী জুনো, মিনার্ভা ও ভিনাসের মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। কে বেশি সুন্দরী স্থির করার জন্য তাঁরা ট্রয়ের যুবরাজ প্যারিসের কাছে উপস্থিত হন। প্যারিস ভিনাসকে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলায় অন্য দুই দেবী তাঁর সর্বনাশ সাধনে তৎপর হন—আর ভিনাস তাঁকে মেনেলাউসের পত্নী হেলেনকে উপহার দেন। এর ফলেই ট্রয়-যুদ্ধ এবং ট্রয়বংশের ও ট্রয়নগরীর মহাসর্বনাশ। এই কাহিনীর ছাঁচে মধুসূদন দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী শচী, কুবের-পত্নী মুরজা ও মদনপত্নী রতির মধ্যে সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতার কল্পনা করেছেন, আর এর মীমাংসার জন্যে তাঁরা প্রতিষ্ঠানপুরীর রাজা ইন্দ্রনীলের নিকট উপস্থিত হয়েছেন। ইন্দ্রনীল রতিকে সুন্দরী বলায় রতি সুন্দরী-পত্নী পদ্মাবতীকে তাঁকে উপহার দিলেন, আর এই দুই দেবীর কোপে পতিত হলেন। এর ফলে ইন্দ্রনীল পদ্মাবতীকে লাভ করেও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে রইলেন। শচীর আদেশে কলিরাজ রাজ্যভ্রষ্ট ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীকে অশেষ নির্যাতনের মধ্যে ফেললেন। এই পর্যন্ত গ্রীক অদৃষ্টবাদের ছায়ায় নাটকের কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। তারপরেই দেখানো হয়েছে পদ্মাবতী মুরজারই কন্যা। তিনি শাপভ্রষ্টা হয়ে মর্তে এসেছেন—শাস্তিভোগের জন্যে। সে-কথা জানতে পেরে ভবানী পদ্মাবতীর দুঃখ-কষ্টের অবসান ঘটালেন ইন্দ্রনীলের সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটিয়ে। ভারতীয় অদৃষ্টবাদ এইখানে। এ-কাহিনী মধুসূদনের নিজস্ব। আর তিনি পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতিতে যে-ভাবে পাঁচটি অঙ্কে নাট্যবস্তু রচনা করেছেন, তাতে পূর্ববর্তী নাটকের চেয়ে এর বস্তু অনেকখানি সুসংহত ও সুগ্রথিত হয়েছে। প্রথম অঙ্কে ইন্দ্রনীলের বিচার-দৃশ্যে তিন দেবীর মধ্যে রতির সঙ্গে মুরজা ও শচীর বিরোধ কেন—তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ; দ্বিতীয় অঙ্কে তিন দেবী কর্মপন্থা স্থিরীকরণে চিন্তিত। তৃতীয় অঙ্কে ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতী জটিলতার মধ্য দিয়েও মিলিত ও রতির সাফল্যের কথা। চতুর্থ অঙ্কে অপর দুই দেবীর চক্রান্তে ও সক্রিয়তায় ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীর জীবনে অশেষ দুর্গতি। আর পঞ্চম অঙ্কে সকল বিরোধের অবসান এবং পদ্মাবতী ও ইন্দ্রনীল পুনরায় মিলিত হয়েছেন। চরিত্র-সৃষ্টিতেও মধুসূদন এ নাটকে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন—বিশেষত রতি, মুরজা ও শচীর মধ্যে পার্থক্য রক্ষা করে। পদ্মাবতীর

ওপর নির্যাতন-ব্যাপারে মুরজার অপেক্ষাকৃত কোমলভাব পরবর্তীকালে মাতা-মুরজারূপে পরিচিতা জননীর যেন অতি-স্বাভাবিক আচরণ। শর্মিষ্ঠা নাটকের মাধর্য্য সংস্কৃত নাটকের ছায়ায় সৃষ্ট হলেও এ নাটকের বিদূষকের চাতুর্য বিশেষ-ভাবে প্রশংসনীয়। শেক্সপীয়রের ফলস্টাফ চরিত্রের কথা মনে রেখেই এ নাটকের বয়স্য চরিত্রে নানা ঘটনায় তিনি মৌলিকতা দেখিয়েছেন। অবশ্য ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীর চরিত্র-সৃষ্টিতে তিনি সার্থক নন। দৈব-শক্তির অধীন মানুষ চরিত্রের মধ্যে স্বাধীনতা দেখানো কঠিন। তবুও যেটুকু ছিল মধুসূদন তার সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। তাছাড়া এ নাটকে মধুসূদনের কবিত্বশক্তিও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। চরিত্রগুলিকে একটা কোন পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে তার মধ্য থেকে নাট্যরস-সৃষ্টির চেষ্টা তিনি করছেন না—সমস্যাস্থলগুলোকেও তিনি এড়িয়ে চলেছেন একথা সবই সত্য। কিন্তু গদ্যে লিখিত নাটকখানির সংলাপে কবিত্বরস প্রচুর আছে। আর সেই কবি-প্রেরণার বশেই মধুসূদন এখানে দু'একটি স্থলে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। সমস্ত নাটকটি যদি অমিত্রাক্ষরে তিনি লিখতে পারতেন, তাহলে এর মূল্য অনেক বৃদ্ধি পেত বলে মধুসূদন মনে করেছিলেন। তাই পত্রে তিনি বলেছেন, "যদি কেবল পাখা মেলতে পারতাম, যদি শুধু অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ধরতে পারতাম।" আর এ ছন্দকে আশ্রয় না করতে পারলে বাংলা নাটকের উন্নতিও নেই। কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্যে দেশবাসী তখনো যে প্রস্তুত হয় নি। তার প্রমাণ আছে যতীন্দ্রমোহনের পত্রে। এইজন্যই মধুসূদন তাঁর এ নাটকে পুরোপুরি এ ছন্দের প্রয়োগ করেন নি—করলে অবশ্য নাট্যকাব্য-রূপে এর একটি পৃথক উচ্চতর শিল্পমূল্য দেখা দিত।

মধুসূদনের লেখা ফার্স দুটি রাজারা তাঁদের নাট্যশালায় অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে পারলেন না—খুব সম্ভবত এ দুটির একটিতে যে-ভাবে সমকালীন ইয়ংবেঙ্গল সমাজের ইতরতা এবং অন্যটিতে এ দেশের রক্ষণশীল সমাজের ভণ্ডামি ও লাম্পট্যকে তিনি আক্রমণ করেছেন, তা দর্শকদের মনোরঞ্জন করবে না বলেই। এর জন্যে মধুসূদন মানসিক কষ্টও কিছু কম পান নি। এ দুটি গ্রন্থ প্রকাশের কথায় তিনি বলেছিলেন "I half regret having published those two things" শুধু তাই নয়। বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন, 'তুমি জানো এখনো জাতীয় নাট্যশালা বলে কোন জিনিস আমাদের দেশে জন্মলাভ করে নি। তার অর্থ এই যে, এখনো আমরা যথেষ্ট সংখ্যক নাটক—সুস্থির ও উন্নত আদর্শের নাটক রচনা করতে পারি নি যাতে দেশের সুরুচি গঠন ও পরিচালন সম্ভব হয়। আমাদের এখনো প্রহসন রচনা করবার সময় হয় নি।" অথচ এই ফার্সের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু গ্রহণের জন্যে মধুসূদন দূরে পৌরাণিক জগৎ বা ইতিহাস-জগতে বিচরণ করেন নি। চোখের সামনে ইংরেজি সংসর্গে দেশের মধ্যে যে নব্য যুবকের দল গড়ে উঠেছিল

—তাদেরই একটি শ্রেণীর মধ্যে মদ্যপানের আতিশয্য, বারাঙ্গনা-বিলাসের মত্ততা এবং গুরুজনদের প্রতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ দেখিয়ে প্রাচীন সমস্ত কিছুকে আক্রমণ ও নিজেদের প্রগতিপরায়ণ বলার যে অশোভনতা তাকেই তিনি কটাক্ষ করেছেন 'একেই কি বলে সভ্যতা'য়। আর বাইরে ধর্মধ্বজী গোঁড়া হিন্দু ও ভিতরে লম্পট এক ভণ্ড বৃদ্ধের মুখোস খুলে দিয়ে 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ফার্সে সমসাময়িককালের রক্ষণশীল সমাজের একাংশের চিত্রটিকে উদ্ঘাটিত করেছেন তিনি। বলাই বাহুল্য এ দুটি ক্ষেত্রেই স্বাধীনভাবে মধুসূদন অগ্রসর হতে পেরেছেন। সংস্কৃত প্রহসনের আদর্শ এখানে তাঁকে পথ দেখায় নি। বরং গ্রীক কমেডি এবং মলিয়েরের কমেডি ও ফার্সের জগৎ থেকে তিনি উৎসাহ পেয়ে থাকবেন। তৎকালীন বাংলার এ দুখানি শ্রেষ্ঠ ফার্স এবং পরবর্তীকালেও এ দুটিকে খুব বেশি ফার্স অতিক্রম করেছে—এ কথা বলা যাবে না। এ-দুটি শিল্প হিসেবে এমনই উন্নত যে সূক্ষ্ম বিচারে এদের প্রহসন বা ফার্স বলাই কঠিন—কমেডির অনেক লক্ষণ এর মধ্যে থাকায় এদের মিশ্র নাটক বলাই সঙ্গত। ফার্সে নিখুঁত বস্তু-গঠনের দাবি করা চলে না—অল্পায়তনে চরিত্রসৃষ্টিতেও সার্থকতা দাবি করা হয় না—পরিস্থিতি সৃষ্টি এবং ঘটনা বিন্যাসের সুকৌশলের মধ্য দিয়ে হাস্যরসসৃষ্টিই এর বড় কথা। তথাপি মধুসূদনের এ দুটি ফার্সে নিপুণ ঘটনার বিন্যাস, পরিস্থিতি সৃজনের দক্ষতা, অসঙ্গতিজনিত হাস্যরস-সৃষ্টিতে সাফল্য এবং প্রাণময় অপরূপ সংলাপ লক্ষণীয়। প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টি শিল্প-লক্ষণে বেশি সার্থক। সমসাময়িক সমাজ সম্বন্ধে তিনি যে কতখানি চিন্তিত ছিলেন এ দুটি গ্রন্থে তার প্রমাণ আছে। পুরোপুরি পাশ্চাত্ত্য আদর্শেই এ দুটি ফার্সকে তিনি রূপ দিতে পেরেছেন। 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী'তে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তিনি যে-পথে অগ্রসর হতে পারেন নি—এখানে তা পেরেছেন। প্রধান চরিত্রগুলি কমেডির আদর্শেই অঙ্কিত করার চেষ্টা করেছেন তিনি এবং মলিয়ের যে-ভাবে নাট্যবৃত্তের একটি বিশেষ পর্বে ঘটনাকে চরমে নিয়ে গিয়ে পরিস্থিতি-সৃষ্টি করেন—এ দুই ফার্সে 'জ্ঞানতরঙ্গিনীসভা' ও 'ভগ্নশিবমন্দিরের' ঘটনা বর্ণনায় তিনি সেই পথই অবলম্বন করেছেন।

'পদ্মাবতী'র পরে ইতিহাসের 'রিজিয়ার' কাহিনী নিয়ে নাটক লেখার ইচ্ছে হয়েছিল মধুসূদনের। কিন্তু মুসলমানী কাহিনী বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অনুমোদন পেল না। বন্ধু রাজনারায়ণ স্বাদেশিকতা এবং জাতীয়তাবোধক নাটক লেখার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন। আবার সেকালের খ্যাতিমান অভিনেতা কেশব গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে রাজপুত কাহিনী নিয়ে নাটক লিখতে বলেন। মধুসূদন রাজনারায়ণের অনুরোধের উত্তরে জানালেন, "আমি আরো তিন চারটি ক্লাসিক আদর্শের নাটক রচনা করে যেতে চাই—যাতে আমার দেশবাসী বুঝতে পারে উন্নত নাট্য-সাহিত্য কাকে বলে। এর পরেই ঐতিহাসিক ও অন্যান্য নাটকে হাত দিব।

তুমি জাতীয় কাব্য রচনার পক্ষে যে বিষয়টির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, বলতে পারি তা সুন্দর—অতি সুন্দর। কিন্তু আমার এখনো সন্দেহ আছে তাকে গ্রহণ করার উপযোগী শিল্পশক্তি আমার জন্মেছে কিনা। তোমাকে আরো কয়েকটি বছর অপেক্ষা করতে হচ্ছে।" মধুসূদনের এ ইচ্ছে ঠিক পূরণ হয় নি। 'পদ্মাবতী'র পরে কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুরোধে তিনি টডের রাজস্থান থেকে কাহিনী নিয়ে একখানি ঐতিহাসিক ট্রাজেডি লিখলেন—'কৃষ্ণকুমারী'। এই নাটকটি সম্বন্ধে কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বহু পত্রালাপ ঘটে এবং সেগুলিতে তাঁর নাট্যচিন্তা ও নাট্যাদর্শ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। নাটকটি লেখার জন্যে মধুসূদনের কি গভীর পরিশ্রম ও উদ্বেগ। রাজনারায়ণকে তিনি লিখছেন, "For two nights I sat up for hours pouring over the tremendous pages of Tod and about 1 A. M. last saturday, the Muses smiled." ১৮৬০ খৃীস্টাব্দের ৬ই আগস্ট থেকে ৭ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে নাটকটি লিখিত। এটি বাংলা ভাষায় প্রথম ঐতিহাসিক ট্রাজেডি। বিশেষ করে তিনি যে ট্রাজেডি লিখছেন সে-কথা মনে করিয়ে দিয়ে বন্ধুকে বলেছেন, "I have been dramatizing, writing a regular tragedy." আমাদের দেশের তৎকালীন সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নারীদের নাটকে কিভাবে স্থান দেবেন এ নিয়েও তিনি যথেষ্ট বিব্রত বোধ করেছেন। তিনি বন্ধুকে জানিয়েছেন আমাদের দেশে নাটকের মধ্যে কোন স্ত্রী চরিত্র অন্য কোন পুরুষ চরিত্রের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে—এ দৃশ্য দর্শকদের আঘাত দেবেই যদি সেই পুরুষ তার স্বামী, ভ্রাতা বা পিতা না হয়। অথচ "The position of European females, both dramatically as well as socially, are very different." যেখানে নারী-স্বাধীনতা বলতে কিছুই নেই, সেখানে দর্শকদের মুখ চেয়ে সীমিত ক্ষেত্রেই তাদের আনয়ন করতে হয়। তাছাড়া পাশ্চাত্ত্যে জীবনের যে বাস্তব রূপ, প্রবৃত্তির যে সংঘর্ষ দেখা যায় তার তুলনায় আমাদের জীবন নিস্তরঙ্গ ও শান্ত। বন্ধু গৌরদাসকে তিনি লিখছেন, "ইউরোপীয়দের তুলনায় এশিয়াবাসীরা অধিকতর রোমান্টিক মনোভাবাপন্ন। শকুন্তলার মত রোমান্টিক নাটক পাশ্চাত্ত্যে নেই। "In the great European drama, you have the stern realities of life, lofty passion and heroism of sentiment. With us it is all softness and all romance. We forget the world of reality and dream of fairy land". আমাদের নাটক এখনো মাঝামাঝি ধরনের উন্নত হয় নি—এখানে শুধুই নাট্যকাব্য। মধুসূদন যে প্রকৃতপক্ষে কবি এবং এ সত্তা তাঁর নাট্যরচনাতেও যে প্রভাব বিস্তার করে তা তিনি জানেন। আর এ সত্তার প্ররোচনায় তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী'-তে নাট্যগুণের কিছু হানি ঘটেছে একথা স্বীকার করতেই হয়। তাই 'কৃষ্ণকুমারী' রচনার সময়ে এ বিষয়ে তিনি সতর্ক থাকবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন—কবিত্বরসকে ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি অকারণ এদিক-ওদিক চাইবেন না—ঘটনার

ধারায় স্বাভাবিকভাবে কবিত্ব এসে পড়লে তাকে তিনি অবশ্য বর্জন করতে চান না। নাটকের নাটকীয়তাকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনে অথবা নাটকের প্রয়োজনে কবিত্ব দেখা দিলে কোন নাটকের পক্ষেই তা দোষাবহ তো নয়ই বরং তার মূল্যই বৃদ্ধি করে। এ বিষয়ে মধুসূদনের সচেতনতা লক্ষণীয়। এখন তিনি বুঝেছেন, শুধুই প্লট বা বৃত্ত নয়, সার্থক-চরিত্র সৃষ্টি নাট্যকারের সর্বাপেক্ষা বড় কাজ। আর সে চরিত্র হবে স্বাভাবিক, জীবন্ত ও সঙ্গতিপূর্ণ। তিনি লিখছেন, 'I shall endeavour to create characters who speak as nature suggests and not mouth-mere poetry.'।—আর এ আদর্শ তো শেক্সপীয়রের।

নাটকের প্লট সম্বন্ধে তিনি নাট্যরচনার শুরু থেকেই চিন্তা করছেন। প্লট বা বৃত্তকে জটিল করে তুলতে দু' একটি বেশি চরিত্রের যে আমদানী করতে হয়, এ তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি এখন অবহিত। তিনি ঐতিহাসিক নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'র বৃত্ত বা কাহিনী নির্বাচন করতে গিয়ে বেশ সংকটের মধ্যে পতিত হয়েছিলেন। অকারণ যুদ্ধের বর্ণনা ও রাজনৈতিক আলোচনার দ্বারা ভারাক্রান্ত করলে নাট্যবৃত্ত আকর্ষণীয় হয় না—দর্শক বা পাঠকদের বিরক্তি উৎপাদন করে। তাই তিনি এ নাটকে যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা প্রত্যক্ষভাবে করেন নি—রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝার ছায়াতলে একটি রাজ-পরিবারের পারিবারিক জীবন-রস পরিবেশন করেছেন। নাটকটি ট্রাজেডি বলে তিনি হাস্য-উদ্রেকের উদ্দেশ্যে কোন দৃশ্যকে আনেন নি। তিনি জানতেন এতে নাটকটির স্থায়িভাব বিনষ্ট হত। কিন্তু চলবার পথে যখন কোন হাস্যকর কথা সহজে এসে গেছে, তাকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। আর এ নীতিকে তিনি শেক্সপীয়রের নীতি বলে শ্রদ্ধা করে বলেছেন,—"Never strive to be comic in a tragedy; but if an opportunity presents itself unsought to be gay, do not neglect it in the less important scenes, so as to have an agreeable variety। ঐতিহাসিক নাটকের চরিত্রগুলির পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন, "আমি জগৎসিংহকে ইতিহাসে যেমন পেয়েছি, তেমনি রেখেছি—ক্ষুদ্রচেতা ও বিলাসী। ভীমসিংহ বিষণ্ণ ও গম্ভীর প্রকৃতির চরিত্র। তাঁর স্ত্রীও তাঁর মত বিষণ্ণ ও গম্ভীর না হয়ে পারেন না।" তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে বলেছিলেন, "I have certain dramatic notions of my own, which I follow invariably." কেবলমাত্র ভাবময় কথার দ্বারা, ভাবুকতার দ্বারা বা বক্তৃতার দ্বারা তিনি দর্শককে আবিষ্ট করতে চান নি। তাঁর নাটককে শেক্সপীরীয় আদর্শে বিচার করতে বন্ধুদের বারণ করে দিয়েছিলেন—কারণ "Our social and moral developments are of a different character."

অভিনীত হবার আশায় তিনি নিজ কবি-কল্পনাকে সংযত করে গদ্যেই লিখলেন নাটকটি। কিন্তু এত যত্ন ও এতখানি সাবধানতার সঙ্গে নাটকটি লিখেও তাঁর প্রত্যাশা পূরণ হয় নি। বেলগাছিয়া নাট্যশালার দর্শকদের কাছে নাটকটির

ট্রাজেডি-রস আদরণীয় হবে না ভেবেই সেখানে এর অভিনয় হল না। সেকালের ক্ষমতাবান সম্ভ্রান্ত দর্শকদের কেউ কেউ মধুসূদনের প্রহসনের মধ্যে নিজেদের প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করে তাদের অভিনয় হতে দেন নি—এক্ষেত্রেও তাঁরাই জয়ী হলেন। নিদারুণ বেদনায় মধুসূদন কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন, "...Mind, you all broke my wings once again about the farces , if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew or chinese."

সে যাই হোক, 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকটি তাঁর পরিণত শিল্প-প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। ঐতিহাসিক নাটক রচনা খুবই দুরূহ। ইতিহাসের চরিত্রগুলির মোটামুটি ঐতিহাসিক পরিচয় রক্ষা করে তাদের মধ্যে মানবিক গুণ-সঞ্চার করতে হয়—ইতিহাসের নীরবতাকে কল্পনাশক্তির দ্বারা নাট্যকারকে পূরণ করতে হয়। সেদিক থেকে নায়ক ভীমসিংহ, কৃষ্ণা চরিত্র ও মহিষীর চরিত্র সার্থক। ঐতিহাসিক নাটক রচনার মূলসূত্রটিকে প্রথম ব্রতী যে ধরতে পেরেছিলেন, এটা কম বিস্ময়কর নয়।

উদয়পুরের রাণা ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারীর রূপ-সৌন্দর্যের কথা শুনে জয়পুর রাজ জগৎ সিংহ এবং মারবারের রাজা মানসিংহ দুজনের তরফ থেকেই তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব আসে। পিতা ভীমসিংহ রাজী না হলে তাঁরা উদয়পুর আক্রমণ করবেন। রাণা ভীমসিংহ তখন অত্যন্ত দুর্বল—এঁদের কারো প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার শক্তি নেই। সুতরাং তিনি শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন কন্যাকে হত্যা করবেন। কিন্তু তার আর প্রয়োজন হল না—কৃষ্ণা নিজেই বিষপানে প্রাণত্যাগ করলেন। ইতিহাসের এই ঘটনাকে আশ্রয় করে মধুসূদন নাটকের দ্বন্দ্বাত্মক বৃত্ত রচনার চেষ্টা করেছেন। একথা সত্য যে, ভীমসিংহের মধ্যে বা কৃষ্ণার মধ্যে যতখানি অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টির সুযোগ ছিল, মধুসূদন তা গ্রহণ করতে পারেন নি। ট্রাজেডি-নায়ক বা নায়িকার চারিত্রিক কোন দুর্বলতার পথে কিংবা কোন একটি প্রবৃত্তির মারাত্মক একদেশ-দর্শিতায় জীবনে যে ট্রাজেডি আসে তার আভাস ভীমসিংহের মধ্যে থাকলেও বিরুদ্ধ প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে বোঝাপড়ায় তাঁর ব্যর্থতা চোখে পড়ে। ঘটনা-ঐক্য এবং স্থানগত ঐক্য সম্পর্কে মধুসূদনের অধিকতর সচেতনতা এখানে লক্ষ্য করতে পারি। আর ভাষা সম্পর্কেও এখানে তিনি বিশেষভাবে যত্নবান। বাংলা ভাষার একটা সার্থক রূপ নাটকে গ্রহণ করার মত অবস্থা তখনো চোখের সামনে ছিল না। তবুও বাংলা ভাষার অপরিবর্তনীয় রীতিটিকে মনে রেখে নিজেই তাকে নবরূপে তৈরী করে নিয়েছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর ভাবনার কথা স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, 'As for language, the Drama to be written in, I shall follow Dr Johnson's advice.—"It there be", says he, "what I believe there is, in every nation a style which never becomes obsolete, a certain mode of phraseology so consonant and congenial to the analogy and

principles of its respective language, as to remain settled and unaltered. This style is to be probably sought in the common intercourse of life, among those who speak only to be understood, without the ambition of elegance." শেক্সপীয়রও এই নীতি অনুসরণ করেছিলেন বলে তাঁর ধারণা। মধুসূদনের নাট্যচিন্তা ও নাট্য আদর্শের পরিচয় যতদূর সম্ভব তাঁর নিজ উক্তির আলোকে এবং তাঁর সৃষ্ট নাটকে অনুসৃত পন্থা থেকে এতক্ষণ দেখানোর চেষ্টা করা হল।

এবারে মধুসূদনের নাট্যমানস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে চাই। মধুসূদনের সাহিত্য-সাধনা মাত্র চার-পাঁচ বছরের। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যা রচনা করছেন এবং যে-পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে তা করেছেন, সে-কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। উচ্চাকাঙ্ক্ষী, বহু ভাষাবিদ্ ও অসামান্য প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটির ঐ অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ নাটক ও কাব্য লেখা সমাপ্ত হয়েছিল। ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দের পরে চতুর্দশপদী কবিতাবলী, অসমাপ্ত হেক্টরবধ, কিছু নীতি কবিতা, মায়াকানন প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র রচনা আমরা পাই। ধীর, সুস্থির মানসিকতায় তিনি সাহিত্য-সাধনায় দীর্ঘদিন নিবিষ্ট থাকতে পারেন নি—সাধ অনেক ছিল—কিন্তু পরিবেশ ও মানস-যন্ত্রণায় তাঁকে নিবৃত্ত হতে হয়েছিল। দেশবাসীর কাছ থেকে তিনি যা প্রত্যাশা করেছিলেন তা পান নি—তাঁরা তাঁকে ঠিক বুঝতে চান নি। রাজারা তাঁর বাংলা নাটককে যথোচিত উৎসাহ দিলেন না। 'Alas, born in an age too soon! 'অকালে অসময়ে জন্মগ্রহণ করে মারা গেলাম···কি করতাম—কত কিছু করতে পারতাম।' এই হাহাকার, এই দীর্ঘনিঃশ্বাস মধু-জীবনের এক মর্মগত নিয়তি। জীবনের সর্বক্ষেত্রে উচ্চাভিলাষী এই মানুষটির নিদারুণ ব্যর্থতার কান্না 'আত্মবিলাপ' কবিতায় ধরা পড়েছে। ফার্স দুটি এবং 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনীত না হওয়ায় মধুসূদন মর্মান্তিকভাবে আহত হলেন। তাঁর একনিষ্ঠ সারস্বত-সাধনার মানসিকতা চঞ্চল হয়ে উঠল। অর্থ-প্রতিপত্তিতে শক্তিমান অপদার্থ মানুষগুলির প্রতি তাঁর মন ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল। মর্মবিদারী বেদনায়, অভিমানে ও ক্ষোভে বলে উঠলেন—"এ দেশে টাকা ছাড়া কোন সম্মান নেই। তোমার যদি টাকা থাকে, তাহলেই তুমি বড় মানুষ। এ জাতি এখনো অধম অবস্থা অতিক্রম করে নি। এ দেশে বড় লোক কে? চোরবাগান এবং বড়বাজারের অস্তিত্বহীন মানুষগুলি। টাকা চাই ভাই, টাকা। যদি মনে কর, আমি সাহিত্যে কিছু করে যেতে পারতাম,—আমার শক্তি ছিল। কিন্তু আমি অবস্থাবৈগুণ্যে শক্তিকে চূড়ান্তভাবে কাজে লাগাতে পারলাম না।" এখানেও সেই একই হাহাকার ও হতাশার কান্না। একদিকে দুরূহ সাহিত্যচর্যায় দুরূহ প্রস্তুতি ও তপস্যা—অন্যদিকে অর্থের প্রবলতম আকর্ষণ—এই দুয়ের টানা-পোড়েনে মধুসূদনের জীবন

সংক্ষুব্ধ, পীড়িত ও ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল। তাই তিনি নিজেও মনে করতেন, তাঁর জীবন যেন দেবী সরস্বতী ও লক্ষ্মীর ঘোরতর বিরোধের একটি শোচনীয় ক্ষেত্র। এ মানব-জীবনকে নিয়ে অদৃষ্ট, অদৃশ্য দেবতার নির্মম লীলার ক্ষেত্রটিকে মধুসূদন হোমরের ইলিয়াড কাব্যে এবং গ্রীক পুরাণের কাহিনীতে লক্ষ্য করেছিলেন। গ্রীক-সাহিত্য ও চিন্তার সঙ্গে অতি-ঘনিষ্ঠ কবি তাই সেখানে প্রাণের প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করতেন। এমনি ভাবেই গ্রীক ট্রাজেডির সুরটি মধুসূদনের প্রাণের ছন্দ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কী কাব্য ও কী নাট্য—যখনই তিনি স্বাধীনভাবে সাহিত্য-সৃষ্টির সুযোগ পেয়েছেন, বহির্গত কোন নির্দেশ বা তাড়না আসে নি—সেখানে ঐ গ্রীক ট্রাজেডির সুর বা অদৃষ্টতত্ত্ব তাঁর মনকে অধিকার করে বসেছে।

আমরা মনে করি নাট্য সাধনাতেও মধুসূদনের অন্তরের এই প্রচ্ছন্ন প্রবণতা ধীরে ধীরে বাধামুক্ত হয়ে বিকশিত হতে চেয়েছে। ব্যতিক্রম শুধু ফার্স দুটি। এদের রস সম্পূর্ণ পৃথক এবং রাজাদের অনুরোধেই এ দুয়ের সৃষ্টি। যদিও শিল্পীর পূর্ণ স্বাধীনতায় রচিত বলে এখানে পাশ্চাত্ত্য-আদর্শের প্রতি পূর্ণ পক্ষপাত ও চূড়ান্ত সিদ্ধি। 'শর্মিষ্ঠা'য় মধুসূদনের সর্বাপেক্ষা প্রিয় চরিত্র শর্মিষ্ঠা। দুঃখের গভীর দহনে দৈত্যরাজকন্যাকে পতিত হতে হল নিজের আচরণেই। নিজের লঘু অপরাধে শুক্রাচার্যের অভিশাপ মাথায় নিয়ে রাজনন্দিনী দেবযানীর দাসী হয়ে জীবন কাটালেন। পরে যযাতিকে লাভ করে তাঁর বেদনাদীর্ণ জীবনের অবসান ঘটলেও তার সুখ স্থায়ী হল না। আবার দেবযানীর অনুরোধে শুক্রাচার্যের অভিশাপে স্বামী জরাগ্রস্ত হলেন। দুর্বিষহ যন্ত্রণার রাজ্যে আবার তিনি পতিত হলেন। এইখানেই নাটক শেষ করা যেতে পারত। কিন্তু মহাভারত কাহিনী, সংস্কৃত নাটকের প্রভাব এবং সমকালীন দর্শকের মুখ চেয়েই মধুসূদনকে আরো অগ্রসর হতে হল। শর্মিষ্ঠার গর্ভজাত পুত্রকে জরা দান করে যযাতি শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর সঙ্গে পুনরায় মিলিত হয়েছেন এবং শান্তির ললিতসুরে কাহিনী পরিণাম লাভ করেছে। এই পর্বটি না থাকলে শুক্রাচার্যের অভিশাপকে গ্রীক দৈবরোষ মনে করা যেতে পারে—আর তাহলে গ্রীক অদৃষ্টবাদের ছায়া এখানেও লক্ষ্য করা যাবে।

শর্মিষ্ঠায় মধুসূদনের প্রাণ যা পাবে নি—'পদ্মাবতী'তে তাই সম্ভব করার জন্যে শুরু থেকেই সতর্কতা। এখানে গ্রীক অদৃষ্টবাদের ছায়ায় ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীর জীবন মুহুর্মুহু আন্দোলিত হয়েছে। কিন্তু নাটকের অন্তিমপর্বে গিয়ে নাট্যকারের সেই স্বাধীনতা সংকুচিত—ভারতীয় পৌরাণিক চিন্তার পথে উভয়ের বিচ্ছিন্ন ঘোরতর বেদনাক্লিষ্ট জীবনের সমাপ্তি ঘটাতে হয়েছে মিলনের দৃশ্য অংকন করে। দুটি নাটকেই নাট্যকারের মর্মগত অভিপ্রায় লক্ষ্য করা গেল।

'কৃষ্ণকুমারী'-তে আর কোন বাধা নেই। নাট্যকারের প্রাণ যা চেয়ে আসছে সেই গ্রীক অদৃষ্টবাদকে ভীমসিংহের জীবনে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কৃষ্ণকুমারীকে

তার পিতৃব্য হত্যা করতে গিয়েও মানবিক-বোধে ব্যাকুল হয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। কৃষ্ণা সমস্ত অবস্থাটি উপলব্ধি করে দেশের কথা ও পিতার কথা ভেবে আত্মহননের পথই বেছে নিয়েছে। দেশের চরমতম দুর্দিনে অসহায় দুর্বল রাণা ভীমসিংহের কাছে কন্যা-গ্রহণের দাবি নিয়ে যাঁরা এলেন তাঁদের একজনের দাবি পূরণ করলেও নিষ্কৃতি নেই—আর একজনের ভয়াবহ আক্রমণে দেশ ধ্বংস হবে। এ হেন অসহায় অবস্থায় কন্যাকে হত্যার পথ বেছে নেওয়ার মধ্যে যে অকল্পণীয় মানস-বেদনা নিহিত আছে এবং যে-বেদনার ঘণীভবনে মানুষের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা, মধুসূদন সেই রাজ্যে এ নাটকের দর্শকদের নিয়ে গেছেন। ইতিহাসের সত্যকে বিকৃত করতে না পেরে কৃষ্ণার আত্মোৎসর্গ দেখিয়ে নাট্যকার গ্রীক অদৃষ্টবাদের নির্ভেজাল রূপ দেখাতে পারেন নি। তবু ইতিহাসের ঝটিকাক্ষুব্ধ বক্র-কুটিল চক্রান্তে কোমলপ্রাণা নিষ্পাপ সুন্দরী কৃষ্ণার মৃত্যু ন্যায়-নীতিশূন্য গ্রীক অদৃষ্টবাদের দিকেই অঙ্গুলি সংকেত করে।

আমরা জানি সমকালে রচিত মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণের চরিত্রেও এই গ্রীক-অদৃষ্টবাদকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে।

কবির মৃত্যুর কিছু পূর্বে রোগশয্যায় তিনি 'মায়াকানন' নামক একখানি নাটক লেখেন। পৌরাণিক প্রতিবেশের মধ্যে স্থাপিত হলেও কাহিনীটি তাঁর নিজস্ব। তাই এখানে তিনি সম্পূর্ণভাবে মুক্তপক্ষ। সেইজন্য এর ঘটনাকে তিনি পুরোপুরি দৈবনিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছেন। অজয়-ইন্দুমতীর প্রণয় এবং তাদের মিলনের পথে এই দৈবশক্তি পূর্ণভাবে ছাড়া পেয়েছে। তাদের জীবনকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করে চরমতম শোচনীয়তা—অজয় ও ইন্দুমতীর আত্মহত্যার দিকে তাদের ঠেলে দিয়েছে। প্রবল দৈবশক্তির অধীনে চরিত্রদ্বয়ের স্বাধীনতা যা ব্যক্তিত্ব বিকাশের অবসর অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং এ নাটকের নাটকীয় মূল্য সে দিক থেকে খর্বীকৃত হলেও ট্রাজেডি পরিকল্পনার দিক থেকে বিশেষত তপস্বিনী অবুন্ধতী-চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর নাট্য-প্রতিভার স্বাক্ষর আছে।

মোট কথা ফার্স, কমেডি ও ট্রাজেডি এই তিন শ্রেণীর নাটক রচনা করলেও জীবনের ট্রাজিক-সুরকে নাট্যে ধ্বনিত করে তোলার দিকে তাঁর প্রাণের একটা প্রচ্ছন্ন কামনা ছিল। দৈবাহত জীবনে গুরুগম্ভীর, শোচনীয় রূপের মধ্যেও যে সহনীয়তা তা তাঁকে কেমন উন্মনা করে দিত। তাই দর্শকদের ও কর্তৃপক্ষের প্রচণ্ড চাপের মধ্যেও তাঁর কমেডি দুটি অবিমিশ্র কমেডি হল না—শান্ত গম্ভীর সমতলভূমিতে বেদনার যজ্ঞবেদী রচনা করেও ভেঙে দিতে হল—কমেডি হয়ে পড়ল ট্রাজি-কমেডি—অথচ ট্রাজেডি হওয়ার সম্ভাবনাও সেগুলির মধ্যে ছিল। গ্রীক অদৃষ্টবাদের সূত্রেই মধুসূদনের নাট্যরচনায় এই ট্রাজিক সুরের অভ্যাগম। আর এ সুরও তাঁর ব্যক্তিজীবন ও কবিজীবনেরও মর্মগত গীত। ব্যতিক্রম শুধু বলেছি ফার্স দুটিতে। জীবনের লঘু-চপল দিকটিকে স্বতন্ত্রভাবে কোন নাটকে রূপায়িত করতে তিনি প্রবল

উৎসাহ-বোধ করেন নি—বরং এই কথাই মনে করতেন যে জগতের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলিতে ট্রাজিক সুরের সঙ্গে কমিক-সুরের মিশ্রণ থাকে—"The most beautiful Plays in the world are combination of Tragedy and Comedy" (কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি।) আর এই কারণেই ধনদাস-বিলাসবতী-মদনিকার কাহিনীকে 'কৃষ্ণকুমারী'তে তিনি স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু তবু মধুসূদন প্রতিভাবান শিল্পী—অঘটন-ঘটন-পটীয়সী লোকোত্তর প্রতিভা তাঁর। এমন প্রতিভা শপথ-বন্ধ হলে ভাঙা টালিতেও যে জলতরঙ্গের সুর তুলতে পারে ফার্স দুটি তার অভ্রান্ত প্রমাণ।

নাট্যাদর্শে তিনি পাশ্চাত্যরীতি অনুসৃতির প্রতিশ্রুতি দিলেও প্রথম নাটকে সংস্কৃত নাট্যরীতিকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারেন নি। দ্বিতীয় নাটকে গ্রীক কাহিনীর আদর্শে বৃত্ত-রূপান্তরণের প্রয়াস এবং প্লট-সজ্জা চরিত্র-সৃষ্টি ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ-প্রয়োগের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্যরীতির প্রতি অধিকতর আকর্ষণ লক্ষণীয় হয়েছে। ফার্স দুটিতে তিনি সত্যই বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। অ্যারিস্টোফেনিসের কমেডির আদর্শ ও মলিয়েরের ফার্স রচনার রীতির কথা মনে রেখে সমকালের সমস্যা নিয়ে এখানে মৌলিক সৃষ্টি। নাট্যসংলাপের ভাষা নিয়ে এখানে কোন দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব তাঁর পথরোধ করে নি। 'কৃষ্ণকুমারী' তে সংস্কৃত নাট্য-সংস্কার থেকে তিনি প্রায়ই মুক্ত, পাশ্চাত্য-আদর্শই আলোকবর্তিকা। গ্রীক অদৃষ্টবাদ, শেক্সপীয়রের চরিত্র নির্মাণ-পদ্ধতি, ট্রাজিক সুরের সঙ্গে কমিক সুরের মিশ্রনাদর্শ, ফলস্টাফের ছায়ামূর্তি, ভাষা প্রয়োগে সেক্সপীয়রের রীতি, ঐতিহাসিক নাটক রচনার পন্থা—কোন কিছুই বিস্মৃত হন নি। জানি, তিনি বলেছিলেন, "I shall look to the great dramatists of Europe for models"। কিন্তু এও জানি মধুসূদন সকল প্রভাব ও আদর্শের ছায়াতলে নিজ স্বভাবধর্মকে লালিত করতে ভালোবাসতেন—তাই সর্বত্রই তাঁর মৌলিক-দৃষ্টির অল্প-বিস্তর পরিচয় মিলবে—কারণ তিনিই তো আমাদের জানিয়েছেন—"I have certain dramatic notions of my own,which I follow invariably". সুযোগ পেলে, উৎসাহ পেলে কত কি তিনি করতে পারতেন অন্তত বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে—তাঁর এ আপশোষকে আজ বড় করে না দেখে পরিশেষে বলব, তিনি যা করে গেছেন তাতে বাংলা নাটকের এক হিসেবে তিনিই জনক।

মধুসূদনের অন্বয়

জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়

'বাক্যগঠনের জটিলতাদোষই তাঁর রচনার প্রধান দোষ।' মধুসূদনের ভাষারীতি সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন তাঁর সমকালীন কবি হেমচন্দ্র। কবিতায় নির্দিষ্ট মাপের সরল বাক্যে অভ্যস্ত ছিলেন যে পাঠক, অনুমান করতে পারি, তাঁকে কতখানি বিচলিত করেছিল মধুসূদনের বাক্য ;—

'সম্মুখসমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ হে দেবি, অমৃতভাষিণি
কোন বীরবরে বরি সেনাপতি পদে
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ?' — মেঘনাদবধ ১।১-৬

এমনকি এ কাব্যপাঠের সঠিক পদ্ধতি আয়ত্ত করতেও যথেষ্ট সময় লেগেছিল সে যুগের পাঠকবৃন্দের। এর অভিনবত্বকে তাঁরা সহজে স্বীকার করতে পারছিলেন না, মধুসূদনের তুলনায় রঙ্গলালকে অনেক বেশি স্বচ্ছ মনে হয়েছিল তাঁদের। তারপর ক্রমশ অমিত্রাক্ষরের রহস্য উন্মোচিত হল বাঙালী কবি এবং পাঠকের কাছে, এ ছন্দ আশ্রয় করে রচিত হল সমিল প্রবহমান পয়ার। যতিপ্রান্তিক পঙ্‌ক্তিতে অনাস্থা জন্মাল কবিদের। আধুনিক কবি প্রতিজ্ঞা করলেন বাক্যবিন্যাসের মৌখিক রীতি থেকে চ্যুত হবেন না, কবিতাতেও। এই ভাবেই বাঙলা কবিতার বাক্যে মধ্যযুগের অবসান ঘটিয়েছিলেন মধুসূদন, উন্মুক্ত করেছিলেন এক অনন্ত সম্ভাবনাময় পথ। বাক্য-গঠনের বৈশিষ্ট্য তাঁর কবিভাষার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।

সমালোচকদের কাছে কিন্তু বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পায় নি। কবির শব্দাবলী, বিশেষত তাঁর ব্যবহৃত আভিধানিক শব্দের আলোচনাই তাঁদের লেখার অধিকাংশ জুড়ে থেকেছে। বাক্যগঠনরীতি সম্বন্ধে হয় তাঁরা নীরব, বা তার দুরান্বয় দোষ এবং বিদেশী প্রভাবের কথা উল্লেখ করেই তাঁরা ক্ষান্ত।

তার অবশ্য একটি গৌণ কারণও আছে। নিজের কবিতার বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শব্দের কথাই বার বার বলেন মধুসূদন। বন্ধুকে লেখেন, ভাব এবং উপমা তাঁর কাছে বহন করে আনে শব্দ, সেই সব শব্দ যা ছিল তাঁর অজানা। আর শুধু মধুসূদনই কেন ? কবিতার ভাষা আলোচনায় শব্দের কথাই উল্লেখ করেন

প্রায় সব কবি এবং সমালোচকও। 'শব্দই কবিতা' বলেছেন একজন। আর একজনের মতে কবিতা রচনার সময় কবিকে এক অসহনীয় মল্লযুদ্ধ চালাতে হয় শব্দের সঙ্গে। এটা ঠিক যে এঁরা কেউই নিঃসঙ্গ শব্দের কথা ভাবছেন না, শব্দের সঙ্গে শব্দের সাযুজ্য, শব্দে শব্দে সংঘর্ষে নতুন অনুষঙ্গের জন্ম প্রভৃতি প্রসঙ্গ নিশ্চয়ই প্রচ্ছন্ন রয়েছে তাঁদের উক্তির মধ্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব, কবিভাষার আলোচনায় মূল লক্ষ্য সব সময়েই কবির ব্যবহৃত শব্দ, তাঁর বাক্যগঠন সম্বন্ধে সমালোচকেরা তখনই আগ্রহী যখন তাঁরা সেখানে দেখেন প্রচলিত নিয়মের বিপর্যয়।

কিন্তু কবিতার বাক্যগঠনকে আপাতদৃষ্টিতে যতই নিরীহ মনে হোক, কাব্যের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে বা বিশেষ একটি প্রসঙ্গকে কাব্যিক করে তুলতে অনেক সময়েই তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। আর তার জন্য সব সময়ে প্রয়োজন হয় না ব্যাকরণের উল্লংঘন। মেঘনাদবধের সপ্তম সর্গে, যুদ্ধক্ষেত্রে কার্ত্তিককে দেখে বলছেন রাবণ ;—

> 'শংকরীশংকরে দেব পূজে দিবানিশি
> কিংকর। লংকায় তবে বৈরীদলমাঝে
> কেন আজি হেরি তোমা ? নরাধম রামে
> হেন আনুকূল্য-দান কর কি কারণে
> কুমার ? রথীন্দ্র তুমি, অন্যায় সমরে
> মারিল নন্দনে মোর লক্ষ্মণ ; মারিব
> কপটসমরী মূঢ়ে ; দেহ পথ ছাড়ি।'

মেঘনাদবধ ৭।৫৭৭-৫৮৩

যথাক্রমে ১৭, ১৯, ২৩, ৩৯ মাত্রার চারটি বাক্য রয়েছে অংশটিতে। অর্থাৎ বাক্যের দৈর্ঘ্যবৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়েছে গাণিতিক নিয়ম। ২, ৪, ১৬ মাত্রার পার্থক্য বাক্যগুলির মধ্যে। রাবণের আবেগ, উত্তেজনা এবং অভিমান যেন বৃদ্ধি পেয়েছে স্তরে স্তরে। ব্যাকরণের কোন নিয়ম লংঘন না করেও কবি শুধু বাক্যদৈর্ঘ্যের সাহায্যেই সৃষ্টি করেছেন cresendo।

অবশ্য সব সময়েই স্বীকৃত বাক্যরীতির এতখানি আনুগত্য স্বীকার করেন না কবিরা। কেননা কবিমাত্রেই আবিষ্কার করতে চান ভাষার একটি অনন্য রূপ। অথচ প্রচলিত নর্ম-এর অধীনতাও তাঁকে সহ্য করতেই হয়। ভাষা সামাজিক সম্পত্তি, ভাব বিনিময়ের মাধ্যম, কবি এবং পাঠকের সংযোগ সেতু। তাই তাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তনের যে কোন চেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য।[১] কিন্তু ভাষার স্বভাবের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে এক ধরনের মুক্তি বা স্বাধীনতা। ভাষাতাত্ত্বিক যাকে বলেছেন

১ Das, S. K. "Towards a unified Theory of Style, p.p. 9.

'openended nature of language'[২] সাধারণ জীবনেও কখনো কখনো যার সুযোগ নিই আমরা, যদিও কবির কাছে তার প্রয়োজন অনেক বেশি। তারই সাহায্যে তিনি পুরোনো অভিজ্ঞতাকে নতুন, পরিচিত অনুভূতিকে অপরিচিত করে তোলেন। ব্যাকরণের সব ক্ষেত্র সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য। এখানে বাক্যরীতির উদাহরণ দিয়েই বক্তব্যটি বিশদ করব।

বাঙলায় জটিল বাক্যগঠনে বাক্যাংশ বিন্যাসের একটি নিজস্ব রীতি আছে। কিন্তু একটি জটিল বাক্যে কতগুলি অধীন বাক্যাংশ থাকবে সে সম্বন্ধে কোন নিয়ম নেই। জীবনানন্দ 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় এই স্বাধীনতার সুযোগ নিয়েছেন। আটটি অনুচ্ছেদের কবিতাটিতে, প্রথম সাতটি অনুচ্ছেদে একবার মাত্র একটি আশ্চর্যবোধক চিহ্ন ব্যতীত আর কোথাও পূর্ণযতির ব্যবহার নেই। অর্থাৎ সাতটি অনুচ্ছেদ ধরে চলেছে একটি দীর্ঘ জটিল বাক্য, প্রতিটি অনুচ্ছেদে এক একটি অধীন বাক্যাংশ প্রয়োগ করে কবি এক প্রত্যাশাবোধ জাগিয়ে তুলেছেন, যার শেষ হয়েছে অষ্টম অনুচ্ছেদে,—

'আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর?' এই দ্ব্যর্থক প্রশ্নবোধক বাক্যটির মধ্যে। অনুচ্ছেদের বাকী অংশ তাঁর এই বক্তব্যেরই বিস্তার। আবার জটিল বাক্যে সম্বন্ধসূচক সর্বনামের অবস্থানের নিয়মও পালন করেন নি জীবনানন্দ। 'আমরা হেঁটেছি যারা……, আমরা দেখেছি যারা'……এই ধরনের বাক্যাংশে।

অন্বয়রীতির এই অভিনবত্ব একান্তভাবে জীবনানন্দের নিজস্ব। এর সাহায্যে তিনি ভাষার মধ্যে নতুন আবহ সৃষ্টি করেছেন।

এইভাবে প্রচলিত রীতির অনুসরণ, প্রসারণ এবং কখনো কখনো তার মধ্যে ঈষৎ পরিবর্তন ঘটিয়ে বাক্যগঠনের একটি নিজস্ব স্টাইলের সৃষ্টি করেন কবি। মনোযোগী পাঠকের চোখে সহজেই ধরা পড়ে তার রূপ। কিন্তু কাব্যের বিশেষ প্রসঙ্গ তার কাছে আরো বেশি অর্থময় হয়ে ওঠে. কাব্যের রসাস্বাদও বৃদ্ধি পায় যখন সে বাক্যরীতির সঙ্গে কবিতার সমগ্রতার একটি যোগসূত্র আবিষ্কার করতে পারে।

মধ্যযুগের বাঙলা কবিতায় বাক্য ছিল ছন্দের বন্ধনে বন্দী। ছন্দের পরিবর্তন ঘটিয়ে কবিরা বড় জোর বাক্যের স্পন্দে কিছুটা পার্থক্য আনতে পারতেন। কিন্তু বাক্যের দৈর্ঘ্য থাকত পূর্বনির্দিষ্ট. তার গঠন সরল একঘেয়ে। মধুসূদন এই পুরোনো পদ্ধতিতে প্রচণ্ড আঘাত হানলেন, পঙ্‌ক্তিকে অতিক্রম করে প্রবাহিত হল তাঁর বাক্যের গতি। শুধু তাই নয়, স্বোপার্জিত এই স্বাধীনতাকে তিনি ব্যবহার করলেন নানাভাবে। শতাধিক মাত্রার জটিল বুনোনের দীর্ঘ বাক্য. আর চার পাঁচ

২ Chapman, Raymond, Linguistics and Literature p.p. 46

ছয় মাত্রার ecliptic বাক্য, মৌখিক ভাষার প্রবাদ বাক্য এবং গ্রীকো-রোমান রেটোরিকের কৌশলময় আলংকারিক বাক্য তাঁর কাব্যে রইল পাশাপাশি। যতিচিহ্নের বহুল প্রয়োগে, বাক্যাংশ এবং পদগুচ্ছের বিচিত্র বিন্যাসে তৈরী হল অজস্র প্যাটার্ন। সমালোচকেরা এর প্রতি যোগ্য বিচার করেন নি, এই কথা বলেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হয় না। প্রশ্ন ওঠে, বাক্যরীতিকে মধুসূদন কতখানি শিল্পের প্রকরণ করে তুলতে পেরেছিলেন? কোন্ নির্দিষ্ট কাব্যিক প্রয়োজন সিদ্ধ করেছিলেন তার সাহায্যে? তাঁর কাব্যের অবয়বের সঙ্গে বাক্যরীতির সম্পর্ক কতদূর ঘনিষ্ঠ? অথবা রামগতি ন্যায়রত্ন প্রমুখ সমালোচকদের ধারণাই আসলে ঠিক, শুধুমাত্র নূতনবিধ কাণ্ড সৃষ্টির চেষ্টার মধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে মধুসূদনের সব উদ্যম?

দুই

তিলোত্তমাসম্ভবে এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না। এ কাব্য সর্বতোভাবেই পরীক্ষাবৃক্ষের ফল। অসমান দৈর্ঘ্যের, ভিন্ন গঠনের বাক্য এখানে আছে বটে, কিন্তু অনেকসময়েই তারা বিশৃংখল, কবির কোন সচেতন অভিপ্রায়ও সেখানে চোখে পড়ে না। মেঘনাদবধে পৌঁছেই অবশ্য বাক্যরীতির একটি বিশেষ ধরন তৈরী করলেন কবি। এ কাব্যকে বহন করতে হল মহাকাব্যের বৃহৎ ভার। তার পটভূমির বিশালতা, পরিবেশ এবং সংলাপের ভিন্নতা পরিস্ফুট করতে হল কবিকে। বাক্যগঠনের এত বহুমুখী নিদর্শন, মধুসূদনের আর কোন কাব্যে নেই। বীরাঙ্গনা বা চতুর্দশপদীতে বাক্যগঠনে কোন নতুন রীতিরও সৃষ্টি করেন নি কবি। শুধুমাত্র মেঘনাদবধকাব্যের বাক্যরীতির সাহায্যেই চেনা যায় মধুসূদনের নিজস্ব Syntax-কে।

বৈচিত্র্যের ঘনঘটা সত্ত্বেও, মেঘনাদবধকাব্যে তিনটি বিশিষ্ট বাক্যরীতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবি এই রীতিগুলির প্রতি সব চেয়ে বেশি আনুগত্য দেখিয়েছেন। একটিতে তিনি 'নম''-এর মধ্যে থেকেও প্রয়োগবৈশিষ্ট্যে অনন্যতা এনেছেন। অন্য দুটি 'নম''-এর ঈষৎ বিপর্যয়ে সৃষ্টি হয়েছে কবির নিজস্ব 'নম''। যথার্থ অর্থে এরাই 'মাইকেলী বাক্য' নামে অভিহিত হতে পারে। কবির সমগ্র-শিল্পভাবনা, তাঁর বিশিষ্ট কবিপ্রকৃতির উৎস থেকেই যেন এরা সৃষ্ট।

যৌগিক বাক্যের একটি বিশেষ রীতি মেঘনাদবধকাব্যে সব চেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন মধুসূদন,—

> "হেমহর্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে,
> কমল-আলয় সরঃ, উৎস রজঃ ছটা;
> তরুরাজী; ফুলকুল, চক্ষুবিনোদন,
> যুবতী যৌবন যথা; হীরাচূড়াশিরঃ

দেবগৃহ ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি
বিবিধ রতন পূর্ণ ; এ জগৎ যেন
আনিয়া বিবিধ ধন পূজার বিধানে
রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে,
জগৎ বাসনা তুই, সুখের সদন।' মেঘনাদবধ ১।২০৯-২১৭

সেমিকোলনের সাহায্যে, স্বাধীন বাক্যাংশ জুড়ে একটি দীর্ঘ বাক্য বিদ্যাসাগরের রচনাতেও আছে। বঙ্কিমচন্দ্র তো তাঁর উপন্যাসে এর বহুল প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু, সংযোজক অব্যয় ছাড়াই, যতিচিহ্নের প্রয়োগ করে স্বাধীন বাক্যাংশের সংযুক্তিই এ বাক্যের মূল বৈশিষ্ট্য নয়। মেঘনাদবধে এ ধরনের বাক্যগুলিতে, বাক্যাংশগুলি প্রায়শ ছোট ছোট, এবং ক্রিয়া উহ্য, যেমন দেখছি ওপরে লঙ্কাপুরীর বর্ণনায়, অথবা আধুনিক বাঙলা কবিতাতে ;—

আকাশে জমেছে মেঘ ; পথ নির্রিবিলি
সব চুপ ; রাত দুপুর। (একখানা হাত: বুদ্ধদেব বসু)

বলা বাহুলা, বাঙলা কবিতায় মধুসূদনই এই বাক্যরীতির ব্যবহার আরম্ভ করেছিলেন। আর এই রীতির বাক্যের আর একটি পৃথক রূপও সৃষ্টি করলেন তিনি। সেখানে বাক্যাংশগুলি একই গঠনের, প্রত্যেকটি ক্রিয়াযুক্ত এবং ক্রিয়ার কালবাচক বিভক্তিও এক—

'কুহরিছে ডালে
কোকিল ; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি ;
বিকশিছে ফুলকুল ; মর্ম্মরিছে পাতা ;
বহিছে বাসন্তানিল ; ঝরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর।' মেঘনাদবধ ১।৬২৮-৬৩২

মেঘনাদবধের কাহিনী বর্ণনার বিশেষ ভঙ্গী থেকেই উদ্ভূত হয়েছে এই বাক্যগুলি এই ভঙ্গী অভারতীয়।[১] গ্রীক কাহিনী গ্রহণ করব না, কিন্তু গ্রীকদের ধরনে রচনা করব আমার কাব্য। এই সংকল্পানুসারে ভারতীয় মহাকাব্যের বর্ণনারীতি বর্জন করেছিলেন কবি, আশ্রয় করেছিলেন পাশ্চাত্য মহাকাব্যের নাটকীয় ধরন। কাহিনীর উপস্থাপন, এবং অগ্রসরণ ঘটনাসন্নিবেশ এবং সংলাপে নাটকীয় রীতির প্রভাব স্পষ্ট।[২] মহাকাব্যের কবির প্রতি যা ছিল অ্যারিস্টটলের নির্দেশ এবং হোমার থেকে মিলটন পর্যন্ত বিভিন্ন পাশ্চাত্য কবির রচনায় এই রীতির অনুসরণ পাই।

নাটকীয় রীতি অনুসরণ করে মধুসূদন পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রময় যে বর্ণনা মহাকাব্যের প্রাণ, তাকে এক নতুন ডাইমেনসন দিলেন। একটি দীর্ঘ উদাহরণ দিই। মেঘনাদবধ কাব্যের নবম সর্গে একটি বিরাট শ্মশান যাত্রার বর্ণনা আছে। মেঘনাদের

১. Das, S. K.-A Bengali Epic constructed on a Western Model.
২. অশ্রুকুমার সিকদার "মেঘনাদবধ : কাব্যনাট্যের সম্ভাবনা" দ্রষ্টব্য

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করতে লঙ্কাপুরবাসী চলেছে মহাসমুদ্রের তীরে। কবি এই মহাযাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন পাঁচটি অনুচ্ছেদে একশটি পঙ্‌ক্তি জুড়ে (৯।২০৯-৩১১)। সে অনুচ্ছেদগুলি যথাক্রমে রক্ষঃসৈন্য, প্রমীলার দাসীবৃন্দ, প্রমীলা-মেঘনাদের শববাহী রথ, রাবণ ও তাঁর অনুচরদের বর্ণনা। এই নির্দিষ্ট বিন্যাসেই তাঁরা লঙ্কাপুরী থেকে নির্গত হয়েছেন। কবি চারটি অনুচ্ছেদে প্রথম বাক্যের গঠন প্রায় এক রেখেছেন ;—

(১) বাহিরিল লক্ষ রক্ষ স্বর্ণদণ্ড করে ... ... (১ম অনু)
(২) বাহিরিল বীরাঙ্গনা প্রমীলার দাসী ... ... (২য় অনু)
(৩) বাহিরিল মৃদুগতি রথবৃন্দ মাঝে রথবর ... ... (৪র্থ অনু)
(৪) বাহিরিল পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজা ... ... (৫ম অনু)

এখানে কবি বর্ণনার যে রীতি অনুসরণ করেছেন তাকে শুধু নাটকীয় বললেই যথেষ্ট হয় না, এখানে কবি যেন ব্যবহার করছেন সিনেমার একটি টেকনিক।[১] ক্যামেরার সেট আপ এখানে বার বার বদলাচ্ছে, একবার কবি নিচ্ছেন একটি লঙ্‌ শট্‌, ক্যামেরার আলো পড়ছে লঙ্কাপুরীর পশ্চিম দ্বারে—যেখান থেকে বাহির হয়ে আসছে একটি দল, কিছুদূর সেই দলকে অনুসরণ করে ক্যামেরা ফিরে আসছে লঙ্কাপুরীর দ্বারে। আর এই দীর্ঘ বর্ণনার মধ্যে ছোট ছোট ইউনিট তৈরী করছে যৌগিক বাক্য ;—

'রবিকর তেজে
শোভে হৈমধ্বজদণ্ড ; শিরোমণি শিরে ;
অসিকোষ সারসনে ; দীর্ঘ শূল হাতে ,
বিগলিত অশ্রুধারা হয়ে রে নয়নে।' ৯।২২০-২২৩

সূর্যালোকে উজ্জ্বল অস্ত্রশস্ত্র শিরোস্ত্রাণ প্রভৃতির পর, ক্যামেরার আলো পড়েছে অশ্রুধারায়। এবং যেন মুহূর্তের জন্য স্থির হয়েছে তার মুভমেন্ট (গতি)। কারণ, এই শেষের বাক্যাংশটি পূর্ববর্তী তিনটি বাক্যাংশ অপেক্ষা দীর্ঘ। এখানে যেন সৃষ্টি হয়েছে একটি ক্লোজ আপ।

মধুসূদন পরবর্তী কাব্যগুলিতেও যৌগিক বাক্যের এই গঠন প্রচুর ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কোথাও তারা সমগ্র কবিতার বর্ণনাভঙ্গীর সঙ্গে এমন অচ্ছেদ্য নয়।

মেঘনাদবধের আর একটি বহুল ব্যবহৃত বাক্যরীতিও একাধিক বাক্যাংশের গ্রন্থনে সৃষ্ট। কিন্তু সে বাক্যরীতি যৌগিক নয় জটিল। প্রথমটির মত কবি এখানে 'নর্ম'-এর অনুসরণও করেন নি ;—

'যুঝিল উভয়ে ঘোর, যুঝিল যেমতি
কীচকের সহ ভীম নারীবেশ ধরি
বিরাটে।' মেঘনাদবধ ৮।৪৭০-৪৭২

---

১. আইজেনস্টাইন মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর বর্ণনারীতিতে সিনেমার টেকনিকের কথা উল্লেখ করেছিলেন। মূলত সেখান থেকেই এই আইডিয়াটি পেয়েছি। —লেখিকা।

এখানে বাঙলা বাক্যের রীতি অনুযায়ী অধীন বাক্যাংশ বাক্যের প্রথমে স্থাপিত হয় নি। কিন্তু, জটিল বাক্যকে কবি যেখানে জটিলতর করে তুলেছেন, একাধিক অধীন বাক্যাংশের সাহায্যে, আমাদের আগ্রহ মূলত সেই বাক্যগুলি সম্বন্ধে ;—

(১) 'মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল
শিশুকুল আর্ত্তনাদে ; কাঁদিল যেমতি
ব্রজে ব্রজকুলশিশু যবে শ্যামমণি
আঁধারি সে ব্রজগৃহ ; গেলা মধুপুরে।' মেঘনাদবধ ৬।৬৩৮-৬৪১

(২) 'যেমতি মাতঃ বসিলা আসিয়া
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন কাননে
ক্রৌঞ্চ বধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা
তেমতি দাসেরে আসি দয়া কর সতি। মেঘনাদবধ ১।১১-১৫

দুটি বাক্যেই অধীন বাক্যাংশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে আর একটি অধীন বাক্যাংশ। যদি মূল বাক্যাংশকে 'গ', প্রথম অধীন বাক্যাংশকে 'খ' এবং তদ্‌জাত অধীন দ্বিতীয় বাক্যাংশকে 'ক' বলি, তাহলে বাঙলার স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী বাক্যের গঠন হওয়া উচিত ক+খ+গ। উপরোক্ত বাক্যদুটিতে বাক্যাংশ বিন্যাসে এই স্বাভাবিক 'নর্ম'' অনুসৃত হয় নি, যথাক্রমে 'গ+খ+ক', 'খ+ক+গ' এই রীতিতে সাজানো হয়েছে।

বাঙলা কবিতায়, সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে কিন্তু জটিল বাক্যে, অধীন বাক্যাংশ+মূল বাক্যাংশ—এই গঠন অনুসরণ করেছেন কবিরা, সীমিত পরিসরে যখনই এ ধরনের বাক্য গঠনের প্রয়াস করেছেন তাঁরা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মিশনারীদের বাংলা গদ্যে ইংরাজীর, আক্ষরিক অনুবাদ, 'এক গাধা, যে এক ছোট কুকুরের সহিত এক বাটিতে থাকিত……জাতীয় হাস্যোদ্দীপক বাক্যের জন্ম দিলেও, মধুসূদন যখন কবিতা লিখছেন তখন বাঙলা গদ্যে জটিল বাক্যের 'নর্ম'' সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কবি সে রীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, গদ্যে তিনি কোথাও সে নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নি। অতএব মেঘনাদবধ কাব্যের জটিল বাক্যগুলি কবির ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচয় নয়। মধুসূদন সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করেছেন তাঁর উত্তরসূরী একাধিক কবি। এমন কি এ বাক্যকৌশলকে শুধুমাত্র সাধারণ 'inversion-এর উদাহরণ বলেও এড়িয়ে যেতে পারি না। এ জটিলতা কবির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, এর সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে মেঘনাদবধ কাব্যের বিশেষ প্রকৃতি বা 'genre'।

মেঘনাদবধ সাহিত্যিক মহাকাব্য। যার সমগ্র প্রকৃতিতেই আছে কৃত্রিমতা, সাহিত্য সমালোচক যে জন্য তাকে বলেছেন 'spurious'। মহাকাব্যের যে পরিবেশ জীবনে নেই তাকেই কলাকৌশলের সাহায্যে পুনরুজ্জীবিত করা হয় এ-ধরনের কাব্যে। ভাষাকে করে তুলতে হয় 'Something stylized, remote from

conversation hierophantic'।[১] এই উদ্দেশ্যেই মিলটন ইংরাজী ইডিয়ম কিছুটা পরিহার করে লাতিন রীতির প্রয়োগ করেছিলেন।[২] মধুসূদন শব্দের ক্ষেত্রে দ্বারস্থ হয়েছিলেন সংস্কৃতের, বেছে নিয়েছিলেন ইরম্মদ, কম্বুর, বিতিহোত্র জাতীয় অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ। কিন্তু বাক্যরীতিতে 'দূরত্ব' আনার কৌশল সৃষ্টি করতে হয়েছিল তাঁকে নিজেকেই। তিলোত্তমাসম্ভবেও এই চেষ্টা ছিল কবির, যার ফলশ্রুতি—

'হেমহর্ম্য দিবানিশি যার চারিপাশে
ফেরে অগ্নি চক্ররাশি মহাভয়ংকর
বিরাজয়ে সুধা যথা মেঘবর কোলে
চপলা বা অবরোধে যথা কুলবধূ
ললিতা ভুবনস্পৃহা প্রফুল্লযৌবনা
নারী অরবিন্দ সহ ইন্দু মহামতি
হেরি ত্রিদিবের ইন্দ্র দূরে প্রণমিলা
নম্রভাবে, যথা যবে প্রলয় পবন
নিবিড় কাননে বহে তরুকুলপতি
ব্রততী সুন্দরী দল শাখাবলী সহ
বন্দে নোয়াইয়া শির অজেয় মারুতে।

তিলোত্তমাসম্ভব, ২।৫৫-৬৫

—জাতীয় জটিল অন্বয়ক্লিষ্ট বাক্য। অধীন বাক্যাংশের সাহায্যে জটিলতা সৃষ্টির চেষ্টায় মিলটনের অনুকরণ এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার চেয়েও বড়ো কথা বাক্যটি দুর্বোধ্য। এর বক্তব্য কোথায় আরম্ভ কখন শেষ তা বুঝতে সময় লাগে। কবি নিশ্চয়ই অনুভব করেছিলেন, বাঙলার পক্ষে এ রীতি স্বাভাবিক নয়। মেঘনাদবধে কবি জটিল বাক্যগঠনে এই রীতি পরিত্যাগ করলেন, এবং সৃষ্টি করলেন অধীন বাক্যাংশ বিন্যাসের নিজস্ব 'নম''।

সাহিত্যিক মহাকাব্যের আর একটি প্রয়োজন এই ধরনের বাক্যে সিদ্ধ হয়েছে। সাহিত্যিক মহাকাব্যে অনেক সময়েই কাহিনীতে আদি মহাকাব্যের স্থানগত এবং কালগত বিস্তার থাকে না, কবি অন্যান্য কৌশলের প্রয়োগে সে সংকীর্ণতায় বিস্তার আনেন। মেঘনাদবধে যেমন লংকাপুরীর দুই রাত্রি তিন দিনের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, ত্রিলোক এবং ত্রিকালকে। আর একই কারণে এসেছে অন্যান্য মহাকাব্য এবং পুরাণের নানা ঘটনার উল্লেখ, 'এপিক সিমিলির' ব্যবহারে।

সাধারণত 'মহাকাব্যিক উপমা' সৃষ্টিতেই কবি ব্যবহার করেছেন একাধিক

১. Lewis, C. S. 'A Preface to Paradise Lost', ch vi-vii

২. এক সমালোচক মিলটনের 'Syntax'-এর একটি বিশেষ দিক সম্বন্ধে লিখেছেন, "This Latinism is inadmissible, there is no loop-hole in our language for its reception" Welby, T E (Ed) Imaginary Conversation. Southey and Landour.

বাক্যাংশ-সমন্বিত জটিল বাক্য। কাহিনী বর্ণনার গতি যেন অকস্মাৎ রুদ্ধ হয়ে আসে এখানে সমগ্র বাক্যটি শেষ করার পর অর্থের জন্য আবার ফিরে যেতে হয় মূল বাক্যাংশের কাছে; তাতে মূল ছবিটি শুধু পূর্ণতাই পায় না, উপমিত ছবি কাহিনীর বিস্তার বাড়িয়ে তোলে। কোন কোন বাক্যে এই আবর্তন আক্ষরিক অর্থে সত্য:—

'ফিরায়ে বদন, ইন্দুবদনা ইন্দিরা
বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি
বিজয়াদশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে—উমা চন্দ্রাননা
করতলে বিন্যাসিয়া কপোল, কমলা,
তেজস্বিনী বসি দেবী কমল আসনে,—

মেঘনাদবধ ১।৫০২-৫০৭

মধুসূদন মূল বাক্যাংশকে শুধু প্রথমেই বসান নি, বাক্যের শেষে একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন ঈষৎ পৃথক একটি বাক্যাংশে। এর ফলে সমগ্র বাক্যের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এক ধরনের আবর্ত, তাতে যেন কাহিনীর গতি রুদ্ধ হয়েছে কিছুক্ষণের জন্য। রবীন্দ্রনাথের একটি বাক্যের সঙ্গে তুলনা করছি:—

'দেবগণ
মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ
দূর স্বপ্নসম, যবে কোনো অর্ধরাতে
সহসা হেরিব জাগি নির্মল শয্যাতে
পড়েছে চন্দ্রের আলো নিদ্রিতা প্রেয়সী
লুণ্ঠিত শিথিল বাহু পড়িয়াছে খসি
গ্রন্থি শরমের, মৃদু সোহাগ চুম্বনে
সচকিতে জাগি উঠি গাঢ় আলিঙ্গনে
লতাইবে বক্ষে মোর।

রবীন্দ্রনাথও এখানে মূল বাক্যাংশটি বাক্যের প্রথমে স্থাপিত করেছেন। কিন্তু ব্যাকরণের নিয়মানুসারে যেটি প্রধান বাক্যাংশ তাকেই কবি বাক্যের প্রধান বক্তব্যে পরিণত করেছেন। মর্ত্যে দাম্পত্য প্রেমের নিবিড় ছবি কবির মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। স্বর্গভূমি তাঁর কাছে স্বপ্নের মত অলীক। ফলে বাক্যের গতি হয়েছে এখানে দ্রুত, তার গতি সম্মুখে।

মেঘনাদবধে অধিকাংশ জটিল বাক্যেই কবি নিজস্ব 'নম''-এর প্রয়োগ করেছেন। যদিও প্রচলিত রীতিকেও একেবারে পরিহার করেন নি; সে রীতির বাক্য সংখ্যায় অল্প। বীরাঙ্গনা বা চতুর্দশপদীতে এর বিপরীত পন্থা অবলম্বিত। সেখানে অল্প বাক্যেই রীতির ব্যতিক্রম। কিন্তু যখন আমরা এমন কোন কোন সনেটে সেই

ব্যতিক্রম পাই, যাদের বিষয়বস্তু মহাকাব্যের কোন চরিত্র বা ঘটনা নয়, যেখানে ভাষায় 'distancing effect' আনা আবশ্যিক ছিল না কবির পক্ষে,—

(১) 'তার ধন অধিকারী হেন জন নহে
যে জন নির্ব্বংশ হলে বিস্মৃতি আঁধারে
ডুবে নাম, শিলা যথা তলশূন্য দহে।'
'অর্থ'

অথবা

(২) 'মোর মতে নরকুলে কলঙ্ক সে জন
পোড়ে আঁখি যার যেন বিষ বরিষণে
বিকশে কুসুম যদি, গায় পিকগণে
বাসন্ত আমোদে পুরি ভাগ্যের কানন
পরের।' 'দ্বেষ'

তখন আমরা একে শুধু একটি বিশেষ 'genre'-এর সঙ্গে জড়িত বাক্যরচনার কৌশলমাত্র বলতে পারি না। তাকে যুক্ত করি মধুসূদনের সমগ্র কবিভাষার সাধারণ স্বভাবের সঙ্গে।

বাক্যাংশের মত পদের বিন্যাসে বিপর্যয় সৃষ্টি করাও মধুসূদনের একটি প্রিয় অভ্যাস। হেমচন্দ্র এজন্য কবির বিরুদ্ধে অস্পষ্টতার অভিযোগ এনেছিলেন। পরে আরো অনেকে যার পুনরাবৃত্তি করেছেন। তাঁদের মতে বিশেষ্যের সঙ্গে তৎপ্রতি প্রযুক্ত বিশেষণের অবস্থান-বিচ্ছিন্নতাই মধুসূদনের কাব্যে অর্থের অস্পষ্টতা সৃষ্টি করেছে। তাঁদের এ মন্তব্য আমরা সবটা মেনে নিতে পারি না। কারণ যেসব বাক্যে আমরা এই বিপর্যয় লক্ষ্য করি ;

(১) 'খুল্লতাত আমি
ডাকি তোমা বিভীষণ' মেঘনাদবধ ৬।৬৮০-৬৮১

(২) 'ত্বরায় আসিব আমি পূজিব যতনে
ও পদ রাজীব যুগ সমর বিজয়ী' মেঘনাধবধ ৫।৫২০-৫২১

(৩) 'প্রফুল্ল হায় কিংশুক যেমতি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন বলে' মেঘনাদবধ ৭।৯১-৯২

(৪) 'চন্দন কুসুম
নৈবেদ্য কৌষিক বস্ত্র আদি বলি যত
অবহেলা করে দেব দাতা যে যদ্যপি
অসৎ।' মেঘনাদবধ ২।৬১৬-৬১৯

এরকম উদাহরণ আরো আছে। কিন্তু কোথাও বক্তব্য দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেনি। হয়নি কাহিনীগত ধারাবাহিকতার জন্য।

তবু একথাও সত্যি যে, এই বাক্যগুলি পড়ে আমাদের এক ধরনের অস্বস্তি জন্মায়। আমরা কিছুতেই এদের মেনে নিতে পারি না। এরা নিঃসন্দেহে ব্যর্থ। কিন্তু কেন? কাব্যে পদক্রমের বিপর্যয় মাত্রই তো দোষাবহ নয়? বরং এ ধরনের স্বাধীনতা তো কবিদের প্রাপ্য বলেই ধরে নিই আমরা। আসলে পদান্বয়ে নতুনত্ব সার্থক তখনই যখন তার জন্ম আভ্যন্তরীণ অনিবার্যতার বোধ থেকে। যখন কবি তার সাহায্যে ডেকে আনতে পারেন কোন নামহীন মনোলীন অভিজ্ঞতা। মধুসূদন কি সচেতনভাবেই সৃষ্টি করেছিলেন এই ক্লিষ্টতা? করেছিলেন কোন প্রেরণার তাগিদে?

এসব প্রশ্নের উত্তরের জন্য খুব বেশি দূরে যেতে হয় না আমাদের। অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবিষ্কার এবং তার সাহায্যে বাকস্পন্দের সৃষ্টির চেষ্টার মধ্যেই নিহিত আছে তাদের উত্তর। ছান্দসিকের মতে অমিত্রাক্ষর ছন্দে লুকোনো ছিল কথা বলার স্পন্দ। ছন্দের প্রবাহের মধ্যেই যাকে আয়ত্ত করতে চেয়েছিলেন মধুসূদন।[১] সেই সঙ্গে তিনি সচেতন ছিলেন, এর অন্তর্নিহিত বিপদ সম্বন্ধে। কারণ এই প্রবাহকে ঠিক মত ধরতে না পারার জন্য মধ্যযুগের অনেক পঙ্‌ক্তিতে গদ্য-পদ্যের নৈকট্য ভাষাকে 'prosaic' করে তুলেছে। মধুসূদন একদিকে যেমন কবিতার মধ্যে কথা বলার টান আনতে পয়ারের ৮।৬ বিরতির নিয়মকে অগ্রাহ্য করলেন, সৃষ্টি করলেন যতির নানা বৈচিত্র্য সেই সঙ্গে গদ্যময়তা এড়াতে সাহায্য নিলেন শব্দসংঘাতময় ধ্বনি এবং নাম ধাতুর, পরিহার করলেন যৌগিক ক্রিয়া। কিন্তু তাতেও বোধ হয় তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। তিলোত্তমাসম্ভবের;

(১) 'রাহু শশী গ্রাসিবারে
ব্যগ্র সদা দুষ্ট কিন্তু রাহু সে দানব
আমরা দেবতা একি আমাদের কাজ?'

তিলোত্তমাসম্ভব, ২।৪২৭-৪২৯

(২) রাজা যাহা ইচ্ছা করে
প্রজার কি উচিত বিবাদ রাজার সহ?

তিলোত্তমাসম্ভব, ২।৩৬৯-৩৭০

—জাতীয় ব্যর্থতার কথা স্মরণ করেই তিনি মেঘনাদবধে দূরান্বয়ের সাহায্যও নিলেন। যেমন মিলটন একদিন পদক্রমকে নিক্ষেপ করেছিলেন গদ্যের বাইরে।[২] মধুসূদন তেমনি তাঁর কবিতার পদান্বয়কে প্রচলিত 'নর্ম'-এর অনেক দূরে রাখতে চাইলেন। কখনো কখনো তার ফলে বক্তব্যের মধ্যে এল এক রকমের 'irony.'

১ শঙ্খ ঘোষ, ছন্দের বারান্দা পৃঃ ১-৬

২ 'To give his verse, the greater sound and throw it out of Prose' Addison, The spectator, No 285 (26th Jan, 1712)

'চলিলা দূজনে
চন্দ্রচূড়ালয়ে, যথা রক্ষঃকুলেশ্বরী
আরাধেন চন্দ্রচূড়ে রক্ষিতে নন্দনে—
বৃথা !'		মেঘনাদবধ, ৭।৪০-৪৩

'বৃথা' শব্দটিকে, রক্ষঃকুলেশ্বরী-র পরেও বসানো চলত, কিন্তু তাতে সমগ্র বক্তব্যের মধ্যে 'total negation' ভাবটি আসত না, যেমন এসেছে এখন।

কিন্তু যেখানে পদক্রমের বিপর্যয় বক্তব্যকে আরো বেশি অর্থপূর্ণ করে তুলতে সাহায্য করছে না, অথচ তারা হয়ে উঠেছে ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, সেখানে তারা শুধুমাত্র 'bad syntax'-এর উদাহরণ। মধুসূদনের বিভিন্ন কাব্যগুলিতে যার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়।

যতিচিহ্নের প্রাচুর্য, বাক্যাংশের বিচিত্র বুনোন এবং পদক্রমের বিপর্যয়—এই তিনটিকেই মধুসূদনের 'syntax'-এর মূল বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। এদের সঙ্গে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য আলংকারিক বাক্য রচনার কৌশল যুক্ত হয়ে একটি নিজস্ব স্টাইল গড়ে উঠেছে। যতির বহুলতায় তার গতি ধীর, বাক্যাংশ এবং পদক্রমে সাধারণ 'নর্ম'-এর ব্যতিক্রমে তার পদক্ষেপ জটিল, এবং অলংকারের প্রাচুর্যে তা মহনীয়। প্রাত্যহিক তুচ্ছতা এবং মসৃণ শ্রুতি সুখকরতা থেকে তার অবস্থান অনেক দূরে। অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে একত্র হয়ে এই 'syntax' মধুসূদনের কবিভাষায় সঞ্চারিত করেছে গাম্ভীর্য, পৌরুষত্ব, দার্ঢ্য। কবি অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু নির্বাচনে পরিহার করেছেন সমকালীন বা প্রাত্যহিক জীবনকে, কিন্তু যখন সমসাময়িক কোন বিখ্যাত ব্যক্তি বা প্রকৃতির কোন অতি পরিচিত দৃশ্য অথবা গ্রাম্য রমণী রাধার হৃদয়-বেদনা নিয়ে কবিতা লিখছেন তিনি, তখন তাঁর ভাষা ভাবানুযায়ী হলেও সেখানেও অনুভব করা যায় Demetrius-বর্ণিত 'elevated style'-এর স্পর্শ, যা মহাকাব্যের উপযোগী। কিন্তু বাঙলা কবিতার স্বাভাবিক প্রবণতা এর বিপরীত। মধুসূদনের পূর্বাপর বাঙলা কবিতার ইতিহাসে গীতিকবিতার ধারাই হয়েছে সর্বাতিশায়ী। মধুসূদনের মহাকাব্যিক কবিভাষা তাই সেখানে সম্পূর্ণ একক, নিঃসঙ্গ। যেন ব্যতিক্রম। 'His slyle was never repeated in Bengali'—মধুসূদন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এ উক্তির যাথার্থ্য অনস্বীকার্য।

কিন্তু এই প্রসঙ্গেই তাঁর অন্য মন্তব্য 'he was nothing of a Bengali scholar' আমাদের বিষণ্ণ করে। কারণ রবীন্দ্রনাথের যে কোন উক্তির প্রভাবই বাঙলা সমালোচনায় গভীর ভাবে মুদ্রিত হয়। তাই তাঁর এ ধরনের মন্তব্য মধুসূদনের সমগ্র কবি-প্রচেষ্টাকেই অনেকের কাছে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিতে পারে। কিন্তু তাতে কি কবির প্রতি অবিচার করা হয় না? প্রত্যেক কবি, বা সাধারণ ভাবে যে কোন সাহিত্যিককেই বিচার করতে হবে তাঁর নিজস্ব পরিমণ্ডলের মধ্যে,

যে জগৎ তিনি তৈরী করেছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করতে হবে তাঁর ভাষা রীতির। অন্যথায় আমরা কি সেই একই ভুল করব না, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন, 'ধান্যক্ষেত্রে বার্ত্তাকু সন্ধান?' অবশ্য এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, মধুসূদন মহাকাব্যিক ভাষারীতি গড়ে তুলতে যেসব innovations করেছেন, সেগুলি কতদূর সার্থক হয়েছে? বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বা রবীন্দ্রনাথেরও মতে একটুও হয়নি, মাইকেলের ভাষা বাংলাই নয়, এমন কথা বলেছেন তাঁরা। অথচ এঁরা সকলেই কিন্তু মধুসূদনকে শক্তিধর পুরুষ, বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বলে স্বীকার করছেন। এই দুই বক্তব্যের মধ্যে যে অসংগতি রয়েছে, মোহিতলাল বহুদিন পূর্বেই তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তার পুনরাবৃত্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে, মধুসূদনই বাঙলা সাহিত্যের প্রথম কবি যিনি ভাষার সম্ভাব্য রূপ এবং শক্তিকে বিচিত্রভাবে পরীক্ষা করেছিলেন। অবশ্য প্রচলিত 'নর্ম'-এর মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেন না কোন মহৎ কবিই, মধুসূদনের পূর্বেও ছন্দের আঁটসাঁট বন্ধনের মধ্যেই, হঠাৎ এক একটি পঙক্তি বা বাক্যের নতুনত্ব আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে বিদ্যুৎ-রেখার মত উদ্ভাসিত হয়, চমকে দেয় আমাদের। কিন্তু কবিতার ছন্দ, ভাষারীতি এবং সর্বোপরি 'syntax'-এ এতখানি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারেন নি প্রাক্-মধুসূদন কোন কবি। সমগ্রতার সঙ্গে অচ্ছেদ্য, আবার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে মহিমান্বিত এক 'syntax' তৈরী করেছিলেন কবিশিল্পী মধুসূদন—যা তাঁর সমগ্র কবি-ভাষাকে অভিনব করে তুলেছে।

"কবি মধুসূদনের স্বদেশে ও বিদেশে তাঁর দুটি মনের মানুষ ছিলো।···এই দু'জন বিপরীত বৃত্তির মানুষ, মিল্টন ও বিদ্যাসাগর, মধুসূদনের কাব্যচেতনায় কোথাও এক হ'য়েছিলেন। মাইকেল রাজনীতি করেন নি, সমাজ সংস্কারও তাঁর ব্রত ছিলো না। অথচ তাঁর সাহিত্য-জীবনের, কবিতা ও নাটক রচনার, অধিকাংশ প্রেরণাই এসেছে এঁদের কাছ থেকেই। মাইকেলের সমগ্র রচনাবলীর অনুসরণ করলে আমরা এই প্রেরণা এবং নেপথ্যে দুটি মানুষের উপস্থিতি বার বার টের পাই।"

—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

॥ মধুসূদন ও উত্তরকাল ॥

মধুসূদনের কাব্য-কবিতায় 'মিথ'-এর প্রয়োগ

মানস মজুমদার

পুরাণ-কুতূহলী মধুসূদন

আবাল্য মধুসূদন পুরাণ-কুতূহলী। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে কৌতূহল বৃদ্ধি পেয়েছে। যুগপৎ দেশী ও বিদেশী পুরাণে পাঠ নিয়েছেন তিনি। পুরাণ-রসে হৃদয়-মন সঞ্জীবিত হয়েছে। বাস্তব-সমস্যা-জর্জর মধুসূদন পুরাণ-জগতে আশ্রয় খুঁজেছেন। পুরাণ-জগতে তাঁর মানস-মুক্তি ঘটেছে। পুরাণ তাঁকে ঐতিহ্য-সচেতন করে তুলেছে। দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত করেছে। অন্যদিকে পুরাণ-আশ্রয়ে তিনি বিশ্বব্যাপী মানব-মনের নিগূঢ় ঐক্যরূপটি আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছেন। বহুবিচিত্র প্রবৃত্তিপীড়িত মানুষকে, তার সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, আশা-নিরাশা, জয়-পরাজয়, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ঐক্য-বিভেদ, সংঘাত-সমন্বয়, প্রতিষ্ঠা ও পতনকে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছেন। পুরাণ-আশ্রয়ে কাব্য-কবিতা রচনা করেছেন, নাটক লিখেছেন। পুরাণ তাঁর রোমান্টিক রস-পিপাসা চরিতার্থ করেছে : দৃষ্টিভঙ্গিতে এনেছে ক্লাসিক স্বচ্ছতা ; রচনায় এনেছে ধ্রুপদী গাম্ভীর্য। পুরাণ তাঁর ত্রিভুবনচারী কবি-কল্পনার উৎস। পুরাণ তাঁকে দিয়েছে তৃতীয় নেত্র। ঐ নেত্র-সহায়তায় পৌরাণিক পাত্র-পাত্রীর দেহ-মন-আত্মার সন্ধান পেয়েছেন তিনি। এক কথায়, সাহিত্য যদি হয় শিল্পী মধুসূদনের প্রেয়সী, পুরাণ তবে তাঁর জননী।

'মিথ' : স্বরূপ-বিশ্লেষণ

স্বভাবতই পুরাণকথার সঙ্গে যুক্ত 'মিথ'গুলি মধুসূদনকে আকৃষ্ট করেছে। মধুসূদনের কাব্য-কবিতায় মিথের প্রয়োগ-প্রাচুর্য বিস্ময়কর। 'মিথ' কাকে বলবো ? মিথ হ'ল লোকপুরাণ। পুরাকালের কাল্পনিক গল্প। সহজ সরল অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী লোকসাধারণের মুখে মুখে রচিত, লোকস্মৃতিবাহিত। ঐতিহ্যসম্ভূত লোকবিশ্বাস-আশ্রয়ী অলৌকিক উদ্ভব-বৃত্তান্ত। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, আকাশ, পৃথিবী, কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান, কোন বিশেষ নদী বা পাহাড়-পর্বত, আগুন, ঝড়-বৃষ্টি, বজ্র-বিদ্যুৎ, ভূমিকম্প, বন্যা, ঋতু-পরিবর্তন, কোন বিশেষ বৃক্ষ বা লতা, কোন বিশেষ পশু বা পাখি, কীটপতঙ্গ বা সরীসৃপ, কোন বিশেষ দেব-দেবী, দৈত্য-দানব, অসুর বা রাক্ষস বা মানুষের ও তার ক্রিয়া বা আচরণের অলৌকিক উদ্ভব-বৃত্তান্ত :

"myth is always related to a 'creation', it tells how something came into existence, or how a hattern of behaviour, an institution, a manner of working were established; this is why myths constitute the paradigms for all significant human acts."[১]

সংক্ষেপে বলা চলে, মিথ হ'ল সৃষ্টি সংক্রান্ত গল্প :

"A myth is a story which for those who tell it and for those who receive it has a kind of cosmic purpose."[২]

মিথ-এ পাই প্রাকৃত ব্যাপারের অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা :

"It professes to relate some happening in which supernatural beings are concerned and probably in so doing to offer an explanation of some natural phenomenon."[৩]

একদা লোকসমাজের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে এগুলির ছিল নিগূঢ় যোগ :

"In ancient societies there was an essential relationship between myth and ritual practice : myth clarified the prescribed action of rites,"[৪]

এক হিসেবে এগুলি তাই পবিত্র গল্প। পরবর্তীকালে যখন ধ্রুপদী পুরাণ-সমূহ রচিত হ'ল, তখন সেগুলির প্রধান অবলম্বন হ'ল এই সমস্ত লোকপুরাণ। কখনো কখনো বিভিন্ন পুরাণে পাওয়া গেল একই মিথ-এর কথান্তর।

মিথ : গুরুত্ব-বিচার

মিথ আমাদের কাছে কেন গুরুত্বপূর্ণ? গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, যদিও এগুলি কাল্পনিক ও অলৌকিকতা-আশ্রয়ী, তবুও পুরাকালের মানুষ আর তার পারি-পার্শ্বিক জীবনের ইতস্ততঃ-বিচ্ছিন্ন কিছু পরিচয় এগুলিতে দুর্লক্ষ্য নয়। এগুলির আড়ালে রয়েছে পুরাকালের মানুষের অবদমিত আশা-আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা-ভয় ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অভিব্যক্তি :

"It expresses instinctual drives and the repressed wishes, fears, and conflicts that they motivate. These appear in the themes of myth."[৫]

১. Encyclopaedia Britannica, Vol. 15, 1973, p. 1135.
২. Cassell's Encyclopaedia of Literature. Vol 1, 1953, p. 372.
৩. Ibid.
৪. Feder, L. Ancient Myth in Modern poetry, 1977, p. 5.
৫. Ibid, p. 10.

বিশ্বব্যাপী মানুষের অন্তর্জীবনের ইতিহাস এ সমস্ত গল্পে নিহিত। নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক প্রয়াসসাধ্য গবেষণায় তা উদ্ঘাটন করতে চান। মনস্তাত্ত্বিক এগুলির ভিতর থেকে প্রাচীনকালের মানুষের মনের গতি-প্রকৃতির স্বরূপ-রহস্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন:

"Myth has had a significant role in human society from its beginings as primitive religions narrative to its recent adaptation as an aid in the exploration of the unconscious mind."[৬]

আর শিল্পীর কাছে মিথ হয়ে ওঠে সৃষ্টি-প্রেরণার উৎস। মিথের নতুন ব্যাখ্যা দেন তিনি। মিথকে সম্প্রসারিত করেন। একালের সঙ্গে সেকালের সেতু যোজনায় মিথকে কাজে লাগান। মিথ প্রতীকী তাৎপর্যে অন্বিত হয়। এ মন্তব্য কাব্য-শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অধিকন্তু, কাব্য-কবিতায় মিথ অলংকার-সৃষ্টির উপকরণ হয়ে ওঠে; কোন বিশেষ বক্তব্যের সমর্থনে দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কবি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে মিথ-সহায়তায় সর্বজনবোধ্য করে তোলেন। আবার প্রাত্যহিক প্রাকৃত ঘটনাকে মিথ-সহায়তায় স্বতন্ত্র তাৎপর্য দান করেন।[৭] মিথ কথা বলে। কবির ভাব-প্রকাশের বাহন হয়ে ওঠে। কবি-ভাষায় পরিণত হয়। এভাবেই যা কাল্পনিক, আপাত-মিথ্যা, তা সত্য হয়ে দেখা দেয়।

মধুসূদনের কাব্য-কবিতায় মিথের প্রয়োগ

মধুসূদনের কাব্য-কবিতায় ব্যবহৃত মিথ-এর সংখ্যা কম নয়। আলোচ্য প্রবন্ধের স্বল্প-পরিসরে নির্বাচিত কয়েকটি দৃষ্টান্ত-সহায়তায় মিথ-প্রয়োগে তাঁর বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যেতে পারে।

১. কৃষ্ণ মিথ

'বীরাঙ্গনা কাব্যে' (১৮৬২) কৃষ্ণ-মুগ্ধ রুক্মিনী কৃষ্ণ-সমীপে যে পত্র প্রেরণ করেছেন (৩ সংখ্যক পত্র) তাতে সুকৌশলে কৃষ্ণের প্রতি তাঁর প্রণয়-আকর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে। রুক্মিনী অন্তঃপুরচারিনী রাজকন্যা (বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা)। কৃষ্ণের অপরিচিতা। নারীর স্বভাবজাত লজ্জা হেতু প্রেম-প্রকাশে দ্বিধা জেগেছে। অথচ মনে মনে কৃষ্ণকেই স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছেন তিনি। জীবনের বিশেষ সংকট-মুহূর্তে কৃষ্ণের কাছে যে পত্র পাঠিয়েছেন তাতে তাই ইঙ্গিতে প্রণয়ানুরাগ জ্ঞাপিত হয়েছে। কৃষ্ণ-জীবনের বিশেষ বিশেষ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন তিনি। বস্তুতপক্ষে মধুসূদন রুক্মিনীর উক্তি-আশ্রয়ে কৃষ্ণ-জীবন-সম্পৃক্ত একাধিক মিথেরই প্রয়োগ করেছেন। মিথগুলি হ'ল:

৬ Ibid, p, 4.

৭. এবিষয়ে John Crowe Ransom সম্পাদিত 'The kenyon Critics', (Newyork, 1951) গ্রন্থভুক্ত W. H. Auden-এর 'Yeats as an example' প্রবন্ধটি পঠনীয়।

১.১ কারাগারে জন্ম ('গৃহিলা পুরুষোত্তম জন্ম কারাগারে')

১.২ পূতনা-বধ ('ছলে শিশু নাশিলা পূতনারে')

১.৩ কালীয় নাগ-দমন ('কাল নাগ কালীয়……লইল আশ্রয় নমি পাদ-পদ্ম তলে')

১.৪ গিরি গোবর্ধন-ধারণ ('কৌশলে গোবর্ধন তুলি, রক্ষিলা গোকুল')

মিথগুলি ভাগবত থেকে গৃহীত। অত্যাচার-ভীতি থেকেই মিথগুলির উদ্ভব। কৃষ্ণের বিবিধ আচরণ (জন্মগ্রহণ, পূতনা-বধ, কালীয়-দমন, গিরি গোবর্ধন-ধারণ) এগুলিতে উল্লেখিত। ঘটনার স্থান: মথুরায় কংশের কারাগার, গোপালক নন্দের গৃহ, কালিন্দী হ্রদ ও গোবর্ধন গিরির পাদদেশ। পাত্র-পাত্রী: প্রথম মিথে কৃষ্ণ, দ্বিতীয় মিথে কৃষ্ণ ও পূতনা রাক্ষসী, তৃতীয় মিথে কৃষ্ণ ও কালীয় নাগ, চতুর্থ মিথে কৃষ্ণ ও গোবর্ধন গিরি। তাৎপর্য-বিচারে দেখতে পাই, প্রথম মিথে কৃষ্ণের অলৌকিক আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় মিথ-এ শিশু কৃষ্ণের অতিপ্রাকৃত শক্তির পরিচয় প্রদান। তৃতীয় ও চতুর্থ মিথেও কৃষ্ণের অতিপ্রাকৃত শক্তির উল্লেখ। গঠন-প্রকৃতির দিক থেকে বলতে পারি, জন্ম-পরিবেশের প্রতিকূলতা ও সেই প্রতিকূলতা অতিক্রম,—এই বিপরীতমুখী প্রবণতা প্রথম মিথ-এর কায়া-নির্মিতির উপাদান। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মিথ-এ অশুভ শক্তির সঙ্গে শুভ শক্তির দ্বন্দ্বে অশুভ শক্তির বিনাশ। চতুর্থ মিথ-এ গোবর্ধন গিরিকে উপলক্ষ করে কৃষ্ণ ও ইন্দ্র দুই শক্তিমানের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং কৃষ্ণের জয়। দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বের অবসান, – এই সূত্র এখানে কার্যকর।

মধুসূদনের রচনায় মিথগুলির প্রয়োগ হয়ে উঠলো ইঙ্গিতধর্মী। ইঙ্গিতগুলি হ'ল: ১.১ কারাবন্দী পিতা-মাতার উদ্ধারকর্তা কৃষ্ণ বিপন্না অভিভাবককুলের অনুশাসন-কারাগারে বন্দিনী রুক্মিনীরও উদ্ধারকর্তা হবেন। ১.২ রুক্মিনী-ভ্রাতা কৃষ্ণবিদ্বেষী রুক্মী, মগধরাজ জরাসন্ধ ও চেদিরাজ শিশুপালের চক্রান্ত (শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিনীর বিবাহ-সংঘটনের উদ্যোগ) প্রতিহত করে কৃষ্ণ রুক্মিনীকে রক্ষা করবেন। একদা যেমন পূতনাকে বধ করে কংশের চক্রান্ত ব্যর্থ করেছিলেন। ১.৩ অমিততেজা কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-বিদ্বেষীদের পরাভূত করে রুক্মিনীকে ত্রাণ করবেন। যেমন, কৃষ্ণ-বিদ্বেষী কালীয়কে দমন করেছিলেন। ১.৪ কৃষ্ণ প্রচণ্ড শক্তিধর। রুক্মিনী-হরণ তাঁর কাছে সামান্য ব্যাপার মাত্র।

উল্লেখিত প্রতিটি ঘটনাই অলৌকিকতা-সমৃদ্ধ। কৃষ্ণের অসাধারণত্বের নিদর্শন। এই অসাধারণত্বই রুক্মিনীকে কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। প্রণয়-মনস্তত্ত্বনিপুণ কবি রুক্মিনীর প্রণয়-আকর্ষণের রহস্যসূত্রগুলি উন্মোচন করেছেন।

২. নারায়ণ মিথ (সমুদ্র-মন্থন মিথের অংশ-বিশেষ)

স্বামী মহাদেব ধ্যানমগ্ন। রাবণ তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। তাঁর অনুগ্রহ ও আনুকূল্য

ব্যতীত রাবণ-বিনাশ সম্ভব নয়। ইন্দ্রের অনুরোধে দেবী শঙ্করী তাই মোহিনী মূর্তিতে চললেন ধ্যানমগ্ন মহাদেবের উদ্দেশে। উদ্দেশ্য-সাধন-সহায়ক হিসেবে কামদেবকে সঙ্গে নিলেন। দেবীর মোহিনীমূর্তি দর্শনে কামদেবের মনে পড়লো নারায়ণের মোহিনীমূর্তি ধারণের কথা :

সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত
বিবাদিল দেব সহ সুধামধু হেতু।
মোহিনী মুরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।
(মেঘনাদবধ কাব্য : দ্বিতীয় সর্গ ; পঙ্‌ক্তি : ৩৪৬-৩৪৯)

নারায়ণ মোহিনী মূর্তিতে সমুদ্রমন্থনকারী অসুরকুলকে বশীভূত করেছিলেন। দেবী শঙ্করী চলেছেন স্বামী মহাদেবকে বশীভূত করতে। উঠলো নারায়ণের মোহিনী মূর্তির কথা।

মিথটির উৎস রামায়ণ-মহাভারত। এ মিথের উদ্ভব গোষ্ঠী-বিরোধ থেকে। এ বিরোধ দেবতাগোষ্ঠীর সঙ্গে অসুরগোষ্ঠীর। সমুদ্রমন্থনজাত অমৃতভাণ্ডের অধিকার নিয়ে বিরোধ। পটভূমি : ক্ষীরোদসমুদ্রতীর। নারায়ণের আচরণ-বিশেষ (মোহিনী মূর্তি ধারণ) মিথটির উপজীব্য। তাৎপর্য : অলৌকিক রূপান্তর। গঠন-প্রকৃতি : দু'টি গোষ্ঠীর বিরোধ, শক্তিশালী গোষ্ঠীর চক্রান্ত, অতিপ্রাকৃত শক্তির সহায়তা গ্রহণ, উদ্দেশ্য সিদ্ধি। পুরুষ মূর্তির রমণী মূর্তিতে রূপান্তর এখানে অতিপ্রাকৃত শক্তির নিদর্শন।

নারায়ণের মোহিনী মূর্তি ধারণের পরিস্থিতি এবং দেবী শঙ্করীর মোহিনী মূর্তি ধারণের পরিস্থিতি দুই ঠিক এক নয়। দু'টি ছলনাও এক পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ মিথের সাহায্য নিলেন মধুসূদন। সে উদ্দেশ্য মোহসৃষ্টি। নারায়ণের মোহিনী মূর্তির সঙ্গে তাই দেবীর মোহিনী মূর্তির তুলনা করা হ'ল। সুকৌশলে দেবীর মাদকতা-সঞ্চারী অপার্থিব রূপ-সৌন্দর্যের প্রশস্তি কীর্তন করলেন মধুসূদন।

৩. মহাদেব ও দেবগণ মিথ

(=বিষ ও অমৃত মিথ=সমুদ্র-মন্থন মিথের অংশ বিশেষ)

মহাদেব 'নীলকণ্ঠ' হলেন কিভাবে ? দেবগণ কিভাবে লাভ করলেন অমরত্ব ? এসব প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে 'সমুদ্রমন্থন' মিথ-এ। দেবাসুরের সম্মিলিত প্রয়াসলব্ধ সুধাভাণ্ড চাতুর্য-কৌশলে শেষ পর্যন্ত দেবতাদের করায়ত্ত হ'ল, অসুরকুল হ'ল বঞ্চিত। বস্তুতপক্ষে মিথটি দেবতাদের বুদ্ধি-চাতুর্য ও সৌভাগ্যময়তার পরিচয়বহ। মধুসূদন সুপরিচিত এই মিথটিকেই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থিত করলেন 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যে (১৮৬০)। দৈত্যকুলের কাছে যুদ্ধে পরাজিত

প্রসঙ্গবর্গ দেবেন্দ্রের প্রতি অন্তকের ক্ষুব্ধ উক্তিটি এস্থলে স্মরণযোগ্য ঃ

কে পারে সহিতে—
হায় রে, কহ, দেবেন্দ্র, হেন অপমান ?
এই মতে সৃষ্টি যদি পালিতে ধাতার
ইচ্ছা, তবে বৃথা কেন আমা সবা দিয়া
মথাইলা সাগর ? অমৃত-পানে মোরা
অমর , কিন্তু এ অমরতার কি ফল
এই ? হায়, নীলকণ্ঠ, কিসের লাগিয়া
ধর হলাহল, দেব, নীল কণ্ঠদেশে ? (দ্বিতীয় সর্গ)

মূল মিথ-এর অংশ-বিশেষ এখানে উল্লেখিত। তা হ'ল মহাদেবের নীলকণ্ঠত্ব ও দেবগণের অমরত্ব। উৎস : রামায়ণ-মহাভারত। মৃত্যুভীতি থেকেই অমৃত আহরণের উদ্যোগ। মিথ-এর ঐ অংশে বিষ ও অমৃতের উদ্ভবের অলৌকিকত্ব নির্দেশিত। গঠন-প্রকৃতি ঃ বৈপরীত্যের সহাবস্থান, বিষ ও অমৃতের সমাবেশ।

এখন মধুসূদনের প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাক। 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের ঐ অংশে বলা হ'ল, পরাজয়ের গ্লানি অমর দেবকুলের সমস্ত সুখ শান্তি আর আনন্দ ম্লান করে দিয়েছে। অমরত্ব হয়ে উঠেছে দুর্বহ। অন্তক মৃত্যু-সংঘটক, জীবকুলের ত্রাস। দৈত্যকুলের কাছে শোচনীয় পরাজয়ে তিনি মৃত্যুকামী, কিন্তু মৃত্যু-বরণের স্বাধীনতা তাঁর নেই। বিধাতা দেবতাদের অমর করেছেন, নিরুদ্বিগ্ন করেন নি। অমরত্বের বিড়ম্বনাটুকু দেখালেন মধুসূদন। দেবকুলের আপাত সৌভাগ্যের অন্তরালশায়ী দুর্ভাগ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। অমরতাও দুঃখময়, অখণ্ড শান্তি, বিঘ্নহীন সুখ, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ কোথাও নেই,—নেই দেবলোকেও। মিথ এভাবেই একটি পরম সত্য আবিষ্কারে সহায়ক হ'ল। দার্শনিকতায় সমৃদ্ধ হ'ল। মধুসূদনের মিথ-ভাবনার গভীরতার পরিচয় পাওয়া গেল।

৪. মহিষমর্দিনী মিথ

'আশ্বিন মাস' কবিতায় (চতুর্দশপদী কবিতাবলী ঃ ১৮৬৬) মধুসূদনের পুরাণ-প্রীতি বাল্যস্মৃতিরসে অভিষিক্ত। কবিতাটির সূচনায় রয়েছে উমা-আবাহনরত উৎসবমুখর বঙ্গভূমির চিত্র ঃ

সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
এসেছেন ফিরে উমা, বৎসরের পরে,
মহিষমর্দিনীরূপে ভকতের ঘরে ;

স্বদেশভূমি থেকে বহুদূরে ফরাসীদেশে অবস্থানরত কবি বাল্যস্মৃতির জগতে উপস্থিত হন। উৎসবমুখর আশ্বিন তাঁকে হাতছানি দেয়। স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে দেবী দুর্গার মহিষমর্দিনী মূর্তি। বাল্যস্মৃতির জগত কবিকে আর এক জগতে

পৌঁছে দেয়। সে জগত মিথ-এর জগত। প্রবল পরাক্রমশালী মহিষাসুরের আক্রমণে স্বর্গচ্যুত সন্ত্রস্ত দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন। বিষ্ণু জানান, ব্রহ্মার বরে পুরুষের হাতে মহিষাসুর অবধ্য। বিষ্ণুর পরামর্শে তাই দেবগণের তেজ থেকে এক অসাধারণ রূপলাবণ্যময়ী রমণীর আবির্ভাব ঘটে। ইনিই দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী। বহুবিচিত্র অস্ত্রসম্ভারে দেবগণ তাঁকে সজ্জিত করেন। মহাদেব দেন ত্রিশূল, বরুণ শংখ, অগ্নি শীতঘ্নীশক্তি, ইন্দ্র বজ্র, যম দণ্ড, ব্রহ্মা কমণ্ডলু। মহাশক্তিরূপিনী ঐ দেবী দুর্গার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় মহিষাসুর। তীব্র হয়ে ওঠে সংগ্রাম। শেষ পর্যন্ত দেবীর চক্রাঘাতে মহিষাসুরের মস্তক দেহচ্যুত হয়। মহিষাসুরের মৃত্যু ঘটে। আর দেবী দুর্গা পরিচিত হন মহিষমর্দিনী নামে।

মহিষমর্দিনী মিথ-এর উদ্ভব ভীতি থেকে। দেবীভাগবতে এ মিথ উল্লেখিত। পাত্র-পাত্রী : মহিষাসুর, দেবগণ ও দেবী দুর্গা। দেবী দুর্গার মহিষাসুর নিধনরূপ আচরণ এ মিথের মূল অবলম্বন। পটভূমি : স্বর্গ-মর্ত্য। তাৎপর্য : অলৌকিক শক্তির আবির্ভাবে অশুভের বিনাশ। গঠন-প্রকৃতি : শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বে অশুভের পরাজয়।

মধুসূদনের স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত মহিষমর্দিনীর উজ্জ্বল মূর্তি, আশ্বিনের বঙ্গভূমির জন্য তাঁর স্পর্শকাতরতা ও ভাবব্যাকুলতা যে ঐতিহ্যানুরাগের নিদর্শন তাতে সন্দেহ নেই।

৫. কার্তিকেয় মিথ

লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করবেন। দেবরাজ ইন্দ্রের মাধ্যমে মহামায়া তাই শক্তিশালী অস্ত্রসম্ভার প্রেরণ করলেন। দেব সেনাপতি কার্তিকেয় দুরন্ত তারকাসুর-নিধনে ঐ সমস্ত অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। ইন্দ্রের প্রতি মহামায়ার উক্তিতে সেই মিথের অবতারণা :

দুরন্ত তারকাসুর, সুর-কুল-পতি,
কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিমুখি
সমরে, কৃত্তিকা-কুল-বল্লভ সেনানী,
পার্বতীর গর্ভে জন্ম লভিলা তৎকালে
বধিতে দানব-রাজে সাজাইলা ধীরে
আপনি বৃষভধ্বজ, সৃজি রুদ্র-তেজে
অস্ত্রে। এই দেখ, দেব, ফলক, মণ্ডিত
সুবর্ণে ; ওই যে অসি, নিবাসে উহাতে
আপনি কৃতান্ত ; ওই দেখ, সুনাসীর,
ভয়ংকর তূনীরে, অক্ষয়, পূর্ণ শরে,
বিষাকর ফণি-পূর্ণ নাগ-লোক যথা ! মেঘনাদবধ কাব্য
২।৪৯১-৫০১

মূল মিথ এখানে কার্তিকেয়র জন্ম-আশ্রয়ী। তারকাসুর-ভীতি থেকে এর উদ্ভব। শিবপুরাণ আর দেবীভাগবতে এ মিথের উল্লেখ পাই। তারকাসুর ও কার্তিকেয়,—এই দুটি চরিত্রের প্রাধান্য। কার্তিকেয়র জন্ম ও তারকাসুর-নিধন,—মিথটিতে দ্বিবিধ ক্রিয়া গুরুত্বপ্রাপ্ত। পটভূমি স্বর্গলোক। অতিপ্রাকৃত শক্তিসম্পন্ন দেবতার আবির্ভাব, অতিপ্রাকৃত শক্তিসম্পন্ন অস্ত্রের উৎপত্তি, অশুভ শক্তির বিনাশ,—এই হ'ল মিথটির তাৎপর্য। গঠন-প্রকৃতির দিক থেকে দেখতে পাই দ্বন্দ্ব-প্রাধান্য। দ্বন্দ্ব দেবতা ও অসুরে; শুভের সঙ্গে অশুভের। দেব-শক্তি বা শুভ-শক্তির জয়ে ঘটেছে দ্বন্দ্বের অবসান। আর জয়লাভের জন্য অতিপ্রাকৃত শক্তির সাহায্য নিতে হয়েছে।

প্রশ্ন, মেঘনাদবধ কাব্যে মিথটির প্রয়োগ ঘটলো কেন? উত্তর: মেঘনাদের সঙ্গে লক্ষ্মণের যে যুদ্ধ আসন্ন, সেই যুদ্ধের ভয়াবহতা ঘোষিত হ'ল অতীতে সংঘটিত এক ভয়াবহ যুদ্ধের উল্লেখে। তারকাসুর নিধনের মতই মেঘনাদ-নিধনও দুরূহ-কর্ম। তারকাসুর নিধনে ব্যবহৃত অস্ত্র-সম্ভার সহায়তায় সেই দুরূহ কর্ম সম্পন্ন করবেন লক্ষ্মণ। ভয়ংকর প্রাণঘাতী ঐ সমস্ত অস্ত্র অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন।

প্রকারান্তরে এ মিথ কি মেঘনাদের বলবীর্যেরই স্বীকৃতি নয়? মেঘনাদের পরাজয় আর মৃত্যুকে মহিমান্বিত করে তুলেছে এ মিথ। মেঘনাদের মৃত্যুকে মহাকাব্যোচিত ব্যাপ্তি ও বিশালতা দানে সমর্থ হয়েছেন মধুসূদন।

৬. মদন-রতি মিথ

'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের প্রথম সর্গে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে বিরহিনী রাধিকা-চিত্তে জেগেছে ব্যাকুলতা:

যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে
মদন রাজার বিধি লংঘিব কেমনে?
যদি অবহেলা করি, রুষিবে শম্বর-অরি;
কে সম্বরে স্মর-শরে এ তিন ভুবনে।

(বংশী-ধ্বনি)

'শম্বর-অরি'র উল্লেখ করলেন রাধিকা। মিথের আবির্ভাব ঘটলো। কে এই শম্বর-অরি? কামদেব। কিভাবে তিনি শম্বরের শত্রু হলেন? বিচিত্র সে কাহিনী। শম্বর ছিল এক পরাক্রমশালী দৈত্য। হর-কোপানলে দগ্ধ কামদেব রুক্মিনীর গর্ভে কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নরূপে জন্ম নিলে বিচলিত হ'ল সে। কারণ, প্রদ্যুম্নের হাতে তার মৃত্যু ঘটবে এ ভবিষ্যৎ-বাণী অজানা ছিল না তার। শম্বর তাই শিশু প্রদ্যুম্নকে জন্মের ষষ্ঠ দিবসে মায়াবলে সূতিকাগৃহ থেকে হরণ করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলো। বিশালকায় একটি মাছ গ্রাস করলো ঐ শিশুকে। জেলের জালে ধরা পড়লো সেই মাছ। জেলেরা শম্বরকে উপহার দিলো ঐ মাছ। মাছটি কাটা হলে তার উদর-অভ্যন্তরে পাওয়া গেল শিশু প্রদ্যুম্নকে। কাম-পত্নী রতি সে সময় মায়াবতী নামে শম্বরের গৃহে রন্ধন-কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। দেবর্ষি নারদের কাছে তিনি জানতে

পারলেন শিশু প্রদ্যুম্নের প্রকৃত পরিচয়। তিনি রক্ষা করলেন ঐ শিশুকে, সযত্নে লালন-পালন করতে লাগলেন। প্রদ্যুম্নের যখন ষোল বছর বয়স হ'ল, তখন তিনি মায়াবতীর মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হলেন। শম্বরকে হত্যা করলেন তিনি। মায়াবতীরূপিনী রতিকে প্রদ্যুম্নরূপী কামদেব গন্ধর্বমতে বিয়ে করে দ্বারকায় কৃষ্ণ-ভবনে উপস্থিত হলেন। 'শম্বর-অরি' শব্দ-যুগ্মকের আড়ালে রয়েছে কামদেবের পুনর্জন্মের অলৌকিক বৃত্তান্ত এবং শম্বর হত্যার রোমাঞ্চকর কাহিনী।

প্রসঙ্গ : মদন-রতির পুনর্জন্ম ও পুনর্মিলন জন্মান্তর-ভাবনা থেকে এ মিথ-এর উদ্ভব। হরিবংশে এ কাহিনী গ্রথিত। প্রদ্যুম্ন (মদন), মায়াবতী (রতি), ও শম্বর দৈত্য,—এই ত্রয়ী চরিত্রের প্রাধান্য এ মিথ-এ। মিথটি জন্ম, হত্যা ও মিলন —ত্রিবিধ ক্রিয়া-সংযুক্ত। দ্বারকাপুরী ও দৈত্যপুরী এর পটভূমিকা। প্রেমিক-প্রেমিকার অলৌকিক পুনর্জন্ম ও পুনর্মিলন আলোচ্য মিথ-এ তাৎপর্যমণ্ডিত। গঠন প্রকৃতি : প্রেমিক-প্রেমিকার বিচ্ছেদ, মিলনের প্রতিকূলতা, প্রতিকূলতা অপসারণ-মিলন।

লৌকিক জন্মান্তর-বিশ্বাস আশ্রয়ে এ মিথ-এর উদ্ভব। অবিনাশী প্রেমের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে এতে। কৃষ্ণপ্রাণা রাধিকার প্রেমের ঐকান্তিকতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই এ মিথের সাহায্য নিলেন মধুসূদন। অন্ত্যমিল আর সূক্ষ্ম অনুপ্রাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'শম্বর-অরি'র আবির্ভাব ঘটলো। প্রয়োগ চাতুর্যের চমৎকার নিদর্শন।

স্মরণযোগ্য, পরবর্তী 'জলধর' অংশে কৃষ্ণ-বিরহিনী রাধিকার উক্তিতে মদন-বিরহিনী রতির আবির্ভাব :

অরে আশা আর কি হবে রে হবি ফলবতী ?
আর কি পাইব তারে
সদা প্রাণ চাহে যারে
পতি-হারা রতি কি লো পাবে রতি-পতি ?

'বীরাঙ্গনা' কাব্যে 'অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী' পত্রে দ্রৌপদীর স্মৃতিচারণাতেও মদনহারা রতির মিথটি ব্যবহৃত। অর্জুনের প্রতি অনুরাগ-আকর্ষণের প্রাবল্য হেতু জতুগৃহদাহের সংবাদ শ্রবণে বিচলিতা দ্রৌপদী প্রাক্-বিবাহ পর্বেই বৈধব্য-যন্ত্রণার সম্মুখীন হয়েছেন :

উঠিল যৎকালে
জনরব—'জতুগৃহে দহি মাতৃ-সহ
ত্যজিলা অকালে দেহ পঞ্চ পাণ্ডুরথী'—
কত যে কাঁদিনু আমি, কব তা কাহারে ?
কাঁদিনু—বিধবা যেন হইনু যৌবনে !

প্রার্থনায় রত হয়েছেন দ্রৌপদী ঃ

প্রার্থিনু রতিরে পূজি,—হর-কোপানলে,
হে সতি, পুড়িলা যবে প্রাণ-পতি তব,
কত যে সহিলা দুঃখ, তাই স্মরি মনে,
বাঁচাও মদনে মোর,—এই ভিক্ষা মাগি !'

ভারতীয় পুরাণ-ঐতিহ্যে মদন-রতি প্রেমের আদর্শস্বরূপ। মদন-রতির প্রেম লাভ করেছে প্রতীক তাৎপর্য। মিথ যে কখনো কখনো প্রতীক-গৌরব প্রাপ্ত হয়, এ তারই দৃষ্টান্ত। মিথটি মধুসূদনের খুবই প্রিয়। প্রেমের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা প্রদর্শনে এ মিথ তাই পুনঃ পুনঃ তাঁর কাব্য-কবিতায় ব্যবহৃত। লক্ষণীয় সমস্ত ক্ষেত্রেই কিন্তু এ মিথের প্রয়োগ ঘটেছে নায়িকার জবানীতে।

৭. সীতা মিথ

সখী সরমার কাছে সীতা তাঁর জন্ম-বৃত্তান্ত শোনাচ্ছেন ঃ

দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী
মা আমার !··· ··· ···
কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুর বাণী ;—
বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে
রক্ষোরাজ ; তোর হেতু সবংশে মজিবে
অধম ! এ ভার আমি সহিতে না পারি,
ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে !

(মেঘনাদবধ কাব্য, ৪।৪৫২-৪৫৮)

সীতার অতিপ্রাকৃত জন্ম-মিথের উল্লেখ করলেন মধুসূদন। সীতা অযোনি-সম্ভূতা। রাজর্ষি জনকের হল কর্ষণে মৃত্তিকা গর্ভ থেকে সীতার উদ্ভব। সাধারণ মানবী তিনি নন। তাঁকে উপলক্ষ করেই রাম-রাবণের যুদ্ধ, পরিণামে স্বর্ণলঙ্কার বিনাশ।

প্রসঙ্গ ঃ সীতার জন্ম। রাবণ-ভীতি থেকে এ মিথের উদ্ভব। বাল্মীকি রামায়ণ থেকে মিথটি গৃহীত। এ মিথের দুই প্রধান চরিত্র সীতা ও বসুন্ধরা। পটভূমি মর্ত্যজগত। উপজীব্য সীতার জন্ম।

তাৎপর্য ঃ জন্মের অলৌকিকতা। নায়ক-নায়িকার এ ধরনের অলৌকিক জন্ম-মিথ পৃথিবীর সব দেশেই লভ্য। সুপরিচিত একটি folk motif এর ভিত্তি।[৮] তা হ'ল 'Earth gives birth to woman' (A1234.4) Animism বা সর্ব-প্রাণবাদে বিশ্বাস থেকেই এ motif-এর উদ্ভব। বসুন্ধরাকে সজীবসত্তা কল্পনা।

গঠন প্রকৃতি ঃ অসাধারণ কন্যার জন্মের অসাধারণত্ব।

---

৮. Stith Thompson. Motif Index of Folk.-literature, Vol. 1, 1966, P. 206.

মেঘনাদবধ কাব্যে এ মিথের প্রয়োগ-তাৎপর্য হ'ল, রাবণ-বিনাশের হেতুটি কবি ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন। এ ইঙ্গিত অবশ্য কবিগুরু বাল্মীকি বহুদিন পূর্বেই দিয়ে গেছেন।

৮. বাল্মীকি মিথ

বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ডে বাল্মীকির কবিত্ব-লাভের যে বিবরণ পাই তার উল্লেখ ঘটলো মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে :

যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন-কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি।
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে ?
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে,
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি !
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি ! (পঙ্‌ক্তি ১১-২১)

প্রসঙ্গ : বাল্মীকির জন্ম। উৎস : বাল্মীকি রামায়ণ। রূপান্তর-বিশ্বাস থেকে মিথটির উদ্ভব। পাত্র-পাত্রী : বাল্মীকি, নিষাদ, ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চী। হত্যা, শোক ও শ্লোক-উচ্চারণ ক্রিয়া-সংযুক্ত এ মিথ। পটভূমি : বাল্মীকি-তপোবনে সন্নিহিত তমসা তীরবর্তী অরণ্যভূমি। মুনি বাল্মীকির কবি বাল্মীকিতে অলৌকিক রূপান্তর। মিথ-এ তাৎপর্যে বিধৃত। গঠন প্রকৃতিতে পাই অবস্থা-বৈপরীত্যের সাক্ষাৎ। এক দিকে নিষাদের ক্রৌঞ্চ হত্যা (বিনাশ), অন্যদিকে বাল্মীকির শ্লোক রচনা (সৃষ্টি)। মুনি বাল্মীকি সাধারণ ব্যক্তি মাত্র। কবি বাল্মীকি অসাধারণ ব্যক্তি রূপে পরিগণিত। বাল্মীকির মানসিক রূপান্তরটি নির্দেশিত হ'ল।

বাল্মীকি-রামায়ণে মুনি বাল্মীকির কবি বাল্মীকিতে রূপান্তরের যে বর্ণনা, তাতে সরস্বতীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ অনুচ্চারিত। মেঘনাদবধ কাব্যের সূচনায় সরস্বতী-বন্দনায় প্রবৃত্ত মধুসূদন সুপরিচিত পুরা-কাহিনীর সঙ্গে সরস্বতীর যোগ ঘটিয়ে পুরা-কাহিনীটিতে একটি নতুন মাত্রা যোজনা করলেন। বাল্মীকি-রামায়ণে যে অলৌকিক শক্তি ছিল রহস্যাবৃত, মেঘনাদবধ কাব্যে তা যেন ব্যাখ্যাত হ'ল। বাল্মীকির ঐ রূপান্তরণের পিছনে মধুসূদন দেবী সরস্বতীর অস্তিত্ব কল্পনা করলেন। প্রচলিত মিথ এভাবেই নতুন তাৎপর্য লাভ করলো। ঘটলো ব্যাপ্তি। যা ছিল নিছক মানুষের কথা, তা দৈবী কৃপা-কাহিনীতে পরিবর্তিত হ'ল। দৈবী-প্রেরণার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপিত হ'ল। মিলটনের 'Paradise Lost' কাব্যের

Invocation to Muse'-কে সামনে রেখে মধুসূদন সরস্বতী-বন্দনায় প্রবৃত্ত হলেন। স্মরণযোগ্য, পরবর্তীকালে কবি বিহারীলালও তাঁর 'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯) কাব্যে এই অলৌকিক শক্তিকে 'সারদা' নামে অভিহিত করলেন।

৯ শেষ নাগ মিথ।

সৈনাপত্যে অভিষেক ঘটেছে ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদের। ভীত-সন্ত্রস্ত দেবরাজ ইন্দ্র রাক্ষসকুলের শক্তি হ্রাসের আবেদন নিয়ে কৈলাসধামে অম্বিকা-সকাশে উপস্থিত হলেন। রাবণের অন্যায়াচরণের শাস্তি-কামনা করলেন। জানালেন, পৃথিবী রাবণের পাপে পরিপূর্ণ, পৃথিবীর ভারবহনরত শেষ নাগের কাছে এ ভার হয়ে উঠেছে দুর্বহ : 'ক্লান্ত বিশ্বধর শেষ' (মেঘনাদবধ কাব্য, ২য় সর্গ, পঙ্‌ক্তি : ১৫৬)। একটি মিথ-এর প্রয়োগ ঘটলো। পাতালবাসী নাগরাজ শেষ বা বাসুকির ফণার উপরে স্থাপিত রয়েছে এ পৃথিবী। ব্রহ্মার আদেশে পৃথিবী-ধারণের ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল শেষ নাগ। মহাভারতের আদিপর্বের ৩৬ সংখ্যক অধ্যায়ে ব্রহ্মার সেই আদেশের কথা পাই : 'ব্রহ্মা কহিলেন, "বৎস ! আমি তোমার শম ও দম দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু হে বৎস ! তোমাকে এই সর্বলোকহিতকর কার্যটি সম্পাদন করিতে হইবে। পর্বত কাননাদি-সমবেত এই ধরনীমণ্ডলকে তোমায় এইরূপে ধারণ করিতে হইবে যেন, উহা আর বিচলিত না হইতে পারে।'[৯]

পৃথিবীর স্থিতিশীলতার প্রশ্নেই এ মিথ এর উদ্ভব। পাত্র-পাত্রী শেষ নাগ ও পৃথিবী। শেষ নাগের আচরণ-বিশেষ (পৃথিবীর ভারবহন) এ মিথের আশ্রয়। পটভূমি পাতাল লোক। পৃথিবী ধারণকারী শেষ নাগের অতিপ্রাকৃত শক্তিটি এ মিথ-এ নির্দেশিত। Cosmology বা সৃষ্টি তত্ত্বের সঙ্গে যোগ এ মিথ-এর। গঠন-প্রকৃতি বিচারে বলা চলে, বাস্তু ভিটার সঙ্গে বাস্তুসাপের সম্পর্ক থেকে পৃথিবীর সঙ্গে সাপেদের রাজার এই সম্পর্ক কল্পিত হয়েছে। সমধর্মী যাদু বিশ্বাসের প্রভাবজাত এই সম্পর্ক-কল্পনা।

মেঘনাদবধ কাব্যে শেষ নাগের ক্লান্তির উল্লেখে রাবণের পাপের মাত্রাধিক্য জ্ঞাপিত হ'ল। বিশাল পৃথিবী ভারবহনে যে অক্লান্ত, সেও রাবণের পাপের ভারে ক্লান্ত, পীড়িত। ইন্দ্রের আবেদনের ভাষা হয়ে উঠলো উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ, গভীর অর্থবহ। মিথ এখানে সূচীমুখ অস্ত্রে পরিণত। মিথ যেন কথা বলে উঠলো, রাবণের অন্যায়াচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালো। প্রচলিত একটি মিথ-এর বিস্তার ঘটলো, তা নতুন তাৎপর্যে বিধৃত হ'ল। আর এসবই সম্ভব হ'ল কবির প্রয়োগ-কুশলতায়।

এ হ'ল মনস্তাত্ত্বিক কুশলতা। পাপের প্রতি স্পষ্টতই আমাদের এক ধরনের

৯ কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত মহাভারত, সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৩৮০, পৃ-৪৪ (বানানের ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-বিধি অনুসৃত)

বিরূপতা আছে। সেই বিরূপতাই প্রকাশ পেল ইন্দ্রের জবানীতে। বস্তুর ভার আর পাপের ভার,—এ দুইয়ে বিস্তর প্রভেদ। পাপের সঙ্গে রয়েছে অন্যায়ের যোগ। রাবণের সীতাহরণজনিত পাপে ন্যায়-নীতি লাঞ্ছিত, বিপর্যস্ত। বিশ্বধর শেষ নাগের ক্লান্তিতে আহত বিশ্ব-নিয়মেরই যেন আত্মপ্রকাশ ঘটলো। ক্লান্ত শেষ নাগ শরীরী হয়ে উঠলো। শুভ-অশুভ, ভালো-মন্দ, জয়-পরাজয় ইত্যাদির সঙ্গে এ মিথ সম্পর্কযুক্ত। শেষ নাগ হ'ল নৈতিক সত্যের প্রতিভু। এক কথায় এ মিথকে 'social vehicle of thought and feeling' হিসেবে গ্রহণ করা চলে।

১০ মৈনাক পর্বত মিথ

দেব-দানবের যুদ্ধে দেবকুল পরাজিত। দেবরাজ ইন্দ্র লাঞ্ছিত। অসহায়ভাবে একাকী চলেছেন হিমাচল অভিমুখে। কবি স্মরণ করিয়ে দিলেন, এই ইন্দ্রই একদা বজ্রাঘাতে পর্বতকুলের স্বর্ণ পক্ষচ্ছেদনে ব্রত হয়েছিলেন। সে সময়ঃ

শৈলরাজসুত মৈনাক পশিলা
অতলজলধিতলে—মান বাঁচাইতে!
(তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, ১ম সর্গ)

সুপরিচিত একটি মিথ-এর প্রয়োগ ঘটলো। প্রসঙ্গঃ মৈনাক পর্বতের আত্মগোপন। উদ্ভবঃ নিসর্গ-ভীতি থেকে। মিথটির আড়ালে রয়েছে বিশেষ একটি motif: 'wings cut from flying mountains' (A 1185) স্টিথ থম্পসনের 'মোটিফ ইনডেক্স অফ ফোক লিটারেচার' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (১৯৬৬) উল্লেখিত (পৃ ২০২)। ইন্দ্র ও মৈনাক এ মিথের দুই প্রধান চরিত্র। পটভূমি মর্ত্যলোক। ইন্দ্রের ক্রোধাচরণ ও মৈনাকের আত্মগোপনরূপ ক্রিয়া-সংযুক্ত এ মিথ। ইন্দ্র ও মৈনাকের অতি-প্রাকৃত কার্যকলাপ বর্ণিত। গঠন প্রকৃতিতে পাই, দুই শক্তির দ্বন্দ্ব। একদিকে ক্ষতিকারক অত্যাচারী শক্তি (মৈনাক), অন্যদিকে ক্ষতিনিবারক দৈবী শক্তি (ইন্দ্র)। পরিণামে দৈবী শক্তি জয়ী। মৈনাক জীবন্ত সত্তা রূপে কল্পিত। Animism বা সর্বপ্রাণবাদের নিদর্শন।

প্রবল পরাক্রমশালী ইন্দ্রের অসহায়তা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই মিথটির সাহায্য নিলেন মধুসূদন। দেবরাজ ইন্দ্রের অতীত ও বর্তমান অবস্থার প্রতি তুলনা সূত্রেই এ মিথ-এর আবির্ভাব। স্বল্পতম পরিসরে ইন্দ্রের অবস্থা-বিপর্যয়-চিত্রণে মিথটির কার্যকারিতা তাই অনস্বীকার্য। লোক ব্যাখ্যায় মৈনাকের আত্মগোপনের হেতু ছিল ইন্দ্রভীতি। মধুসূদন ভীরু মৈনাককে মর্যাদাসম্পন্ন করে তুলেছেন। কেন এই পরিবর্তন সাধন? সুপরিচিত মিথ-এর সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে মর্যাদা-হারা ইন্দ্র আর মর্যাদা ভীরু মৈনাকের মানস যন্ত্রণার ঐক্য রূপটি নির্দেশ করলেন কবি। মধুসূদনের এ ব্যাখ্যায় মিথ পেল নতুন তাৎপর্য, নতুন মাত্রা। স্বরূপত এ মিথ মনস্তত্ত্বনির্ভর।

প্রসঙ্গত স্মরণ যোগ্য, 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের প্রথম সর্গে রাধিকার কণ্ঠে এ মিথ-এর প্রথমাংশ উল্লেখিত :

শুনিয়াছি, সই ইন্দ্র রুষিয়া
গিরিকুল-পাখা কাটিলা যবে,
সাগরে অনেক নগ পশিয়া
রহিল ডুবিয়া—জলধিভবে।

মৈনাক প্রসঙ্গ স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখিত হয় নি। অতিরিক্ত দু'টি পংক্তিতে কবি বাস্তব সমস্যা-সচেতন :

সে শৈল সকল শির উচ্চকরি
নাশে এবে সিন্ধুগামিনী তরী।

মিথ ও বাস্তবের বিচিত্র সহাবস্থানের দৃষ্টান্ত। মধুসূদনের কবি-কল্পনায় আত্মগোপনকারী পর্বতকুল যেন প্রতিশোধলিপ্সু। বিরহিনী রাধিকার আক্ষেপোক্তি, প্রণয়-সাগরে বিচ্ছেদ-পাহাড় প্রেমতরীর বিনাশক। মিথ-আশ্রয়ে কবি-ভাবনার বিস্তার ঘটলো।

১১. গঙ্গা মিথ

'কাশীরাম দাস' কবিতায় (চতুর্দশপদী কবিতাবলী) গঙ্গা মিথের সাহায্য নিয়েছেন কবি। ইক্ষ্বাকু বংশীয় ভগীরথ কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে তাঁর জটাজালে আবদ্ধা সুরধনী গঙ্গাকে মর্ত্যে নিয়ে আসেন (গঙ্গার আর এক নাম তাই ভাগীরথী)। ভাগীরথীর পূত সলিল স্পর্শে কপিল মুনির শাপে ভস্মীভূত ভগীরথের পূর্বপুরুষ সগর রাজার ষাট হাজার পুত্রের মুক্তি লাভ ঘটে।

এ হ'ল গঙ্গার মর্ত্যাবরণ মিথ। পবিত্র নদীর উদ্ভব-কাহিনী। গঙ্গা পতিতোদ্ধারিনী। অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী। বাল্মীকি রামায়ণে রয়েছে গঙ্গার মর্ত্যাবতরণ কাহিনী। গঙ্গা, মহাদেব আর ভগীরথ এ কাহিনীর প্রধান পাত্রপাত্রী। ভগীরথের তপস্যা, গঙ্গাবতরণে মহাদেবের আনুকূল্যবিধান, গঙ্গার মর্ত্যাবতরণ ও পতিতোদ্ধার ইত্যাদি আচরণ ঘিরে এ-মিথ গড়ে উঠেছে। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ত্রিলোক ব্যাপ্ত এর পটভূমি। মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা, মুক্তিদাত্রী নদীর কল্পনা, নদীর আবির্ভাব, মুক্তি প্রদান,—এই সূত্র পরম্পরা অনুসরণেই মিথটি গঠিত। বিশেষ এই নদীকে দেখা হ'ল জীবন্ত সত্তারূপে। স্পষ্টতই Animism বা সর্বপ্রাণবাদের নিদর্শন।

আলোচ্য কবিতায় গঙ্গা মিথ রূপক তাৎপর্যে অম্বিত। ভগীরথের দুশ্চর সাধন-কৃতিত্বের সঙ্গে কাশীরাম দাসের কবি-কৃতিত্ব তুলনায়িত। কাশীরাম দাস সংস্কৃত ভাষায় মহর্ষি দ্বৈপায়ন রচিত মহাভারত কথার বঙ্গানুবাদ করে মহাভারত-রসে বঙ্গভূমিকে প্লাবিত করেন। বাঙ্গালীর মহাভারত-রস-পিপাসা এতে নিবৃত্ত হয়।

মধুসূদনের কবিতায় রূপক-পরম্পরায় কাশীরাম দাসের কৃতিত্ব প্রদর্শিত হ'ল। যথা :

উপমেয়	উপমান
১. মহাভারত-রস-ধারা	১. গঙ্গার স্রোতধারা
২ মহর্ষি দ্বৈপায়ন	২. দেবতা চন্দ্রচূড় (মহাদেব)
৩. জটিল সংস্কৃত ভাষা	৩. মহাদেবের জটাজাল
৪. কাশীরাম দাস	৪. ভগীরথ
৫. ভারতকথার বঙ্গানুবাদ	৫ ভাগীরথী
৬. বাঙ্গলীর ভারত-রস-পিপাসার চরিতার্থতা বিধান	৬. সগর পুত্রগণের মুক্তি সংঘটন

এককথায়, কাশীরাম দাসের প্রশস্তি-কীর্তনরত মধুসূদন মিথের কাব্যিক উপস্থাপনায় বিরল কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

১২. ইন্দ্রপ্রস্থ মিথ =ময়দানব মিথ)

লংকাধিপতি রাবণের রাজসভার প্রশস্তি-কীর্তনে একটি ব্যতিরেক অলংকারের ব্যবহার ঘটেছে :

কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে ?

(মেঘনাদবধ কাব্য, ১ম সর্গ, পঙ্‌ক্তি : ৫৯-৬১)

পাণ্ডবদের তুষ্টি সাধনের নিমিত্ত পুরাণ-প্রসিদ্ধ ময়দানব নির্মিত ইন্দ্রপ্রস্থের তুলনায় লংকার রাজসভার উৎকর্ষ প্রতিপাদনই কবির অভিপ্রায়। ময়দানবের ইন্দ্রপ্রস্থ প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের অতুলনীয় নিদর্শন : "Maya is an architect, builder of palaces combining all "divine, demoniac, and human' designs. His chief work is a palace of such beauty as to be "like a god-guarded maya."[১০]

তা যেন এক যাদুকরের সৃষ্টি।

ইন্দ্রপ্রস্থ মিথের উদ্ভব অলৌকিক পুরীর কল্পনা সম্ভূত। মহাভারতের সভাপর্বে এ মিথের উল্লেখ লভ্য। ময়দানব এ মিথের কেন্দ্রীয় চরিত্র। পটভূমি পাণ্ডব সভা। শিল্পী ময়দানবের শিল্পসৃষ্টির অলৌকিকত্ব প্রতিপাদনই মিথটির উদ্দেশ্য।

পাঠক-মনে ময়দানব সৃষ্ট ইন্দ্রপ্রস্থ সম্পর্কে যে ধারণা বিদ্যমান, তাকে রাবণের রাজসভার অসাধারণত্ব প্রতিপাদনে ব্যবহার করলেন মধুসূদন। অল্প কথায় অনেক

১০. E. W. Hopkins, Epic Mythology, 1915, p. 49

কথাই বলা হ'ল। মিতভাষিতার নিদর্শন। সভা-বর্ণনায় এলো গাম্ভীর্য আর সংহতি। স্বল্পায়াসে লঙ্কেশ্বর রাবণের প্রচণ্ড শক্তি, প্রভূত ঐশ্বর্য আর সৌন্দর্য-বিলাসের পরিচয় প্রদানে সমর্থ হলেন কবি। পাঠককে রাবণের রাজসভায় পৌঁছে দিলেন। মিথ সম্পর্কিত আলোচনায় ক্লদ লেভিস্ট্রসের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর বক্তব্য: "Myth is language : to be known, myth has to be told ; it is a part of human speech, ... it is both the same thing as language, and also something different from it."[১১] সন্দেহ নেই, মিথ এ ভাবেই ভাষার শক্তি আর সামর্থ্য বাড়িয়ে দেয়। লক্ষণীয়, রাবণের রাজসভা-বর্ণনায় মহাভারতোক্ত ইন্দ্রপ্রস্থের অবতারণা ঘটেছে। রামায়ণ-আশ্রয়ী মেঘনাদবধ কাব্যে মহাভারত-প্রসঙ্গ স্থানপ্রাপ্ত। এ হ'ল পুরাণ-সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত।

মিথ প্রয়োগে অসতর্কতা

মিথ প্রয়োগে মধুসূদনের আত্যন্তিক সতর্কতা সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে যে তিনি অন্যমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। উদাহরণ হিসেবে 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে ব্যবহৃত সীতার অগ্নি-পরীক্ষা সম্পর্কিত মিথটির উল্লেখ করা চলে:

হে বসুধে, জগৎজননি।
দয়াবতী তুমি, সতি, বিদিত ভুবনে।
যবে দশানন অরি,
বিসর্জিলা হুতাশনে জানকী সুন্দরী,
তুমি গো রাখিলা বরাননে।

বস্তুতপক্ষে, রাবণ বিনাশের পর রামচন্দ্র লঙ্কায় সর্বজন সমক্ষে সীতার যে অগ্নি-পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন, তাতে স্বয়ং অগ্নিদেব সীতাকে আশ্রয় দেন (লংকা কাণ্ড, বাল্মীকি রামায়ণ)। পরবর্তীকালে বাল্মীকির নির্দেশে আশ্রমবাসিনী সীতাকে পুনর্গ্রহণের জন্য রামচন্দ্র দ্বিতীয়বার সীতাকে পরীক্ষা করতে চাইলে রোরুদ্যমানা সীতার প্রার্থনায় ধরণী দ্বিধাবিভক্ত হয়; সীতার পাতাল প্রবেশ ঘটে। স্পষ্টতই মধুসূদন এ মিথের বিপর্যয় ঘটিয়েছেন।

উপসংহার

জলের সঙ্গে মাছের যে সম্পর্ক মিথ-এর সঙ্গে মধুসূদনের সেই সম্পর্ক। তাঁর কাব্যচর্চায় মিথ কখনো প্রেরণা (মিথ: ৮), কখনো বা অলংকার (মিথ: ২,১১,১২)। মিথ কখনো অবিকৃত (মিথ: ১.১, ১.২, ১.৩, ১৪, ২, ৩, ৬ ইত্যাদি), কখনো বা ঈষৎ পরিবর্তিত (মিথ: ৮), প্রয়োজনে সম্প্রসারিত (মিথ: ৯)। ক্ষেত্রবিশেষে মিথের নতুন ব্যাখ্যাও দেন তিনি (মিথ: ৭,১০)। মিথ কবি-ভাষণের ব্যাপ্তি ঘটায়

---

১১ Levi-strauss, claued : The structural study of myth, Myth : A Symposium, 1965, p. 84.

(মিথ ঃ ১২), চরিত্রের স্বরূপ-রহস্য উদ্ঘাটন করে (মিথ ঃ ১), চরিত্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করে (মিথ ঃ ৫), হয়ে ওঠে পরিবেশ পরিস্থিতি চিত্রণ-সহায়ক (মিথ ঃ ৪,১২)। মিথ কখনো মনস্তত্ত্বনির্ভর (মিথ ঃ ১০) কখনো সর্বপ্রাণবাদের নিদর্শন (মিথ ঃ ৭,১০,১১)। মিথ শ্রেণীদ্বন্দ্বেরও দৃষ্টান্ত। দেবকুল ও অসুরকুলের দ্বন্দ্ব-বিরোধের উদাহরণ নারায়ণ (বা ২ সংখ্যক সমুদ্র মন্থন) ও ইন্দ্রপ্রস্থ মিথ (১২ সংখ্যক)। ইন্দ্র ও পর্বতকুলের দ্বন্দ্ব-বিরোধের দৃষ্টান্ত ১০ সংখ্যক মিথটি। কালে এই দ্বন্দ্ব-বিরোধ পেয়েছে প্রতীকী তাৎপর্যঃ 'struggle between good and evil.'[১২] মানুষের স্থায়ী মূল্যবোধের আবেগবাহিত নিদর্শন এগুলি। সমাজতাত্ত্বিকেরা এ সমস্ত মিথ-এর আড়ালে প্রাচীন গোষ্ঠী সংগ্রামের লুপ্ত ইতিহাস অনুসন্ধান করতে পারেন।

মিথ কবি মধুসূদনকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী করে তোলে (মিথ ঃ ৮), স্থলবিশেষে প্রতিবাদের অস্ত্রে পরিণত হয় (মিথ ঃ ৯)। মিথ তাঁর হাতে প্রতীক তাৎপর্য লাভ করে (মিথ ঃ ৬), মিথ-সহায়তায় তিনি রূপকের জগতটি গড়ে তোলেন (মিথ ঃ ১১)। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, হরিবংশ, শিবপুরাণ, দেবীভাগবত প্রভৃতি পুরাণ-কাব্য তাঁর মিথ সংগ্রহের উৎস। মধুসূদনের অধ্যয়ন-পরিধির বিশালতাই এতে প্রমাণিত হয়। স্বরূপ-বিচারে এগুলি literary myth, কিন্তু এগুলির ভিত্তি যে pre-literary myth তাতে সন্দেহ নেই।

উপরি-উক্ত মিথগুলিতে বহুবিচিত্র পাত্র-পাত্রীর আবির্ভাব ঘটেছে। সারণী-যোগে তা প্রকাশ করা যেতে পারে—

পাত্র-পাত্রী	মিথ সংখ্যা
১. দেবতা	১.১
২. দেবতা + দেবী + দানব	৬
৩. দেবতা + অসুর	২,৩,৯
৪. দেবী + অসুর	৪
৫. দেবতা + রাক্ষসী	১.২
৬. দেবতা + পর্বত	১.৪,১০
৭. দেবতা + নাগ	১.৩
৮. দেবতা + মানব + নদী	১১
৯. দানব	১২
১০. পৃথিবী ও নাগ	৯
১১. পৃথিবী ও পৃথিবী-কন্যা	৭
১২. মানব + পাখি	৮

১২. E. O. James এ জাতীয় মিথকে এভাবেই দেখতে চেয়েছেন। তাঁর 'Myth and ritual in the ancient near east' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

এ সমস্ত পাত্র-পাত্রীর আচরণ-বৈচিত্র্যও কৌতূহলোদ্দীপক। যেমন—

আচরণ	মিথ সংখ্যা
১. কৃষ্ণের জন্ম	১.১
২. সীতার জন্ম	৭
৩. মদন-রতির পুনর্জন্ম	৬
৪. কার্তিকেয়র জন্ম	৫
৫. কবি বাল্মীকির জন্ম	৮
৬. তারকাসুর হত্যা	৫
৭. মহিষাসুর হত্যা	৪
৮. শম্বর হত্যা	৬
৯ পুতনা হত্যা	১.২
১০. ক্রৌঞ্চ হত্যা	৮
১১. মহাদেবের বিষভক্ষণ	৩
১২. দেবগণের অমৃতপান	৩
১৩. নারায়ণের মোহিনী মূর্তি ধারণ	২
১৪. কৃষ্ণের পর্বত উত্তোলন	১.৪
১৫. কৃষ্ণের কালীয় নাগ দমন	১.৩
১৬. ইন্দ্রের বজ্রনিক্ষেপ	১০
১৭ পর্বতকুলের আত্মগোপন	১০
১৮. শেষ নাগের পৃথ্বী-ভার বহন	৯
১৯. ময়দানবের মায়াপুরী নির্মাণ	১২
২০. ভগীরথের তপস্যা	১১
২১. গংগার মর্ত্যাবতরণ ও পতিতোদ্ধার	১১

স্থান-বৈচিত্র্যের আলোচনায় বলতে হয় ত্রিলোকচারিতার কথা। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ত্রিভুবনের উপস্থিতি। মর্ত্য-চিত্রণে পাই সমুদ্রমন্থন পরবর্তী সমুদ্রতীর, মথুরা, দ্বারকা, ব্রজধাম, কালীয় হ্রদ, ইন্দ্রপ্রস্থ, বাল্মীকির আশ্রম সন্নিহিত তমসা তীরবর্তী অরণ্য-ভূমি, শম্বরপুরী প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ।

এক কথায়, মিথ মধুসূদনের কবি-ভাষার অংগ হয়ে উঠেছে। মিথ কবিকে করেছে মিতভাষী। কবি-ভাষণের গাম্ভীর্য ও গভীরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। বক্তব্যে সঞ্চারিত হয়েছে ব্যাপ্তি আর বিশালতা। মধুসূদনের কাব্য-কবিতায় মিথ-এর প্রয়োগ শিল্পশ্রী মণ্ডিত।

মধুসূদন প্রতিভার মূল্যায়ন

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

[প্রথম পর্ব : ১৮৬০-১৯২০]

মধ্যাহ্ন সূর্যের খরদীপ্তিতে জ্যোতিষ্মান মধুসূদনের কাব্যপ্রতিভা। সে প্রতিভার ছিলো প্রচণ্ড প্রবলতার সংগে বিপুল ব্যাপকতা। ধূমকেতুর মতো তাঁর আকস্মিক আবির্ভাবে শ্লথগতি বাংলা সাহিত্য হঠাৎ বেগবান হয়ে উঠলো। মধুসূদনের সমকালে বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। কিন্তু সেখানেই তাঁর কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা থেমে থাকে নি। তাঁর তিরোধানের পরবর্তীকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য-জগতের বহু রথী-মহারথী তাঁর কবিমানস ও কাব্য প্রতিভার স্বরূপ সম্পর্কে নানা বিচার, বিবেচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সে প্রতিভার ব্যাপ্তি ও গভীরতা এত বেশী যে, সে সম্পর্কে শেষ কথা উচ্চারিত হয়েছে—এমন কথা বলা যায় না। মহৎ প্রতিভার ধর্মই এই। যুগ-বিবর্তনের সংগে সংগে নিত্য নতুন ভাবচিন্তার আলোকে সে প্রতিভার স্বরূপ নতুন রূপে দেখা দেয়। পৃথিবীর অপরাপর ক্লাসিক কবিদের কবি-প্রতিভার স্বরূপ অনুসন্ধানের বেলায় এটা যেমন ঘটেছে, মধুসূদনের কবি-প্রতিভা নিরূপণের সুদীর্ঘ ইতিহাসেও এ সত্যের ব্যতিক্রম হয়নি। ভাববস্তু ও চিন্তা-বিচারের দিক থেকে মধুসূদন-প্রতিভার মূল্যায়নকে কালানুক্রমিক কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্বের বিস্তৃতি কাল ১৮৬০ থেকে ১৯২০। এই বিস্তৃত কালসীমায় বিভিন্ন মনীষীর মূল্যায়নে তাঁর প্রতিভার স্বরূপ কি পরিমাণে উম্মোচিত হয়েছে—তা আলোচনা করে দেখা যেতে পারে।

সহজাত নাট্যপ্রতিভা-বলে বাংলা সাহিত্যে অতর্কিত আবির্ভাবের সংগে সংগে মধুসূদন প্রচলিত নাট্য রীতিকে লংঘন করে নতুন আদর্শের কয়েকখানি নাটক ও প্রহসন রচনা করেন। নাট্য রচনায় অভিনব রীতি অনুসরণের সাহায্যে তিনি সে যুগের প্রগতিশীল নাট্যামোদী সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করেন—এ তথ্য সুবিদিত। কিন্তু প্রাচীনপন্থীদের বিরোধিতার চাপে এবং পৃষ্ঠপোষকদের বিরূপতায় তাঁর নাটক রচনা-প্রয়াস মাঝপথেই খণ্ডিত হয়ে যায়। নাটকীয় সংঘাতপূর্ণ 'রিজিয়া' নাটক রচনার পরিকল্পনাও তাঁকে বিসর্জন দিতে হয় সে যুগের নাট্যামোদী সমাজের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্য। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে Calcutta Review-তে বাংলা সাহিত্য বিষয়ক ইংরেজীতে লিখিত আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের

নাট্যপ্রতিভার মূল্য নির্ণয়ে যে সাহিত্যিক সমালোচনা করেছিলেন, তা ছাড়া সে যুগে মধুসূদনের নাটক প্রহসনের মূল্যবান তেমন কোন আলোচনা বা সমালোচনা চোখে পড়ে না, একমাত্র বন্ধুবান্ধব-লিখিত সোৎসাহ কিছু কিছু চিঠিপত্র ছাড়া। ১৮৬০ সনে তাঁর তিনখানি নাটক প্রহসন রচনার সমকালে অভিনব ছন্দ-রীতিতে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সে যুগের সমালোচক-মহলের সমস্ত মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নতুন কাব্যাদর্শে রচিত এই কাব্যখানির প্রতি। তখন থেকে মধুসূদন-প্রতিভার মূল্যনির্ণয়-প্রয়াস তাঁর কাব্যের খাতেই প্রবাহিত হতে থাকে।

॥ দুই ॥

ফর্ম ও কনটেন্টের দিক থেকে মধুসূদনের অভিনব কাব্যসৃষ্টিও তাঁর বিপ্লবী-নাট্যপ্রয়াসের মতই সে যুগের প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীলদের উপহাস অবজ্ঞা ও সমালোচনার বস্তুতে পরিণত হয়। দৃঢ়চেতা, মৌলিক প্রতিভাবান সাহিত্যশিল্পী মধুসূদন এ সমস্ত মূল্যহীন সমালোচনাকে কোন প্রকার আমল না দিয়ে সৃষ্টির উল্লাসে সামনের দিকে এগিয়ে গেছেন। সৌভাগ্যক্রমে পাশ্চাত্ত্য ব্ল্যাংক্ ভার্সের আদর্শে মধুসূদন-রচিত কাব্য-পাঠকের সংখ্যা তাঁর নাট্য-পাঠক কিংবা অভিনয়-দর্শকের সংখ্যার মত এত সীমাবদ্ধ ছিলো না। এঁদের মধ্যে উন্নত সাহিত্যরুচির পাঠকও ছিলেন। এঁরা নিরন্তর উৎসাহ দান করে তাঁর অভিনব কাব্যসৃষ্টিকে বাঞ্ছিত পরিণামের দিকে এগিয়ে দিতে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। এ ছাড়া সে যুগের সাহিত্যবোধসম্পন্ন কোন কোন ব্যক্তি সহৃদয় সমালোচনার সাহায্যে তাঁর সৃষ্টির অগ্নিকে জ্বালিয়ে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। ১৮৭৩ সনে মধুসূদনের অকাল-প্রয়াণের পরও তাঁর কাব্যপ্রতিভার মূল্যায়ন সমানভাবে চলতে থাকে।

এখন প্রথম পর্বের মধুসূদন-কাব্য-সমালোচনার একটা কালানুক্রমিক খতিয়ান নিয়ে সে সমালোচনার সত্যমূল্য কতখানি—বিচার করে দেখা যেতে পারে।

১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে অভিনব অমিত্রচ্ছন্দে 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে যুগের প্রাচীনপন্থী সাহিত্য-সমাজ মধুসূদন-সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। এই প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ। সেই সংকীর্ণ সংস্কারান্ধতার যুগেও উদারপন্থী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বিপ্লবী কবির অভিনব ছন্দ-সৃষ্টি-প্রতিভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। স্ব-সম্পাদিত বিখ্যাত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার ২৩শে শ্রাবণ, ১২৮৭ (১৮৬০ খ্রীঃ অঃ) সংখ্যায় তিনি মন্তব্য করেন, কাব্যে প্রগাঢ় বিষয় প্রবর্তনের জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োজনীয়তা অবশ্য-স্বীকার্য। এই অভিনব ছন্দের সাহায্যে মধুসূদন বাংলা কাব্যের মান উন্নয়নের জন্য যে সচেষ্ট হয়েছেন—তা অত্যন্ত সময়োচিত কাজ বলেও তিনি মন্তব্য

করেন। তবে এই কাব্যের ফর্ম বিষয়ে উচ্ছ্বসিত হলেও কনটেন্ট বা বিষয়বস্তু সমালোচনায় তিনি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। তাঁর মতে এ কাব্যের বিষয়বস্তু উন্নত মানের বলে বিবেচিত হতে পারে না। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বিদ্যাভূষণের পক্ষে অমিত্রচ্ছন্দের কার্যকারিতা উপলব্ধি প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক সন্দেহ নেই। তবে পাশ্চাত্ত্য কাব্য-প্রভাবিত মধুসূদন তাঁর প্রথম বাংলা কাব্যে যে অনির্বচনীয় রোমান্টিক সৌন্দর্যজগত সৃষ্টি করেন, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দ্বারকানাথ তার মর্মলোকে প্রবেশের অধিকার পান নি বলেই মনে হয়।

সে যুগের সর্বজনশ্রদ্ধেয় মনীষী পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর বিখ্যাত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকার ৬ষ্ঠ পর্বের ৬৮ খণ্ডে (১৮৭২ শকাব্দ, অগ্রহায়ণ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ) প্রকাশিত একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে মধুসূদন-প্রবর্তিত অভিনব অমিত্রাক্ষর-ছন্দের সমর্থন করেন। এই সমর্থনের যুক্তি হিসেবে তিনি সংস্কৃত কাব্যের বহু নজীর উল্লেখ করে প্রমাণ করেন যে, সংস্কৃত কাব্যেও অমিত্রচ্ছন্দের অস্তিত্ব ছিলো। অমিত্রচ্ছন্দের ঐতিহ্য সম্পর্কে মনীষী রাজেন্দ্রলালের এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা মধুসূদন-বিরোধী রক্ষণশীল সমালোচকদের স্তব্ধ করে দেবার পক্ষে ছিলো যথেষ্টরও বেশী। মধুসূদন জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁর 'মধুস্মৃতি'র ১৪৪ পৃষ্ঠা থেকে ১৪৭ পৃষ্ঠায় সেই মূল্যবান সমালোচনাকে পুনর্মুদ্রিত করে পাঠকের নিকট সহজগম্য করে দিয়েছেন। কৌতূহলী পাঠক এই প্রবন্ধ পাঠে ছন্দশাস্ত্রে সুপণ্ডিত রাজেন্দ্রলালের যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করতে পারবেন বলে এ সম্পর্কে বাগ্‌বিস্তারের বেশী প্রয়োজন নেই। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' প্রকাশিত হবার পর স্বীয় সম্পাদিত 'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রিকায় রাজেন্দ্রলাল নতুন আঙ্গিকে রচিত চতুর্দশপদী কবিতাগুলিরও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এই প্রশংসা-বাক্যের ভেতর সেই অভিনব রীতিতে রচিত কবিতার সৌন্দর্য-মাধুর্য উপলব্ধিতে তাঁর ক্ষমতা লক্ষণীয়।

তিলোত্তমা সম্ভবের পরবর্তী মেঘনাদবধ-এর (১৮৬১) প্রকাশ কাল থেকে এ কাল পর্যন্ত কাব্যখানিকে কেন্দ্র করে যত তর্ক-বিতর্কমূলক সমালোচনার ঝড় বয়ে গেছে, কোন বাংলা কাব্য নিয়ে বোধ হয় তেমন হয়নি। সে সমালোচনার লক্ষ্য শুধুমাত্র অভিনব কাব্য-রীতি ছিলো না, ছিলো কাব্যগত ভাববস্তুর অভিনবত্বও। এ কাব্যের সর্বপ্রথম বিস্তৃত ও মূল্যবান সমালোচনা করেন কবির অকৃত্রিম বন্ধু মনীষী লেখক রাজনারায়ণ বসু। ইংরেজীতে পত্রাকারে লিখিত তাঁর মেঘনাদবধ-সমালোচনা পরবর্তীকালে সংশোধিত হয়ে তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এ (১২৮৯ বঙ্গাব্দ, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ) গ্রন্থবন্ধ হয়। রাজনারায়ণই বোধ হয় প্রথম সমালোচক যিনি কাব্যজগতে অভিনব সৃষ্টি মেঘনাদবধ-এর ভাববস্তু এবং মধুসূদনের কবিমানসের স্বরূপ অনেকটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। মেঘনাদবধকে তিনি 'এশিয়ারূপ জননী ও ইউরোপ-

রূপ জনয়িত্রীর সন্তান স্বরূপ' বলে মন্তব্য করেন। তাঁর এই প্রাজ্ঞ অভিমতই পরবর্তীকালে বিভিন্ন সমালোচনায় বিস্তৃত ও নতুন রূপে দেখা দিয়েছে। মধুসূদনের প্রতি অকৃত্রিম বন্ধুপ্রীতি সত্ত্বেও তাঁর কাব্য-সমালোচনায় তিনি নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি-ভংগীর পরিচয় দিতে দ্বিধা করেন নি। অনেক মহৎ গুণের সমাবেশ সত্ত্বেও এ কাব্যে তিনি ভাবের অনৈক্য, সরল ও অসরল বর্ণনার একত্র মিশ্রণ, বিপরীত ভাবের অসংগত সমাবেশ, হিন্দুভাববিরুদ্ধ বর্ণনা প্রভৃতি কতগুলি দোষত্রুটির কথা উল্লেখ করেন। এ ছাড়া বর্ণনার অপরিমিত দৈর্ঘ্য এবং নীতিগর্ভ বাক্যের অনুপস্থিতিকেও তিনি এ কাব্যের ত্রুটি বলে উল্লেখ করেছেন। বলা বাহুল্য, রাজনারায়ণের এই বিশ্লেষণে সাহিত্যিক দৃষ্টিভংগীর সংগে সে যুগের হিন্দু এবং পিউরিটান' দৃষ্টিভঙ্গীও একই সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করেছে। এতদ্সত্ত্বেও সেই রক্ষণশীল কাব্য-সংস্কারের যুগে রাজনারায়ণ বিপ্লবী কবি মধুসূদনের কাব্য প্রতিভার উত্তুংগ মহিমা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন—এটা কম কথা নয়। এই উপলব্ধি-প্রভাবে অনুন্নত বাংলা ভাষার সংস্কারক হিসেবে তিনি মধুসূদনকে শুধু মহাকবি গ্যেটের সংগে তুলনা করেই ক্ষান্ত হননি, অভ্রান্ত ক্লাসিকধর্মিতার জন্য মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা সাহিত্যে কালজয়ী হবে বলে তিনি যে ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন,—তা সত্যে পরিণত হয়েছে। 'বাংগালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায়'ও রাজনারায়ণ মধুসূদনের বিরুদ্ধে বিজাতীয়তার, প্রাঞ্জলতার অভাবের এবং রসভংগ দোষের অভিযোগ আনয়ন করেন। 'আত্মচরিত' রচনাকালে তাঁর এই অভিমত কিছুটা পরিবর্তিত হয়। বিজাতীয় আচার-আচরণ সত্ত্বেও অন্তঃপ্রকৃতির দিক থেকে মধুসূদন যে হিন্দু—এ সত্য তিনি অকপটে স্বীকার করেন। মধুসূদনের শিল্পী-ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ও অন্তর্জীবন উন্মোচনে এই সত্যই পরবর্তীকালে অনেক মূল্যবান সমালোচনায় পুনঃ পুনঃ দেখা দিয়েছে। মধুসূদনের শিল্পী-ব্যক্তিত্বে এই দ্বৈতরূপের উপলব্ধি নিঃসন্দেহে রাজনারায়ণের সুগভীর মানব চরিত্রজ্ঞান এবং সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকের দৃষ্টিভংগীর পরিচায়ক।

সে যুগের কৃতবিদ্য এবং প্রতিভাধর কবিদের মধ্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তত তিনবার মেঘনাদবধ কাব্যের সম্পাদনা প্রসংগে মধুসূদন-প্রতিভার স্বরূপ উন্মোচন করেন। সর্বশেষ সমালোচনা প্রকাশিত হয় মেঘনাদবধ-এর ষষ্ঠ সংস্করণের সংশোধিত ভূমিকায়—মধুসূদন তখন বিদেশে। সে ১৮৬৭ সনের কথা। সে সমালোচনায় তিনি মন্তব্য করেন, ভারতচন্দ্রের তুলনায় মধুসূদনের কল্পনাশক্তি অনেক উচ্চ স্তরের। এ ছাড়া তিনি মধুসূদনের বিভিন্ন রস সমাবেশের ক্ষমতা এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের সাহায্যে কাব্যের উদাত্ততা গুণ বৃদ্ধির উচ্চ প্রশংসা করেন। মৌলিক প্রতিভাবলে মধুসূদন ভারতচন্দ্রের যুগের অবসান ঘটিয়ে বাংলা কাব্যে নতুন যুগের প্রবর্তন করেছেন বলেই তাঁর সুচিন্তিত ধারণা। সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হেমচন্দ্রের এই স্বীকৃতি মধুসূদনের বিপ্লবী কবি-প্রতিভা সম্পর্কে সমকালীন বিরোধী পক্ষের মত পরিবর্তনে যে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল—তাতে সন্দেহ নেই।

॥ তিন ॥

'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পূর্বেই ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে Calcutta Review পত্রিকায় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র Bengali Literature প্রবন্ধে উচ্ছ্বাসবর্জিত সংযত ভাষায় মধুসূদন প্রতিভার যে মূল্য নির্ধারণ করেন, তার ভেতর সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয় বর্তমান। বঙ্কিমের বিবেচনায় মধুসূদনকে মহাকবিদের গোষ্ঠীভুক্ত করা যায় না, তবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান সর্বোচ্চে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কবিদের নিকট থেকে যথেষ্ট ঋণ গ্রহণ করা সত্ত্বেও, তাঁর মতে, মেঘনাদবধ বাংলা কাব্যসাহিত্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান গ্রন্থ। অমিত্রচ্ছন্দকে আবেগময় ভাবপ্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তবে আড়ম্বরপ্রিয়তা মধুসূদনের অন্যতম ত্রুটি এবং দেশী বিদেশী বহু কবির ভাব তিনি আত্মসাৎ করেছেন—এই গুরুতর অভিযোগও বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের বিরুদ্ধে আনয়ন করেন।*

ইংরেজী রীতি অনুসরণে মধুসূদন ব্যাকরণের নিয়মও লঙ্ঘন করেছেন বলে বঙ্কিম তাঁর কঠোর সমালোচনা করেন। রূপপ্রকাশ এবং ভাবধর্মিতার দিক থেকে 'বীরাঙ্গনা' তাঁর মতে পরিণততর কাব্য এবং অভিনবত্বহীন হলেও 'ব্রজাঙ্গনা' তাঁর মতে মিত্রাক্ষরে রচিত কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবার যোগ্য। বিভিন্ন বিষয়ে যদৃচ্ছভাবে রচিত বলে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'কে তিনি মধুসূদন-প্রতিভার যোগ্য সৃষ্টি বিবেচনা করেন নি। কল্পনার প্রসারের অভাবে মধুসূদনের নাট্য-শিল্প সার্থকতা লাভ করেনি বলে তাঁর ধারণা। তবে ঐকান্তিক বাস্তবধর্মিতার জন্য তিনি 'একেই কি বলে সভ্যতা'কে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রহসন বলে বর্ণনা করেছেন। মধুসূদনের মহাপ্রয়াণের পর তাঁর অনন্যসাধারণ কবি-প্রতিভার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং আবেগময় প্রেরণায় এই যুগপ্রবর্তক কবিকে 'জাতীয় কবি'র সম্মান দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছিলেন, তা তাঁর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সমালোচক সত্তার অভ্রান্ত প্রমাণ। বস্তুত-পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের মধুসূদন-সমালোচনায় কঠোর নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সহৃদয় সাহিত্যিকের যে মর্মগ্রাহিতা অভিব্যক্তি লাভ করেছে সে যুগের সমালোচনায় তা ছিল দুর্লভ।

* বাবু ভোলানাথ চন্দ্র ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের স্মৃতিচারণে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন: "Madhu has kept all the great Epic authors of Europe in his view, and has very successfully imitated Dante and Milton in his description of the infernal regions. ...The pictures are not plagiarisms—they are sufficiently originally graphic and spirited."

[দ্রষ্টব্য: মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু, দ্বিতীয় সংকরণ/পরিশিষ্ট পৃঃ ৩৭]

১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'-এ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মেঘনাদবধ-এর কবির কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, সহৃদয়তা এবং কল্পনাশক্তির উচ্চ প্রশংসা করেও এই কাব্যে 'চক্ষুঃশূলরূপ' নামধাতুর ব্যবহার, অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দের প্রয়োগ, অতিরিক্ত অলংকারপ্রিয়তা এবং দুর্বোধ্যতার সমালোচনা করেন। বীররসের উদ্দীপনার জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দের অপরিহার্যতার কথা তিনি স্বীকার করেন নি। তাঁর সুচিন্তিত অভিমত, মধুসূদন স্মরণীয় হবেন,—পাশ্চাত্ত্যের অনুসরণে তাঁর নবোদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্য নয়, তাঁর কবিত্বের গুণে।

কাব্যে মধুসূদনের ব্যাপক নামধাতুর ব্যবহার শুধুমাত্র সে যুগের রক্ষণশীল পণ্ডিতসমাজকে নয়, কোন কোন গতানুগতিক কবিকেও যে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছিল, জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'ছুছুন্দরী বধ' নামক ব্যঙ্গকাব্য তার প্রমাণ। পাশ্চাত্ত্য কাব্যপ্রভাবিত প্রতিভাধর কবি মধুসূদন সে যুগের গতিহীন বাংলা কাব্যে গতিবেগ এবং প্রবহমানতা সঞ্চারের জন্য কবি-ভাষায় যে এই পাশ্চাত্ত্য রীতি গ্রহণ করেছিলেন—পরবর্তী সমালোচনায় তার উপযোগিতা স্বীকৃত হয়েছে। অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দের আশ্রয়ে মধুসূদন তাঁর কাব্যভাষায় মহাকাব্যের গাম্ভীর্য আনয়নের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন, অলংকার প্রয়োগে আতিশয্যের পশ্চাতে রয়েছে একদিকে হোমারের অলংকার-রীতির অনুসরণ, আর একদিকে সমকালীন সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকদের রুচি তৃপ্তির প্রয়াস—এ সমস্ত কথাই পরবর্তী সমালোচনায় বিশদভাবে আলোচিত। মধুসূদনের কবি-ভাষার বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ শুধুমাত্র সে যুগের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নই করেন নি, এ যুগের কোন কোন আধুনিক কবিও উপস্থিত করেছেন। এ সমস্ত অভিযোগ যে কত অসার, মধুসূদনের স্ব-কাল থেকে এ কাল পর্যন্ত কাব্যামোদী সমাজে তাঁর কাব্যের জনপ্রিয়তা তার অভ্রান্ত প্রমাণ। অমিত্রছন্দের সাহায্যে মধুসূদন মেঘনাদবধ কিংবা বীরাঙ্গনা কাব্যে শুধু যে সার্থকভাবে বীররস সৃষ্টি করেছেন তা নয়, করুণরস-সৃষ্টিতেও অনন্যসাধারণ পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন, মধুসূদন-কাব্যের নিবিষ্ট পাঠকমাত্রই তা জানেন। এ ছাড়া অমিত্রচ্ছন্দের আবিষ্কার যে মধুসূদনের অভূতপূর্ব কবিত্বশক্তি বিকাশে অনন্য সহায়ক হয়েছিল এবং পয়ারের সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ বাংলা কাব্যজগতে তা যে ভাবমুক্তি ঘটিয়েছিল—প্রাচীন কাব্য-সংস্কার-প্রভাবিত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তা স্বভাবতই উপলব্ধি করতে পারেন নি।

মধুসূদন-প্রতিভার স্বরূপ নির্ণয়ে ১৮০৪ শকে-এ (১৮৮২ খ্রীঃ অঃ) 'ভারতী'তে প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধুসূদন-সমালোচনাও খুবই উল্লেখযোগ্য। মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কবি-কীর্তি মেঘনাদবধ-এর সমালোচনায় তিনি অ্যারিস্টটল-কথিত কাব্যগত ঐক্যের অভাবের অভিযোগ এনেছেন। নায়ক পরিকল্পনার

ভারতীয় আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্য আদর্শ গ্রহণ করায় মেঘনাদবধ মহাকাব্যের গৌরবলাভে বঞ্চিত হয়েছে—তাঁর এই সমালোচনা প্রাচীনপন্থী,—মধুসূদনের গ্রহিষ্ণু সৃষ্টিধর্মী কবি-মনের ওপর যুগ-প্রেরণার অনিবার্য প্রভাব উপলব্ধির অসামর্থ্যজনিত। নবযুগের কাব্যপ্রেরণার উৎস সম্পর্কে ধারণায় পেঁছোতে পারেননি বলে, শুধু বহিরঙ্গ বিচারে মেঘনাদবধকে তিনি মহাকাব্য বলতে চেয়েছেন। তাঁর বিবেচনায় মেঘনাদবধ-এ মহকাব্যোচিত সত্যিকারের কোন গুণ নেই। বঙ্কিমের মতই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মধুসূদনের বিরুদ্ধে আড়ম্বর-প্রিয়তার অভিযোগ এনে আরও মন্তব্য করেছেন,—তাঁর এই আড়ম্বরপ্রিয়তা আমোদজনক হলেও হৃদয়স্পর্শী নয়; তবে তিনি মনে করেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের দ্বারা শিথিল-বিন্যস্ত বাংলা কাব্যে গাঢ়বন্ধতা আনয়নের জন্য তিনি স্মরণীয় হবেন। মধুসূদনের কবি-প্রতিভা নির্ণয়ে পরিশীলিত-বুদ্ধি জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ এই দুর্লভ প্রতিভাবান কবির শ্রেষ্ঠ কবি-কীর্তির অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ—উভয় দিকের জ্ঞানবুদ্ধিমত বিচার করে প্রকৃত রসগ্রাহী সমালোচকের দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

মধুসূদনের কোন কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সমকালীন কোন কোন জীবিত ব্যক্তি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে যোগীন্দ্রনাথ বসু সর্বপ্রথম মধুসূদনের নির্ভরযোগ্য জীবনী প্রকাশ করেন। রক্ষণশীল ও নীতিধর্মী মনোভাবের জন্য বহু সমালোচিত হলেও এই বইখানি মধুসূদন-জীবনীর মধ্যে আকর-গ্রন্থের মর্যাদা পেয়ে আসছে। মধুসূদনের পাশ্চাত্য-প্রভাবিত জীবনের বহিরঙ্গের দিকে অধিকতর মনঃসংযোগ করায় এই গ্রন্থে তিনি কবির সৃষ্টিশীল অন্তর্জীবনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে পারেন নি—এ মন্তব্য কঠোর মনে হলেও সত্য। রক্ষণশীল হিন্দুমনোভাবের প্রভাবে মধুসূদনের জীবনের সকল দুর্গতির জন্য তাঁর খ্রীস্টধর্ম গ্রহণকে দায়ী করেছেন যোগীন্দ্রনাথ। অথচ খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের পর বিশপ্‌স্ কলেজে অধ্যয়নের সময়ে মধুসূদন গ্রীক, লাটিন, হিব্রু ভাষার সঙ্গে সর্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষা অনুশীলনেরও সুযোগ পান। মাদ্রাজ প্রবাসকালে মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি সচেতনভাবে সংস্কৃত চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন (তাঁর চিঠিপত্রেই এ সত্যের স্বীকৃতি আছে); এবং কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পরও তিনি এই সংস্কৃত-সাহিত্যের চর্চা অব্যাহত রাখেন। এই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যজ্ঞানের সাহায্যেই যে তিনি নিম্নমানের বাংলা কাব্যের সংস্কার-সাধন করেছিলেন, এ সত্য কারো অজানা নয়। সুতরাং খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের পরই তাঁর মহাকাব্য রচনার প্রস্তুতি-পর্ব শুরু হয়েছিল—এমন মন্তব্য তথ্যবিরোধী নয়। সৃষ্টিকর্মে মধুসূদনের বিদেশী আদর্শ-গ্রহণকে যোগীন্দ্রনাথ সমর্থনযোগ্য বিবেচনা করেন নি। অথচ সচেতনভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শ গ্রহণ করে বাংলা কাব্যে তিনি যুগান্তর উপস্থিত করেছিলেন—এ সত্য অস্বীকার করা শক্ত। জীবন-চর্যায় এত উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত জীবন-যাপন না করলে

মধুসূদন তাঁর নবসৃষ্টির ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করতে পারতেন—যোগীন্দ্রনাথের এ অভিমতও গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। যেহেতু যে-অপ্রতিরোধ্য প্রেরণার আত্মবিস্মৃত আবেশে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে নিম্নমানের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় তিনি নবসৃষ্টি করেছেন, সে প্রেরণার উৎস শুকিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৃষ্টিক্ষমতাও ক্ষীয়মান হয়েছে—বন্ধুর নিকট লিখিত মধুসূদনের এই স্বীকৃতিকে অবিশ্বাস করার মতো কোন সঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না। বস্তুতপক্ষে দুর্বার অন্তঃপ্রেরণার অভাব ঘটবার পর থেকেই মধুসূদনের অনেক নবসৃষ্টি-পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে—যোগীন্দ্রনাথ মধুসূদনের সৃষ্টিশীল কবি-মানসের এই বাস্তব পরিস্থিতির কথা বোধ হয় ভেবে দেখেন নি। নবসৃষ্টির আবেশ অন্তর্হিত হবার পর মধুসূদন যা রচনা করেছেন, সেগুলিকে যুগান্তকারী অভিনব-সৃষ্টি বলা চলে না। যোগীন্দ্রনাথ বসুর মধুসূদন-জীবনী তথ্যসমৃদ্ধ, সুলিখিত ও সুপাঠ্য। কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তিনি মধুসূদনের অনন্য প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেন নি বলেই আমাদের বিশ্বাস।

মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর 'Literature of Bengal' (১৮৯৫)-এ যেভাবে মধুসূদন-প্রতিভার মূল্যায়ন করেছেন, তাতে শ্রদ্ধাশীল ভক্তের পূজার মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে বেশি। মেঘনাদ বধ-এর কবিকে সমুচ্চ প্রতিভা-সম্পন্ন কবি বলেই তিনি শুধু ক্ষান্ত হন নি,—ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, হোমার, দান্তে এবং শেক্সপীয়রের পরবর্তী পর্যায়ে তাঁকে স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে কবি হিসেবে মধুসূদনের শ্রেষ্ঠত্বের পটভূমিকায় ছিলো তাঁর চিন্তার মহত্ত্ব ও পরিকল্পনার নৈপুণ্য। ঐশ্বর্যময় কল্পনার সঙ্গে কোমল কারুণ্যের প্রকাশ, চিত্রকল্পের ভাবসৌন্দর্যের সঙ্গে বর্ণনার বৈচিত্র্য তাঁকে বাঙালী কবিকুলের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য স্থান দিয়েছে। বায়রনের মতো সমালোচকদের বিরূপ সমালোচনার প্রত্যুত্তর না দিয়ে মধুসূদন নিজের সৃষ্টিকর্মে আত্মমগ্ন থেকে মহত্তর সার্থকতা লাভের পর সমালোচকদের স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর মতো প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার আবির্ভাবকে সাহিত্যাকাশে নতুন আলোর দীপ্তিময় প্রকাশ বলে অনুভব করেছিল তাঁর সমকালীন বাঙলাদেশ।

মনীষী রমেশচন্দ্রের এই মূল্যায়নে আবেগের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ সত্ত্বেও সে মূল্যায়ন যে সত্যবর্জিত নয়,—তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

ইতিহাসসচেতন লেখক শিবনাথ শাস্ত্রী ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে মধুসূদন-প্রতিভার অনন্যতা প্রতিপন্ন করেছেন তাঁর সুবিখ্যাত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (১৯০৩) গ্রন্থে। মধুসূদন প্রতিভার মূল্যায়নে বিশ্লেষণী দৃষ্টির সঙ্গে ঐতিহাসিক দৃষ্টি সংযুক্ত হওয়ায় তাঁর এই মূল্যায়ন যথেষ্ট মূল্যসমৃদ্ধি অর্জন করেছে।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতে মেঘনাদবধ-এর প্লট-সৃষ্টির প্রেরণা একান্তভাবে

পাশ্চাত্ত্য হলেও রচনাশৈলী ও পরিকল্পনা—এই উভয় দিক থেকে কাব্যখানিকে তিনি ক্লাসিকধর্মী বলে মত প্রকাশ করেছেন। মিল্টনের কাব্যাদর্শ অনুসরণ করায় এ কাব্যে মহাকাব্যোচিত শক্তিদ্বন্দ্ব বাস্তব স্তর থেকে নৈতিক স্তরে উন্নীত হয়েছে। এখানে এসে মধুসূদন তাঁর ক্লাসিক ধারণাকে অতিক্রম করে গেছেন বলেই আচার্য শীলের বিশ্বাস—যদিও কাব্যখানিতে বিরুদ্ধ প্রকৃতির ভাব ও উপাদানের একত্র মিশ্রণ ঘটেছে—যা মহাকাব্যিক প্রতীকের সুস্পষ্ট লক্ষণ বলে চিহ্নিত। ১৯০৩ সনে প্রকাশিত আচার্য শীলের 'The Romantic Movement in Bengali Literature'-এর ৫১ পৃষ্ঠায় বিধৃত মধুসূদনের কাব্য সম্পর্কে এই আলোচনা তাঁর প্রতিভার স্বরূপ নির্ণয়ে নতুন মাত্রা অর্জন করেছে।

সাবিত্রী লাইব্রেরীর প্রথম অধিবেশনে 'বাংলা সাহিত্য' বিষয়ক প্রস্তাবে পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মধুসূদনের জীবনের সঙ্গে কাব্যের সাদৃশ্য দেখিয়ে মধুসূদন-প্রতিভা নির্ণয়-প্রয়াসকে আধুনিক চিন্তার প্রাঙ্গনে এনে হাজির করেন। তাঁর বিবেচনায় জীবনের মতো কাব্যেও সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্তির সাধনাই ছিল মধুসূদনের একাগ্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অবস্থাবৈগুণ্যে বারে বারে প্রতিহত হয়ে তাঁর সৃষ্টিকে শোকান্ত মহাকাব্যে পরিণত করেছে। মধুসূদনপ্রতিভা নির্ণয়ে এ সূত্রই পরবর্তী সমালোচনায় নানাভাবে বিবর্তিত ও বির্বধিত হয়েছে।

॥ চার ॥

মধুসূদন-প্রতিভা মূল্যায়নে আমাদের আলোচ্য কালসীমায় সর্বাধুনিক অভিমত ব্যক্ত করেন বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ১৩১৪ বঙ্গাব্দে (১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে) প্রকাশিত 'সাহিত্য' গ্রন্থধৃত 'সাহিত্যসৃষ্টি' নামক প্রবন্ধে 'মেঘনাদবধ' সমালোচনায়। এ প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন, অসামান্য কবি-প্রতিভা ও বিদ্রোহাত্মক কবিচেতনার সাহায্যে মধুসূদন বহুকাল-প্রচলিত বাংলা কাব্যের বহিরঙ্গেরই শুধু পরিবর্তন সাধন করেন নি, কাব্যের মর্মগত ভাব ও রসেরও আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। এ ছাড়া মধুসূদনের রাবণ চরিত্র সৃষ্টিতে ট্র্যাজিক মাহাত্ম্যের উপলব্ধি রবীন্দ্র-কৃত মেঘনাদবধ সমালোচনাকে আধুনিক জীবনচিন্তার পাদপীঠের ওপর স্থাপন করেছে। পরবর্তী যুগের কোন কোন কৃতী সমালোচক রবীন্দ্রনাথের মর্মসন্ধানী এই সমালোচনাকেই বিভিন্ন তত্ত্বের অবতারণার সাহায্যে বিস্তৃততর রূপ দিয়েছেন।

প্রতিভাবান কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৯১৩ সালে (ভারতবর্ষ পত্রিকার প্রথম বর্ষের সূচনায়) মধুসূদন-প্রতিভা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়ে স্পষ্টভাবে না বললেও তাঁকে বাঙালী রেনেসাঁসের প্রথম সার্থক কবি তথা আধুনিক বাংলা কাব্যের স্রষ্টা বলে অভিহিত করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের এই অভিমতকেও পরবর্তী সমালোচনায় বিস্তৃতি দান করা হয়েছে।

১৩২৪ বঙ্গাব্দে (১৯১৭ খ্রীঃ অঃ) প্রকাশিত দীননাথ সান্ন্যাল সম্পাদিত 'মেঘনাদবধ কাব্য' (সটীক ও সমালোচিত) মধুসূদন-জীবন এবং কাব্যসমালোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। তাঁর মতে, সাহিত্যসেবা মধুসূদনের জীবনধর্ম—যে কোন অবস্থায় তাঁর জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। জীবিতাবস্থায় মধুসূদনের প্রতিটি গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে মুদ্রিত চিত্রের দিকে তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—যার ভেতর মুদ্রিত থাকতো একটি সংস্কৃত বাক্য—'শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্যং বা সাধয়েয়ম্'। অর্থাৎ কবি-জীবনের লক্ষ্যে পেঁছোতে গিয়ে যদি দেহপাত হয়—তাতেও ক্ষতি নেই—এই ছিলো মধুসূদনের সাহিত্যসেবার মূলমন্ত্র। ঐ সাংকেতিক চিত্র মধ্যে এক দিকে একটি হস্তী আর একদিকে একটি সিংহ থাকতো। এই হস্তী প্রাচ্যের দ্যোতক এবং সিংহ প্রতীচ্যের। উভয়ের মধ্যবর্তী সূর্যরূপে কবি-প্রতিভা বঙ্গসাহিত্যকে আলোকিত করছে। সাহিত্য-সৃষ্টিতে মধুসূদনের একাগ্র লক্ষ্য ছিলো—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সম্মেলন। মহাকবি দান্তের ষষ্ঠ শতবার্ষিকী উপলক্ষে এই স্মরণীয় কবির উদ্দেশ্যে বাংলায রচিত একটি সনেটের সঙ্গে তিনি তৎকালীন ইতালীর রাজাকে যে চিঠি লিখে পাঠান, সে চিঠির নিম্নে বাম পার্শ্বেও এই প্রতীক চিহ্নটি মুদ্রিত ছিলো (ডক্টর রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৭ সনে প্রকাশিত Michael Madhusudan Dutt-নামক ক্ষুদ্রকায় ইংরেজী সংকলন গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। মেঘনাদবধ-এর দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে এই প্রতীকটি ব্যবহৃত হতো। মধুসূদনের সাহিত্যসেবার মূলমন্ত্রের সংকেত-স্বরূপ এই প্রতীক চিহ্নটি পরবর্তী কালে তাঁর সকল গ্রন্থ থেকে পরিত্যক্ত হওয়ায় দীননাথ সান্ন্যাল দুঃখ প্রকাশ করেছেন। 'অহং' চেতনায় স্পর্ধিত হলেও অপরের সঙ্গে লেখক ব্যবহারে নিজ নাম স্বাক্ষরের পূর্বে মধুসূদন সবত্র 'দাস' শব্দটি ব্যবহার করে অন্তর্নিহিত হিন্দু স্বভাবেরই পরিচয় দিয়েছিলেন বলে শ্রীযুক্ত সান্ন্যালের ধারণা। বে চর্য্যহীন ধর্ম-সাহিত্য জগতে মধুসূদনই সর্বপ্রথম 'বিশুদ্ধ' সাহিত্যধারার প্রবর্তন করেন—তাঁর এই অভিমত অবশ্যগ্রাহ্য। তাঁর মতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সর্বপ্রথম সমন্বয় ঘটেছে মেঘনাদবধ কাব্যে। পাশ্চাত্ত্য Epic কিংবা ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র বিচারে মেঘনাদবধ তাঁর মতে নিঃসন্দেহে মহাকাব্য, যদিও নিতান্ত বিনয়বশত কবি কাব্যটিকে মহাকাব্য বলে অভিহিত করেন নি। পেশায় চিকিৎসক হয়েও শ্রীসান্ন্যাল এই মহাকাব্যের নিপুণ বিশ্লেষণাত্মক টিকা-টিপ্পনী ও আলোচনার সাহায্যে অমর কবির প্রতিভাকে এ যুগের পাঠকের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন—এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

মধুসূদন-প্রতিভার মূল্যায়নে প্রথম পর্বের সর্বশেষ প্রয়াস বোধ হয় নগেন্দ্রনাথ সোম-এর 'মধুস্মৃতি' (প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩২৭/১৯২০ খ্রীঃ অঃ)। এই গ্রন্থখানি মধুসূদনের বৈচিত্র্যময় জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে শুধু তথ্যসমৃদ্ধ নয়, মধুসূদনের সময়কাল থেকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বিভিন্ন মনীষী ব্যক্তিকৃত কবির

ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য-সম্পর্কীয় আলোচনা-সমালোচনার পরিশ্রমসাধ্য সংকলন। বসওয়েল-লিখিত ডকটর জনসনের বিখ্যাত জীবনীগ্রন্থের আদর্শ অনুসরণে তিনি এ গ্রন্থে মধুসূদনের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক ও সাহিত্য-জীবনের খুঁটিনাটি বিবরণ সংগ্রহ করে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে কবির শিল্পী-ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যপ্রতিভার সামগ্রিক পরিচয় ফুটিয়ে তোলবার প্রয়াস পেয়েছেন। এ কারণে মধুসূদন-গবেষকদের নিকট এ গ্রন্থের মূল্য অপরিহার্য বিবেচিত হয়। তাঁর গ্রন্থমধ্যে যোগীন্দ্রনাথ বসুর রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় নেই, মধুসূদনের গতানুগতিকতামুক্ত আপাত-উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে কোন নীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে বিচারও করেন নি তিনি। কালের দূরত্বে বসে একটি মহৎ প্রতিভার জাগরণকে তিনি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে অবলোকন করেছেন মাত্র। এই নৈর্ব্যক্তিক অথচ সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য মধুসূদন-প্রেমিকদের নিকট এই জীবনীগ্রন্থখানি খুবই সমাদৃত।

মধুসূদন-প্রতিভার মূল্যায়ন-প্রয়াসের প্রথম পর্ব 'মধুস্মৃতি' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিসমাপ্ত হয়েছিল বলা যেতে পারে। অতঃপর মধুসূদন-প্রতিভা মূল্যায়নের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় ১৯২১ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি-সমালোচক শশাংকমোহন সেনের মধুসূদনের অন্তর্জীবন ও প্রতিভা সম্পর্কীয় বক্তৃতা দানের সঙ্গে সঙ্গে (এই বক্তৃতা গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সনে)। মধুসূদনের কবি-ব্যক্তিত্বের সত্ত্ব সম্বন্ধে এ ধরনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণী প্রয়াস ইতিপূর্বে দেখা যায় নি। তাঁরই প্রদর্শিত পথ ধরে এই মৌলিক প্রতিভাবান কবির অন্তর্জীবন এবং কবি-প্রতিভার স্বরূপ উদ্ঘাটনে সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণী দৃষ্টির পরিচয় দেন মোহিতলাল মজুমদার, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ কৃতী সমালোচকগণ।

দ্বিতীয় পর্ব

শশাঙ্কমোহন সেন

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমালোচক কাব্যের যথার্থ মর্ম উপলব্ধির জন্য কবি-আত্মার সন্ধান নেওয়ার ওপর গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। এই রীতি অনুসরণে কবি-সমালোচক শশাংকমোহন সেনও মধুসূদনের প্রতিভা নির্ণয়ে তাঁর সমস্ত প্রয়াস কেন্দ্রীভূত করেছেন কবির অন্তর্জীবনের স্বরূপ উন্মোচনে। শশাংকমোহন তাঁর গ্রন্থের নামও দিয়েছেন 'মধুসূদন ঃ অন্তর্জীবন ও প্রতিভা' (প্রথম প্রকাশ, ১৯২৮)। এই মনস্বী সমালোচকের মতে মধুসূদনের সৃষ্টিকর্মের সজীবতাই তাঁর প্রতিভাকে কালজয়ী করেছে। এই সজীবতার উৎসে ছিল মধু-কবির তীক্ষ্ন সৌন্দর্যানুভূতি, সুতীব্র প্রেম-ব্যাকুলতা, নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা, সহজাত সুগভীর স্বদেশপ্রেম, এবং স্ব-জীবনের মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি। সমকালীন কোন বিশিষ্ট ভাবচেতনা বা জাগ্রত সমাজভাবনা মধুসূদনের সৃষ্টিকে অর্থপূর্ণ

করেছিলো কিনা,—এ প্রশ্নে শশাংকমোহন নীরব। তবে যে বিদ্রোহচেতনার প্রভাবে সাহিত্যে নতুন আদর্শ-সন্ধানী মধুসূদন তাঁর যুগান্তকারী কাব্যসমূহের চরিত্র-পরিকল্পনায়, কবি-ভাষা ও ছন্দ-সৃষ্টিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছিলেন—সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক দৃষ্টি এবং প্রসারিত সাহিত্য জ্ঞানের সাহায্যে তিনি তা স্পষ্ট করে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

শশাংকমোহন মনে করেন, পাশ্চাত্ত্য ভাবচেতনা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ক্লাসিক ও রোমান্টিক ভাবাদর্শের যুগ্ম-প্রভাবে মধুসূদন-প্রতিভার জাগরণ ঘটেছিল। সে দুর্লভ প্রতিভার জাগরণে গ্রীক অদৃষ্টবাদ এবং 'দেবযন্ত্রের' প্রভাব সম্পর্কে শশাংকমোহন যে প্রাজ্ঞ আলোচনার সূত্রপাত করেন, পরবর্তী কালে কবি-সমালোচক প্রমথনাথ বিশী সে প্রভাবের বিশদ পরিচয় দান করেছেন। রাবণ চরিত্র সৃষ্টিতে মধুসূদনের আত্মপ্রক্ষেপ ঘটেছে—শশাংকমোহনের এই প্রত্যয়কে পরবর্তী শক্তিমান সমালোচক মোহিতলাল বিস্তৃতি দান করেছেন। এতদ্ব্যতীত করুণ রসসৃষ্টি মেঘনাদবধে শিল্পসিদ্ধির অনন্য সহায়ক—শশাংকমোহনের এই অভিমত তাঁর উত্তরসূরী সমস্ত সমালোচককে নতুন চিন্তায় জাগ্রত করেছে। তাঁর মতে 'ওড্'-জাতীয় 'ব্রজাঙ্গনা' রেনেসাঁস যুগের 'অহং'-প্রভাবিত প্রেমাদর্শের প্রথম গীতিকাব্য; আর বীরাঙ্গনা কাব্যে প্রাচীন আর্য সমাজের নারীস্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছেন মধুসূদন যদিও তাঁর কবি-মানসের ওপর রেনেসাঁসের অনিবার্য প্রভাবের কথা উল্লেখ করতে ভোলেন নি শশাংকমোহন। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে মধুসূদনের স্বদেশপ্রেম, জাতিপ্রেম, মহৎ জীবনপ্রীতি এবং বিশ্বাত্মবোধ অতি-সংযত বাক্-রীতিতে আত্মপ্রকাশ করে কবি-প্রতিভার চরম বিন্দু স্পর্শ করেছে—শশাংকমোহনের এই অভিমত অবশ্য পরবর্তী সমালোচকদের দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় নি।

শশাংকমোহনের ঐকান্তিক বিশ্বাস, সমযুগের রক্ষণশীল চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে মধুসূদনের সাহিত্য ও সমাজচিন্তা অত্যন্ত প্রগতিশীল। তবে গ্রীক ও য়ুরোপীয় আদর্শে রচিত বিয়োগান্ত নাটকে তাঁর প্রতিভা সম্যক বিকাশের অবকাশ পায় নি। মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের দ্বৈতরূপ উপলব্ধিতে শশাংকমোহন অভ্রান্ত দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতে এক রূপে মধুসূদন ভাবতন্ময়—সকল সাংসারিক জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যেও নব সৃষ্টি-চেতনায় একাগ্রচিত্ত। আর এক রূপে পৈতৃক উত্তরাধিকার হিসেবে তাঁর মধ্যে দেখা যায় অতৃপ্ত ভোগতৃষ্ণা এবং অপরিমিত অর্থাকাংক্ষা। তিনি মনে করেন, কবির পক্ষে এই অবাঞ্ছিত অর্থাকাংক্ষাই তাঁর মানসিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে চরম সর্বনাশ ঘটিয়েছিল। শশাংকমোহন মন্তব্য করেছেন, দৈহিক জীবনাবসানের বহু পূর্বেই মধুসূদনের আত্মিক মৃত্যু ঘটেছিল। তবে তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্বে দুই পরস্পরবিরোধী শক্তির নিরন্তর দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ সত্ত্বেও তাঁর সহজাত প্রকৃতিগত সারল্য পূর্বাপর অক্ষুণ্ণ ছিল। এই নিষ্কলুষ হৃদয়প্রবৃত্তি সকল বাধা-বিপত্তির মধ্যেও তাঁর অম্লান প্রতিভাকে অমর মহিমায় জ্যোতির্ময় করেছে। শশাংকমোহনের

মতে 'ভাবুকতার সংযমশীল পৌরুষ এবং বীরধর্মী সৌন্দর্যদৃষ্টিই মধুসূদনের শিল্পী-আত্মার প্রধান লক্ষণ'। মধুসূদন সাহিত্যে কবি-আত্মার সৌন্দর্য-বিহ্বল আনন্দের যে 'সুসংযত' এবং 'সমশীর্ষ' প্রকাশ লক্ষিত হয়, বাংলা সাহিত্যে তা দুর্লভ বলেই তাঁর ধারণা। শশাঙ্কমোহনের নিশ্চিত বিশ্বাস, মধুসূদনের কালজয়ী ট্র্যাজিক সৃষ্টি তাঁর স্ব-জীবনের গভীর দুঃখ-জ্বালাযন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত এবং সে কারণে সহজে হৃদয়স্পর্শী। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য-নাটকে অদৃষ্টদেবতার অট্টহাসিকে উপেক্ষা করে যেভাবে মৃত্যুর জয় ঘোষণা করা হয়েছে—বাংলা সাহিত্যে এরূপ শিল্পসৃষ্টি দুর্লভ। মধুসূদনের জীবন ও শিল্পকর্মের মধ্যে কোন মিথ্যাচারের আড়াল ছিল না, তাঁর দুর্লভ কবিত্বশক্তি হৃদয়রক্ত দিয়ে অর্জিত বলে কালের পৃষ্ঠায় তা অক্ষয় হবে বলেই শশাঙ্কমোহনের বিশ্বাস। আধুনিক কাব্যরচনার ক্ষেত্রে মধুসূদন পূর্বসূরীহীন, নতুন রীতির আবিষ্কারক—শশাঙ্কমোহনের এ মন্তব্য পরবর্তী সমালোচকদের রচনায় বারে বারে দেখা দিয়েছে। তবে মধুসূদনের শিল্পী-ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ে শশাঙ্কমোহন এই অমর কবিকে চিন্তাশিল্পী না বলে শুধু যে ভাবশিল্পী বলে চিহ্নিত করেছেন, তা এ যুগের সমাজবাদী সমালোচকদের নিকট স্বীকৃতি পায় নি। মধুসূদনের প্রতিভামুগ্ধ কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহন তাঁর কবিতাপাঠকে সমুদ্র স্নানের সঙ্গে এবং তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বকে divine বলে প্রণাম জানিয়ে আবেগ-বিহ্বলতার পরিচয় দিয়েছেন—এই আবেগ-বিহ্বলতা লঙ্গিনুস (Longinus)-কথিত সাবলাইম সাহিত্যের মাহাত্ম্য উপলব্ধিজাত বিস্ময় প্রকাশের যে নামান্তর,—তাতে সন্দেহ নেই।

মোহিতলাল মজুমদার

শশাঙ্কমোহন সেনের গ্রন্থ প্রকাশের প্রায় ২৬ বৎসর পরে মধুসূদনের সাহিত্য-প্রতিভা নির্ণয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত 'শ্রীমধুসূদন' গ্রন্থে। এই গ্রন্থে মধুসূদনের সাহিত্যপ্রতিভার বিস্তৃত ও মননশীল আলোচনার পূর্বে শ্রাবণ, ১৩৪৩ (১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে) প্রকাশিত তাঁর প্রথম সমালোচনা গ্রন্থ 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে' র বিভিন্ন প্রবন্ধে এবং পরিশিষ্টের 'রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও মধুসূদন' নামক প্রবন্ধে মধুসূদন প্রতিভার প্রকৃতি নির্ণয়ে তিনি প্রাথমিক উদ্যমের পরিচয় দেন। মধুসূদন-প্রতিভা নির্ণয়ের এই প্রথম উদ্যমেই তিনি কবির 'খাঁটি বাঙালি' স্বভাবের উপর অতিরিক্ত জোর দিয়েছিলেন। এই বাঙালী ভাবাতিশয্যের ফলে পাশ্চাত্ত্য মহাকবিদের সচেতন অনুসরণ সত্ত্বেও তাঁর মহাকাব্য রচনা-প্রয়াস বাঙালী জীবনের কারুণ্যমাখা গীতিকাব্যে পর্যবসিত হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। মধুসূদন-প্রতিভা-নির্ণয়ে এই মূল প্রতিপাদ্যকে আরো ১১ বৎসর পরে প্রকাশিত তাঁর 'শ্রীমধুসূদন' গ্রন্থে মোহিতলাল বিস্তৃতি দান করেছেন। মধুসূদনের কবি স্বভাবের

এই আত্যন্তিক গীতি-প্রাণতা তাঁর মহাকাব্য রচনা-প্রয়াসকে যে পদে পদে খণ্ডিত করেছে—মোহিতলালের এই সুচিন্তিত অভিমত পরবর্তী অধিকাংশ সমালোচক দ্বারা অল্পবিস্তর স্বীকৃত।

মধুসূদন-প্রতিভার স্বরূপ সন্ধানে মোহিতলাল মধুসূদন-মানসের অনিবার্য দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করেছেন। একদিকে রেনেসাঁসীয় পৌরুষ-বীর্য প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসে পাশ্চাত্ত্যের অনুসরণে মহাকাব্যের কাঠামোর মধ্যে বীররস সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস, আর একদিকে অন্তর্নিহিত প্রাণধর্মের প্রণোদনায় করুণরস সৃষ্টিতে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতা। মেঘনাদবধ কাব্যের বিস্তৃত বিশ্লেষণে মোহিতলাল এ-দ্বন্দ্বের স্বরূপটি অত্যন্ত যোগ্যতার সংগে ফুটিয়ে তুলেছেন। মধুসূদনের শিল্পী মনের আরও একটি দ্বন্দ্বের দিকেও মোহিতলাল পাঠকের মনোযোগী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মেঘনাদবধ-এ কবির সচেতন মনে বস্তুমুখী নাটকীয়তা সৃষ্টি অভিষ্ট হলেও অবচেতন মনে লিরিক পক্ষপাতের জন্য মধুসূদন তাঁর অভিপ্রায়কে কাব্যে যথাযথ রূপ দিতে পারেন নি। অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাংলা ছন্দ-জগতে অভিনবত্বের জন্যই শুধু বিশিষ্ট নয়, মোহিতলালের মতে মধুসূদনের নব-আবিষ্কৃত এই ছন্দ বাংলা কাব্যে কল্পনামুক্তির প্রধান বাহন। নারীত্বের মহিমা, ও দাম্পত্য প্রেমের সৌন্দর্য তাঁর মতে মধুসূদনের কাব্যপ্রেরণার অন্যতম উৎস। 'শ্রীমধুসূদন' গ্রন্থে মোহিতলাল এই দুইটি প্রেরণার উৎসকে বিশদ বিশ্লেষণের সাহায্যে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

মধুসূদনের কবি-ভাষার যথার্থ স্বরূপ উন্মোচনের উদ্দেশ্যে মোহিতলাল তাঁর শ্রীমধুসূদন গ্রন্থে অখণ্ডনীয় যুক্তির সাহায্যে যে বিস্তৃত আলোচনা করেন, তার সূত্রপাত দেখা যায় 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে। এই গ্রন্থ রচনার সময় মধুসূদনের কবি-ভাষার বিরুদ্ধে বুদ্ধদেব বসু বা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের তীব্র, বিষকণ্ঠ, অসহিষ্ণু আক্রমণ শুরু হয় নি। শুধুমাত্র ১৩৪১ সনের (১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে) 'উদয়ন' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ উদাহরণ সহযোগে মন্তব্য করেছিলেন, মেঘনাদবধ প্রাকৃত বাংলা ছন্দে লিখলেও সার্থক হতে পারতো। মোহিতলাল এই গ্রন্থের ২৯৮ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করে লেখেন,—রবীন্দ্রনাথ এই উক্তির দ্বারা গত শতাব্দীর সমগ্র সাহিত্যকে অস্বীকার করেছেন। প্রাকৃত ছন্দে লিখলেও মেঘনাদবধ-এর গাম্ভীর্যের ত্রুটি ঘটতো না—রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত যে অসার, মোহিতলাল 'বলাকা'র কবিতার গভীর সুরের গাম্ভীর্যের উল্লেখ করে তা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। মোহিতলালের সুচিন্তিত অভিমত, মধুসূদনের কাব্যের ভাষা —খাঁটি বাংলা রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। 'খাঁটি বাংলা রীতি' বলতে মোহিতলাল কি বোঝাতে চেয়েছেন তা পরবর্তী কালে লিখিত মেঘনাদবধ-এর ভাষা আলোচনায় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। মধুসূদন-প্রবর্তিত সংস্কৃত-প্রভাবিত ভাষা বাংলা সাহিত্যকে গ্রাম্য বর্বরতা থেকে উদ্ধার করেছে—মোহিতলালের এই মন্তব্য উড়িয়ে দেওয়া

যায় না। পরিশিষ্টের 'রঙ্গলাল হেমচন্দ্র মধুসূদন' প্রবন্ধে মোহিতলাল প্রথমোক্ত দুই কবির তুলনায় মধুসূদনের স্বতন্ত্র প্রতিভার স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে রঙ্গলালের কবিমন পুরাতনের আদর্শলগ্ন—রঙ্গলালের কাব্যকে মোহিতলাল নবীনের বিরুদ্ধে প্রাচীনের শেষ যুদ্ধোদ্যম বলে অভিহিত করেছেন। আর হেমচন্দ্রের কাব্যকে তিনি প্রাচীন ও নবীনের সন্ধিস্থল এবং মধুসূদনের কাব্যকে নতুনের 'পূর্ণ-অবতার' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি মনে করেন, হেমচন্দ্রের কাব্যে আধুনিকতার ইঙ্গিতমাত্র আছে,—আধুনিক সাহিত্যসৃষ্টির জন্য আত্মনিমগ্ন সাধনা বা অনন্যসাধারণ শক্তি তাঁর ছিল না। একাগ্র সাধনা এবং প্রচণ্ড শক্তির সাহায্যে মধুসূদন সংকীর্ণ বাংলা সাহিত্যের খাতে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা প্রবাহিত করে সে সাহিত্যকে ভবিষ্যতের দিকে আকর্ষণ করেন। মধুসূদনের কল্পনার সামঞ্জস্য, কাব্যের গঠননৈপুণ্য, ভাব ও চিত্রের সুপরিস্ফুট সৌন্দর্য 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের গৌরব দান করলেও মোহিতলালের মতে রোমান্টিক সৌন্দর্যই এ কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রোমান্টিক ও ক্লাসিক প্রবৃত্তির মধ্যে কবি-অন্তরের দ্বন্দ্ব মেঘনাদবধ কাব্যে নাট্য-সৃষ্টির দ্বন্দ্বে পরিণতি লাভ করেছে বলেই মোহিতলালের ধারণা (দ্রষ্টব্য, 'শ্রীমধুসূদন')।

'মেঘনাদবধ কাব্য' মধুসূদনের কবি-প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিচয়বাহী বলেই মোহিতলালের সুচিন্তিত অভিমত। এ কারণে তাঁর শ্রীমধুসূদন গ্রন্থে মধুসূদনের অপরাপর কাব্য-নাটকের আলোচনা খুবই সংক্ষেপে সেরে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন মেঘনাদবধ-কাব্যের সর্বাঙ্গীণ আলোচনায়। তাঁর মতে 'মেঘনাদবধ'-এর পূর্বে ও পরে রচিত কাব্যে মধুসূদনের শুধু কলাকৌতূহলই প্রকাশ পেয়েছে—তার বেশি কিছু নয়। নাটকগুলি প্রচলিত নাট্যকলার সংস্কারের উদ্দেশ্যে সাময়িক প্রয়োজনের তাড়নায় লিখিত। সেগুলিতে তাঁর শক্তির পরিচয় থাকলেও প্রতিভার পরিচয় নেই। 'ব্রজাঙ্গনা'য় মৌলিক কাব্যপ্রেরণা নেই, এ কাব্য আলংকারিক কল্পনা-কৌশলপূর্ণ Literary Revivalism ছাড়া কিছুই নয়। 'বীরাঙ্গনা'র ফর্ম বিদেশী হলে ও এ কাব্যের ভাবকল্পনা খুব গভীর নয়—কাব্যকলার সংস্কার ও সমৃদ্ধিসাধনেই এ কাব্যের সার্থকতা। সনেট রচনার উদ্দেশ্যও বৈচিত্র্যহীন বাংলা কাব্যের সমৃদ্ধিসাধন। এই সমস্ত কাব্য-নাটকে মধুসূদনের কবি-প্রতিভা বা কবি-কীর্তির সম্যক পরিচয় নেই। এ জাতীয় কঠোর মন্তব্য ইতিপূর্বে বঙ্কিমও গত শতাব্দীতে Calcutta Review-এ প্রকাশিত তাঁর মধুসূদন-প্রতিভার মূল্যায়নে করেছিলেন। সুতরাং মোহিতলালের এই মন্তব্য অসার বা অসমর্থিত নয়।

পূর্বসূরী শশাঙ্কমোহনের মতো মোহিতলালও মধুসূদনের জীবন ও কাব্যকে এক সূত্রে গ্রথিত করে বিচারে আগ্রহী। জীবনচর্যায় বিজাতীয় ভাবাপন্ন হলেও মধুসূদন তাঁর সৃষ্টিতে খাঁটি জাতীয় কবি—এই উপলব্ধি বঙ্কিমের মতো মোহিতলালেরও। মধুসূদনকে খাঁটি বাঙালী প্রমাণ করবার অত্যুৎসাহে মোহিতলাল

বঙ্কিমেরই মত তাঁর খ্রীস্টীয় নাম 'মাইকেল' শব্দটিকে বর্জন করবার পক্ষপাতী—যদিও স্ব-জীবনে মধুসূদন তাঁর নাম স্বাক্ষরের পূর্বে 'মাইকেল' শব্দটিকে কখনও বর্জন করেন নি। তবে মাইকেল-পরবর্তী বাংলা কাব্য জাতীয়তাবোধহীন, স্বাতন্ত্র্যধর্মী এবং বিশ্বমুখী হয়ে উঠেছে বলে মোহিতলাল যে অভিযোগ করেছেন—তা বিচারসহ কিনা বিবেচনাযোগ্য।

মেঘনাদবধ কাব্যেই মধুসূদনের কবিস্বপ্ন এবং কবিশক্তির পরিপূর্ণ জাগরণ ঘটেছে বলে মোহিতলালের ধারণা। তাঁর মতে এ কাব্যের কয়েকটি ক্ষেত্রে মধুসূদনের স্বকীয়তা তাঁর মৌলিক সাহিত্যপ্রতিভার পরিচায়ক। যেমন, (১) তাঁর চরিত্র পরিকল্পনার মৌলিকতা, (২) জীবনের ট্র্যাজেডি রচনায় যুগপ্রভাবের স্বীকৃতি, (৩) অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্তনের সাহায্যে কবি-ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সামর্থ্য আবিষ্কার (৪) স্বাধীন কবিকল্পনার সাহায্যে বাঙালীর ভাবজীবনের জাড্যমুক্তি, (৫) নারী চরিত্র সৃষ্টিতে প্রেমের দ্বৈত আদর্শ সন্ধান, (৬) জীবনের গভীর ও করুণ দিককে যথাযথ কাব্যরূপ দেবার উপযোগী কবি-ভাষার সৃষ্টি।

মধুসূদনের দুর্লভ কবি-প্রতিভার স্বরূপ সন্ধানে মোহিতলাল সব চাইতে জোর দিয়েছেন মেঘনাদবধ এর ভাষা বিচারে এবং কবি-প্রবর্তিত অমিত্রচ্ছন্দের বৈশিষ্ট্য ও শক্তির উৎস নির্ণয়ে। তাঁর মতে মেঘনাদবধের বিতর্কিত ভাষা সে কাব্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিরোধীদের যুক্তি খণ্ডন করে সে ভাষা যে খাঁটি বাংলা ভাষার প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত—তা তিনি অত্যন্ত সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আলোচ্য গ্রন্থে। কবিকল্পনাকে অবাধ মুক্তি দেবার উদ্দেশ্যে তিনি ভাষার অভ্যস্ত রুচি ও সংস্কার নির্ভয়ে বিসর্জন দিয়েছিলেন—এবং এর দ্বারাই মধুসূদন আধুনিক কবি-ভাষা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন বলেই মোহিতলালের বিশ্বাস। ভাষার এ স্টাইল মধুসূদনের নিজস্ব। এই স্টাইল-সম্পন্ন ভাষাকে সাঙ্গীতিক মাধুর্যে রসোচ্ছল করে তিনি সে ভাষায় স্বাদুতা সঞ্চার করেছেন। এই বিশিষ্ট কবি-ভাষাতে কবি-কণ্ঠের প্রকাশ সুস্পষ্ট। মধুসূদনের কবিসিদ্ধির মূলে এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল কবি-ভাষা। এই বিশিষ্ট কবি-ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে পারেন নি বলেই মধুসূদনের সমসাময়িক ও পরবর্তী বহু অনুকারী কবি মহাকাব্য রচনায় চরম বিফলতার পরিচয় দিয়েছেন। মধুসূদনের কবিভাষা আলোচনা প্রসঙ্গে মোহিতলাল তাঁর শব্দ-সঙ্গীত বা Phrasal music-এর কথাও উল্লেখ করেছেন। তাঁর আত্যন্তিক অলংকারপ্রীতির মূলে অভিনব কবি-ভাষায় ধ্বনিব্যঞ্জনা সৃষ্টি-প্রয়াস—মোহিতলালের এ অভিমত গ্রাহ্য। ভাষা ব্যাপারে বিদ্রোহিতা সত্ত্বেও মধুসূদন ছিলেন মূলত ক্লাসিকপন্থী—এ কারণে শুচিতা ও শোভনতার সঙ্গে তাঁর কবি-ভাষার ক্ল্যাসিকাল আভিজাত্য সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না বলে মোহিতলাল যে মন্তব্য করেছেন—তার সত্যতা অবশ্যস্বীকার্য।

মধুসূদনের কবিভাষার বিরুদ্ধে যৌবনে রবীন্দ্রনাথই শুধু কৃত্রিমতার অভিযোগ আনেন নি, পরবর্তী কালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসুর মত কোন কোন প্রতিষ্ঠিত কবিও সোচ্চার হয়েছিলেন। কারো নাম উল্লেখ না করে মোহিতলাল বলেন, কাব্যের প্রয়োজনেই মধুসূদন দুরূহ, দুরুচ্চার্য, আভিধানিক ভাষা ব্যবহার করেছেন সত্য, কিন্তু তাতে তাঁর ভাষা-প্রকৃতির কোন বিকৃতি ঘটেনি, বরং কবিভাষার শক্তিবৃদ্ধিই হয়েছে। এ ছাড়া মধুসূদনের কবি-ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল বলে দুরূহ অভিধানিক শব্দের সঙ্গে খাঁটি বাংলা শব্দ ব্যবহারেও তিনি দ্বিধা করেন নি। ভাব ও চিত্রকে যথাযথ রূপ দেবার উদ্দেশ্যে অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রভাবেই তিনি বিভিন্ন প্রকৃতির শব্দ নির্বাচন করেছিলেন বলে মোহিতলালের ধারণা। তিনি আরো বলেন, কাব্যের প্রয়োজনে মধুসূদন ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করেছিলেন, কোন স্বেচ্ছাচারী প্রবৃত্তির বশে নয়। তাঁর বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে পরবর্তী বহু লেখকের যে গুরুতর অভিযোগ—নামধাতুর অত্যধিক প্রয়োগ—তা খাঁটি বাংলায়ও প্রচলিত ছিল বলে মোহিতলাল প্রমাণ করেছেন। এছাড়া নামধাতুর প্রয়োগের সাহায্যে ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য ও গতিবেগ বৃদ্ধি করা যায়—মোহিতলালের এ-ধারণাও বিচারসহ। তবে ক্রিয়াপদ নির্মাণে মধুসূদনের মাত্রাতিরক্ত ইংরেজী অনুকরণের ঝোঁক সমর্থনযোগ্য নয় এবং স্বল্পাক্ষরতার প্রয়োজনে মধুসূদনের ব্যবহৃত অনেক শব্দ সুষ্ঠু ও শোভন হয় নি বলেই মোহিতলালের বিশ্বাস।

'শ্রীমধুসূদন' গ্রন্থে মধুসূদন-প্রতিভার অন্যতম কীর্তি অমিত্রাক্ষর ছন্দের আলোচনাও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। সাতটি অধ্যায়ের বিস্তৃত পরিসরে মধুসূদনের ছন্দ-প্রতিভার বিভিন্ন দিকের ওপর তিনি যে আলোকপাত করেছেন তা মননশীলতায় উজ্জ্বল। মিল্টনের Blank Verse-প্রভাবিত হলেও মূলত বাংলা পয়ারের ওপর ভিত্তি করে সর্বভাব-প্রকাশক্ষম অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করে মধুসূদন বাংলা কাব্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছিলেন—মোহিতলালের এ বিশ্লেষণ নির্ভুল। মিল্টনের Blank Verse-কে ইংরেজী সাহিত্যে যেমন National Verse-এর গৌরব দেওয়া হয়েছে, মোহিতলালের মতে মধুসূদন প্রবর্তিত 'অমিত্রচ্ছন্দে'রও সে গৌরব প্রাপ্য।

মধুসূদন-প্রতিভা মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হয়ে মোহিতলাল আরও কয়েকটি সংশ্লিষ্ট তথ্যের দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন—যা চিন্তা ও বিবেচনাযোগ্য। প্রথমে, মেঘনাদবধ কাব্য-সৃষ্টিতে মধুসূদনের ঋণের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, কাহিনী অংশের জন্য কৃত্তিবাসের নিকট ঋণী হলেও কবি-প্রেরণার জন্য তিনি মুখ্যত ঋণী হোমারের নিকট। মিল্টনের কবি-প্রতিভার সঙ্গে মিল না থাকলেও উদাত্ত-গম্ভীর ছন্দসৃষ্টির জন্য মিল্টনের নিকট তাঁর ঋণ অপরিসীম। দান্তে বা ট্যাসোর খ্রীষ্টীয় কবি-কল্পনার সঙ্গে আন্তরিক সংযোগ ছিল না বলে এই দুই

কবির মাইকেলীয় অনুকরণ প্রাণহীন। কাব্যের নায়ক হিসাবে রাবণের প্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছে গ্রীক জীবনদর্শের প্রতি কবির অকম্পিত শ্রদ্ধা। মধুসূদনের কবিমন ও কবি-প্রাণের দ্বন্দ্বের প্রবল আলোড়নে মেঘনাদবধ-এ কবির আকাঙ্ক্ষিত বীররস-সৃষ্টিপ্রয়াস করুণ রসে পর্যবসিত। সীতা ও প্রমীলা চরিত্র সৃষ্টিতে কবির হিন্দু-সংস্কারই জয়ী হয়েছে। এ কারণে হোমার-মিল্টন-এর সমমর্যাদাসম্পন্ন কবি হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও মধুসূদন বাঙালী কবিই থেকে গেছেন। মধুসূদনের শিল্পী-ব্যক্তিত্ব বিচারে এ মতও বিবেচনাযোগ্য। তবে মেঘনাদবধ-এর করুণ রস কবির Romantic self-representation বা Imaginative self-identification-জাত বলে মোহিতলাল যে মন্তব্য করেছেন—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত পরবর্তী কালে সে মতের বিরোধিতা করেছেন। একদিকে য়ুরোপীয় কাব্যভঙ্গীর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ, আর একদিকে সমকালীন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মনোরঞ্জন প্রয়াসে পুরাতন রীতির প্রভাব স্বীকার—মধুসূদনের শিল্পীচিত্তে তথা কাব্য-প্রকাশে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ মোহিতলালের মনস্বিতার পরিচায়ক।

মেঘনাদবধ কাব্যে কবিপ্রতিভার দুর্বলতার দিকগুলি প্রদর্শনেও মোহিতলাল উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর শ্রীমধুসূদন গ্রন্থে। তাঁর মতে মধুসূদন এ কাব্যে সৃষ্টিধর্মের রীতি অনুযায়ী গ্রীক ও হিন্দু পুরাণের মধ্যে সমন্বয় সাধনে সমর্থ হন নি। মেঘনাদবধ-এ গ্রীক প্রভাবই বেশি—মধুসূদন-উক্ত এই বক্তব্য মোহিতলালের মতে গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর মতে এ কাব্যসৃষ্টিতে কবিমানসের উপর দেশীয় প্রভাবই অধিকতর কার্যকরী হয়েছিল। মধুসূদনের কবিপ্রকৃতির সঙ্গে গ্রীক-প্রকৃতির সমগোত্রতা থাকলেও তাঁর কবিমানসের উপর আধুনিক কাব্যকলার প্রভাবই বেশি বলে মোহিতলালের ধারণা। মোহিতলালের বিশ্বাস, মধুসূদন মিল্টনের মতো গ্রীক, লাটিন, ইটালীয় প্রভৃতি প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যের আত্মাকে অধিগত করতে সমর্থ হন নি—তাঁর কবিমানসের ওপর এ সমস্ত কাব্যের প্রভাব ছিল মুখ্যত সাহিত্যিক। মিল্টনের সাহিত্য সাধনায় গ্রীক, হিব্রু, ল্যাটিন, ইটালীয—এই চার ধাতুর মিশ্রণ, আর মধুসূদনের কাব্যে সংস্কৃত, য়ুরোপীয় ক্লাসিক ও বাংলা—এই তিন ধাতুর মিলন—তবে মূল ধাতু যে বাংলা তাতে সন্দেহ নেই। মোহিতলাল বলেন এই বিভিন্ন প্রভাবকে স্বীকার করে মধুসূদনের অভিনব কাব্যসৃষ্টি বাংলা কাব্যজগতে আধুনিকতার জন্ম দিয়েছিল।

পরিশিষ্টে 'কবি শ্রীমধুসূদন স্মরণে' নামক একটি প্রবন্ধে মোহিতলাল মধুসূদন প্রতিভা সম্পর্কে এমন একটি দুঃসাহসী উক্তি করেছেন, যা এ যুগের পাঠকদের নিকট চমকপ্রদ মনে হবে—'ইংরেজীতে যাকে Sheer force of genius বলে, তাতে রবীন্দ্রনাথও এক হিসেবে মধুসূদনের সমতুল্য নন, এখানে কবিত্ব ও প্রতিভাকে আমি

পৃথক করে নিচ্ছি।' এখানে মোহিতলাল সংস্কৃত আলংকারিক-কথিত অভিনব বস্তুর সৃষ্টিক্ষমতাকে প্রতিভার পরিচায়ক বলে চিহ্নিত করে মধুসূদনের অনন্য শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন। মোহিতলালের এ মন্তব্যের লক্ষ্য খুব সম্ভব এই : সৃষ্টির ক্ষেত্রে মধুসূদন পূর্বসূরীহীন, অপরপক্ষে মধুসূদন অপেক্ষা উচ্চতর কবিত্বশক্তির অধিকারী হয়েও কাব্যসৃষ্টির প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথ পূর্বসূরী কোন কোন কবি থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।

মধুসূদন-প্রতিভা মূল্যায়নে মোহিতলালের ভাবাতিরেক সুস্পষ্ট হলেও তাঁর রসগ্রাহী সূক্ষ্ম অন্তদৃষ্টিতে মধুসূদন-প্রতিভার সত্যস্বরূপ যে পরিমাণে উদ্ভাসিত হয়েছে, মধুসূদন-চর্চায় তা বিরলদৃষ্ট বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

প্রমথনাথ বিশী

বিশিষ্ট কবি-সমালোচক প্রমথনাথ বিশী দুই পর্যায়ে মধুসূদন-প্রতিভার মূল্যায়ন করেছেন। প্রথমে 'মাইকেল মধুসূদন' গ্রন্থে ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে—মোহিতলালের 'শ্রীমধুসূদন' (১৯৪৭) প্রকাশের ছয় বৎসর পূর্বে। ২৩ বৎসর পরে ১৯৬৪ সনে মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত 'মাইকেল রচনা সম্ভারে'র মূল্যবান ভূমিকায় তিনি মধুসূদন-প্রতিভার বিশিষ্ট দিকের ওপর যে আলোকসম্পাত করেন, তা তাঁর প্রথম প্রয়াসের পরিপূরক। যথেষ্ট কালের ব্যবধানে মধুসূদন-প্রতিভার এই মূল্যায়ন নতুন তথ্য সমাবেশে ও চিন্তার স্বাতন্ত্র্য বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।

অধ্যাপক বিশী মনে করেন, দুই পরস্পরবিরোধী আকাঙ্ক্ষার সংঘাতে মাইকেল-জীবনের ভারসাম্য বিচলিত হয়েছিল। তাঁর মনের এক কোটিতে মহাকাব্য সৃষ্টির উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আর এক কোটিতে অপরিমেয় সম্পদের মোহ, ভোগের উল্লাস। তাঁর কবিকল্পনার ঐশ্বর্যের মূলে রাজকীয় আড়ম্বরের স্বপ্ন। দুর্ভাগ্যক্রমে মাইকেল আত্মার সঙ্গে ঐশ্বর্যের সমন্বয় করতে পারেন নি।

মধুসূদনের বৈচিত্র্যময় জীবনে খ্রীস্টধর্মগ্রহণ খুবই তাৎপর্যময় ঘটনা বলে অধ্যাপক বিশীর বিশ্বাস। ধর্মান্তরিত হবার পর বিশপস্ কলেজে অধ্যয়ন কালেই তিনি গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি ক্লাসিকাল সাহিত্য আয়ত্ত করবার সুযোগ পান—মুখ্যত যে সাহিত্যের আশ্রয়ে পরবর্তী কালে তাঁর অনন্যসাধারণ কবি-প্রতিভা বিকাশ লাভ করেছিল। অধ্যাপক বিশীর মতে মধুসূদনের কাব্যসাধনা পোপের Prettiness থেকে মিল্টনের Sublimity-তে, পোপের Pseudo-classicism থেকে মিল্টনের Classicism-এ উত্তীর্ণ হবার সাধনা। মাইকেলের কবি-জীবনের এক পারে 'বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস,—অপর পারে হোমার, ভার্জিল, মিল্টন ; মধুর কাব্যজীবন এই দুই পারের মধ্যে পারাপারে নিরত।' মাদ্রাজ প্রবাসকালে হিব্রু, গ্রীক, তেলেগু, সংস্কৃত,

ল্যাটিন ও ইংরেজী ভাষার চর্চার সাহায্যে মাতৃভাষাকে অলংকৃত করবার একাগ্র প্রয়াস। কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পর একই উদ্দেশ্যে সংস্কৃত চর্চা খুবই উল্লেখযোগ্য। বস্তুতপক্ষে তাঁর অমর কবি-কীর্তি মেঘনাদবধ-এ সংস্কৃত ও গ্রীক প্রভাবই সর্বাধিক।

অধ্যাপক বিশীর সুচিন্তিত অভিমত,—শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, নব্যভারতীয় সংস্কৃতি-জগতে তথা নব্যভারতের স্রষ্টাদের মধ্যে মধুসূদন অন্যতম প্রধান পুরুষ। ভারতীয় কবিদের মধ্যে য়ুরোপীয় রেনেসাঁস-প্রভাবিত দৃষ্টিপ্রভাবে সর্বপ্রথম উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন মাইকেল। য়ুরোপের সঙ্গে বাঙালী-চিত্তের মিলনের বাহন হিসাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ আবিষ্কারকে তিনি সুয়েজ খাল খননের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ দুটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছিল উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ আবিষ্কার অধ্যাপক বিশীর মতে সংস্কৃতি-দ্বন্দ্বেরও অন্যতম বাহন। মধুসূদনের প্রভাব শুধুমাত্র সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয় নি, নব্যভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনকেও স্পর্শ করেছে বলে অধ্যাপক বিশীর ধারণা। তাঁর মতে মধুসূদনের সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিত্বের বন্ধন মোচন প্রক্রিয়ার আরম্ভ। এই বন্ধনের বিলাপেই মধুসূদনীয় সাহিত্য পরিপূর্ণ। তিনি মনে করেন, রাবণের বিদ্রোহী চরিত্রের মধ্যে একটি যুগের ইতিহাস যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। সমকালীন পাশ্চাত্য জীবন-চেতনা-উদ্বুদ্ধ শিক্ষিত বাঙালীর বিদ্রোহী আত্মার জীবন্ত রূপ রাবণ চরিত্র।

মোহিতলালের মতো অধ্যাপক বিশীও মনে করেন, মধুসূদনের কবি-কল্পনা মুখ্যত রোমান্টিক। নানা বিপরীত ধাতুতে গঠিত তাঁর শ্রেষ্ঠ রাবণ-চরিত্রও রোমান্টিক। তাঁর মতে মধুসূদনের কাব্যে গ্রীক অদৃষ্টবাদের গোঁজামিল আছে, ভারতীয় কর্মফল আছে, এ ছাড়া অদৃষ্টের নতুন ব্যাখ্যার চেষ্টাও আছে। মধুসূদন নরনারীর ভাগ্য বিপর্যয়ে অদৃষ্টের রহস্যময় এই লীলা লক্ষ করেছেন। এ কারণে অদৃষ্ট-লীলাই তাঁর সমস্ত কাব্যের ভাব-ভিত্তিভূমি। তাঁর মতে মধুসূদনের শিল্পবোধের তিনটি ধাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রথম ধাপে তাঁর আদর্শ ছিল বায়রণ, স্কট ও মূর—তাঁর রচিত ইংরেজী কাব্যে যাঁদের প্রভাব ছিল প্রত্যক্ষ। দ্বিতীয় ধাপে তাঁর আদর্শ মিল্টন—যাঁর প্রভাব তাঁর কবিজীবনে সর্বাধিক। এই ধাপেই মধুসূদন শ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি অর্জন করেন। তৃতীয় ধাপে—শেক্সপীয়রীয় দৃষ্টির সূচনামাত্র আছে, বিকাশ নেই। বিশী মশায়ের মতে মধুসূদন অপূর্ণ সম্ভাবনার মহাকবি।

অধ্যাপক বিশী মধুসূদনকে কাব-স্থপতি বলে অভিহিত করেছেন। বিলাত প্রবাস কালে মানসিক অরাজকতায় তাঁর সৃজনশক্তি অন্তর্নিহিত হলেও তা যে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি,—তার প্রমাণ চতুর্দশপদী কবিতাবলী, যে ধারার কাব্য রচনায় মধুসূদন-প্রতিভা অনতিক্রান্ত। কবিপ্রকৃতির একাগ্রতা কাব্যসামগ্রী সম্বন্ধে তাঁকে কখনও দ্বিধান্বিত করে নি। শিল্পী মধুসূদন মানুষ মধুসূদনকে সর্বদা চালনা করেছেন।

ব্যারিস্টারী জীবনেও অর্থকরী কাজ ফেলে সখীসংবাদ শোনা বা বন্ধুদের সঙ্গে সাহিত্যিক আড্ডা দেওয়া তাঁর অননামুখী সাহিত্যপ্রাণতার পরিচায়ক।

'মাইকেল রচনা সম্ভার'-এর ভূমিকায় অধ্যাপক বিশী মাইকেলের জীবন ও কাব্যের ওপর গ্রীক-প্রভাবের পরিমাণ নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে মাইকেলের জীবনই একটি গ্রীক ট্র্যাজেডি—তাঁর জীবন ও কাব্য একই সূত্রে গাঁথা। জীবন ও কাব্যের মধ্যে এমন সঙ্গতি খুব কমই দেখা যায়। তাঁর দৃষ্টিতে মধুসূদনের জীবন সুস্পষ্ট পাঁচ অংকে বিভক্ত একটি নাটক। প্রথম অংকে—ধর্মান্তর গ্রহণ, দ্বিতীয় অংকে—মাদ্রাজ প্রবাস। কলিকাতা প্রত্যাবর্তনে দ্বিতীয় অংকের যবনিকাপাত। তৃতীয় অংকে বিলাত যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত কলকাতা বাস—মাইকেলের জীবনে সব চাইতে ফলপ্রসূ কাল—মহাকাব্যাদি রচনা। চতুর্থ অংকে – য়ুরোপে আর্থিক জীবনে চরম সংকট। পঞ্চম অংকে—সার্থকতার মুখে সামঞ্জস্যের অভাবে পতন যা গ্রীক ট্র্যাজেডির অনুরূপ। সাফল্যের এমন নিষ্ফলতা একান্ত দুর্লভ। মধুসূদন গ্রীক কবির মতো মেঘনাদবধ-এর ট্র্যাজেডি লিখতে চেয়েছিলেন। অধ্যাপক বিশীর বিশ্বাস, নির্মম নিয়তি মধুসূদনের জীবন নিয়ে একটি গ্রীক ট্র্যাজেডি রচনা করেছে।

অধ্যাপক বিশী মেঘনাদবধ-কে ভার্জিল-এর ঈনিড্, দান্তের ডিভাইন কমেডি এবং মিল্টনের প্যারাডাইস লস্টের মত যুগসন্ধিক্ষণের কাব্য বলে বিবেচনা করেন। তাঁর মতে এই কাব্য তৎকালীন ঘটনাপ্রবাহজাত 'চিত্তসংঘর্ষের' অনিবার্য পরিণাম। সমকালীন চিত্তসংঘর্ষের প্রভাব সুদূরপ্রসারী বলে মেঘনাদবধের আবেদন এখনও সজীব বলে তাঁর বিশ্বাস।

মাইকেলের কাব্যে গ্রীক প্রভাবের পরিমাণ বিচারে অধ্যাপক বিশী যথেষ্ট সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। এই আলোচনায় তিনি গ্রীক সাহিত্যের চারটি সুস্পষ্ট লক্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন : (ক) অখণ্ড সৌন্দর্যবোধ (খ) সংস্কারমুক্তি (গ) ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-প্রতিষ্ঠা ও মানব-রস (ঘ) বস্তুকে দেখার ঋজু দৃষ্টি—যে দৃষ্টি তাদের জীবনকেও পরিচালনা করতো। এর মধ্যে মানব-রস এবং ঋজুদৃষ্টি গ্রীক জীবন ও সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

অধ্যাপক বিশী মনে করেন, মেঘনাদবধ কাব্যে শিল্পী মধুসূদনের এই গ্রীক সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ অতি প্রত্যক্ষ। যুগসন্ধিক্ষণে জন্ম লাভ করেছিলেন বলে মধুসূদন গ্রীকদের মত না হলেও বহুল পরিমাণে পূর্ব-সংস্কার অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। এই সংস্কারমুক্তির প্রভাবেই তিনি রামায়ণ কাহিনীকে নতুন ছাঁচে ঢালাই করতে সাহসী হয়েছিলেন ; ট্র্যাজেডি, এপিক, সনেট প্রভৃতি বিদেশী কাব্য-রীতিকে বাংলা ভাষায় প্রবর্তন করতে দ্বিধা করেন নি, এমনকি পৌরাণিক নারীকেও বীরাঙ্গনার ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। মনুষ্য-রসের সব চাইতে উজ্জ্বলতম স্ফূর্তি ঘটেছে মেঘনাদবধ কাব্যে। মেঘনাদবধ-এ মাইকেলের ঋজুদৃষ্টি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত না হলেও প্রিয় পুত্র ইন্দ্রজিতের মৃত্যু এবং পুত্রবধূ প্রমীলার সহমরণকে রাবণ ধীর

চিত্তে, নির্মোহ চেতনায় যেভাবে গ্রহণ করেছেন—তার ভেতর সে দৃষ্টির প্রভাব অতি-প্রত্যক্ষ। তাঁর মতে মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণের খেদ হেক্‌টরের মৃত্যুতে প্রায়ামের খেদোক্তির সংগে তুলনীয়—এই খেদ একই সংগে গ্রীক কবির মতো Poetical এবং Practical। বস্তুতপক্ষে বহু দূরান্তবর্তী দেশ ও কালে জন্মগ্রহণ করেও মধুসূদনের পক্ষে গ্রীক জীবনবোধ যে পরিমাণে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছিল, সে পরিমাণেই সে জীবনবোধকে তিনি কাব্যে প্রতিষ্ঠা দিতে পেরেছেন।

বলা বাহুল্য, অধ্যাপক বিশী-উপলব্ধ মধুসূদনের এই কবি-প্রেরণা মোহিতলালের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। অধ্যাপক বিশী মনে করেন, একমাত্র মেঘনাদবধ-এ প্রাচীন গ্রীক কাব্য ও জীবনবোধের আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে—অন্য কাব্যে নয়। তাঁর মতে তিলোত্তমা ও মেঘনাদবধ-এর কবিভাষা ও ছন্দরীতির পার্থক্য—গ্রীক সাহিত্যের প্রভাবজাত। নবসৃষ্টির জন্য গ্রীক আদর্শসম্মত অপর কোন বিষয়বস্তুর সন্ধান না পেয়ে মাইকেল বীরধর্মী কাব্যসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে রোমান্টিক ও লিরিক কাব্যের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন—মধুসূদনের পত্রধৃত উক্তি উদ্ধৃত করে অধ্যাপক বিশী তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। নব্য বাঙালীর চিত্ত সংঘর্ষজাত যে মূল প্রেরণা মেঘনাদবধ-এর মুখ্য উৎস, সে মূলধন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদন ওই জাতীয় নতুন কোন মহাকাব্য রচনা করতে পারেন নি বলেই অধ্যাপক বিশীর ধারণা।

এখানে অধ্যাপক বিশী মধুসূদনের কবি-প্রতিভার জাগরণে গ্রীক প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে বাঙালী রেনেসাঁসের অনতিক্রমণীয় প্রভাবের কথাও স্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য এই যে, বাঙালী রেনেসাঁসের প্রথম যুগে বাঙালীমানসে যে সংস্কারমুক্তি ও মানবচেতনার স্ফুরণ ঘটেছিল তার প্রকৃতি অনেকটা গ্রীক জীবন-চেতনারই অনুরূপ।

অধ্যাপক বিশী বলেন, বীরাঙ্গনা ও ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচনায় মধুসূদন বাংলা কাব্যের রোমান্টিক ও লিরিক্যাল ঐতিহ্য সামনে পেয়েছিলেন। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যে আধুনিক কবি মধুসূদন ডক্টর রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত-কথিত যে 'প্রাচীন কালের কণ্ঠস্বর' ধ্বনিত করে তুলেছেন, বাংলা কাব্যজগতে তা নাজরাবিহীন।* সাহিত্যের ইতিহাসে এমন ঘটনা আকস্মিক। অধ্যাপক বিশীর মতে আধুনিক কালে প্রাচীন কালের কণ্ঠস্বরকে সজীব করে তোলা মধুসূদন-প্রতিভার অন্যতম অবদান। তাঁর বিবেচনায় মেঘনাদবধ কাব্য ক্লাসিক্যাল রীতির আত্মসংযম ও আতিশয্য বর্জনের

---

* Dr. R. K. Dasgupta—Our Divine Language—Michael's Achievement in Verse,—The Sunday Hindusthan Standard, March, 22, 1959. অধ্যাপক বিশীর উক্ত ভূমিকায় এ প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশ উল্লেখিত ও উদ্ধৃত। —সম্পাদক

উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। এই কাব্য, তাঁর মতে, মানুষের সীমাবদ্ধ মনে মনুষ্য উদ্বোধনের কাব্য—উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মনীষার সর্বশ্রেষ্ঠ দান। অধ্যাপক বিশীর একান্ত বিশ্বাস, মহাকাব্যের রীতিসম্মত চরিত্রচিত্রণে, গঠনচাতুর্যে এবং পাঠকচিত্তে মহৎ ভাবের উদ্বোধনে মেঘনাদবধ মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট অপেক্ষা নিকৃষ্ট কাব্য-তো নয়ই, বরং মানবিক অনুভূতি-স্পন্দিত কাব্য হিসেবে মেঘনাদবধ প্যারাডাইস লস্ট্ থেকে অনেক বেশি মর্মস্পর্শী। মিল্টনের মহাকাব্য কোন বিশিষ্ট সমাজের অন্তরঙ্গ বস্তু নয়,—সর্ব-মানবের কল্পনাভোগ্য। অপরপক্ষে মেঘনাদবধ উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জীবনের মহাকাব্য। এ কাব্যের মানবিক আবেদন অনেকটা হোমারের ইলিয়াডের মত। মিল্টনের মহাকাব্যের Spiritual আবেদন মধুসূদনের মহাকাব্যে নেই বলে তা মানবচিত্তকে ঊর্ধ্বায়িত করে না, এটা সত্য। কিন্তু এ কাব্যের আবেদন মানবিক বলে তা মর্ত্যের মানুষকে হৃদয়-বেদনায় আলোড়িত করে।

বজ্রধ্বনিময় উদাত্ত ছন্দ সৃষ্টি মধুসূদন-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দান। যে ইংরেজী Blank verse-কে মিল্টনীয় পরিণতি লাভ করতে একশত বৎসর সময় লেগেছিল, মধুসূদন মাত্র তিনটি বৎসরে সকল পর্যায়ের হৃদয়ানুভূতি ও বর্ণনা প্রকাশে সক্ষম অমিত্রচ্ছন্দ সৃষ্টি করে সেই অসাধ্য সাধন করেছিলেন। অধ্যাপক বিশীর মতে বাংলা কাব্যের সংকীর্ণ ধারায় পাশ্চাত্ত্য কাব্যের বৈচিত্র্য আনা সম্ভব হয়েছে—এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের মাধ্যমে।

অধ্যাপক বিশী মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাবে মধুসূদনের কাব্যের আবেদন সাময়িকভাবে ক্ষীণশক্তি হলেও, সে প্রভাব হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ভাবীকালের বাংলা কাব্যে মধুসূদনের প্রভাব নতুন করে অনুভূত হবে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, রবীন্দ্রোত্তর যুগ অক্ষম পাশ্চাত্ত্য কবিদের অক্ষমতর অনুকরণে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে না, মধুসূদন-প্রবর্তিত আখ্যায়িকা কাব্য ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে সে কাব্য নতুন পথের সন্ধান পাবে।

ভাবীকালের জন্য মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান, অধ্যাপক বিশীর মতে, প্রচলিত রীতি-নীতির শাসন ও সংস্কার অগ্রাহ্য করে সাহিত্যে নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে স্রষ্টার মনে দুর্জয় আকাঙ্ক্ষার জাগরণ। কঠোর তপস্যার সাহায্যে বাংলা সাহিত্যে তিনি যে নতুন জগৎ সৃষ্টি করে গেছেন,—ভাবীকালে তা স্রষ্টার মনকে নতুন সৃষ্টি-প্রেরণায় সঞ্জীবিত করবে।

অধ্যাপক বিশীর মধুসূদন-প্রতিভার মূল্যায়ন বিস্ময়বোধের সঙ্গে যুক্তিনিষ্ঠার সমন্বয়ে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,

সুশীলকুমার দে

মনস্বী লেখক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডঃ সুশীলকুমার দে মধুসূদনের সামগ্রিক প্রতিভার মূল্য নির্ণায়ক কোন গ্রন্থ রচনা করে যান নি,—মধুসূদন-চর্চায় উৎসাহী ব্যক্তিদের পক্ষে এটা পরম নৈরাশ্যের বিষয়। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপক অরুণ বসু সম্পাদিত মেঘনাদ ধ কাব্যের ভূমিকায় (১ম-৩য় সর্গ) যে বক্তব্য রাখেন মধুসূদন-প্রতিভা মূল্যায়নে তার বিশিষ্টতা অবশ্য-স্বীকার্য। ডঃ সুশীলকুমার দে-র 'নানা নিবন্ধে'র অন্তর্গত 'বাংলা মহাকাব্য ও মধুসূদন' প্রবন্ধেও লেখকের গভীর চিন্তাপ্রসূত মধুসূদন-প্রতিভার কয়েকটি দিক স্বচ্ছভাবে প্রতিবিম্বিত।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত ভূমিকায় বলেছেন, মধুসূদনের জীবনের কোন কোন উপাদান আমাদের হাতে এসে পৌঁছালেও তাঁর ব্যক্তিস্বভাব ও কবি-স্বভাবের মূল প্রাণকেন্দ্রটি এখনও অনাবিষ্কৃত। প্রতীচ্য ও প্রাচ্য ভাবাদর্শের আশ্চর্য সমীকরণ তাঁর সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার অন্যতম পরিচয়। কিন্তু কী সমাহার কৌশলে তিনি এই আশ্চর্য সমন্বয় সাধন করেছিলেন তার রহস্য এখনও অনুদ্‌ঘাটিত। পাশ্চাত্ত্য মহাকবিদের প্রভাব-প্রসঙ্গে তিনি মোহিতলালের বিপরীত অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে মধুসূদন হোমার, ভার্জিল, দান্তে, মিল্টন, টাসো, এরিয়স্টো প্রভৃতি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কবিদের দ্বারা শুধু প্রভাবিতই হন নি, 'তাঁদের আত্মার নির্যাস আকণ্ঠ পান করেছিলেন'। তাঁদের কাব্যাত্মার বৈশিষ্ট্য তাঁর কবি-স্বভাবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গিয়েছিল। মধুসূদনের কাব্যগঠন-শিল্প ছিল কষ্টার্জিত ভারসাম্যের ওপর নির্ভরশীল। যোগ্যতার অভাবে পরবর্তী কবিদের দ্বারা সে ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয় নি।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মধুসূদনের সৃষ্টিকর্মকে সচেতন ও অবচেতন মনের ক্রিয়াজাত বলে মন্তব্য করেছেন। সচেতন মন তাঁর সৃষ্টিকে যে-পথে চালনা করতে চেয়েছিল, অবচেতন মনের সুপ্ত কোন অদৃশ্য শক্তি সে সৃষ্টিকে অনভিপ্রেত ভিন্নতর পথে চালনা করেছে। মধুসূদনের আকাঙ্ক্ষিত বীররস সৃষ্টি-প্রয়াস অন্তরের গোপন উৎসের প্রেরণায় করুণ রসে পর্যবসিত হয়ে কাব্যের স্নিগ্ধরসকে ভারতীয় ঐতিহ্যানুগ করেছে বলে শ্রীকুমারের বিশ্বাস। প্রমীলা ও সীতা চরিত্র মধুসূদনের পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য জীবনদৃষ্টির সমন্বয়বোধের পরিচায়ক। প্রাচীন ও আধুনিকের মধ্যে মধুসূদনের স্বচ্ছন্দ পরিক্রমার কথা কোন সমালোচনায় পরিস্ফুটভাবে অঙ্কিত হয় নি বলেই শ্রীকুমারবাবুর বিশ্বাস।

ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, মহাকাব্য রচনায় মধুসূদনের অভীপ্সিত গ্রীক আদর্শ নিখুঁতভাবে অনুসৃত হলেও তার মধ্যে কবির অন্তর্নিহিত ভারতীয় ও বাঙালী জীবনচেতনা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে অভিনব সুরসংগতি সৃষ্টি করেছে। পাশ্চাত্ত্য মহাকবিদের

অনুকরণ-প্রয়াস মধুসূদনের কাব্যতরণীকে পশ্চিম মহাসমুদ্র থেকে বাংলার মৃদু-কল্লোলিত নদীতীরে পৌঁছে দেবার যে চমৎকার চিত্রটি তিনি অঙ্কিত করেছেন, তা যেন মোহিতলালের ভাবোচ্ছ্বসিত অনুরূপ ভাষাচিত্রেরই বিশ্বস্ত প্রতিচ্ছবি।

অলঙ্কার সৃষ্টিতেও মধুসূদন জীর্ণ ঐতিহ্যকে অতিক্রম করতে পারেন নি এবং পুরাণ-চেতনা তাঁর সৃষ্টির সর্বত্র ব্যাপ্ত বলে শ্রীকুমারবাবু মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে দেবলোক এবং নরকের বর্ণনায় মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য প্রভাব স্বীকার করেও পৌরাণিক আদর্শের প্রতি যথাসম্ভব বিশ্বস্ত থেকেছেন। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের প্রচণ্ডতা সত্বেও এত গভীর ভারতীয় সংস্কৃতি-প্রীতি মধুসূদনের শিল্প-সৃষ্টিকে কিভাবে এত উদার পরিণামমুখী করল তার যুক্তিসংগত কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে শ্রীকুমারবাবু মধুসূদনের অলৌকিক জাতিস্মরতার প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর বিশ্বাস, এই রহস্যময়তার প্রভাবেই মধুসূদন সচেতনভাবে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব স্বীকার করেও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগ অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব এবং কাব্য-প্রতিভার মূল্যায়নে শ্রীকুমারবাবু তীক্ষ্ণ বিচারশীল সমালোচকের দৃষ্টির পরিচয় দিলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা মোহিতলালের সমধর্মী। চিন্তার জগতে এই দুই মনস্বী সমালোচকের সাদৃশ্য আপাতিক হওয়াও বিচিত্র নয়।

একটিমাত্র প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে ডঃ সুশীলকুমার দে মহাকবি হিসেবে মধুসূদন-প্রতিভার যে মূল্যায়ন করেছেন, তাতে মোহিতলালের ভাবোচ্ছ্বাস বা শ্রীকুমারের বাক্যবিন্যাসের ঘনঘটা নেই সত্য, কিন্তু বুদ্ধিশাসিত যুক্তির সাহায্যে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত সে মূল্যায়ন সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ডঃ সুশীলকুমার দে-র মতে মহাকবি হিসেবে মধুসূদনের শিল্পসিদ্ধির মূলে পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যের প্রাণের আবিষ্কার। প্রাণের আবিষ্কার বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, পাশ্চাত্ত মহাকাব্যের মূল আদর্শ, সে কাব্যকলার অসীম সম্ভাব্যতা, অপূর্ব রচনাভঙ্গী, বিচিত্র রসমাধুর্য, ভাষার অপরিমেয় শক্তি ও ছন্দের অবাধ স্বাচ্ছন্দ্য। তাঁর মতে সমকালীন মৃতকল্প বাংলা ভাষার অন্তরঙ্গে ও বহিরঙ্গে এই নবপ্রাণের সঞ্চারই সে সাহিত্যকে ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির পথে চালনা করেছে। তবে মধুসূদনের সৃষ্টিশীল কবিমানসের ওপর এই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ণয়ের ওপরই তাঁর কবি-প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন নির্ভরশীল বলে ডঃ দে-র ধারণা। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে তিনি মধুসূদনের কবি-প্রতিভার জাগরণে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের যে পরিমাপ করেছেন—তা মূল্যবান। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তিনিও বলেন, পাশ্চাত্ত্য কাব্যকলার বহিরঙ্গ ও সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে শুধু আত্মসাৎ নয়, আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর হাতে বাংলা সাহিত্যে নবসৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। তবে ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে মধুসূদনের প্রতিভার জাগরণে তাঁর অন্তরস্থিত 'ভারতীয়'

সাহিত্য-সংস্কৃতি-প্রীতির উপর জোর দিয়েছেন, সেখানে মোহিতলালের মতই ডক্টর দে মধুসূদনের মর্মতলপ্রবাহিত 'বাঙালীর অতি প্রাচীন বাঙালীত্ব'কে-ই সে প্রতিভা বিকাশের উৎস স্থল বলে বর্ণনা করেছেন। Epic-যুগের বীররসপ্রধান মহাকাব্যের মত মহাকাব্য রচনা এ যুগে যে কোন প্রতিভাধর ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব নয় বলে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যের আকারে বাঙালী জীবনের প্রতিচ্ছায়ামূলক খাঁটি আধুনিক কাব্য হয়েছে বলেই তাঁর ধারণা। মধুসূদনের শিল্পীমনের ক্লাসিক-রোমান্টিক দ্বন্দ্ব তাঁর বীররস সৃষ্টি-প্রয়াসের ওপর বাঙালীর মর্মগত করুণ রসের আচ্ছাদন টেনে দিয়েছে বলে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তা যেন মোহিতলালের অভিমতেরই প্রতিধ্বনি। মেঘনাদবধ প্রাচীন যুগের মানদণ্ডে মহাকাব্য পদবাচ্য না হলেও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের নতুন আদর্শানুযায়ী অন্তরাবেগের সংমিশ্রণে উপভোগ্য কাব্য হিসেবে পরম সার্থকতা লাভ করেছে। এই বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের মত সূক্ষ্মদর্শী lyric-কবির দৃষ্টিকেও এড়িয়ে গেছে' বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। নতুন ছন্দ আবিষ্কারের সাহায্যে কবি-কল্পনার অবাধ বিস্তার এবং অভিব্যক্তির অবারিত স্বাচ্ছন্দ্য মধুসূদনের কবি-প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বলে ডঃ দে মনে করেন। মধুসূদনের কাব্যের অন্তঃস্থিত লিরিক আবেগ পরবর্তী বাংলা কাব্যকে আত্মগত ভাবচেতনার পথে প্রবাহিত করে যুগ-সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করেছে বলেও ডঃ দে-র একান্ত বিশ্বাস।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত :

ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচক অধ্যাপক ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 'মধুসূদন : কবি ও নাট্যকার' গ্রন্থে (১৯৬০) মধুসূদন-প্রতিভার স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়ে প্রথমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গীতে মহাকাব্যের স্বরূপ-লক্ষণ নির্ণয় করেছেন—যেহেতু মহাকবি হিসেবে মধুসূদন-প্রতিভা বিচারের পূর্বে মহাকাব্য সম্পর্কে ধারণা থাকা অপরিহার্য। পাশ্চাত্ত্য নন্দনতত্ত্ব এবং সংস্কৃত অলংকারের সংগে তাঁর পরিচিতি সুগভীর হওয়ায় মহাকাব্য বিচারে তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, মধুসূদন সমালোচনায় তা খুব সুলভ নয়।

তাঁর মতে মহাকাব্যের কাহিনীতে থাকবে অপরিসীম বিস্তৃতি ও সুরের ঐক্য। এই ঐক্যের বিধায়ক হলো মহাকবির কল্পনা—যার সংগে সংগতি লাভ করবে জাতির আশা, আকাংক্ষা ও ধর্মবোধ। মহাকাব্যের কাহিনী শুধুমাত্র বিস্তৃত বা বিশাল হলেই হয় না, বিষয়ের সার্বভৌমিকত্বই মহাকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া মহাকাব্যের তাৎপর্য হবে মহাজাগতিক। মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অসামান্যতার পরিচয় অবশ্যই থাকবে,—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও তদনুভবের কাহিনী নিয়ে মহাকাব্য হয় না (যেমন, দান্তের ডিভাইনা কমেদিয়া)। অনুভূতির সর্বজনীনতাই মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণ।

মহাকাব্য শুধু মহামানবের চিত্র নয়, নৈসর্গিক শক্তির রূপও মহাকাব্যে প্রতিফলিত হয় বলে মহাকাব্যের বিস্তৃতি অপরিসীম।

প্রাচীন মহাকাব্যে দেবদেবী পরিকল্পনায় কোন অসংগতি নেই। তবে গ্রীক মহাকাব্যে নিয়তির ভূমিকা দেবতাদেরও ওপরে, ভারতীয় মহাকাব্যেও কর্মফল বা প্রাক্তনের প্রভাব অখণ্ডনীয়।

গ্রীক মহাকবিরা জগতকে দেখেছিলেন শিল্পীর দৃষ্টিতে, নৈতিক দৃষ্টিতে নয়। ভারতীয় মহাকাব্যে ন্যায়-অন্যায়, মংগল-অমংগলের সীমারেখা স্পষ্ট। পরিণতিতে অমংগলের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

মহাকাব্য নায়ক-প্রধান। আবার কারো কারো মতে আখ্যানভাগই মহাকাব্যের প্রধান উপজীব্য,—চরিত্র-মহিমার প্রতিষ্ঠা নয়।

মহাকাব্যের বর্ণনা ও রচনাভংগীতেও বিশালতার পরিচয় থাকা অবশ্য-প্রয়োজনীয়। তবে বর্ণনার যাথার্থ্য মহাকাব্যের অন্যতম গুণ।

মহাকাব্যের সুর হবে উদাত্ত-গম্ভীর, আর কাব্যদেহে থাকবে অলংকারের প্রাচুর্য। ঐশ্বর্যময় অলংকরণ ও ধ্বনিসমৃদ্ধ শব্দপ্রয়োগ শুধুমাত্র প্রাচীন মহাকাব্যে নয়, আধুনিক মহাকাব্যেও উদাত্ততা ও বিশালতা সম্পাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়। বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি সাধনের জন্য উপমা-পরম্পরাও সৃষ্টি করা হয়।

প্রাচীন মহাকাব্য সমগ্র মানব জাতির জীবন-অভিজ্ঞতার ফল। অপর পক্ষে আধুনিক মহাকাব্য কোন বিশিষ্ট কবির প্রতিভাসৃষ্ট—তাঁর মানসিকতার স্বাতন্ত্র্যে দীপ্যমান। স্বতন্ত্র মানসিকতা-সৃষ্ট ব'লে আধুনিক মহাকাব্য যতই তাৎপর্যপূর্ণ ও উপাদেয় হোক না কেন, তার প্রকৃতি স্বাভাবিক ভাবেই সংকীর্ণ হয়।

প্রাচ্য মহাকাব্যে উচ্চতর জীবননীতির জয় ঘোষণা করা হয়েছে। রামায়ণ মহাভারত পাঠের ফলে আমাদের চিত্ত আদর্শের ঊর্ধ্বলোকে পক্ষবিস্তার করে। অপর পক্ষে গ্রীক ও লাটিন জাতির মহাকাব্য পড়ে হৃদয় বিস্ময়ে ও আনন্দে বিস্ফারিত হয় মাত্র।

মহাকাব্যের উক্ত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে মধুসূদনের মহাকাব্য-রচনা-প্রতিভার বিচার করেছেন তীক্ষ্নধী সমালোচক ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। তাঁর মতে তিলোত্তমাসম্ভবে মহাকাব্যের বিস্তৃতি নেই। তবে যে নবাবিষ্কৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দে এ কাব্য রচিত, তা ভবিষ্যৎ কবির অবাধ পক্ষবিস্তারের বাহন। সে হিসেবেই এই কাব্যের তাৎপর্য।

তিলোত্তমা মুখ্যত গ্রীক-প্রভাবে রচিত। তিলোত্তমার সাহায্যে দানববিজয় এ কাব্যের বিষয়। এ কাব্যে মানবীয় রসের একান্ত অভাব। ভারতীয় ভাবাদর্শের প্রাধান্য না থাকায় এ কাব্য তেমন সার্থকতা লাভ করে নি।

একমাত্র ভারতীয় ভাবাদর্শের অনুপস্থিতির কথা ছাড়া তিলোত্তমার বিরুদ্ধে এ সমস্ত অভিযোগ পূর্বেও উত্থিত হয়েছিল। সুতরাং তিলোত্তমা সম্পর্কে ডঃ সেনগুপ্তের বক্তব্যে নতুন কথা তেমন কিছু নেই।

মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা ও ছন্দের ওজস্বিতা এবং ঐশ্বর্য সর্বজনস্বীকৃত হলেও

এ কাব্যে কৃত্রিম মহাকাব্যজাত কবির বাক্‌চাতুর্যই প্রাধান্য পেয়েছে বলে ডঃ সেনগুপ্তের বিশ্বাস। এই কাব্যে সমগ্র জাতির অন্তরানুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি নেই—যে অভিব্যক্তি দেখা যায় রামায়ণে ও মহাভারতে। তবে ডঃ সেনগুপ্ত মনে করেন, এ কাব্যে রামায়ণ-মহাভারতের মূল ভাব অক্ষুণ্ণ আছে। এ কাব্যে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির মূল নীতিকে মধুসূদন নিজস্ব ভাব-কল্পনানুযায়ী রূপ দিয়েছেন বলে ডঃ সেনগুপ্ত অভিমত প্রকাশ করেছেন।

ডঃ সেনগুপ্ত মেঘনাদ, বিভীষণ, রাম প্রভৃতি চরিত্র সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে খণ্ডন করে নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে মধুসূদন তাঁর প্রিয় মেঘনাদ-চরিত্রের প্রতি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে রামায়ণ-বর্ণিত লক্ষ্মণ ও মেঘনাদ—এই দুইটি চরিত্রকেই বিকৃত করেছেন। মেঘনাদবধে মেঘনাদের শক্তির উৎস দেবতার আশীর্বাদ ও স্বীয় বাহুবল। লক্ষ্মণ মায়াবলে বলীয়ান। অথচ মূল রামায়ণে দেখা যায়, মেঘনাদই মায়াবলে নানা ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এতদ্‌ব্যতীত মধুসূদন রামায়ণোক্ত ধর্মপ্রাণ বিভীষণকে দেশদ্রোহী রূপে চিত্রিত করেছেন, রামচন্দ্রকে অশ্রুপাতপ্রবণ চরিত্র হিসেবে সৃষ্টি করে তাঁর অপরিসীম বীরত্বের যথাযোগ্য স্বীকৃতি দেন নি। চরিত্র সৃষ্টিতে এ সমস্ত বিকৃতি দেখে মনে হয়, মেঘনাদের দীপ্ত শৌর্য-বীর্যের প্রদর্শন এবং অন্যায় ভাবে তাঁকে নিধন করার হীনতা প্রমাণ করাই এ কাব্যের লক্ষ্য।

ডঃ সেনগুপ্ত মধুসূদনের এই দৃষ্টিভঙ্গীকে ভ্রান্ত বলে বিবেচনা করেন। তাঁর মতে আদর্শের বিরোধ এবং নিম্নতম স্তরের আদর্শের পরাজয় প্রদর্শনই মেঘনাদবধ-এর প্রকৃত ভাববস্তু। লক্ষ্মণ যদি সম্মুখ-যুদ্ধে বাহুবলে ইন্দ্রজিতকে পরাস্ত করতেন, তবে তা নিছক যুদ্ধকৌশলের পরীক্ষাতেই পর্যবসিত হত। এর ফলে কাব্যের আদর্শগত ব্যাপকতা বিনষ্ট হত। মেঘনাদের প্রতিদ্বন্দ্বী লক্ষ্মণ বিশ্বব্যাপ্ত নৈতিক শক্তির প্রতীক। এই শক্তির জন্যই তিনি দেবতাদের আশ্রিত। মেঘনাদ বধ কাব্যে রাম-লক্ষ্মণকে দেশবৈরী রূপে চিত্রিত করায় তাঁদের আদর্শ চরিত্র বিকৃত হয়েছে। চিত্রাঙ্গদার উক্তিতেই এ কথা প্রমাণিত যে, অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্যই তাঁরা লঙ্কা আক্রমণ করেছেন,—পর-রাজ্য গ্রাসের জন্য নয়। ইন্দ্রজিতের পরাজয় ঘটেছে এই নৈতিক শক্তির নিকট,—লক্ষ্মণ তার উপলক্ষ মাত্র। যে শক্তি ইন্দ্রজিতকে আঘাত করেছে, তা তাঁর পিতৃভক্তি বা দেশপ্রেমের চাইতে অনেক বড়। অপরিমেয় শক্তি সত্ত্বেও রাবণের পরাজয় ঘটেছে তাঁর ধর্মবিরোধী ক্রিয়াকলাপের জন্য। প্রমীলার পাশাপাশি সীতার মত স্নিগ্ধ, পতিব্রতা রমণীর চিত্র অংকিত করে মধুসূদন প্রমীলা চরিত্রের বীরত্বকে ম্লান করে দিয়েছেন বলেই ডঃ সেনগুপ্তের ধারণা।

অধ্যাপক সেনগুপ্তের মতে মেঘনাদবধ আখ্যায়িকা-প্রধান কাব্য, চরিত্র-প্রধান নয়। এই মহাকাব্যোচিত আখ্যায়িকার গঠনরীতি নিখুঁত। যুদ্ধ-প্রধান ইলিয়াড্‌ মহাকাব্যের সঙ্গে মেঘনাদবধ-এর পার্থক্য মৌলিক। বিভিন্ন নীতির সংঘর্ষ এবং

পরিণামে উন্নততর নীতির জয় ঘোষণা মেঘনাদবধ-এর মূল বিষয়। করুণ এবং শান্ত রসসৃষ্টিতে মেঘনাদবধ-এর পরিসমাপ্তি। এই উপসংহার ভারতীয় রুচির সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ডক্টর সেনগুপ্তর মতে মেঘনাদবধ-এর বর্ণনা-সমাবেশ, শব্দ ব্যবহারের ঘনঘটা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চিত্র, প্রকৃতি ও পুরাণের সামঞ্জস্য, অধিকাংশ চিত্রের উদাত্ত-গাম্ভীর্য ও তীব্র হিংস্রতা—সবই মহাকাব্যের বিশালতা সম্পাদনার সহায়ক। অংগী বীররসের সংগে বিভিন্ন রসের সংমিশ্রণ ঘটায় এ কাব্যের মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে। বিদেশী মহাকাব্যের প্রভাব সত্ত্বেও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিফলনে, বিভিন্ন নীতির সংঘর্ষে এবং নিম্নস্তরের নীতির পরাজয়ে মধুসূদন মেঘনাদবধ-এ ভারতীয় মহাকাব্যের তাৎপর্যকে নতুন ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্তি দিয়েছেন বলেই অধ্যাপক সেনগুপ্তের বিশ্বাস।

মধুসূদনের অভিনব জীবনধর্মী মহাকাব্য-বিচারে ডক্টর সেনগুপ্ত মধুসূদনের ভারতীয় আদর্শপ্রীতির ওপর যে আত্যন্তিক গুরুত্ব দিয়েছেন, তা যুক্তিনির্ভর হলেও কি পরিমাণে বাস্তবসম্মত—তা অবশ্যই বিবেচনার বিষয়। মেঘনাদবধ কাব্যকে ভারতীয় আদর্শের মহাকাব্য বলে প্রমাণ করবার অত্যুৎসাহে এ কাব্যের ট্র্যাজিক বৈশিষ্ট্য এবং অন্তর্নিহিত গোপন ধারায় প্রবাহিত লিরিক-প্রবণতার কথা তিনি উল্লেখ মাত্র করেন নি। এ কাব্য প্রণয়নে মধুসূদনের মন ও প্রাণেরি দ্বন্দ্ব প্রবল বেগে আত্মপ্রকাশ করে তাঁর মহাকাব্য রচনার আকাঙ্ক্ষাকে যে কেন্দ্রচ্যুত করেছে—পূর্ববর্তী সমালোচকদের এ অভিমতও তাঁর অনুমোদন লাভ করে নি। এ কাব্যে মধুসূদনের আকাঙ্ক্ষিত গ্রীক রচনাদর্শ কি পরিমাণ অনুসৃত হয়েছে—তাও তাঁর আলোচনায় স্থান পায় নি। তবে মেঘনাদবধ কাব্যে দুই পরস্পরবিরোধী পক্ষের দ্বন্দ্বে তিনি মহা-জাগতিক নৈতিক শক্তির অন্তিম জয়লাভের কথা ঘোষণা করে প্রকৃত সমালোচকের দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

প্রকাশভংগীর বৈচিত্র্য সত্ত্বেও বৈষ্ণব কবির অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও তন্ময়তার অভাব থাকায় ডঃ সেনগুপ্ত 'ব্রজাঙ্গনা'কে উচ্চাংগের কবিতার স্বীকৃতি দেন নি। তবে প্রকৃত রসোপলব্ধি-প্রভাবে সৃষ্টিধর্মী ও খেয়ালী কল্পনার মধ্যে সমন্বয় সাধিত হওয়ায় কাব্য হিসেবে ব্রজাঙ্গনা উপভোগ্য বলেই তাঁর বিশ্বাস। তাঁর মতে এ কাব্য মধুসূদনের নতুন সাহিত্যসৃষ্টি-পরীক্ষার একটি স্মারক মাত্র।

চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেটগুলিতে মধুসূদনের স্বাভাবিক কবিত্বের স্পর্শ থাকলেও কবি-প্রতিভার চরম বিকাশের চিহ্ন নেই বলেই ডঃ সেনগুপ্ত মনে করেন। তবে অধিকাংশ সনেটে মহাকাব্য রচয়িতার প্রতিভার চিহ্ন বর্তমান। এ সনেটগুলিতে দূরস্থিত বস্তুও কবিকল্পনার দৃষ্টিতে বিস্তৃতি ও বিশালতা লাভ করেছে। একান্তভাবে পার্থিব জগতের স্মৃতিবেদনা বিচিত্র উপমানের সাহায্যে সনেট-গুলিতে তীব্রতা ও বিস্তৃতি লাভ করেছে বলেই এ কাব্যের সার্থকতা। বীরাঙ্গনা

কাব্য পরিকল্পনার অভিনবত্বে, ভাবের ঐশ্বর্যে, ভাষা ও ছন্দের ওজস্বিতা ও মাধুর্যে—বাংলা কাব্যজগতে অতুলনীয় বলেই ডঃ সেনগুপ্তের বিশ্বাস। এ কাব্য রোমীয় কবি ওভিদের অনুসরণে রচিত হলেও দুই কবির দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। ওভিদের এই পর্যায়ের পত্রাবলীতে সৌন্দর্যপিপাসু কলাবিদের দৃষ্টির প্রাধান্য, মধুসূদনের পত্রাবলীতে সদাজাগ্রত নীতিবোধ এই কাব্য পরিকল্পনায় তাঁর শিল্প-দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এ কাব্যে কেকয়ী ও জনার পত্রিকা কবির দৃষ্টিভঙ্গীর নবীনতায়, অনুভূতির গভীরতায়, শাণিত মননশীলতায় মধুসূদনের খণ্ডকাব্য রচনা-প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বলেই ডঃ সেনগুপ্তর প্রত্যয়।

নাটক রচনায় প্রাচীন সংস্কৃত আদর্শকে পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্ত্য আদর্শ গ্রহণের মধ্যে মধুসূদনের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা তাঁর বিরল প্রতিভার পরিচায়ক বলে ডক্টর সেনগুপ্ত মন্তব্য করেছেন। যে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের সম্মিলনে নাট্যকারের প্রতিভা সূচিত হয়, মধুসূদনের নাটকে সে অপূর্ব সমাবেশের পরিচয় নেই বলেই তাঁর ধারণা। তাঁর মতে ইতিহাসাশ্রিত কৃষ্ণকুমারীর মত সম্পূর্ণাঙ্গ ট্র্যাজেডি বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। 'মায়াকানন'-এ দৈবের প্রভাবের আধিক্য থাকায় মানব-চরিত্র বিকাশের সুযোগ ঘটে নি। প্রহসন রচনায় মধুসূদনের শক্তি সর্ববাদীসম্মত। ডঃ সেনগুপ্তর মতে নাট্যপ্রতিভা মধুসূদনের সহজাত। অনুশীলনের সুযোগ পেলে সে প্রতিভা-বিকাশের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল বলে ডক্টর সেনগুপ্ত অভিমত প্রকাশ করেছেন।

মধুসূদনের মানসপ্রকৃতি বিশ্লেষণে ডঃ সেনগুপ্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। সৃষ্টিকর্মে খ্রীস্টীয় মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে 'প্যাগান' দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় তাঁর রচনা মানবিক চেতনায় স্পন্দিত হয়েছে। তাঁর মতে মাইকেলের নীতিবোধ ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। মেঘনাদবধে তিনি নীতি-ধর্মের অমোঘ পরিণতিকেই কাব্যরূপ দিয়েছেন বলেই তাঁর বিশ্বাস। ডঃ সেনগুপ্তের সুচিন্তিত অভিমত, মধুসূদন-প্রতিভা প্যাগান-সুলভ অবিমিশ্র সৌন্দর্য পিপাসা-জাত নয়—সুতীব্র নীতিবোধ-উদ্বোধিত। তাঁর কাব্যে সৌন্দর্য ও নীতিবোধের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। প্রাচীন ভারতীয় ও প্রাচীন গ্রীসের আদর্শ-সমন্বয়েই মধুসূদন-প্রতিভার মৌলিকতা ও অনন্যতা।

মধুসূদন-প্রতিভার মূল্যায়নে সুপণ্ডিত সমালোচক ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত পূর্ববর্তী সমালোচকদের সমালোচনার ধারা থেকে একটু সরে এসে মধুসূদনের যুগান্তকারী প্রতিভার জাগরণে সৌন্দর্যবোধ ও নীতিবোধের, এবং প্রাচীন ভারতীয় ও প্রাচীন গ্রীসের সমন্বয়ী আদর্শের ওপর যে গুরুত্ব অর্পণ করেছেন—তার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

অমলেন্দু বসু

সাহিত্য অকাদেমি কর্তৃক সম্প্রতি-প্রকাশিত (১৯৮২) ইংরেজীতে লিখিত 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত' গ্রন্থে অধ্যাপক ডঃ অমলেন্দু বসু অত্যন্ত যুক্তিবাদী বাস্তবদৃষ্টির সাহায্যে মধুসূদন-প্রতিভার মূল্যায়নের যে প্রয়াস পেয়েছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে মধুসূদনের অনন্যসাধারণ প্রতিভার দীপ্তিময় বিকাশ ঘটেছিল দুই বিরোধী শক্তির মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায়। মধুসূদনকে তিনি আধুনিক আন্তর্জাতিক মানসিকতাসম্পন্ন ভারতীয়দের অন্যতম পূর্বসূরী বলে অভিহিত করেছেন। লেখক হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব শুধু ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, তা সীমাতিক্রমী। তাঁর সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার ভিত্তি ঐতিহ্য হলেও তিনি বিদ্রোহী, স্রষ্টা হিসেবে ক্লাসিকধর্মী হয়েও তিনি ছিলেন সর্বদা নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উৎসাহী। খৃষ্টধর্মাবলম্বী এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী হয়েও নিজের জন্মভূমি পল্লীগ্রামের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক ছিল জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ। সাহিত্য-সৃষ্টি ব্যাপারে পাশ্চাত্যের অনুসরণ ছিল তাঁর গর্বের বিষয়।

মাইকেলের নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে ডঃ বসু বলেছেন, স্বল্পকাল-বিস্তৃত সাহিত্য-জীবনে কয়েক ধরনের বিষয়বস্তুকে নাট্যরূপ দিয়ে তিনি যে সার্থক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, তা তাঁর সৃষ্টিপ্রতিভার অনন্যতা ও বহুমুখিতার পরিচায়ক। নাটকগুলিতে জটিল ঘটনাচক্রের সৃষ্টি নাটকীয় দ্বন্দ্বকে বেশ তীব্র করে তুলেছে। ক্রিয়াশীলতা ও সঞ্জীবতার দিক থেকে নাটকীয় চরিত্রের বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। তাঁর তিনখানি নাটকের অন্তর্নিহিত আদর্শ আবেগধর্মিতা ও মননশীলতার দিক থেকে বেশ উচ্চমানেরই বলা যায়। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের পরিকল্পনায় গ্রীক বা ল্যাটিন নাটকের প্রভাব না থাকলেও এলিজাবেথীয় নাটকীয়তার স্পর্শ পাওয়া যায়। মধুসূদনের চিঠিপত্রের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, কৃষ্ণকুমারী রচনাকালে মধুসূদন শেক্সপীয়রীয় নাট্যকৌশল সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা করছিলেন। এত সযত্ন প্রয়াস সত্ত্বেও মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভা যে সম্যক বিকাশ লাভ করে নি, তার জন্য তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের এবং সমকালীন নাট্যামোদী সমাজের রক্ষণশীলতা-প্রসূত অসহযোগিতাই বিশেষ ভাবে দায়ী।

প্রহসনে তিনি যে তীক্ষ্ন ব্যঙ্গরস এবং কৌতুকজনক হাস্যরস সৃষ্টি করেছিলেন, তা ছিল সমকালীন বাংলা সাহিত্যে অজ্ঞাত। এ পর্যায়ের উচ্চাঙ্গের ব্যঙ্গ ও হাস্য-রসাত্মক প্রহসন উপভোগ করবার ক্ষমতা সে যুগের সংস্কারাচ্ছন্ন নাট্যামোদীদের ছিল না। ডঃ বসুর ধারণা, ব্যঙ্গ-রসাত্মক নাটক রচনা অব্যাহত থাকলে তিনি এ ধারায় সর্বোচ্চ সার্থকতা লাভ করতে পারতেন। মধুসূদনের হাস্য ও ব্যঙ্গ-রসাত্মক নাট্যসৃষ্টি-ক্ষমতাকে ডঃ বসু তুলনা করেছেন Ben Jonson অথবা Congreve-এর অনুরূপ ক্ষমতার সঙ্গে।

ডঃ বসুর মতে মেঘনাদবধ কাব্য-পরিকল্পনায় হোমারের প্রভাব সর্বাধিক হলেও বাল্মীকির এবং মধুসূদনের মায়ের স্মৃতির প্রভাবও কম নয়। মধুসূদন সাহিত্যিক প্রয়োজনে কাহিনীতে কতকগুলি নতুন-ঘটনা সৃষ্টি করেছেন। যেমন, (ক) তৃতীয় সর্গে যোদ্ধৃবেশে প্রমীলার লঙ্কায় প্রবেশ (খ) চতুর্থ সর্গে flashback পদ্ধতিতে সীতাহরণ বর্ণনা—যা বাল্মীকিতে নেই। পঞ্চম সর্গে লক্ষ্মণের মায়াস্বপ্ন—যা বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসে নেই। ষষ্ঠ সর্গে সর্প ময়ূরের যুদ্ধে সর্পের নিকট ময়ূরের পরাজয় মধুসূদনের স্বকপোলকল্পিত। (ঘ) ষষ্ঠ সর্গে মায়াদেবীর প্ররোচনায় রাজলক্ষ্মীর লংকাত্যাগের দৃশ্যও মধুসূদনের সৃষ্টি (ঙ) অষ্টম সর্গে দশরথের আত্মা-নির্দিষ্ট ওষধির প্রভাবে লক্ষ্মণের পুনর্জন্ম বর্ণনায় বাল্মীকির কাহিনী থেকে স্খলন। এ কাহিনী ভার্জিলের ঈনিড্ এবং দান্তের ডিভাইনা কমেডিয়ার সঙ্গে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ।

সৃষ্টিপ্রতিভা: (ক) মধুসূদন শুধু ভারতবাসীদের মধ্যে নয়, এশিয়াবাসীদের মধ্যে প্রথম কবি—যিনি ইংরেজী অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুকরণে বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করেন। তাঁর প্রভাবে অপর কয়েকজন ভারতীয় কবি অমিত্রচ্ছন্দে কাব্য রচনা করেন। (খ) কাব্যভাষার ঐশ্বর্য ও সঙ্গীতগুণ বৃদ্ধির জন্য মধুসূদন অপ্রচলিত সংস্কৃত ছন্দের ও লৌকিক ভাষার সাহায্য গ্রহণ করেন। (গ) মধুসূদন সাহিত্যিক প্রয়োজনেই মূল কাহিনীর বিকৃতি সাধন করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্ত্য কবির কাব্যেও এরূপ বিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। (ঘ) মেঘনাদবধ-এ মধুসূদনের স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা এবং রাবণ ও লংকাবাসীদের প্রতি আশ্চর্য সহানুভূতি রেনেসাঁসের মানবিক চেতনা-প্রভাবিত। (ঙ) প্রমীলা-চরিত্রের নবায়নও রেনেসাঁস-প্রভাবিত নারী-ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা-জনিত। এ চরিত্র-পরিকল্পনাও মৌলিক। (চ) পাশ্চাত্ত্য সমালোচকেরা যাকে Secondary Epic বা কৃত্রিম আলংকারিক মহাকাব্য বলেন, মেঘনাদবধ কাব্য সে পর্যায়ের নয়। মধুসূদনের মহাকাব্য-সৃষ্টিপ্রতিভা পাশ্চাত্ত্য মহাকবিদের সঙ্গে তুলনীয়। ডঃ বসুর বিশ্বাস, পৃথিবীর কাব্যসভায় মধুসূদন একজন বিশিষ্ট কবি। (ছ) মধুসূদন মিল্টনের মতই অ্যারিস্টটল-নির্দেশিত মহাকাব্য রচনার নিয়ম-শৃংখলা অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছিলেন। এরূপ অভ্রান্ত অনুসরণ ট্যাসোর মহাকাব্যেও দেখা যায় না। ডঃ বসুর মতে শিল্পকর্ম হিসেবে মেঘনাদবধ নিখুঁত। (জ) সংঘাতপ্রধান না হলেও মেঘনাদবধ-এর বর্ণনা মহাকাব্যোচিত। তাঁর সংস্কৃত-নির্ভরতা শব্দ ও অর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়ক হয়েছে। (ঝ) ডঃ বসুর মতে মেঘনাদবধের ট্র্যাজিক পরিণামের জন্য রাম কিংবা তাঁর অনুচরেরা দায়ী নন—দায়ী ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনাসমূহ এবং দৈবী শক্তি। কাহিনীসৃষ্টিতে মধুসূদনের বিদ্রোহ সুচিরকালব্যাপী নিয়তির প্রভাবকে মেনে নেওয়ার বিরুদ্ধে এবং নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দৃঢ় স্বীকৃতিতে। মধুসূদনের কবি-

মানসিকতার ওপর এই নৈতিক প্রভাবের স্বীকৃতিতে ডঃ বসু ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তর সঙ্গে একমত।

ডঃ বসুর ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা বা চতুর্দশ পদাবলীর আলোচনায় বিশেষ কোন নতুন চিন্তা প্রতিফলিত হয় নি।

নব-সৃষ্টির প্রেরণার উৎসে মধুসূদন যে 'আবেশ'-এর কথা দুইবার উল্লেখ করেছেন, ডঃ বসু তাকে কবি-অন্তরের স্বীকৃতি বলে মেনে নিয়েছেন। তাঁর মতে পাশ্চাত্য কবি ল্যাংল্যান্ড, আর্থার র‍্যাঁবো (Rimband), ভারতীয় কবি তুলসীদাস এবং রবীন্দ্রনাথও এই 'আবেশ'-এর প্রভাবেই সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই আবেশ-এর প্রভাবে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া কখনও চলে খুবই ধীর গতিতে—যেমন দেখা যায় ল্যাংল্যান্ড এবং তুলসীদাসের ক্ষেত্রে। আবার কোন কোন কবির বেলায় এই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া চলে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে—যেমন ফরাসী Rimband এবং বাঙালী কবি মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে। এই আবেশের প্রভাবে মধুসূদন মাত্র চার বৎসরের কালসীমায় সৃষ্টিধর্মী রচনায় শুধু সক্রিয়তা দেখান নি, নতুন পথের নির্দেশও দিয়েছেন। এই আবেশ অন্তর্হিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রচনাশক্তির উৎস ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে মধুসূদন নিজেই স্বীকার করেছেন। ডঃ বসুর মতে মাইকেলের মত নির্মম আত্মসমালোচক খুবই দুর্লভ।

ডঃ বসু মধুসূদনকে ভারতীয় রেনেসাঁসের অন্যতম প্রধান পুরুষ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর ভারতচেতনা ছিল ঐশ্বর্যময়, গভীর, বিচিত্র ও সৃষ্টিধর্মী। তাঁর গভীর বঙ্গপ্রীতি ভারতচেতনারই একটি বিন্দুমাত্র। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে ভারতচেতনার যে প্রকাশ ঘটেছে তাতে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু জনপদ, এমনকি সুদূর লঙ্কা পর্যন্ত বিধৃত। তাঁর শিল্পী-ব্যক্তিত্ব ছিল সকল প্রকার আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, ভাষাগত সংকীর্ণতা, পদমর্যাদার মোহ এবং আর্থিক লোলুপতামুক্ত। জীবনে কোন হীনম্মন্যতার দ্বারা তিনি আক্রান্ত হন নি।

মধুসূদন-মানসিকতার সীমাবদ্ধতার কথাও উল্লেখ করেছেন ডঃ বসু তাঁর গ্রন্থে। ১৮৬২ থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত য়ুরোপে বাস করা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে শিল্পবিপ্লব, যুক্তিবাদী এবং বৈজ্ঞানিক ভাবধারা সম্পর্কে কোন সচেতনতা দেখা যায় না। Strauss এবং Ernest Renan-এর ভাবধারা সমকালীন খৃষ্টীয় জগতে যে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল, তাঁর রচনায় কোথাও তার ছায়াপাত ঘটে নি। ডারউইন ও হাক্সলির বিপ্লবী চিন্তাধারাও তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে নি। বঙ্কিমচন্দ্রের মত সমকালীন লেখকেরা বেন্থাম, মিল, হার্বার্ট স্পেনসারের প্রভাবে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হলেও মধুসূদনের মানসিকতার ওপর তাঁদের কোন প্রভাব দেখা যায় না। সমকালীন য়ুরোপীয় কবি বোদলেয়ার, রবার্ট ব্রাউনিঙ্, পার্নেসিয়ান্স, প্রতীকবাদী এবং Pre-Raphaelites-দের সম্পর্কে কোন উল্লেখও তাঁর রচনায় পাওয়া যায় না।

মধুসূদনের শিল্পী-মানসের ওপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের পরিমাণ নির্ণয়-প্রয়াসে ডঃ বসু বলেন, য়ুরোপ থেকে মধুসূদন যে প্রেরণা পেয়েছিলেন তা মুখ্যত আবেগধর্মী—মননধর্মী নয়, নন্দনতাত্ত্বিক (aesthetic)—সামাজিক-অর্থনৈতিক নয়, মুখ্যত আদর্শগত—সৃষ্টিধর্মী, তবে বাস্তবধর্মী নয়। ইলিয়াড্, ঈনিড্, দি কমেডিয়া এবং প্যারাডাইস লস্টের কল্পনা ও আদর্শায়িত জগতে বিচরণ করাতেই ছিল তাঁর অধিকতর উল্লাস,—ইউরিপিডিস, হরেস, টেরেন্স, মলিয়ের এবং ভলতেয়ারের বাস্তব ও বিশ্লেষণধর্মী মনোজগতে বিচরণে তাঁর কোন স্পৃহা ছিল না।

তাঁর ভারত-চেতনার একমাত্র লক্ষ্য ছিল,—সুচিরকালের অন্ধকার থেকে জাতীয় চিত্তকে আলোকের রাজ্যে উত্তীর্ণ করা, এবং সেই আলোকের সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি য়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্কারমুক্তিতে। এবং তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল মাতৃভাষা বাংলায় সৃষ্টিধর্মী রচনার সাহায্যে জাতীয় চিত্তের মুক্তিসাধন। তাঁর স্ব-ভাষাপ্রীতি এত গভীর ছিল যে, য়ুরোপ প্রবাসকালে টেনিসন, ভিক্টর হুগো এবং থিয়োডোর গোলস্টুকারের নামে তিনি যে সনেট লেখেন সেগুলি বাংলা ভাষায়, এমন কি দান্তের উদ্দেশ্যে ইটালীর রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের নিকট তিনি যে সনেট লিখে পাঠান—তাও লিখিত হয়েছিল বাংলা ভাষায়। ভার্সাই এর রাজপ্রাসাদ ও পার্ক সম্বন্ধে সনেট লিখতে গিয়ে ভারতীয় কল্পনাজগতের বৈজয়ন্তধাম, বৃহস্পতি ও অর্জুনের কথা তাঁর মনে পড়ে। য়ুরোপে যখন যে অবস্থায় থাকুন না কেন, তাঁর ভারতীয় সত্তার কথা মধুসূদন এক মুহূর্তও বিস্মৃত হন নি। য়ুরোপীয় পোশাক পরিধান এবং পাশ্চাত্ত্য জীবনযাপনে উৎসাহী হলেও অন্তরে তিনি যে ভারতীয় বাঙালী—সম্বর্ধনার উত্তরে ঢাকার বক্তৃতায় এ সত্য প্রকাশে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। অধ্যাপক শশাঙ্ক সেন মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব নির্ণয় প্রসঙ্গে যে শিশুর সরলতা এবং অকৃত্রিম মানসিকতার কথা বলেছেন—সে প্রসঙ্গ পুনরাবৃত্ত হয়েছে ডঃ বসুর মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ে। তিনি বলেছেন, মধুসূদনের পাশ্চাত্ত্য অনুকরণপ্রীতি তাঁর স্বভাবের একটি আবরণ মাত্র।

নৈতিক এবং সৌন্দর্যসৃষ্টির ব্যাপারে মধুসূদনের ভারতীয়ত্ব সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সমস্ত সৃষ্টিতেই তিনি ভারতীয় আদর্শের অনুসরণ করেছেন। তাঁর কাব্যনাটকে অভিব্যক্ত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, পিতা ও সন্তানদের সম্পর্ক, প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক—সর্বত্রই তিনি ভারতীয় মূল্যবোধকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। বস্তুতপক্ষে একজন পুরোপুরি ভারতীয় হিসেবে মধুসূদন তাঁর সকল সৃষ্টিকর্মেই গভীর অন্তরাবেগের সঙ্গে ভারতীয় আদর্শকেই অনুসরণ করেছেন। তাঁর সাহিত্যের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভারতীয়—তা ভারতীয় পুরাণকাহিনী এবং সাহিত্যিক উৎস থেকে সংগৃহীত। তবে শৈল্পিক প্রয়োজনে তিনি সেগুলিও পুনর্গঠন করেছেন এবং নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রাচ্য-

পাশ্চাত্ত্য সব দেশেই সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনে প্রচলিত বিষয়ের এরূপ পুনর্গঠন প্রয়াস সব সময় দেখা যায়। মধুসূদনের পরবর্তীকালে অনেকগুলি ভারতীয় ভাষায় মেঘনাদবধের অনুকরণে 'বধ-কাব্য' সৃষ্টি হয়। এ সমস্ত কাব্যের উৎসও ভারতীয় এবং নান্দনিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সার্বজনীন আবেদন-সম্পন্ন।

ডঃ বসু বলেন, প্রচলিত বিষয়কে সৃষ্টিধর্মী সৌন্দর্যে মণ্ডিত করবার জন্যে অভিনব বস্তুর অবতারণা অবশ্য-প্রয়োজনীয় নয়। বিভিন্ন যুগের প্রতিভাবান লেখকেরা পুরাতন বিষয়ের পুনর্গঠনের সাহায্যেও সৌন্দর্যসৃষ্টি করেছেন। মধুসূদন মূল বাল্মীকি রামায়ণের খুব বেশি পরিবর্তন না ঘটিয়ে একটি মাত্র অংশের পুনর্গঠন করেছেন। তাঁর পুনর্গঠিত অংশে বহুযুগব্যাপ্ত আর্য-অনার্য সম্পর্কীয় ধারণাকে অতিক্রম করে যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রাধান্য পেয়েছে—তার মধ্যে মানবিক সহানুভূতির অভিব্যক্তিই মুখ্য। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ-প্রভাবিত যে-সমস্ত ধর্মপ্রাণ হিন্দু রাম এবং তাঁর অনুচরদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয়েছে বলে মধুসূদনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তাঁদের মনে রাখা উচিত, মধুসূদনের এই অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী ঊনবিংশ শতাব্দীর এবং সার্বজনীন মূল্যবোধের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধার উৎসজাত। ডঃ বসু মনে করেন, মধুসূদনের রাম-রাবণ কাহিনীর ব্যাখ্যা বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যার তাৎপর্যের মতই সমান যুক্তিবাদী। ডঃ বসুর মতে মধুসূদনের এই যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা ঐতিহাসিক মূল্য এবং কবিসিদ্ধির দিক থেকে ঊনিশ শতকীয় রেনেসাঁসের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তরূপে বিবেচিত হবার যোগ্য।

বলাবাহুল্য, ডঃ বসুর পূর্বসূরী মোহিতলাল মজুমদার, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুশীল দে প্রভৃতি সমালোচক যেখানে কবি-প্রেরণার উৎস হিসেবে মধুসূদনের অন্তরের স্বতোৎসারিত বাঙালীয়ানার কথা উল্লেখ করেছেন, ডঃ বসু সে স্থলে যুক্তি সহযোগে কবি-মানসিকতায় ভারতীয় চেতনার ওপর গুরুত্ব অর্পণ করে মধুসূদনের কবি-ব্যক্তিত্ব-বিচারে নতুন মাত্রার সংযোগ করেছেন।

পরিশেষে বক্তব্য, উক্ত মনস্বী সমালোচকবৃন্দ ছাড়াও ইদানীংকালে আরো অনেক খ্যাতিমান ও স্বল্পখ্যাত লেখক-লেখিকা মধুসূদন-প্রতিভার বিভিন্ন দিক বিচারে যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। এ পর্যায়ে লেখকদের মধ্যে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য, ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র, ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী, ডঃ শীতাংশু মৈত্র, বাণী রায়, ডঃ জীবেন্দ্র সিংহরায়, ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত, ডঃ প্রণয়কুমার কুণ্ডু, অধ্যাপক বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ডঃ গার্গী দত্ত, অধ্যক্ষ মোবাশ্বের আলী প্রভৃতি অন্যতম। এঁদের মধ্যে ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র নতুন আবিষ্কৃত তথ্যের আলোকে মধুসূদনের শিল্পী-ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্যে চিত্রকল্প' গ্রন্থে মধুসূদনের বিরল প্রতিভা নির্ণয়ে যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টি, প্রাসঙ্গিক তথ্য-সমাবেশে গভীর পাণ্ডিত্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিচক্ষণ মননশীলতা

প্রদর্শন করেছেন ইদানীং কালে তার তুলনা বেশি পাওয়া যাবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস।

মধুসূদনের সমকাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত এই মহৎ কবির দুর্লভ প্রতিভার অবমূল্যায়নও কম হয় নি। কিন্তু মধুসূদনের কালজয়ী প্রতিভার দীপ্তি এত প্রখর এবং সর্বব্যাপক যে সে প্রয়াস পাঠক-মনের ওপর কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

"মধুসূদন আর যে মহাকাব্য লিখলেন না তার কারণ মনে হয়, তাঁর নিজের মধ্যেই ছিল দ্বন্দ্ব।...মধুসূদনের কাব্য তাঁর জীবনের মতোই আত্মদ্বন্দ্বদীর্ণ এক ট্র্যাজেডি।"

—অরুণ মিত্র।

শিলাদিত্য, ১-১৫ মে, ১৯৮৩

মাইকেল মধুসূদনের শিল্পী-ব্যক্তিত্ব

নারায়ণ চৌধুরী

মধুসূদনের নামের আগে 'মাইকেল' কথাটা ব্যবহার করতেই আমার ভাল লাগে। তাঁকে 'শ্রী'যুক্ত করে আমাদেরই দলে ফেলার চেষ্টা জাতীয়তার পরিচয়সূচক হতে পারে, কিন্তু তাতে মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের প্রতি যথাযথ সুবিচার হয় না বলেই আমার বিশ্বাস। 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত'—আবাল্য এই নামের সঙ্গে পরিচিত হতে হতে মনোমধ্যে এই নামটির অর্থের, তাৎপর্যের, স্মৃতির এমন একটি অনুষঙ্গ দাঁড়িয়ে গেছে যে, আজ সেই অনুষঙ্গ থেকে বিচ্যুত করে তাকে 'শ্রী'ভূষিত করবার চেষ্টা করলে সেটা কেমন যেন কৃত্রিমতা দোষদুষ্ট হয়ে পড়ে। মধুসূদনের তিরোধানের পর বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠায় শোকজ্ঞাপক প্রবন্ধে প্রথম 'শ্রীমধুসূদন' কথাটি ব্যবহার করেন। তারপর ওই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আরও একাধিক লেখক জাতীয় অভিমানের পরিতৃপ্তিকর এই অভিধার স্মরণ নেন। মোহিতলাল তো তাঁর গ্রন্থের নামই দিয়েছেন—'কবি শ্রীমধুসূদন'।

যে সকল মান্য পূর্বাচার্যগণ মধুসূদনের মাইকেল উপাধি খারিজ করে তাঁকে শ্রীমণ্ডিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন তাঁদের ভাবখানা সম্ভবত এই যে, মধুসূদন বাহ্যত খৃীস্টধর্ম গ্রহণ করলেও মনে প্রাণে ছিলেন বাঙালী, তাঁর সমগ্র সাধনার মধ্য দিয়ে তাঁর যে মনের প্রকাশ ঘটেছে,—তা ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির সৌগন্ধে ভরপুর, সুতরাং তিনি আমাদেরই একজন, তাঁকে মাইকেলী চাপকান চড়িয়ে দূরে ঠেলে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। বাইরে ধড়াচূড়াটা তাঁর বিজাতীয় হতে পারে কিন্তু অন্তরে তিনি খাঁটি বাঙালী।

পূর্বসূরীদের এই ব্যাখ্যার সঙ্গে দ্বিমত হবার অবশ্য কোন কারণ নেই। বাস্তবিক, মধুসূদনের নাটকে কাব্যে ও চিঠি-পত্রাদিতে ও অন্যান্য লেখায় তাঁর যে মনের প্রতিফলন ঘটেছে তা ভারতীয়তায় ওতপ্রোত। এবং ঠিক এইটেই কারণ, যার জন্য মধুসূদনকে স্বধর্মত্যাগী জেনেও বাঙালী পাঠকের তাঁকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে এতটুকু আটকায় নি। প্রসঙ্গত বলি, তৎকালীন বাঙালী সমাজের এটি গভীর রসগ্রাহিতারই প্রমাণ। তাঁরা যে মধুসূদনের ধর্মকে আমল না দিয়ে তাঁর কাব্যকে আমল দিয়েছেন তাতেই বোঝা যায় বাঙালীর চিত্ত সাহিত্য রসোপভোগের ক্ষেত্রে অনুদারতামুক্ত—ধর্মীয় বা অন্যবিধ কোন সঙ্কীর্ণতা তাঁর গুণগ্রাহিতায় কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। বাঙালী চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য আছে বলেই নানা দুর্দৈব ও

ভাগ্য বিপর্যয় সত্বেও সে আজও সাহিত্য ক্ষেত্রে সজীব রয়েছে, নয়ত কী হতো বলা কঠিন।

কিন্তু সৃষ্টিকার্যের ভিতর স্বাজাতিকতা আবিষ্কার করা এক, আর যিনি স্রষ্টা তাঁকেও ওই নজীরে স্বাজাতিকতার গণ্ডীভুক্ত করা আর। মধুসূদনের ব্যক্তিজীবন এত সহজ বা সরল নয় যে তাঁকে এই রকম একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এই শ্রেণী বা ওই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে। আসলে মধুসূদনের ব্যক্তিজীবন ছিল নানাবিধ বৈসাদৃশ্যে ভরা। তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষ, কিন্তু তাঁর প্রতিভা কোন স্থির লক্ষ্যের অবিচলত্ব পায় নি। ফলে নানা পরস্পরবিরোধী আশা ও আকাঙ্ক্ষার আবর্তনে মিলিত হয়ে তাঁর জীবন কেন্দ্রচ্যুত হয়ে গেছে। এই কেন্দ্রাতিগতার জন্য তিনি তাঁর দেশবাসীকে যা দিয়ে যেতে পারতেন তার সামান্য অংশ মাত্রই দিয়ে যেতে পেরেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর সক্রিয় সৃষ্টিশীলতার কাল মাত্র ছয় বৎসর (১৮৫৯-৬৫)। এই অশেষ ফলপ্রসূ কালসীমার অন্তে তিনি পুনরায় তাঁর স্বভাবের বৈপরীত্যে প্রবেশ করেছেন। প্রবেশ করে নিজের প্রতি অবিচার করেছেন, দেশবাসীকেও বঞ্চিত করেছেন। মোমবাতির দুই দিকই তিনি পুড়িয়েছেন সমান ক্ষিপ্রতায় ও সমান অবলীলায়। ফলে ছয় বছরও যে তিনি একটানা সৃষ্টিকার্যে রত থাকতে পেরেছেন সেইটেকেই এক-এক সময় বিস্ময়কর বলে মনে হয়।

মানুষের মন, বিশেষত প্রতিভাধর শিল্পী মানুষের মন যে কত জটিল এবং আঁকাবাঁকা পথ-সঞ্চারী, তার এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন মধুসূদনের জীবন। 'দত্তকুলোদ্ভব কবি' মধুসূদন অন্তরের অন্তস্তলে ছিলেন খাঁটি বাঙালী, খাঁটি ভারতীয়, এ কথা প্রতিবাদের অপেক্ষা রাখে না—তাঁর নাটক ও কাব্যমধ্যে সে পরিচয় তিনি দুহাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মনুষ্যচরিত্রের মজ্জাগত অসংগতির পরিচয়টাও তিনি আবার কৌতূহলোদ্দীপকভাবে তুলে ধরেছেন সকলের সামনে তাঁর বহিরঙ্গ জীবন সাধনার মধ্য দিয়ে। যে-কবি কবিগুরু বাল্মীকির পদাম্বুজ বন্দনা করে কাব্যারম্ভ করেছেন, প্রাচীন ও মধ্যযুগের স্বদেশীয় কবিদের অনুকরণে শ্বেতভুজা ভারতীর পদছায়া প্রার্থনা করেছেন, তাঁর কাব্যকল্পনার শ্রেষ্ঠ স্ফূর্তির জন্য কথায় কথায় যাঁর রচনায় রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদি এবং বৈষ্ণব কাব্যকবিতার উপমা বিকীর্ণ, সেই কবির ব্যক্তিজীবনে সাহেব সাজবার জন্যে কী দুর্নিবার আকুলতাই না আমরা দেখতে পাই! অনেকেই এ বিষয়ে আজ একমত যে, মধুসূদন যে খ্রীস্ট-ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, সে কোন ধর্মীয় আকুতির প্রেরণায় নয়, আধ্যাত্মিক অভীপ্সাবশতও নয়, নিতান্ত স্থূল বৈষয়িকতার আকাঙ্ক্ষা তাঁর এই ধর্মান্তর অবলম্বনের মূলে ছিল। আরও খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে, বিলাতযাত্রার ছাড়পত্র সংগ্রহের উপায় হিসেবেই তাঁর ওই বিজাতীয়তার বর্ম ধারণ। ধর্ম নিয়ে এমন ছেলেখেলা করা গড়পড়তা সাধারণ মানুষের পক্ষে কখনই সম্ভব হতো না—কিন্তু প্রতিভাশালী মানুষের রীতিই

আলাদা। তাঁর জীবনের ছককে সাধারণ মানুষের মাপে মিলাতে গেলে পদে পদে বিড়ম্বিত হবার সম্ভাবনা।

আরও যেটা তাজ্জবের ব্যাপার তা হলো : যে-কবি *মেঘনাদবধকাব্য* (১৮৬১), *ব্রজাঙ্গনা* (১৮৬১) এবং *বীরাঙ্গনা কাব্য* (১৮৬২) লিখে বাঙালী পাঠকচিত্ত নিঃশেষে জয় করে নিয়ে খ্যাতির তুঙ্গশৃঙ্গে আরূঢ় হয়েছিলেন, সেই কবির কিনা হঠাৎ ব্যারিস্টার বনবার সাধ জাগল, এবং কবিখ্যাতি, দেশবাসীর অমিত ভালবাসা, মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ সব হেলায় পেছনে ফেলে রেখে তিনি সহসা ইউরোপের অভিমুখে পাড়ি জমালেন। জাতীয়তা আর বিজাতীয়তার এককালীন টানাপোড়েনের কী বিসদৃশ দৃষ্টান্ত! বোধ হয় মধুসূদনের মতো খাপছাড়া, আত্মখণ্ডনকারী, বৈপরীত্যময় প্রতিভার পক্ষেই এমনটা সম্ভব, নতুবা এ কথা কে ভাবতে পেরেছিল যে, যে-কবি কয়েক বছরের কাব্যসাধনাতেই শিল্পোৎকর্ষের প্রায় চূড়ান্ত বিন্দু স্পর্শ করেছিলেন, তিনি হঠাৎ নিতান্ত স্থূল এক বহির্মুখ উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাড়নায় কাব্যের সিদ্ধিকে জীর্ণ বস্ত্রের মতো অবহেলায় বর্জন করে অনিশ্চিত বৈষয়িক সিদ্ধির মায়ামরীচিকার পশ্চাদ্ধাবন করতে ছুটবেন? এ যদি ধ্রুবকে বর্জন করে অধ্রুবের পশ্চাদ্ধাবনের দৃষ্টান্ত না হয় তাকে আর কী নামে অভিহিত করা চলে জানিনে।

যদি বলেন, অলঙ্ঘনীয় জীবিকার প্রয়োজনে কাব্যসিদ্ধিকে গৌণ স্থান দিয়ে ব্যারিস্টারী মৃগয়াকে প্রধান অনুশীলনের বিষয় করা ছাড়া তাঁর পক্ষে ওই মুহূর্তে আর কোন গত্যন্তর ছিল না, তার উত্তরে বলব, এটাও উদ্দাম প্রতিভার স্ব-বিরোধিতারই এক জাজ্বল্যমান উদাহরণ। মধুসূদন স্বীয় সাধনার বলে অপরিসীম প্রতিভার অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু শক্তির অপচয় রোধ করে কেমন করে সেই প্রতিভাকে সর্বতোমুখী সার্থকতায় ভূষিত করা যায় তার কৌশল তাঁর জানা ছিল না। এক কথায় রবীন্দ্রনাথের ভাষা ব্যবহার করে বলি, শক্তির সঞ্চয় ছিল তাঁর অপরিমিত কিন্তু শক্তির 'গার্হস্থ্যপনা' তাঁর ছিল না। বিচক্ষণ বিবেচনা, পরিণাম ভেবে কাজ করা, অপরের দিকটা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া—এসব মধুসূদনের কোষ্ঠিতে লেখে নি।

তার অর্থ, মধুসূদন ছিলেন একান্তভাবেই আত্মনিবিষ্ট মানুষ, আরও স্পষ্ট করে বললে, আত্মকেন্দ্রিক। তাঁর মনোযোগের কেন্দ্রে ছিলেন তিনি নিজে। বিশ্ব-সংসারের অপর কোন মানুষের যায়গা সেখানে ছিল না। শিল্পীরা কম-বেশি প্রায় সকলেই আত্মকেন্দ্রিক হন, কিন্তু মধুসূদনের বেলায় এই আত্মমনস্কতা প্রায় একটা obsession বা আবেশে পরিণত হয়েছিল। তিনি আপনাকে বাদ দিয়ে কোন কিছু ভাবতে বা করতে জানতেন না। নীতিবাদী দৃষ্টিকোণের বিচারে হয়তো এই আত্যন্তিক আত্মনিবেশের অভ্যাস দূষ্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার না করে পারা যায় না যে, এই আত্মলীনতা বা আত্মমনস্কতা বা আত্ম-কেন্দ্রিকতা যাই বলুন—তাই ছিল মধুসূদনের শিল্পসৃষ্টির চরমোৎকর্ষের অবিসম্বাদী

উৎস। নিজ জীবনের আকাঙ্ক্ষা প্রবৃত্তি প্রেরণা বেদনা মোহ আর মোহভঙ্গের মনস্তাপ প্রভৃতি বিচিত্র মানসিকতার সম্মিলিত ফল হল তার কাব্য। মিল্টনের অনুকরণে লিখতে গিয়েছিলেন মহাকাব্য, তাঁরই কপালগুণে বা দোষে হয়ে দাঁড়ালো কিনা আত্মমুখী গীতিকবিতার চরিত্রলক্ষণে জরজর। মানুষটি ছিলেন প্রচণ্ড আবেগের এক আধার। তাঁর অহংমন্যতায়, তাঁর সীমাতিরিক্ত আত্মপ্রত্যয়ে, তাঁর দম্ভের আস্ফালনে যেমন এই আবেগের এক রূপ, অন্যদিকে তেমনি একই আবেগের অভিব্যক্তি দেখতে পাই তাঁর অসংকোচ অনুতাপে বা অনুশোচনায়, তাঁর নিজ মুখে নিজ ভুলের অকপট স্বীকৃতিতে, তাঁর করুণ বিলাপে। 'আত্মবিলাপ'-এর মতো প্রাণের সমস্ত আবেগ ঢেলে লেখা এমন অকপট হৃদয়োচ্ছ্বসিত অনুতাপ-গাথা বাংলা কাব্যে আর নেই। ওই রচনাই প্রমাণ, মধুসূদন অহংকারেও যেমন দুর্ধর্ষ ছিলেন, তেমনি দীনতার চেতনায় ধূলিতে আপনাকে মিশিয়ে দিতে পারার সরলতাতেও তাঁর জুড়ি কেউ ছিল না বাংলা কবিকুলের মধ্যে। তাঁর আবেগাতিরেক পদে পদে তাঁকে আচরণের বিপরীত প্রান্তে নিয়ে ফেলেছে: হয় তিনি অপরিসীম দম্ভী, নয় তিনি তৃণাদপি সুনীচ—ভাবের বা ব্যবহারের মধ্যপথে বিচরণের অভ্যাস তাঁর ছিল না।

দম্ভের কথাই যদি উঠল, গৌরদাস বসাক, রাজনারায়ণ বসু, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী প্রমুখ বন্ধুদের উদ্দেশে লেখা ইংরেজী চিঠিগুলিই এ কথার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। সব পত্রেরই কেন্দ্রমধ্যে বিরাজিত তিনি স্বয়ং। যাঁদের উদ্দেশ্য করে পত্র লেখা হচ্ছে তাঁরা নিমিত্তমাত্র। 'বাংলাকাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করে আমি বাংলা কবিতার মোড় ঘুরিয়ে দেব,' 'এমন নাটক লিখব যা এর আগে কেউ লেখে নি,' 'বীরগাথা অনেক লিখেছি, এবার গীতিকবিতার কারুণ্যের দিকে ঝুঁকব,' 'বাংলা ভাষার গভীরে যতই প্রবেশ করছি ততই তার নতুন নতুন রহস্য আমার কাছে উন্মোচিত হচ্ছে,' 'একটা নতুন আইডিয়া মাথায় এসেছে, এ সম্বন্ধে বন্ধু, তোমার কী মত?' ইত্যাদি বাক্যবন্ধযুক্ত ও অনুরূপভাবের চিঠিগুলির মধ্যমণি পত্রলেখক নিজে। এই চিঠিগুলি থেকে একটা জিনিসের প্রমাণ হয়। তা হোল এই যে, মধুসূদনের প্রগাঢ় বন্ধুবাৎসল্য ছিল, কিন্তু সেই বন্ধুবৎসলতা একই সঙ্গে তাঁর অহংকে তৃপ্ত করবার একটা মস্তবড় ক্ষেত্র ছিল। বন্ধুদের উপর নির্ভরতা ছিল একাধিক কারণে। ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে তাঁর ভিতর যে একাকীত্বের বোধ জেগেছিল সেই একাকীত্বের পীড়ন দূর করবার জন্য যেমন তিনি এককালীন স্বসমাজভুক্ত বন্ধুদের সঙ্গলাভে ব্যগ্র ছিলেন, তেমনি সেই সঙ্গ একইকালে তাঁর আত্মাভিমানকে পুষ্ট করে তোলবার একটা চমৎকার উপলক্ষ্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। অর্থাৎ মধুসূদনের বেলায় প্রতিটি বন্ধুত্ব ছিল ইংরেজী বাক্যরীতি অনুসরণ করে বলতে পারি তাঁর ego-কে ঝুলিয়ে রাখবার এক একটি পেরেক বিশেষ। বন্ধুত্বের

ত্যাগিদে বন্ধুত্ব নয়, বন্ধুত্বের দর্পণে নিজেকে আরও বিশেষভাবে অনুভব করবার জন্যই তাঁর ওই বন্ধুনির্ভরতা।

আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়, এই পত্র লেখালেখির ব্যাপারটা প্রায় সবটাই ছিল একতরফা। এই পত্রজগতে ভূমিকা মাত্র এক জনারই, আর সকলে নীরব দর্শক মাত্র। বন্ধুদের মধ্যে ধরা যাক্‌ রাজনারায়ণ বসু যদি পত্রোত্তরে তাঁর নিজের রচনা পরিকল্পনা মধুসূদনের কাছে উন্মুক্ত করতে এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলতেন যে, তিনি আপাতত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আদেশে উপনিষদের ইংরেজী তর্জমায় নিরত আছেন এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সেই অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, মধুসূদন যেন একবারটি সেগুলির উপর চোখ বুলিয়ে তর্জমার গুণাগুণ সম্পর্কে মতামত জানান ; —তা হলে নিশ্চিত বলতে পারি মধুসূদন সেই অনুরোধ রক্ষা করে রাজনারায়ণকে বাধিত করতে সামান্যই আগ্রহান্বিত হতেন—এই প্রস্তাব ঝটিতি ভুলে যাওয়াই ছিল মধুসূদনের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। যিনি নিজে সকলের মনোযোগের কেন্দ্র, তাঁর কি অপরের প্রতি মনোযোগী হওয়ার অবসর আছে বা উৎসাহ আছে ? ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতায়ও অনুরূপ উদাহরণের সন্ধান পাওয়া যায়।

তবে মধুসূদনের স্বপক্ষে এই বলা যায় যে, তাঁর ভূমিকাটি একপাক্ষিক হলেও তার ভিত্তি ছিল সুদৃঢ়। তা প্রতিভার বর্মের দ্বারা ছিল সুরক্ষিত। তিনি নিজের সম্পর্কে যে অপরিমেয় আত্মপ্রত্যয় পোষণ করতেন, সেই আত্মপ্রত্যয়ের যৌক্তিকতা তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তাঁর সৃষ্টিসমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে বহুলাংশে। ('বহুলাংশে' কথাটির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়)। সর্বাংশে নয় এই জন্য যে, তাঁর প্রতিভার ভিতর গোড়া থেকেই যে আত্মখণ্ডনের সর্বনাশা বীজ লুক্কায়িত ছিল তা তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের প্রতিবন্ধকতা করেছে পদে পদে। শেষের দিকে তো আরও বেশী পরিমাণে। মৃত্যুর পূর্ববর্তী কয়েক বৎসরের কবিজীবন কবির প্রথম বয়সের অপার প্রতিশ্রুতি তথা অনন্ত উজ্জ্বল সম্ভাবনার ম্লান ছায়া বহন করেছে মাত্র। এ একটা সমুচ্চ কীর্তির ভগ্নদশার প্রায়ান্ধকার গোধূলি কাল। মাইকেলী আত্মঘোষণ বাহবাস্ফোটমাত্র ছিল না, তার মূলে ছিল যুক্তির জোর, কৃতিত্ব-গৌরবের জোর, সাফল্যের জোর, এক কথায় সত্যের জোর। মাইকেল মধুসূদন দত্তের অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠত্বকে বন্ধুরা অবলীলায় মেনে নিয়েছিলেন বলতে পারা যায়।

এইবার মাইকেলের প্রতিভার স্বরূপলক্ষণ নির্ণয়ের একটা চেষ্টা করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে যে-পরিবেশের ভিতর ওই প্রতিভার অভ্যুদয় হয়েছিল তারও একটা পরিমাপ করা চলে।

দশ বছর বয়সে বালক মধুসূদন সাগরদাঁড়ি গ্রাম ছেড়ে পাঠ্যাভ্যাসের উদ্দেশ্যে

কলকাতায় আসেন। সেটা ১৮৩৪ সাল। ধনী পিতার অপরিমিত প্রশ্রয়ে জীবন-যাত্রায় বাহুল্যের চর্চা, আর মায়ের পুণ্য-প্রভাবে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদির অনুশীলন—এই দুইয়ে মিলে বালকের মনে মিশ্র মানসিকতার সঞ্চার করেছিল জীবন বিকাশের একেবারে সেই প্রারম্ভিক পর্বেই। একদিকে তিনি হয়ে উঠে ছিলেন স্বেচ্ছাচারী বিলাসী, অন্যদিকে দেশজ সংস্কৃতির ছায়াস্নিগ্ধ পথ বেয়ে মাঝে মধ্যে জাতীয় সত্তার গহনে দৃষ্টিক্ষেপকারী এক ভাবুক কিশোর। এই বিপরীত দ্বৈত-ব্যক্তিত্বের সংস্কার আজীবন তাঁকে বহন করতে হয়েছে এক অনতিক্রম্য নিয়তির মত।

যাই হোক, হিন্দু কলেজে যখন তিনি প্রবেশ করলেন তখন কলেজের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ডিরোজীয়দের যুগ অস্তমিত প্রায়, তার যায়গায় দেখা দিয়েছে সাহিত্যের অধ্যাপক ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের নেতৃত্বে এক নূতন পাঠার্থীর দল। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন রাজনৈতিক মনোভাবের দিক দিয়ে ছিলেন টোরী দলের অনুগামী, তবে তাঁর কাব্যানুরাগ ছিল খাঁটি, আর সেই কাব্যানুরাগ তিনি তাঁর ছাত্রদের মনে গভীরভাবে প্রোথিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মধুসূদন ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনেরই ছাত্র। রিচার্ডসনের সুন্দর শিক্ষাগুণে ছাত্রদের মনে গভীর কাব্যপ্রীতি সঞ্চারিত হয়েছিল সহজেই, আর এই কাব্যানুরাগের সূত্র ধরে প্রথমে হিন্দু কলেজে, পরে বিশপ্‌স্‌ কলেজে পাঠাভ্যাসকালে মধুসূদন একাধিক ধ্রুপদী ইউরোপীয় ভাষার অধিকার অর্জন করেন এবং সেই সব ভাষার মুকুরে তত্তৎ ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিদের সন্দর্শন করেন। এই ভাবেই একে একে তাঁর অধিগত হয় হোমার ভার্জিল ট্যাসো দান্তে শেক্‌সপীয়র মিল্টন বাইরন কীটস প্রমুখ নূতন-পুরাতন পাশ্চাত্ত্য কবিকুলের রচনাবলীর পরিচয়। পরে ফরাসীদেশে বসবাসকালে রেনেসাঁস যুগের ইতালীয় কবি ও কথাসাহিত্যিক বোক্কাচ্চিও ও পেত্রার্কের রচনার সঙ্গে ঘটে নিবিড়তর সান্নিধ্য। এ ছাড়া সংস্কৃত কাব্যের জ্ঞান তো ছিলই। এইভাবে কাব্যসাহিত্যের সপ্তসিন্ধু মন্থন করে মধুসূদন যৌবনকাল অতিক্রান্ত হতে না হতেই হয়ে উঠেছিলেন এক বিচিত্র কাব্যরসের অভিসারী—নিপুণ বিশ্বনাবিক। নানা কারণে বাংলা ভাষার জ্ঞানটা গোড়ায় কিছু কাঁচা ছিল, তবে অন্তলীন সংস্কারের মত ওটা প্রতি বাঙালী-মনেই থাকে সুপ্ত, উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শ ও সংঘাতে এলে জ্বলে ওঠে সহসা। বিশেষত প্রতিভাবানের বেলায় এ কথাতো আরও বেশী করে খাটে। মধুসূদন যখন থেকে সংকল্প করলেন, বিদেশী ভাষায় কাব্যচর্চা আর নয়, এখন থেকে নিরবচ্ছিন্ন মাতৃভাষাই হবে তাঁর প্রকাশের মাধ্যম, সেইদিন থেকে কর্ণের কবচ-কুণ্ডলের মত মাতৃভাষায় তিনি সহজ দীক্ষা পেয়ে গেলেন; বাইরের জীবনে যত সাহেবিয়ানা আর উচ্ছৃংখলতাই তিনি করুন না কেন, মায়ের ক্রোড়ে যে ভাষায় মুখের বোল ফুটেছিল অতি শৈশবে, সে ভাষায় নতুন করে অধিকার অর্জনে প্রতিভাবানের আর কতটা সময় লাগে?

এই গেল প্রস্তুতির একটা দিক। সেটাই অবশ্য মুখ্য দিক এবং মধুসূদনকে কবিরূপে প্রতিষ্ঠাদানের মূলে। অন্য দিকটা মধু-জীবনের নিতান্ত বহিরঙ্গের দিক —এই দিকটিতে আছে প্রদর্শনবাদী মনোভাব, বাবুয়ানির মোহ, উৎকট উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাড়না, সাহেবকুলে সাহেবদেরই একজন হওয়ার বাসনা, অপরিসীম দম্ভ, আত্ম-কেন্দ্রিকতা ইত্যাদি। সংসারে প্রত্যেকেই দোষেগুণে মানুষ, দোষগুণটাকে সামাজিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোনরকমে মানিয়ে নিয়ে মানুষ মোটামুটি ভারসাম্য নিয়ে জীবনপথে অগ্রসর হয়—মধুসূদনের বেলায়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু প্রতিভাই এক্ষেত্রে বাদ সেধেছিল—কবির পূর্বোক্ত বহিরঙ্গ দোষগুলি কবির গুণাত্মক বৈশিষ্ট্যগুলিকে কাচিয়ে দেবার উপক্রম করেছিল, আর সত্যি সত্যি কাচিয়ে দিয়েও ছিল। আমি প্রবন্ধের গোড়ায় এক যায়গায় বলেছি, কিভাবে মধুসূদন কবিখ্যাতির শিখরদেশে অধিরূঢ় হবার পর কাব্যকে জীবনের পরিকল্পনা থেকে নস্যাৎ করে ব্যারিস্টার হবার খেয়ালে মেতেছিলেন। ব্যারিস্টার তিনি হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু ব্রীফলেস ব্যারিস্টার।* এদিকে বাণী বীণাপানির প্রসাদ প্রায় চিরতরে হারিয়ে-ছিলেন। কবির সর্বশেষ সার্থক রচনা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৫), ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে বসে লেখা সনেটগুচ্ছ। সেই তাঁর সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। তারপর যা লিখেছেন—যেমন, 'হেক্টর বধ,' 'মায়াকানন' ইত্যাদি—সৃষ্টিকর্ম হিসেবে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। অর্থাৎ মধুসূদনের একুল-ওকুল দুকূলই গিয়েছিল। এমনটা হতে পারতো না যদি বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ দিকের মধ্যে অন্তত একটা কাজ-চলা গোছের সামঞ্জস্য তিনি সাধন করতে পারতেন জীবনে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। কবির আত্যন্তিক একঝোঁকা প্রবৃত্তির ফলে তাঁর শিল্পী-জীবনের ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

চূড়ান্ত মনোবৃত্তির লোকদের ক্ষেত্রে এই রকমটাই বুঝি হয়। যখন যে নেশায় মশগুল হন তার হদ্দ করে ছাড়েন। তারপরই দেখা দেয় প্রতিক্রিয়া, খোঁয়াড়ি ভাঙার অবসাদ, এবং সেই প্রতিক্রিয়ার টানে একেবারে বিপরীত প্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হন। মধুসূদন যে ক'বছর নাট্য ও কাব্য রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন তাতে বুঁদ হয়ে ছিলেন, মনে হয়েছিল জীবনভোর চলবে তাঁর এই সাধনা, এর থেকে বিচ্যুত হওয়ার আর তাঁর কোন উপায়ই নেই। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল তাঁর ঝোঁকের বদল হয়েছে, আর ঝোঁকের বদল হতে কবি-জীবনের সৃষ্টি সমারোহের প্রাকারটিও যেন এক লহমায় ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। অনেকখানি বাষ্প একসঙ্গে বেরিয়ে গেলে

* মধুসূদনের জীবনীতে দেখা যায়, তিনি ব্রীফলেস ব্যারিস্টার ছিলেন না। ব্যারিস্টার হিসেবে তাঁর আয় সে যুগে ভদ্রভাবে বাঁচবার পক্ষে ছিল যথেষ্ট। কিন্তু অমিতব্যয়িতার জন্য ঋণগ্রস্ত হয়ে তিনি চরম কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন।—সম্পাদক।

বেলুনের যেমন চুপসানো দুমড়ানো দশা হয় এও অনেকটা সেইরকম। ১৮৬৫ থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত কবিজীবনের এই শেষ কয় বছর পূর্বের সার্থকতার বছরগুলির ভগ্নাস্থি মাত্র।

সমালোচকদের মধ্যে একাধিকজন মধুসূদনকে ডিরোজীয়দের উত্তরসূরী রূপে কল্পনা করে আনন্দ পান। এ কথা মনে করার কি কোন সঙ্গত কারণ আছে? খতিয়ে দেখতে গেলে, ডিরোজিয়দের সঙ্গে মধুসূদনের মিলের চেয়ে অমিলের পরিমাণই বেশী। মিল রয়েছে কিছুটা বাইরের জীবন যাত্রার ধরনে—যথা, সমাজের নিয়ম ভাঙার উৎসাহে, পানাসক্তিতে ইত্যাদি।—ভিতরের মিল সামান্যই। ডিরোজীয়রা ছিলেন কম বা বেশী মাত্রায় সকলেই যুক্তিবাদী—লক আর হিউম প্রমুখ ইংরেজ দার্শনিকদের চিন্তাপ্রভাবে অজ্ঞেয়বাদী ভাবুক, দেশপ্রেমিক, সমাজহিতকামী, নানা প্রশ্নে আন্দোলনকারী ও publicist, তার্কিক। আর মধুসূদন একান্তভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক এক প্রতিভা, আপনাতে আপনি আচ্ছন্ন, রোমান্টিক মনোভাবযুক্ত, কবিস্বপ্নে বিভোর, সচরাচর যুক্তিবাদের বিপরীত সরণীতে চলতে অভ্যস্ত, আনুষ্ঠানিক ধর্মে অবিশ্বাসী এক খ্রীশ্চিয়ান, সমাজ আন্দোলনে অনুৎসাহী, সমাজসেবা জাতীয় কাজে বিমুখ। এই নার্সিসাসধর্মী প্রতিভাকে কি তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব প্রমুখ সমাজহিতকারী মানুষদের সমসারে ফেলবার জো আছে? লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এঁদের কেউই কবি নন, আর মধুসূদন মূলত কবি। বস্তুত কবিত্বই মধুসূদনের গোত্রলক্ষণ, আর শ্রেষ্ঠত্বের অসংশয় নিশানা। স্রষ্টা হিসেবে মধুসূদনের সঙ্গে এঁদের কোন তুলনাই হয় না, পক্ষান্তরে কর্মদক্ষতায় মধুসূদন আদৌ এঁদের সমকক্ষ নন। মধুসূদনের অধ্যয়ন মুখ্যত কাব্যকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছিল, আর এঁদের কৌতূহল ছিল বহুমুখী, জিজ্ঞাসা ছিল নানা বিষয়ে ব্যাপ্ত। মধুসূদনের সঙ্গে এঁদের সব চেয়ে বড় যে তফাৎ তা হলো,—এঁরা সকলেই কর্মিপুরুষ—activist, মধুসূদন কর্মবিমুখ, দিবাস্বপ্নচারী, আপনার প্রেমে আপনি মত্ত। তাঁর একমাত্র কর্মিষ্ঠতার পরিচয় কাব্য রচনায়, অন্যবিধ কাজে প্রবল অনীহা। এই দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সাযুজ্য স্থাপিত হতে পারে এমন কোন সাদৃশ্য-লক্ষণই খুঁজে পাওয়া যায় না। হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও আর ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুর শিক্ষক—দুইয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে 'সামান্য' চিহ্ন আবিষ্কারের চেষ্টা দুরাশা মাত্র।

মধুসূদনের সম্পর্কে আর একটি কিংবদন্তী হল এই যে, তিনি ইউরোপীয় রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ আয়ুধে সজ্জিত হয়ে বাংলা কাব্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং

অভিনব সৃষ্টির সাহায্যে তৃষিতচিত্ত বাঙালী-পাঠকের জগৎ নিঃশেষে জয় করেছিলেন।
বাঙালী পাঠক সমাজকে যে তিনি জয় করিয়াছিলেন তাতে আর সন্দেহ কী! তবে
সেটা রেনেসাঁসের ভূমিতে করেছিলেন কিনা তা একটা প্রশ্ন হয়েই রইলো। আমার ধারণা
মধুসূদন এমনই এক দুর্দমনীয় আত্মকেন্দ্রিক উচ্ছৃংখল প্রতিভা যে, তাঁর এই
আত্যন্তিক সৃষ্টিশীল ব্যক্তিসাক্ষিকতাকে রেনেসাঁসই হোক, কি অন্য কোন বর্গের
সামাজিক ঘটনাই হোক, কোন category-রই অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। মধুসূদনের
তুলনা মধুসূদন স্বয়ং; যদি মিল খুঁজতে হয় তো সেই মিল খুঁজতে হবে কার্য-
প্রকরণে মিলটনের সঙ্গে, আর জীবন চর্যায় বাইরনের সঙ্গে। তবে সেটাও বহিরঙ্গের
মিল, আর সে মিল ব্যক্তি-উদাহরণে সীমিত, কোন ভাবের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত
নয়। এই বাইরের মিল থেকে সুনিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

অথচ দেখা যায় ডক্টর শীতাংশু মৈত্র পাশ্চাত্ত্য রেনেসাঁসের গোত্র-লক্ষণের সঙ্গে মধুসূদনের আত্মার আত্মীয়তা প্রমাণ করে একখানা গোটা বইই লিখে ফেলেছেন—'যুগন্ধর মধুসূদন'। শুধু তাই নয়, তিনি মার্কসীয় চিন্তা দর্শনের আলোকে মাইকেলের ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। মাইকেলের চরিত্রে যে সব অসঙ্গতি আর পরস্পর-বিরোধিতা আছে, কোথায় তিনি মার্কসীয় চিন্তার মাপকাঠিতে সেগুলির সমালোচনা করবেন তা নয়, উল্টে, সেগুলির সমর্থনেই যেন তিনি মার্কসীয় সূত্র সমূহের প্রয়োগ করেছেন, তাঁর প্রতিপাদ্য থেকে এরূপ মনে হওয়াই স্বাভাবিক, মার্কসীয় দর্শনকে বিচার-ক্রিয়ার প্রস্থানভূমি রূপে গ্রহণ করা ভাল, কিন্তু অবৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের সমর্থনে মার্কসীয় বিজ্ঞানের প্রয়োগ হওয়া উচিত নয়—এইটেই আমার বিনীত নিবেদন। মধুসূদন-চরিত্রের উৎকেন্দ্রিকতা, স্বেচ্ছাচার, আত্মপ্রীতি, ক্ষয় ও অপচয়ের মোহ, লক্ষ্যভ্রষ্টতা, কাঞ্চন ও কাচকে তুল্যমূল্য জ্ঞানের সর্বনাশা প্রবৃত্তি—এ সবের যথাযথ সমালোচনা হলে তবেই মধু-ব্যক্তিত্বের সাফল্য ও ব্যর্থতার সঠিক চাবিকাঠির হদিশ পাওয়া যেতে পারে। তা না করে তার বদলে যদি "মধুসূদনের ব্যক্তি জীবনের স্বপ্নভঙ্গ আর হতাশার কাব্যরূপই হলো মেঘনাদবধ কাব্য"—এই রকমের আপ্তবাক্য উদ্‌ঘোষণের চেষ্টা দেখা যায়, যেমন 'যুগন্ধর মধুসূদন' গ্রন্থে দেখা গেছে, তবে সেটাকে বোধ হয় গাজুরী অভিমত ছাড়া আর কিছুই বলবার উপায় থাকে না। ডঃ মৈত্রের ভিতর মধুসূদনের প্রতিটি কাজকে সমর্থন করবার এমনই এক বিচার-অসহ প্রবৃত্তি চোখে পড়ে যে, তিনি মধুসূদনের কোনরূপ সমালোচনা সহ্য করতে নারাজ। যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁর প্রসিদ্ধ জীবনীতে মধুসূদনের অমিতাচার, ব্যয়বহুলতা আর অপরিণামদর্শিতার বিরুদ্ধে ধিক্কারবাণী উচ্চারণ করেছেন বলে যোগীন্দ্রনাথের প্রতি শীতাংশুবাবুর কতই না গোঁসা! তিনি যোগীন্দ্র-দৃষ্টিভঙ্গীকে নীতিবাদী বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু নীতিবাদকে কটাক্ষ করলেই মন্দ ভালতে রূপান্তরিত হয়ে যায় না। মাইকেলের শিল্পী-ব্যক্তিত্বকে বুঝতে হলে তাকে তার ভাল মন্দ নিয়েই বোঝবার চেষ্টা করতে হবে—ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন

বিচ্ছুরণকে যুগধর্মের বিচ্ছুরণ জ্ঞান করে আত্মকেন্দ্রিক প্রতিভাকে সামাজিক প্রতিভার সম্মান দিতে চাইলে, সে চাওয়া গ্রাহ্য না হবারই সম্ভাবনা।

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের দুটি মৌলিক লক্ষণ—সৃষ্টির বিস্ফার ও বুদ্ধির মুক্তি। এই দুইয়ের ভিতর প্রথমটি মধুসূদনের শিল্পকর্মে প্রমূর্ত হয়েছে যদিও স্বল্পকালের জন্য মাত্র; দ্বিতীয় লক্ষণটি মধুসূদনে একেবারেই অনুপস্থিত। মধুসূদনের ভাবনা-চিন্তা অনুভব ও কল্পনা সবই কাব্যসাহিত্যকে কেন্দ্র করে আলোড়িত হয়েছে, মনন বা মনস্বিতাকে কেন্দ্র করে নয়। ফলে বুদ্ধির মুক্তি কথাটি সচরাচর আমরা যে অর্থে প্রয়োগ করি সেই অর্থে তা মধুজীবনে সার্থক হতে পারে নি। মাইকেল দার্শনিকতার জগৎ থেকে বহু দূরে ছিলেন। বস্তুত তাঁর মনের ধাত মোটেই দার্শনিকতার অনুকূল ছিল না। তিনি একান্তভাবে ছিলেন কাব্যঅন্তপ্রাণ 'স্বপ্নিল মানুষ'—ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ অভাব-অভিযোগ বাসনা ও বাসনার ব্যর্থতার আবর্তনে সতত-আবর্তিত এক আত্মনিবিষ্ট ভোগবাদী কবি। ক্ষুদ্র অর্থে হয়ত তিনি স্বার্থপর ছিলেন না, কিন্তু মহৎ অর্থে স্বার্থপর ছিলেন এ কথা বলতেই হবে। বিদ্যাসাগর বলুন, বন্ধুগোষ্ঠী বলুন, সকলেই ছিলেন তাঁর এই মহৎ স্বার্থ সংসাধনের যন্ত্রমাত্র, স্বার্থের প্রয়োজন ফুরুলে তাঁদের প্রয়োজনও শেষ। এমন মানুষের কাছে সামাজিক ভূমিকার মূল্য খুব বেশী নয়। মধুসূদনের যে প্রতিভা, তা 'ভাবয়িত্রী' প্রতিভা, 'কারয়িত্রী' প্রতিভা নয়। ভাবয়িত্রী প্রতিভা সৃষ্টিশীলতাকে অবলম্বন করে স্ফূর্তি লাভ করে, মধুসূদনেরও করেছিল; কিন্তু সেখানেও কথা আছে। কাব্য জগতের বাইরে তাঁর সৃষ্টির উদ্যম কখনও সম্প্রসারিত হয় নি, তাঁর কৌতুহলের পরিধি ছিল শোচনীয়ভাবে সীমাবদ্ধ।

তার উপর তৎকালীন মূল্যবোধ-অনুযায়ী বনেদিয়ানার ধ্যান-ধারণার দ্বারা তিনি ছিলেন সঞ্চালিত—গণতান্ত্রিক অভীপ্সা তাঁর কল্পনাকে সবেগে নাড়া দিয়েছে এমন প্রমাণ বেশী নেই তাঁর রচনায়। তাঁর কাব্যে বীরত্বের ব্যঞ্জনা আছে, ওজোগুণ আছে, দেশপ্রেমের প্রবল অভিব্যক্তি আছে, (যেমন মেঘনাদবধ কাব্যে), প্রেমিক হৃদয়ের বিরহের তপ্তশ্বাস আছে (যেমন ব্রজাঙ্গনা কাব্যে); নিজেই তিনি যে শ্রেণীতে পড়েন সেই শিক্ষিত ইঙ্গবঙ্গীয় সম্প্রদায়ের ভ্রষ্টাচারের উপর নির্মম ব্যঙ্গ আছে (যেমন, একেই কি বলে সভ্যতা? প্রহসনে), কিন্তু গণতান্ত্রিক চেতনার অভিব্যক্তি বিশেষ নেই। ব্যতিক্রম শুধু 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটি। এখানে তিনি নিপীড়িত কৃষক হানিফ গাজীর চরিত্র সৃষ্টি করে বাংলা নাটকে গণতান্ত্রিকতার নান্দী গেয়েছেন। কিন্তু সেখানেই আরম্ভ সেখানেই শেষ। কৃত্রিম আভিজাত্য আর উচ্চবিত্তের তৎকালীন সমাজে এর চেয়ে স্পষ্টতর গণতান্ত্রিক অভিব্যক্তি বোধ হয় সম্ভব ছিল না। অন্তত মধুসূদনে যে সম্ভব ছিল না, তা মধুসূদনের শিল্পীচরিত্র বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়বে। বাইরনীয় বোহমীয় আদর্শের অনুগামী ভোগসুখ-

পরায়ণ অমিতাচারী আত্মকেন্দ্রিক কবির রোমাণ্টিক কল্পনাচারিতার সংগে গণতান্ত্রিক আদর্শ ঠিক মিশ খায় না—তেলের সংগে জলের প্রাবচনিক অসম্ভাবের মতই বোধ করি ওই দুটি বস্তুর ভেদ।

দুই

এ কথা সর্বসাধারণের পরিজ্ঞাত যে, মধুসূদনের সাংসারিক জীবন ব্যর্থ হয়েছিল। নানা দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। তাঁর কাব্যজীবন স্বল্প-স্থায়ী কিন্তু প্রতিভার উজ্জ্বল বিভায় দীপ্ত। সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি যেন আকস্মিক প্রেরণার তাড়নায় উল্কার ঔজ্জ্বল্য নিয়ে সহসা প্রবেশ করেছিলেন এবং উল্কার মতই কিছুক্ষণ চোখ-ধাঁধানো আলো ছড়িয়ে তার পরেই ফুৎকারে নিভে গিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। কাব্যগগনে যা সাময়িক প্রখর আলোক-বিচ্ছুরণরূপে প্রকাশ পেয়েছিল, তা-ই সাংসারিক ক্ষেত্রে দগ্ধাবশেষ অংগারে পরিণত হয়ে প্রচণ্ড দুঃখ-কষ্টের সৃষ্টি করেছিল। মধুসূদনের কাব্যজীবন যে পরিমাণে সার্থক ঠিক সেই পরিমাণে তাঁর ব্যক্তিজীবন ব্যর্থ। ব্যক্তিজীবন বলতে তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কেন্দ্রিক পারিবারিক জীবনকেও বোঝাচ্ছে। এই ব্যর্থতার কারণ মধুসূদনের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। তাঁর সাংসারিক বুদ্ধি ছিল অকিঞ্চিৎকর। স্বপ্নের জগতে বিচরণই ছিল তাঁর সহজাত প্রবণতা। প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাড়নায় তিনি অনেক সময় অলীক আকাশ-কুসুম রচনাতেও সময় ব্যয় করতেন। অকৃত্রিম বন্ধু গৌরদাস বসাককে লেখা একাধিক চিঠিতে তিনি এই দিবা-স্বপ্নবিলাসের পরিচয় দিয়েছেন। সাংসারিক সেয়ানা বুদ্ধির আনুগত্য করবার জন্য মধুসূদনের জন্ম হয় নি। এটি তাঁর জীবন মহিমারই দ্যোতক। তিনি সতত কাব্যকাননে বীণাবাদনে নিরত থাকতে পারলেই তৃপ্ত। তাঁর এই মনোভাবটি 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র 'সাংসারিক জ্ঞান' নামক সনেটে চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে—

> "কি কাজ বাজায়ে বীণা ; কি কাজ জাগায়ে
> সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে ?
> কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের গগনে
> মেঘ-রূপে, মনোরূপ ময়ূরে নাচায়ে ?...
>
> *　　　*　　　*
>
> কহে সাংসারিক জ্ঞান—ভবে বৃহস্পতি।
> কিন্তু চিত্তক্ষেত্রে যবে এ বীজ অংকুরে,
> উপাড়ে ইহায় হেন কাহার শকতি ?
> উদাসীন দশা তার সদা জীব-পুরে,
> যে অভাগা রাঙা পদে ভজে, মা ভারতি।"

সুতরাং বলতে পারা যায়, এক প্রকার স্বেচ্ছাক্রমেই, অন্তর্তাগিদের অনিবার্য টানেই তিনি সংসার-সুখ থেকে নিজেকে বিচ্যুত করে একান্ত অনিশ্চিত ঘাতসংঘাতময় বিড়ম্বনার মধ্যে আপনাকে নিক্ষেপ করেছিলেন। তাঁর কাব্য যেমন নাটকীয়তার উপাদানে ভরা তেমনি তাঁর জীবনও নাট্যভাবে সমৃদ্ধ। বস্তুত তাঁর গোটা জীবনটাই একটা মহানাটক। গভীর অহং-চেতনা এই নাটকের মূল ভাব, আর আজন্ম-বিদ্রোহী মনোভঙ্গী ও অমিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার দুই স্থায়ী বিভাব। মধুসূদনের অহং-চেতনার সঙ্গে আভিজাত্যচেতনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। যা-কিছু সাধারণ মামুলী গতানুগতিক, তার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণার অন্ত ছিল না। ধর্মীয় প্রেরণার আন্তরিকতার বশে তিনি খ্রীস্টধর্ম অবলম্বন করেছিলেন এমন নয়, তিনি খ্রীস্টান হয়েছিলেন স্বজাতির ধর্মবিশ্বাসের প্রতি তাঁর বিমুখতা ও বৈরিতা প্রদর্শনের জন্য। রামচন্দ্র আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের তিনি পছন্দ করেন না ("I hate Rama and his rabble"), তাই বিপরীত জীবনাদর্শের প্রতীক রাবণ ও ইন্দ্রজিতকে বড় করে দেখানোর তাঁর প্রয়োজন ছিল। রাবণের রাজকীয় মহিমা ও আড়ম্বর এবং ইন্দ্রজিতের শৌর্য তাঁর কল্পনাকে বিশেষরূপে উদ্দীপিত করেছে। সেই তুলনায় রাম-লক্ষ্মণ বহু মহৎ মানবিক গুণাবলীর অধিকারী হলেও তাঁর চোখে নিষ্প্রভ ঠেকেছে। মধুসূদন স্বীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি গভীর প্রত্যয়ের বশে—সে প্রত্যয়ের সঙ্গে, বলা নিষ্প্রয়োজন, আত্মাদর অনেকখানি মেশানো ছিল—আজীবন বিদ্রোহী মনোভঙ্গীর দ্বারা চালিত হয়েছেন। ঐ বিদ্রোহী মনোভঙ্গীরই মূল্যবান ফসল হল—বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন, বাংলায় প্রথম বিয়োগান্ত নাটক ('কৃষ্ণকুমারী নাটক') ও প্রথম প্রহসন সৃষ্টি ('একেই বলে সভ্যতা ?' ও 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ), এবং সনেট নির্মাণ (চতুর্দশপদী কবিতাবলী)। মধুসূদনের কাব্য-বৈশিষ্ট্য ছেড়ে দিলেও একমাত্র এই চতুর্বিধ অভিনবত্ব প্রয়াসের জন্যই তাঁর নাম বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকা উচিত। এ সবই অন্তর্সঞ্চিত বিদ্রোহী ব্যক্তিত্বের বহ্নিস্ফুলিঙ্গের বহিঃপ্রকাশ, নিছক অভিনবত্বের জন্য অভিনবত্বের অবতারণা নয়। তিনি যে সংস্কৃত কবিদের আদর্শ অনুসরণ না করে হোমার-ভার্জিল-ট্যাসো ও মিল্টনের আদর্শে তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন তার মূলে শুধুই পাশ্চাত্ত্য ক্ল্যাসিক্যাল কাব্যপ্রীতি ছিল না, ছিল গতানুগতিকের প্রতি গভীর বিরাগ। সকলে যে পথ অনুসরণ করে সে পথ মধুসূদনের জন্য নয়—এ-ই ছিল তাঁর মনোভঙ্গী।

এই মনোভাব অবশ্য নীতিগতভাবে সমর্থনীয় নয়, কিন্তু মধুসূদন যা নিজের সম্বন্ধে ভাবতেন তা অনেকাংশে কার্যতও সত্য ছিল। কাব্যের জ্ঞান ও বৈদগ্ধ্যের বিচারে তৎকালে তাঁর তুল্য বিদ্বান ব্যক্তি বাংলা দেশে আর কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। ব্যক্তিস্বভাবেও কোন নীচতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না। তিনি তা জানতেন এবং তা প্রকাশেও তাঁর কুণ্ঠা ছিল না। বৈষ্ণব বিনয় তাঁর ধাতে ছিল না।

তাঁর মন একান্তভাবেই পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা কর্ষিত ছিল বলে আত্মবৈশিষ্ট্যকে জোরের সঙ্গে ঘোষণা করতে তিনি দ্বিধা করতেন না। মধুসূদনের শিল্পী-ব্যক্তিত্বের এই যে আত্যন্তিক প্রত্যয়শীলতা, এই যে অহং-কেন্দ্রিকতা—এ একেবারেই পাশ্চাত্ত্য মনোভঙ্গীর প্রভাবজাত ফল। সদৃশ মনোভঙ্গী এ দেশীয় শিক্ষায় উপজাত হওয়ার কথা নয়, হয়ও না। বরং উল্টোটাই হয়। প্রাচ্য জ্ঞান মানুষের নম্রতা ও বিনয় বাড়ায়। এ দুই মনোভঙ্গীর মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রাচ্যের আদর্শটি অধিক শ্রদ্ধেয়, তবে পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিকোণটির সপক্ষেও যে কিছু বলা যায় না এমন নয়। মধুসূদনের চরিত্রে যে অকপটতা ও মহানুভবতা আমরা লক্ষ্য করি তার মূল ওই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিতজনসুলভ আত্যন্তিক অহং চেতনার মধ্যেই প্রোথিত ছিল বলেই মনে হয়। সত্য বটে, তার আত্যন্তিক অহং চেতনা তাঁর বিবেচনাশক্তিকে বহুল পরিমাণে পঙ্গু করে রেখেছিল—স্ব-জীবনে কোথাও তিনি সুস্থির বিবেচনা-শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নি—এবং তাঁর স্বভাবে যে impulsiveness বা ভাবোদ্বেলতা লক্ষ্য করা যায় তারও মূল যে ওই 'অহং'—সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এই সত্য আমরা কেমন করে বিস্মৃত হই যে, মধুসূদনের অহং-চেতনাই তাঁর সকল সৃষ্টিশীল বিদ্রোহের মূলে ক্রিয়াশীল হয়েছে। তিনি যদি অহং-ভাবাপন্ন না হতেন, তা হলে বাংলা সাহিত্য চার চারটে মূল্যবান এবং বহুদূরপ্রসারী ফল সম্ভাবনাযুক্ত অভিনবত্বপ্রয়াসের দ্বারা বোধ হয় সমৃদ্ধ হতেও পারত না। মনে রাখতে হবে ইউরোপীয় ছাঁচে লেখা প্রথম বাংলা নাটক 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৮) তিনি রচনা করেছিলেন বন্ধু গৌরদাস বসাকের কথার উত্তরে বাজীর মনোভব নিয়ে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ রচনা 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-ও (১৮৬০) একই মনোভাব প্রসূত। তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' (১৮৬১) বা প্রহসনদ্বয় (১৮৬০) বা পরবর্তী 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬) তিনি ঠিক বাজীর মনোভাব নিয়ে রচনা করেন নি বটে, তবে বাংলায় ইউরোপীয় ধাঁচের বিয়োগান্ত নাটক, প্রহসন সৃষ্টি এবং সনেট নির্মাণের পিছনে তাঁর বিদ্রোহী শিল্পী-সত্তা যে সর্বাংশে সক্রিয় ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। মধুসূদন আজন্ম বিদ্রোহী ছিলেন। মূর্তি ভাঙায় তাঁর সহজ উল্লাস ছিল বলে মনে হয়। বস্তুত তিনি যদি সংসার জীবনে পদে পদে ঠেকে না শিখতেন, রূঢ় বাস্তব তাঁর জীবনের পথে যদি নানাবিধ বাধা বিপত্তি উপস্থাপিত না করত, তবে তাঁর কালাপাহাড়ী মনোবৃত্তি কোথায় গিয়ে যে শেষ হত বলা দুষ্কর। তাঁর স্বভাবে গূঢ়-সঞ্চিত তীব্র জ্বালাময় বিদ্রোহী আগুন বাধাবন্ধনহীনভাবে আপনাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ক্ষয় করে একদিন হয়ত দপ্ করে নিভে গিয়ে নিঃশেষে ফুরিয়ে যেত। প্রবৃত্তিকে বাধা দিতে পারে এমন প্রতিবন্ধক মধুসূদনের ভাব-জীবনে ছিল না,—তিনি বাধাকে বাধা বলেই মনে করতেন না,—একমাত্র সাংসারিক খাতে নানাবিধ নিগ্রহ লাঞ্ছনা দুর্গতি সহ্য করে তবে তিনি খানিকটা আত্মস্থ হতে পেরেছিলেন। তবে এই চৈতন্যোদ্রেকও সাময়িক এবং ক্ষণিক,—তাঁর মোহাবেশ চিরতরে ঘুচিয়ে দেবার পক্ষে

তা যথেষ্ট জোরালো ছিল না। সংসার জীবনে দুঃখকষ্ট আর লাঞ্ছনার মার খেয়ে তাঁর অমিতাচার এবং অদম্য বাসনা ক্ষণকালের জন্য প্রতিহত হয়েছে, আবার দুর্গতির মেঘ কেটে যেতেই স্ব-স্বভাব প্রকট হয়ে উঠেছে—তিনি পূর্বে যা ছিলেন তাই-ই হয়েছেন। মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' সাময়িক বিলাপ মাত্র। এ মোহভঙ্গ স্থায়ী হয় নি

এই আত্মবিলাপের আন্তরিকতা যে স্থায়ী হয় নি তার একাধিক প্রমাণ আছে 'আত্মবিলাপ' নামক প্রসিদ্ধ কবিতাটি মধুসূদন যখন রচনা করেন তখন তাঁর বয়স সাইত্রিশ বৎসর। এই বয়স প্রৌঢ়ত্বের সূচনাকাল। এই বয়সে মানুষের মনে মোটামুটি রকমের একটা ভারসাম্য দেখা দেয়। নানাবিধ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে জীবনের প্রায় মধ্যভাগে এসে মানুষ স্বীয় শক্তির সম্ভাবনা এবং অপূর্ণতার মোটামুটি একটা হিসাব পায় এবং পরিমাপন ক্রিয়ার সাহায্যে নিজের শক্তির দৌড় বুঝে ফেলে তদনুযায়ী উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ছাঁটাই করতে সচেষ্ট হয়; পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার আলোকে তখন পরবর্তী অভিজ্ঞতার ছাঁটটুকু চিনে নেবার একটা প্রবণতা দেখা দেয়। মধুসূদনের বেলায়ও এ নিয়ম সত্য হতে পারত, কিন্তু পূর্বেই বলেছি, প্রচলিত নিয়মের মূর্তিমান ব্যতিক্রম রূপেই মধুসূদনের জীবনের সার্থকতা ও মূল্য। যে-মধুসূদন আশাভঙ্গের গভীর মনস্তাপে ক্ষুব্ধ ব্যথিত কণ্ঠে বলেছেন—

> বাকী কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে,
> সে সাধ সাধিতে ?
> ক্ষতমাত্র হাত তোর মৃণাল কণ্টকগণে,
> কমল তুলিতে !
> নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী
> এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি মন, কেমনে।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেল, বৎসর খানেকের মধ্যে 'বিষজ্বালা' বেমালুম ভুলে গিয়ে রাতারাতি ধনী হবার আশায় তিনি ইংলণ্ডের জাহাজে চাপছেন! রইল পড়ে চার বৎসরের একটানা কাব্যসাধনার আবেশ, কবিখ্যাতির দ্বারা সমাজে যে প্রতিষ্ঠা ও সম্মান তিনি অর্জন করেছিলেন তা শিকেয় তোলা রইল—জ্বলন্ত পাবক শিখার দিকে ছুটে-চলা পতঙ্গের মত তিনিও ব্যারিস্টারী আলেয়ার পিছনে ছুটলেন! কি, না দেশে ফিরে এসে একজন ধনাঢ্য ও মানী ব্যক্তিরূপে সমাজে পরিচিত হবেন! একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস, আর এই পরিহাস একান্তভাবেই মধুসূদনের পাওনা ছিল এই রকম পরিণতি মধুসূদনেরই ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের উপযুক্ত। ফরাসী-সাহিত্যের ইতিহাসে পড়েছি, আঠারো শতকের ফরাসী লেখকেরা লেখক হওয়াটাকে খুব বড় কৃতিত্ব বলে মনে করতেন না। লেখক-জীবনের সাফল্য, ওটা ছিল ওদের হাতের পাঁচ; কি করে বনেদী চাল, বনেদী জৌলুস আরও বাড়ানো যায়, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরূপে সমাজের মান্যমানতা পাওয়া যায় তাই ছিল ওঁদের ধ্যান-জ্ঞান-সাধনা। উনিশ শতকীয় ব্যলজাকের জীবন থেকেও আমরা একই তথ্য আহরণ করি।

এও ঠিক সেই ব্যাপার। কবিকুল চূড়ামণি রূপে দেশ যাঁকে মাথায় করে নিয়েছে, তিনি ছুটলেন কিনা আরও বেশী সাহেব সাজবার আশায় অসার এক ব্যারিস্টারি উপাধির তকমা গায়ে আঁটবার জন্য। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় মণিখণ্ড ফেলে দিয়ে আঁচলে কাচ বাঁধবার সাধনা একেই বলে। এই অশ্রদ্ধেয় সাধনায় নিজেকে লিপ্ত করতে গিয়ে মধুসূদন নিজ জীবনে কি বিড়ম্বনা ডেকে এনেছিলেন সে ইতিহাস সকলেই জানেন।

আর একটি নজীরের উল্লেখ করব। মধুসূদন একবার গৌরদাস বসাককে লিখেছিলেন,—

> "There is nothing like cultivating and enriching our mother tongue. If there be any one among us anxious to leave a name behind him, and not pass away into oblivion like a brute, let him devote himself to his mother-tongue. That is his legitimate sphere, his proper element. ...Let those who feel that they have springs of fresh thought in them fly to their mother tongue.... Our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up."

মধুসূদনের বিখ্যাত সনেট 'বঙ্গভাষা'র সঙ্গে এই কটি লাইন মিলিয়ে পড়লে দেখা যায়, মাতৃভাষার প্রতি এক সময়ে যেমন তাঁর বিমুখতা ছিল তেমনি অন্য এক সময়ে মাতৃভাষার প্রতি তাঁর মনে প্রবল সম্ভ্রমবোধ ও অনুরাগের সঞ্চার হয়। তাঁর সমৃদ্ধ কাব্যফসল শেষোক্ত সময়ের আবেশের দান। কিন্তু এই আবেশ তাঁর জীবনে স্থায়ী হয় নি। মাত্র চার-পাঁচ বৎসর তিনি প্রকৃত অর্থে সাহিত্য সাধনায় নিবিষ্ট ছিলেন, তারপরেই ভিন্নতর ও নিম্নতর আকর্ষণে সাহিত্য সাধনা থেকে স্খলিত হয়ে পড়েছিলেন। উদ্ধৃত চিঠিতে ও অন্যান্য রচনায় মাতৃভাষায় তিনি যে অনুরাগ প্রকাশ করেছিলেন, তাতে এতটুকুও ফাঁকি বা মেকী ছিল না।—মধুসূদনের চরিত্রে মেকীর যায়গা নেই—, কিন্তু কবির জীবন-নিয়তিটাই এমন যে কোন একটি বিশেষ আবেশে বেশীদিন আবদ্ধ হয়ে থাকা তাঁর স্বভাব-বিরোধী ব্যাপার ছিল। যে-প্রবল অধ্যবসায় ও উদ্দীপনার সঙ্গে প্রথম যৌবনে তিনি ইংরেজী কাব্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সেই একই উদ্দীপনার বশে তিনি ইংরেজী কাব্যসাধনা ছেড়ে জীবনের প্রায় মধ্যভাগে মাতৃভাষার সাধনায় তাঁর সবটুকু উদ্যম ও মনোযোগ নিয়োগ করেছিলেন। আবার মন-মেজাজের আর একটি ফেরতার সময়ে বহু যত্নে ও সাধনায় অর্জিত মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগকে পেছনে ফেলে বিত্তকৌলিন্যের ভজনায় আপনাকে ক্ষয় করতেও তাঁর বাধে নি। এই হলেন মধুসূদন, এবং মধুসূদনের স্বভাবের এই বৈশিষ্ট্য না বুঝলে তাঁর কাব্য-বৈশিষ্ট্যকেও ভাল করে বোঝা যাবে না। সাংসারিক মানদণ্ডে

যা ছিল মধুসূদনের স্বভাবের অস্থিরতা ও অব্যবস্থিতচিত্ততা, তা-ই পরোক্ষে, এক হিসেবে দেখতে গেলে, তাঁর কাব্যরচনায় শক্তি জুগিয়েছে। উৎকার প্রকৃতি তাঁর কাব্যে, জীবনে। জীবনের পথে আকস্মিকতার ঝোঁকে দমকে দমকে তাঁর ছুটে চলা, তেমনি কাব্যসৃষ্টিতেও আকস্মিক প্রেরণার প্রাবল্যটাই বড় কথা। প্রেরণা যখন ফুরিয়েছে তখন রচনাও ফুরিয়েছে। কি জীবনে কি কাব্যে মধুসূদন কোথাও হিসেবি বুদ্ধির দ্বারা চালিত হন নি। সত্যিকারের শিল্পী-মন ছিল তাঁর। কবির আত্যন্তিক শিল্পী-সত্তা তাঁকে অনেক বিপাকে জড়িয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ওটাই তাঁর শক্তিরও উৎস ছিল। তাঁর দুর্বলতা এবং বল একই সূত্র থেকে আহৃত হয়েছে। এ-জাতীয় প্রতিভার ধর্মই হল এই যে, তা স্বল্প সময়ের মধ্যে তীক্ষ্ণতম আলোক বিচ্ছুরিত করে, দীর্ঘ সময়ের ব্যাপ্তিতে আলোর রোশনাই ছড়িয়ে দেওয়া এরকম প্রতিভার কাজ নয়।

মধুসূদনের অমিতাচারের একটি নীতিগত শিক্ষা আছে বর্তমান যুগের পক্ষে। তা এই যে, শক্তি যতই অপরিমিত হোক এবং প্রাণপ্রাচুর্য যতই অশেষ হোক—তা যদি সংযমবন্ধনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয় তা হলে সে শক্তির প্রকাশ প্রতিহত হতে বাধ্য। মধুসূদনের বেলায় হয়েছিলও তা-ই। তাঁর জীবনের বিয়োগান্ত পরিণতি তাঁর অমিতাচার আর অবিমৃষ্যকারিতার ফল। কবি যদি নিজ জীবনকে সংযমের শাসনের দ্বারা উপযুক্তভাবে দমিত করতে পারতেন, তা হলে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের পক্ষে তার ফল যে কত সুসমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় হতে পারত তা বলে শেষ করা যায় না। যে সামান্য কয় বছর তিনি কাব্য সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন, তাতেই বাংলা বাণীমালঞ্চ অজস্র পুষ্পসম্ভারে সুশোভিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর সাধনার কাল যদি আরও বিস্তৃত হত এবং তাঁর শক্তি যদি পরিপূর্ণ ভাবে এই সাধনায় নিয়োজিত হত,—তা হলে কী অসম্ভব ব্যাপারই না ঘটতে পারত বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে। এক মধুসূদনই তাঁর শক্তির দ্বারা বাংলা কাব্যকাননকে নন্দন-কাননে পরিণত করতে পারতেন—দ্বিতীয় শক্তির প্রয়োজন হত না।

কিন্তু মধুসূদনের তেমন ধাতই ছিল না। হয় তিনি স্বল্পকালীন, নয় তিনি কোন কালের জন্যই নন। প্রথমত তাঁর আত্যন্তিক শিল্পী-স্বভাব তাঁর প্রতিভার উদ্যমকে দীর্ঘকালে প্রসারিত করার পক্ষে বাধার সৃষ্টি করেছে; দ্বিতীয়ত, উনিশ শতকের শিল্পী জগতে প্রচলিত বোহেমীয় আদর্শের দ্বারাও তিনি কম প্রভাবিত হন নি। কবি ভারতীয় আদর্শের অনুগত ছিলেন না, তিনি একান্তভাবেই ইউরোপীয় আদর্শের প্রভাবাধীন ছিলেন। সেইটি তাঁকে আরও বেশী করে বোহেমীয় হবার প্রেরণা জুগিয়েছে। তাছাড়া তাঁর গোটা কৈশোর ও যৌবনের শিক্ষাদীক্ষাও তাঁকে নিয়ন্ত্রণ-বল্গাহীন জীবনযাত্রার পথে আকর্ষণ করতে কম প্রভাব বিস্তার করে নি। 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর অর্জিত সংস্কার ও বিশ্বাস মধুসূদনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল বললেও চলে।

খুব সম্ভব মধুসূদনের বিমর্ষ দৃষ্টান্ত থেকে এ দেশের পরবর্তী কালের শিল্পীরা

অপেক্ষাকৃত আত্মস্থ হবার প্রেরণা লাভ করেছেন। বোহেমীয় জীবন-যাত্রার আদর্শ এ কালের শিল্পী-মনে খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তার উপর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত ওই ব্যাপারে একটা মস্তবড় check বা নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। তিনি স্বীয় জীবনযাত্রা প্রণালীতে ইউরোপীয় আদর্শের অনুসরণ না করে ভারতের প্রাচীন ঋষি-কবিদের সংযমপূত জীবনের ধারা অনুসরণ করেছেন। বাল্মীকি-ব্যাস প্রমুখ ভারতীয় কবি-ঋষিদের প্রজ্ঞা বোধি ও নিরাসক্তি এ যুগের কোন কবি যদি নিজ জীবনে সার্থকভাবে প্রতিফলিত করে থাকেন তো তিনি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে হয়তো উল্কার ক্ষণিক তীব্র আলোক-বিচ্ছুরণ চোখে পড়ে না ; কিন্তু তাতে আমাদের আক্ষেপ করবার কারণ ঘটে নি, কেননা ওই আলো একটি বিশেষ মুহূর্ত বা বিন্দুতে সংহত না হয়ে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের পরিধির উপর সমানভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাতে তাঁর গোটা জীবনটাই প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। শিল্পীর জীবনাচরণের এইটিই হল ভারতীয় আদর্শ এবং এইটিই আমাদের পক্ষে গ্রহণীয়। আমাদের মহাভাগ্য যে, আমরা আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এক পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শে বিশ্বাসী শিল্পীকে আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম। সংযমনিষ্ঠ আত্মস্থ অনাসক্ত শিল্পীরূপে তিনি আমাদের সমক্ষে এক ধ্রুব অনির্বাণ আলোকবর্তিকা রূপে বিরাজ করেছেন। সর্বাধিক ভাবাকুলতা প্রবৃত্তি-প্রবণতা ও অহংবোধের সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ পথের পথিক তিনি। রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের একেবারেই বিপরীত কোটির শিল্পী। মধুসূদনের জীবনচর্যার আদর্শ অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের জীবনচর্যার আদর্শ এ যুগে সমধিক কার্যকরী হওয়ায় এ যুগের শিল্পীরা বেঁচে গেছেন।

"মধুসূদন ইউরোপে ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মন ভারতে বিশেষত বঙ্গে পড়িয়াছিল। কবে বাংলার শ্রীপঞ্চমী, কবে শরতে শারদীয় অর্চনা, কবে বিজয়া দশমী, কপোতাক্ষ নদী কেমন কুলকুল করিয়া বহিয়া যায়, কোন ঘাটে ঈশ্বর পাটনী খেয়া দিয়াছিল,—সুদূর ফরাসী দেশে বসিয়া…তিনি বঙ্গের এ সমস্ত সুখস্মৃতি মনে জাগাইতেন।"

—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

ব্যক্তিত্বের সঙ্কট : মধুসূদন

সুরেশচন্দ্র মৈত্র

সব ব্যক্তিই ব্যক্তিত্ববান নন, কেউ কেউ বটে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু ব্যক্তি থাকেন নি, ব্যক্তিত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর সংকট ছিল। সংকট এমন লোকেরইতো থাকে। প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র ভোগবাসনার জগৎ থেকে বের হয়ে এলেন; যে সংকটের ঘূর্ণাবর্তে তিনি আবর্তিত হচ্ছিলেন, তার অবসান হোল ঈশা উপনিষদের একটি ছিন্ন পত্র হাতে পেয়ে। সংকট রবীন্দ্রনাথেরও ছিল—আত্মভুবনের চৌহদ্দী ডিঙুতে হবে তাঁকে। কিন্তু কে করবে সাহায্য? কবি সবিস্তারে তার বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু সংকট এক বিশেষ পর্বেই আসে না; জীবনের পর্বে পর্বে সংকট। ধর্মজিজ্ঞাসুকে এই সমস্যায় পড়তে হয় না। কবি বা শিল্পীকে প্রতি পর্বে সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। আর তার হাত এড়িয়ে এগিয়ে যেতে হয়। শিল্পীর শিল্প হোল এই রকম এক একটা সংকটের মোকাবিলা।

সংকট বাইরের ঘটনার জন্যও দেখা দেয়,—দেখা দেয় নিতান্ত আন্তরিক কারণ-বশত।

সংকট ব্যক্তির সঙ্গে পরিবারের, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ফুটতে পারে। কবির ক্ষেত্রে বাইরের এই সব সংকট তো আছেই, তৎসহ আছে আরও কিছু।

এক

মধুসূদন জন্মেছিলেন কোন শিল্পী, সাহিত্য অনুরাগী, বা অবৈষয়িক এষণা-পুষ্ট পরিবারে নয়। তিনি জন্মেছিলেন এক পুরো বিষয়-প্রেমিক, অর্থধনী পরিবারে। তাঁর জীবনের প্রথম সংকট এই পরিবারের কুল-আচারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার সংকট। ধর্মীয় নয়, বৈষয়িক বা পেশাগত।

তিনি চাইছেন কবি হবেন, খুব বড় কবি হবেন। তাঁর পিতা রাজনারায়ণ চাইছেন, তাঁর পুত্র তাঁরই মত জীবন-যাপন করুক। বন্ধু গৌরদাস, তুমি আমার জীবনী লিখবে। আর বিলাত যাত্রা জরুরী হয়ে পড়েছে বড় কবি হবার জন্য। বিলেত না গেলে কেউ বড় কবি হতে পারে না। কানে কানে ফিরে কথাটা পিতা রাজনারায়ণের কানেও পৌঁছেছে। একবার ক্রুদ্ধ হয়ে ভাবলেন, লেখাপড়া যথেষ্ট

হয়েছে। দেশে পাঠিয়ে দেবেন। সম্ভবত জননী জাহ্নবীর চোখের জল এই সংকটের সমাধান করল।

বাবা খুব সফল ব্যবহারজীবী; একটি মামলা উপলক্ষে তমলুক রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁদের আমন্ত্রণে সপ্তমী পূজার রাত্রে তমলুক চললেন। সঙ্গে পুত্র মধুসূদন। ভাবছেন, পাশে পাশে রেখে ছেলের মন বদলাবেন, রুচি বদলাবেন। ছেলে তমলুকে এসে কী দেখছে?

জায়গাটি হতকুচ্ছিত (nasty), "but Gour, there is one consolation for me. I am come nearer that sea which will perhapes see me at a period (which I hope is not far off) ploughing its bosom for "England's glorious shore." The sea from this place is not very far, what a number of ships have I seen go ng to Engiand ! (১৮৪২, অক্টোবর)

এর এক বৎসর আগেই তিনি লিখেছেন,

I sigh for Alion's distant shore
Its valleys green, its mountains high ;
Tho' friends, relations, I have none.
In that far clime, yct, oh I sigh.

তবে তিনি কি গৃহস্নেহ বঞ্চিত ? না,

My father, mother, sister all
Do love me and I love them too.

তবু সেখানে যাবো , যে দেশ অবিরত আমাকে টানছে—

"As if she were my native land"

কবিতার জন্য দেশ ছাড়বেন, বন্ধু গৌরদাস এ কথা জেনেছেন। তিনি বলেছেন, তোমার বাবাকে বলে দেব। তখন বললেন, যদি বলো, তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। কবি পোপ বলেছেন, কবিতার জন্য বাবা-মা সবাইকে ত্যাগ করতে হবে। পোপ কি সত্যই বলেছেন, দেশত্যাগ বাঞ্ছনীয় ? ঘটনা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। বাবা-মা ছেলের জন্য পাত্রী নির্বাচন করে ফেলেছেন। মধু বন্ধুকে জানাচ্ছেন, আজ থেকে তিন মাস পরে আমার বিবাহ ! মেয়েটির কী দুর্ভাগ্য ! হোক না সে সুন্দরী, হোক না সে পরীর মত। বিলাত যাওয়ার ইচ্ছার ফলে যে পারিবারিক কলহ, তার সঙ্গে আর একটি নতুন কলহ যোগ দিল—নাবালিকা বিবাহ !

১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে লিখেছেন এক প্রবন্ধে—"The happiness of a man who has an enlightened partner is complete."

বিয়েই যদি করতে হয়, তবে সত্যকার জীবনসঙ্গিনী চাই। শিক্ষা-দীক্ষায় মনের গড়নে, যে হবে সমকক্ষা। এ দেশে তখন সে সুযোগ কোথায় ?

এবার সংকট পরিবার থেকে বৃহত্তর পরিবেশে এসে দাঁড়াল। মধু মনস্থির করে ফেলেছেন, এ বিবাহ তিনি করবেন না। এর জন্য ধর্মান্তর গ্রহণ করবেন। এ ছাড়া কোন সরকারী কর্মচারী মিথ্যা প্রলোভন দেখালেন, খ্রীস্টান হলে বিলাত যাত্রায় সাহায্য পাবেন তাঁদের কাছ থেকে। খ্রীস্টান হয়েই বুঝতে পারলেন, বিলেত যাত্রা অত সহজ নয়। যিনি তাঁর মস্তকে জর্ডন নদীর জল ছিটিয়েছেন, সেই আর্চডিকন ডিয়াল্‌ট্রি বিলেত যাচ্ছেন ; বললেন, সঙ্গে যাবে ?

মধু গেলেন না। "My father won't allow that" বাবা অনুমতি দেবেন না। খ্রীস্টান হয়েছেন, তবু বাবার অনুমতি অত্যাবশ্যক। আর এক চিঠিতে লিখছেন, "I am not about to come and live with or rather nearer to my father"—এই কি তাঁর পিতৃদ্রোহিতা ?

তবু বিলেত যাওয়া হোল না, চলে গেলেন গঙ্গার অপর পারে শিবপুরে। ওখানে বিশপস্‌ কলেজে ভর্তি হলেন। হিন্দু কলেজে খ্রীস্টান ছেলের স্থান নেই। রাজনারায়ণ কি করে দেখবেন তাঁর বিদ্যানুরাগী পুত্র এই ধর্মযাজক ঐ ধর্মযাজকের দ্বারস্থ হচ্ছে। সব খরচ তিনি বহন করবেন। কিন্তু জীবন তো ইচ্ছামত চলে না। তার গতি কোন ব্যক্তিই সম্পূর্ণ নির্ণয় করে না, নির্ণয় করে পরিবার এবং সমাজ। মধুর বাবা রাজনারায়ণ আলাদা গৃহ নির্মাণ করে বাস করছেন, কিন্তু পরিবার তো তাঁকে ছাড়ে না। শুভানুধ্যায়ীরা পরামর্শ দেন, একমাত্র ছেলে খ্রীস্টান হোল ; মরলে শ্রাদ্ধ করবে কে, পিণ্ডদান করবে কে ? অতএব আবার পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হও। রাজনারায়ণ বিবাহ করলেন, একবার নয়, পর পর আরও দুইবার।

মধুসূদন বিশপস্‌ কলেজে লেখাপড়া করছেন। বিশপস্‌ কলেজ তাঁকে শিক্ষিত করছে কিন্তু তৃপ্ত করতে পারছে কই। বাবার প্রতি অভিমানও হল, মায়ের প্রসঙ্গে গৌরদাস একবার বলেছিলেন। মধু মা-অন্ত প্রাণ। কিন্তু রূঢ় ভাষায় বলে উঠেছেন, মায়ের আঁচলের তলায় জীবন কাটাবার জন্য আমি জন্মাইনি। সে আঁচল সরে গেল। অকস্মাৎ মাদ্রাজে এসে উঠলেন। কোথায় আলবিয়ন তীরের সেই সুদূর দেশ, আর কোথায় মাদ্রাজ ! মাদ্রাজে এসে ছোট্ট চাকরী পেলেন। খ্যাতির থেকেও বড় কিছু পেলেন। পেলেন রেবেকাকে। এই অসামান্যা নারী ধনী ইংরেজ কন্যা। অর্থ ও রক্তের কৌলিন্যের জন্য তাঁকে অসামান্যা বলছি না। অসামান্যা, কারণ, শুধু ভালোবাসার জোরেই মধুকে বিবাহ করলেন। বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে একটি সন্তান হোল। বন্ধুকে সে খবর দিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে লিখতে ভুললেন না যে, এই শুভ সমাচারটি বাবাকে জানিও। "I do not know how to do the thing in Bengali." এই সুখের খবরটি বাংলায় কি করে বাবাকে জানাব, আমি জানি না। এই ভদ্রলোকই ১১খানি পত্র নিয়ে একটি কাব্য একদিন বাংলায় লিখে ফেলবেন ! মনোমোহনের পিতৃবিয়োগ হলে বাংলায় দীর্ঘ চিঠি লিখবেন

মনুর মায়ের কাছে।

মধু খ্রীস্টান, কিন্তু পিতৃপরিচয় দানে পরাঙ্মুখ নন। বিলেতে বসে মনোমোহনকে এক চিঠিতে লিখছেন, তোমার বাবাকে বলবে, যাঁকে তিনি একদিন ভালোবাসতেন, ছোট ভাইয়ের মত দেখতেন, তাঁর অসম্মান হবে এমন কোন কাজ আমি করব না। বাবার সম্মান বিধর্মী পুত্রের কাছে এতই মহার্ঘ! মধু ধর্মান্তরণের সংকটকে আত্মিক সংকটে রূপান্তরিত করেন নি; তিনি বুঝেছিলেন, ধর্ম একটা মত মাত্র। জীবনের সর্বঅঙ্গন দখলকারী নয়।

দুই

যৌবনে কলকাতায় এসে কবিতা লিখেছেন, তাতে বিদেশী কাব্যসাহিত্যের নানা মহলের সাড়া কবুল করেছেন—তাঁর নায়িকারা কেউ নীলনয়না, তাদের কারও বা সোনালী চুল। কখনও ধ্রুপদী সাহিত্যের নায়িকা স্পষ্টত উল্লেখিত "Have you not seen my faithful chaste Penelope", ? কবি হিসেবে নিজের নামও লিখেছেন ইউলিসিজ; আর একবার স্বাক্ষর করলেন মীওনাইডস (Maeonides)। আলবিয়ান তীরের জন্য দীর্ঘশ্বাস বের হয়েছে। এ সবই পোশাকী বেদনা-বৃষ্টি, সাজানো শোকাশ্রু। মাদ্রাজে এসে কবিতার চরিত্র বদলে যাবে। ভাষা ইংরেজী, কিন্তু তা আর ইউরোপীয় রস-আকুলতায় বিব্রত নয়।

King Porus অবশ্য কলকাতায় লেখা; Literary Gleaner-এ ছাপা হয় ১৮৪২ '। মাদ্রাজে কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হোল।

Thou standest like a lofty tree
তবু Shorn of fruits-blossoms-leaves and all.

" চোখে না দেখে লেখা যায় না। তাই চোখে না দেখার খেলা থেকে কবিতার খেলাতে চলে এলেন।

তোমার বাবা তার বই "The Captive Ladie:" 'ক্যাপটিভ লেডি' সংযুক্তা-সম্বন্ধ নেই। কাহিনী। কিন্তু রাজসভায় ভাটের মুখে নানা গান বেজেছে—সেই হবে। পোপ তাঁর ভবিষ্যৎ কাব্যের বীজ-ভাবনাগুলি—দেখা দিল "Proud Ganga বাবা-মা ছে y wave",—খুব বিস্ময় লাগে! আরও বিস্ময়,'ইউরেশিয়ান' পত্রিকায় আজ থেকে রলেন, 'Ode to the Ganges'—লেখক শশিচন্দ্র দত্ত। ছাপা হয়েছিল সুন্দরী Calcutta Literary Gazette-এ; মাদ্রাজে ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি ছাপলেন। অথচ গঙ্গার জল স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করব না,—এ ইতিহাস তো শুরু হয়েছে ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে। হলধর দাস প্রথম উদাহরণ, তারপর জনৈক রামমোহন-শিষ্য, তারপর রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। গঙ্গাজল স্পর্শ করে শপথ না করা আর গঙ্গার মহিমা স্বীকার করা সমস্তরের বিষয় নয়।

এই কাব্যে লংকাকে দেখা গেল—'Fair Lunka in thy holy wave !' শুধু এইটুকু নয়, রামচন্দ্র লংকাকে সমাধিক্ষেত্রে পরিণত করলেন, এ প্রসঙ্গও আছে। আছে সেই অসামান্য পঙক্তিটি—'the very ocean wore his chains'—যা ভাষান্তরিত হয়ে মেঘনাদবধ কাব্যে দেখা যাবে—"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, হে প্রচেতঃ !"

শুধু লংকা নয়, আছে যমুনাতীর, যমুনাতীরে যুবা কৃষ্ণ ও তার গোপিনীরা। আছে দেবী ভাগবতের গল্প, নিশুম্ভ দৈত্যের নিধনের গল্প।

দ্বিতীয় কাব্য The Upsori—অসমাপ্ত কাব্য বা খণ্ডিত কাব্য। এ কাব্য ভারতীয় পুরাণ-ভিত্তিক। এ কাব্যে শুধু অপ্সরী নয়, তমাল তরু আছে, মলয় বাতাস আছে, তুলসীবৃক্ষ আছে। তুলসী বৃক্ষ যে উচ্চ মঞ্চের ওপর স্থাপন করা হয়, তাও কবি স্মরণে রেখেছেন।

একই সঙ্গে বের হল The Visions of the Past—মাত্র আট বৎসরের শৈশব স্মৃতি ভিড় করে এসে দাঁড়াল। ভবিষ্যতের স্বপ্নসাধ নয়, অতীতের সুধাভরা স্মৃতি তাঁকে আক্রমণ করল :—

> As when Bengala ! On they sultry plains
> Beneath the pillar'd and high arched shade
> Of some proud Banyan.

তার সঙ্গে তাঁর বাল্য পরিচিত সেই কৃষ্ণকায় চঞ্চলা পাখিটি—'royal wanderer of the wood—darksome new'। ফিঙা মধুসূদনের প্রিয় পাখি। পরধর্ম গ্রহণ করেছেন, বিদেশিনী বিবাহ করেছেন (না-ই বা হোল বিলেত, তবু আলবিয়ানের তীরাশ্রিত ভূখণ্ড আর তাঁকে ব্যাকুল করছে না)। এখন কোন্ বন্ধ তাঁকে দণ্ডিত করবে ?

Rizia : The Empress of Inde লিখলেন 'ইউরেশিয়ান' পত্রিকায় ; এ পত্রিকা মাদ্রাজে খ্রীস্টীয় যুব সংঘের পত্রিকা। মধুসূদন এই পত্রিকার পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কয়েক বৎসর ঐ সংঘের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনি রিজিয়া নাটকে লীলা নামে একটি তরুণীকে সম্রাজ্ঞীর সহচরী করেছেন। সে গান করেছে, গান করবার পূর্বে যে আত্মপরিচয় দিয়েছে, সে আত্মপরিচয় স্বয়ং কবিরই আত্মপরিচয় মিশে আছে। "আমি এসেছি সেই দেশ থেকে যে দেশ চির-শ্যামল পত্রগুচ্ছে আচ্ছাদিত, আর যার নদী নীল-সলিলা। Land of palmiest grove and bluest stream। এই কবিই ব্যারিস্টারী পড়বার জন্য বিলেত যাত্রার পূর্বে কাতর অনুনয় করবেন,—

> রেখো মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে।

মিনতি কার কাছে ? সেই মায়ের কাছে যিনি 'শ্যামা জন্মদে'। শুধু তাই নয়, ঐ নারী, যার নাম লীলা, যে দিল্লীর যমুনাতীরে বটবৃক্ষ খুঁজে পাবে, খুঁজে পাবে

বৃক্ষতলে একটি মন্দির। লীলা সেই বটবৃক্ষ ও মন্দির তিনবার প্রদক্ষিণ করবে। খ্রীস্টান কবি শ্রদ্ধা কাকে করতে হয়, নত কোথায় হতে হয়, তা জানেন। ধর্ম আর সংস্কৃতি কি এক? অথচ তাঁর এই মাদ্রাজে লেখা দুটি নিবন্ধ নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। প্রথম প্রবন্ধটির কথা বলি—হিন্দু ক্রনিকলে (Hindu Chronicle) এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে ২০শে মার্চ। এই প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, "The situation of India is peculiar, here we have institutions framed in, and adopted for an outer world still flourishing ; a religion like what Greece and Italy rejected nearly two thousand years ago, is still prevalent, in short, we have here a state of society very much resembling that of which civilized Europe finds traces only, in the pages of her oldest lords—it has disappeared entirely and for ever from her shores"

কথাটা ইতিহাসগতভাবে অগ্রাহ্য করার মত কিনা, তা ভেবে দেখতে হবে। রামমোহন রায় খ্রীস্টান নন, তিনি বেদান্তবাদী। তিনি তাঁর বেদান্তগ্রন্থের (১৮১৬) ভূমিকায় লিখলেন, "He is the only object of worship"—তখন মুহূর্তে মধ্যে বহু দেববাদ বাতিল হয়ে গেল। তিনিই পরোক্ষত প্রথম বিগ্রহ ভঙ্গকারী (iconoclast)। এ কাজ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব থেকেই হচ্ছে। মধুসূদন সেই ইতিহাসই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। "The christians had no other idea of Divinity when they demolished the temples and broke the statues of the Gods in order to oust them and keep them from protecting the pagans." (Social and philosophical studies—Paul Lafargue, 1906)। মধুর এই সংকট নতুন যুগের সংকট, পুরনো পৌত্তলিকতার সঙ্গে একেশ্বরবাদের যে বিরোধ, সেই বিরোধ এখানে দেখা দিয়েছে। এ হিন্দু বনাম খ্রীস্টানী বিরোধ নয়।

মধু আর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেটি পুস্তিকা আকারে ছাপা হয়েছিল। তা নিয়েও বিতর্ক হতে পারে। সম্ভবত এ সব বিতর্ক আরও তীব্র হবে এবং এই বিতর্কচারিতার ভাষা আরও কর্কশ হবে। পুস্তিকাটির নাম The Anglo-Saxon and the Hindu—১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজ খ্রীস্টীয় তরুণ সংঘের কাছে প্রদত্ত এক বক্তৃতা।

The Hindu is an aged, a deceased race, look at the old oak, the monarch of hundred years, of the green world !

Is not the glory of the great fathers of the Hindu race entranced in the temples of Fame ? Have they not bequeathed to mankind deathless gifts ?" আজ তিনি চাইছেন, যে fair-haired মানুষ দূর আর্লবিয়ন-

তীর থেকে এসে প্রশস্ত গঙ্গা, আর খরস্রোতা সিন্ধুনদের তীরবাসীকে নবীন মন্ত্রে দীক্ষিত করবে! স্পষ্ট করে না বললেও এখানে তাঁর খ্রীস্টধর্ম-প্রাণতার প্রকাশ ঘটেছে। তবে এই ধর্মপ্রাণতা সাময়িক। মাদ্রাজে খ্রীস্টধর্ম অত্যন্ত জীবন্ত; এবং তার আশ্রয়পুষ্ট ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এই বিচিত্র পরিবেশ তাঁকে এই অভিনব সিদ্ধান্ত নিতে প্ররোচিত করেছে। তাঁর প্ররোচনা প্ররোচনাই মাত্র, রোচনা নয়।

মাদ্রাজে লেখা 'Re-marriage of the Hindu widow' এবং 'The Mussulmans in India' প্রবন্ধ দুটি সব থেকে উল্লেখযোগ্য। কারণ বিষম প্ররোচনা এখানে দমিত। ভিন্ন পথমুখী। প্রথম প্রবন্ধে দেখতে পাচ্ছি, তাঁর তর্ক একজন মুক্তবুদ্ধির অধিকারী হিসাবে, খ্রীস্ট ধর্মধারী হিসাবে নয়। তিনি প্রবাসে বসে মদ্র রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা নিয়ে তর্ক করে যাচ্ছেন। বাঙলা দেশের আন্দোলনকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, তিনি মেয়েদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রশ্নে সমর্থন জানান। ধর্মান্তরিততা তাঁকে তাড়িত করে নিয়ে যায় নি এক সমাজ থেকে আর এক সমাজের অন্ধ কুঠুরীতে। ধর্মভিন্নতা যে জাতিভিন্নতা নয়- একথা তিনিই আমাদের সর্বপ্রথম বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর 'The Mussulmans in India' সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে লেখা। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন, ভারতে মুসলমান শাসন লিডেন হল স্ট্রীটের (যেখানে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সদর দপ্তর) শাসন থেকে শতগুণে শ্রেষ্ঠ। কারণ দেশের সম্পদ তখন বিদেশে রপ্তানী হত না, আর দেশীয়রা শাসনকার্যের শ্রেষ্ঠ পদগুলির অধিকারী হত। সিপাহী বিদ্রোহের সিপাহীরা এর থেকে আর নতুন কি কথা বলেছিল? এতকাল ধর্মত্যাগের জন্য যে সংকট বইছিলেন, এবার তা সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলে দিতে পেরেছেন। মাতৃভুমির উষ্ণ সান্নিধ্য আর অতীত স্মৃতি নয়। এখন যেটুকু বাকী থাকল, তা হল মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে সে সান্নিধ্য সুসঙ্গত ও প্রগাঢ় করে তোলা। সে-ই হবে শিল্পীর যথার্থ পরিচয়, শুধু দেশ অনুসন্ধানীর কর্তব্য সম্পাদন নয়।

মাদ্রাজে মনোনীতা নারীকে বিবাহ করেছেন, কবি-যশ অর্জন করেছেন, সাংবাদিক রূপে প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তবু কি শান্তি আছে?

মায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে কলকাতা ঘুরে গেলেন; কোন বন্ধুকে খবরটা পর্যন্ত দিলেন না, শুধু বাবার সঙ্গে দেখা করলেন। যেমন নিঃশব্দে এলেন, তেমনি নিঃশব্দে চলে গেলেন।

প্রথম চিঠিতেই বন্ধুকে লিখেছিলেন, আমি বাংলা দ্রুত ভুলে যাচ্ছি। আমাকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ আর কাশীদাসী মহাভারত পাঠিয়ে দাও।. প্রথম চিঠিতে তাঁর প্রথম ভাষার জন্য ব্যগ্র অনুরাগ প্রকাশ দেখে বিস্ময় লাগে। শুধু আশিবয়ন তীরস্থ ভূখণ্ড নয়, সেই ভূখণ্ডের ভাষাও আর তাঁকে সম্পূর্ণ অধিকারে রাখতে পারছে না। 'ক্যাপটিভ লেডি' হাতে পেয়ে বাকী কাজটুকু করে দিলেন বীটন সাহেব। বললেন, খুব ভালো, তবে এই শক্তি মাতৃভাষায় নিযুক্ত হলে সুফল আরও বেশী হবে!

মাদ্রাজে বিধবা বিবাহের পক্ষে ওকালতি করেন, স্ত্রী সমাজের সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে ওকালতি করেন, মুসলমান শাসন ও ইংরাজ শাসনের হিতকারিতা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেন, সন্তানের পর সন্তানও আসছে, তবু মাদ্রাজের রাজপথে মদ্যপান করে অচেতন হয়ে পড়ে থাকেন! কী এমন অশান্তি যা তাঁকে আত্মবিস্মৃত করে? অথচ তখনই তো লিখছেন,—জানো, আমার সমস্ত অবকাশ জ্ঞানচর্চায় অতিবাহিত হয়। গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত, হিব্রু, তেলেগু, ইংরেজী চর্চা করে চলেছি! কেন এই সাধনা?

"Am I not preparing for the great object of embellishing the mother-tongue of my fathers?"

মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করতে চান, তার জন্য এই প্রস্তুতি। যে পরিবেশে বাস করছেন, সেখানে তা সম্ভব নয়। সাধনা ও লক্ষ সম্মিলিত হতে চাইছে। কিন্তু পরিবেশ অনুকূলতা করছে না! এই সংকট কিভাবে মীমাংসিত হবে?

পিতৃবিয়োগ ঘটেছে; বন্ধু জানালেন, তাঁর সম্পত্তি নিয়ে বন্ধুরা কলহে মেতেছে। মৃত্যুর সময় রাজনারায়ণ অন্য কারো নামে সম্পত্তি লিখে দেন নি; বলেছিলেন, যার বিষয় সে এসে বুঝে নেবে।

তিন

মাদ্রাজ ত্যাগের প্রাক্কালে লিখছেন, "Yes, dearest Gour, I have a fine English wife and four children." চিঠিখানি ১৮৫৫ সালে ২০শে ডিসেম্বর। ১৮৫৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী শিবপুর বিশপস্ কলেজে এসে উঠলেন। অকস্মাৎ মাদ্রাজ ত্যাগের উদ্দেশ্য নিয়ে নানা গবেষণা হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। তবে মাদ্রাজে বসে মধুসূদন হতে পারতেন না। স্ব-ভূমি থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়ে একটা স্থূল বিষয়-জীবন যাপন করা চলে, কিন্তু কবির জীবন? মধুসূদনের সমগ্র সাহিত্য-সাধনা যেন এর এক সদুত্তর।

রেবেকা পড়ে থাকলেন, সঙ্গে চার চারটি সন্তান। মধু কলকাতায় চাকরী নিলেন, বাসা নিলেন। এবং একদিন হেনরিয়েটাকে গ্রহণ করলেন। কবি হবার জন্য বাবা-মাকে ত্যাগ করতে হয়। শুধু কি বাবা-মা?

মাদ্রাজ প্রসঙ্গ তাঁর জীবনে একেবারে অনুচ্চারিত রইবে, শুধু দুই-একবার বন্ধু নেলর কলকাতায় আসবেন। তখন রুদ্ধ কক্ষে তাঁদের আলোচনা হবে।

ইতিমধ্যে নাটক লিখতে শুরু করলেন, নাটকের কথাবস্তুতে এমন এক নায়ককে বেছে নিলেন যাঁর দুই স্ত্রী। গল্পটি পৌরাণিক, কিন্তু নির্বাচনের অধিকার তাঁর। প্রথমা পত্নীর একটি সন্তান, দ্বিতীয়া পত্নীর সন্তান সংখ্যা তিন। এই গল্পের মধ্যে মাদ্রাজ আর কলকাতার জীবন কোনরূপ খবরদারী করে নি, তাই বা বলি কি করে!

কিন্তু জীবন তো বৈপরীত্য বেশিক্ষণ বহন করে না, সমাধান চায়। একটা কাল্পনিক সমাধান খাড়া করবার চেষ্টা করলেন 'পদ্মাবতী'তে, যেখানে মানুষের জীবন-আকাশে অনৈসর্গিক বিড়ম্বনা উপস্থিত হচ্ছে। 'রত্নাবলী' নাটক যখন অনুবাদ করছিলেন, তখন একটি নিঃসংশয়িত প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন, "Our Countrymen should possess a literature of their own, a vigorous and independent literature and not a feeble echo of everything Sanskrit" শর্মিষ্ঠার ইংরেজী অনুবাদের উৎসর্গ—যাতে পাইকপাড়ার রাজাদের সম্বোধন করে বললেন, "earliest friends of our rising national theatre"

অথচ ওই উৎসর্গ পড়েই তিনি লিখছেন,—"if the mighty spirit of the West and the East, to whom the author of Sarmistha has dedicated the best years of the youth, have not done anything for him, he is a most unfortunate man and deserves the nature's pity!"

মধুসূদনের ব্যক্তি-সংকট পরিবারের গণ্ডী পার হয়ে আর এক তীরে এসে নোঙর ফেলল।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য আদর্শের মধ্যে সংঘাত চলছে। মধু এই দুয়ের মধ্যে সমন্বয় চান।

মাদ্রাজে লেখা The Upsori কাব্যকে ভেঙে রচনা করলেন—'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য স্বভাবে, ধর্মে সম্পূর্ণ আধুনিক। কিন্তু ততটা সমকালীন নয়; যা সমকালীন নয় তা জাতীয় হবে কী করে? জাতি শূন্যে অবস্থান করে না, সে এক বিশেষ কাল ও বিশেষ ভূখণ্ডে আপন মূর্তি ফুটিয়ে তোলে।

তাই তাঁকে লিখতে হোল 'মেঘনাদবধ কাব্য', আর 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'। আত্ম-জিজ্ঞাসার সব ক'টি বাতায়ন খুলে দিতে হল।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য পড়ে বন্ধুরা দারুণ উত্তেজিত, কেউ কেউ উজ্জীবিত। কেউ কেউ ঐ কাব্যকে আর দুই একটি সর্গ বাড়িয়ে মহাকাব্যের রূপ দিতে বলেছিলেন। ভাবটা এই: সুন্দ উপসুন্দ নিহত হয়েছে, তাতে কি, দেবতাদের মহিমা তো আরো প্রকটিত করা যায়। মধুসূদন জানেন, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের বিশেষ চরিত্র। তখন এক বন্ধু পরামর্শ দিলেন, সিংহল বিজয় কাহিনী নিয়ে এক মহাকাব্য লিখে ফেলো। কবিও প্রস্তাবটি বাতিল করলেন না। কিন্তু যাঁকে সারাজীবন বাতিল করেছেন, সে তো বাতিল হয়েও পরাজয় মানছে না।

ক্যাপটিভ লেডি থেকে শুরু করুন, দেখবেন রাম ও সীতা তাঁর সহানুভূতির কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে। 'এ্যাংলো স্যাকসন এণ্ড দি হিন্দু' পুস্তিকায় সীতা প্রসঙ্গে একটি বক্র উক্তি আছে, রাবণ অনুল্লিখিত।

শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী নাটকে রাম প্রসঙ্গই শুধু। বরং পদ্মাবতীতে অত্যাচারী

শাসকের উদাহরণ হিসাবে রাবণ উল্লেখিত। ব্রজাঙ্গনা কাব্যে ও তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে সীতা ও মেঘনাদ প্রসঙ্গ আছে। মেঘনাদ খুব একটা সৎ কাজ করেছেন, তা বলা হয় নি।

'মেঘের আড়ালে পশি মেঘনাদ যথা প্রহারয়ে সীতাকান্তে উর্মিলা-বল্লভে।' (চতুর্থ সর্গ, পঙক্তি সংখ্যা ৪৬২-৪৬৩)।

সিংহল বিজয়ের আখ্যায়িকার বদলে রামায়ণের একটি ক্ষুদ্র কাহিনী সমাদৃত হল। 'মিথ' বা 'পুরাণ-কথা' অতীত কথা হলেও আমাদের জীবনের আদিম উৎসের সঙ্গে জড়িত, জৈব-জীবন মনন-জীবন সেখানে একাকার। এমন বিষয়ের আকর্ষণ কোন সময়েই ফুরিয়ে যায় না। মধুসূদন মাদ্রাজে বসেও কলকাতা জীবনের কলরব শুনতে পেতেন, যখন ছাত্র ছিলেন তখনও সেই কিশোর-জীবনের সকল পরিবর্তনের তরঙ্গগুলি এসে তাঁকে আঘাত করত। তখন সে আঘাতে যেই প্রতিধ্বনি উঠত, তার মধ্যে যতটা উচ্চভাষণ থাকত, ততটা জীবনের প্রত্যক্ষ গূঢ় আলাপ নয়।

বহু দুঃখ মানুষকে শুধু দুঃখী করে না, বহু বঞ্চনা মানুষকে শুধু বঞ্চিত করে না, মানুষকে রচনা করে। আলবিয়ন সাগরের তীরে নয়, বঙ্গোপসাগরের অপর কূলে ভিড়েই তিনি বুঝেছিলেন শিকড় উপড়ে ফেললে তরু বা লতার কি পরিণতি ঘটে!

১. আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী,
স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি শুনি রে উল্লাসে। (মেঘনাদবধ কাব্য ২য় সর্গ)
২. প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে প্রবাসী (ঐ সপ্তম সর্গ)

মাদ্রাজে লীলা যে গান গেয়েছিল, সে তো অসম্পূর্ণ গান, অপরিণত গান। তাকে সম্পূর্ণ করতে হবে, পূর্ণ করতে হবে। তার জন্য চাই কলকাতা, স্বজন-সংসর্গ। তার জন্য কঠিন ত্যাগ স্বীকার করতে হবে ব্যক্তিগত জীবনে। সিপাহী বিদ্রোহের পরিণতি তাঁকে উল্লসিত করে নি, নীল বিদ্রোহ তাঁকে স্বদেশবাসীর পাশে দাঁড় করিয়েছে। অথচ দ্বিতীয় 'পদ্মিনী উপাখ্যান' তিনি লিখলেন না। তিনি বুঝেছিলেন, 'সিংহল বিজয়' দ্বিতীয় 'পদ্মিনী উপাখ্যান' হবে; প্রতিদ্বন্দ্বী 'প্যারাডাইস লস্ট্' হবে না। ইতিহাস জীবনের অতীত চারণা করতে পারে, ইতিহাস তেমন করে বর্তমানকে ধরতে জানে না; ট্যাসোকে তার জন্য কিছু অলৌকিকতা ইতিহাসের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হয়েছিল; পুরাণের নানা অনুষঙ্গ তাঁর সহায় হয়েছিল। পুরাণের কোন বয়স-সীমা নেই, তাই সে সব যুগের সমবয়সী হতে পাবে। যে রাম যে লক্ষ্মণ এতকাল তাঁর সর্ব-অনুভূতির উন্মীলন ঘটাত, তারা আজ বিড়ম্বিত হোল।

"The idea of Ravana elevates and kindles my imagination. He is a grand fellow!" এ উক্তি বহু বৎসরের বিশ্বাসের দ্বারা লালিত উক্তি নয়, এ হল অকস্মাৎ-উত্থিত উক্তি।

বরং পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তাঁর এই মূল্যায়নের সঙ্গে পূর্বতন বিশ্বাসের

কোন পারম্পর্য নেই। মধুসূদন দৈব-বিশ্বাসী নন, কিন্তু এ এক আশ্চর্য ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটল। যা অনভিপ্রেত তাই বরণীয় হোল।

"I have a fine English wife and four children." যে-ব্যক্তি এ কথা বলার দুই মাসের মধ্যে কলকাতায় চলে আসেন সব কিছুর বন্ধন ছিঁড়ে, তাঁর পক্ষেই সম্ভব অসম কথার মর্মে এই নতুন সুর-প্রক্ষেপ।

রামচন্দ্রের অনুচরদের নিয়ে তিনি সমস্যায় পড়েছিলেন।

১. "By the bye, if the father of our Poetry had given Rama human companions I could have made a regular Iliad of the death of Meghanad."

২. "The subject is truly heroic ; only the monkeys spoil the joke—but I shall look to them."

প্রথম খণ্ড ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে বের হল ; ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই লেখা শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের রচনা ও প্রকাশ ১৮৬১ সালের জানুয়ারী থেকে আগস্টের মধ্যে। কবি এর মধ্যে বানর সম্বন্ধে একটি নতুন সিদ্ধান্তে গিয়ে পেঁছেছেন। তারা মানবেতর জীব নয়, তারা এক বিশিষ্ট জাতি।

১ বাঁধ হে আজি কৃতজ্ঞতা পাশে
রঘুবংশে, দাক্ষিণাত্য, দাক্ষিণ্য প্রকাশি। (৭ম সর্গ, পঙ্‌ক্তি ২৪৪-৪৫)

২. গরজে সুগ্রীব সহ দাক্ষিণাত্য যত
যথা করিযূথ, নাথ, শুনি যূথনাথে। (৯ম সর্গ, পঙ্‌ক্তি ২৬-২৭)

'Regular Iliad' হয়েছে কিনা, তা বলা সম্ভব নয়, কিন্তু এই পরিবর্তনে 'regular' মেঘনাদবধ রচিত হয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি রামচন্দ্রকে 'human companions' দিয়েছেন, বানর একটা জাতিবিশেষ হয়েছে। এ কাব্যের কোথাও তাদের লাঙ্গুল প্রসঙ্গ নেই। দাঁত খিঁচোনোর মত বাস্তব (হাস্যকর) বিশিষ্টতা থেকেও তাদের মুক্ত রেখেছেন কবি। এ সংশোধন কাব্যের প্রয়োজনে অতীব জরুরী ছিল। রাবণ অমিত শক্তিশালী, তার ঐশ্বর্যের কোন সীমা পরিসীমা নেই। লংকার বৈভব লংকার স্রষ্টার চিত্তের প্রতিবিম্ব ; এবং সমগ্র রেনেসাঁসীয় ব্যাকুলতার সারাৎসার। রাবণ দেবদ্রোহী, হয়ত এই অর্থে তাঁকে ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী বলা যেতে পারে, কিন্তু রাবণ যে মধ্যযুগীয় মনোভাবের প্রবল প্রতিপক্ষ, এ বিষয়ে কণামাত্র সংশয় নেই। রামচন্দ্র সতত দেবানির্ভরশীল, তাই তাঁর নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কবি বলেছেন 'দেবকুলপ্রিয়'। রাবণ আত্মনির্ভরশীল , নতুন যুগের স্পর্ধা, দম্ভ ও প্রতিবাদের সে সমুত্থিত মূর্তি।

রামচন্দ্রকে তিনি 'ভিখারী' বলেছেন একাধিকবার। "I hate Rama and his rabbles"। সে সম্ভবত পররাজ্য আক্রমণ হেতু। কারণ রামচন্দ্রকে যখন কবি পাঠকের সামনে আনলেন, তখন আদৌ ঘৃণ্য মূর্তি নয়, ভিখারীর বেশধারী নয়।

কতক্ষণ পরে,

প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব।
কণক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত··· (১ম সর্গ, পঙ্‌ক্তি ১৬৫-১৬৯)

আরও পরবর্তী অধ্যায়ে ভিখারীসুলভ তাঁর গতিবিধি দেখি না।

হাতে ধনুঃ, ঘোর সিংহনাদে
দিব্য রথে দাশরথি পশিলা সংগ্রামে।
(৭ম সর্গ, পঙ্‌ক্তি ২৪১-৪২)

তবু রামচন্দ্রকে যে ভিখারী বলে পরিচায়িত করেছেন, তার কারণ রামচন্দ্র পরনির্ভরশীল, দেব অনুগ্রহপুষ্ট। এমন কি যে লক্ষ্মণ তাঁর প্রিয় মেঘনাদকে অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করেছে, তাকেও তিনি দেবাকৃতি. লক্ষ্মণ বলেছেন। এবং ষষ্ঠ সর্গে ইন্দ্রজিত নিধনের অব্যবহিত পরে।

সম্মুখে রক্ষঃ হেরিলা লক্ষ্মণে
দেবাকৃতি। (৭ম সর্গ, পঙ্‌ক্তি ৭০৩-৭০৪)

এ শুধু দেবাকৃতি নয়, ইন্দ্রজিতকে লক্ষ্মণ যে ভাবেই হত্যা করুক, রাবণ-সম্মুখে সে যে কাপুরুষোচিত আচরণ করে নি একথা বলতে কবির মনে দ্বিধা জাগে নি।

বীরমদে দুর্মদ সমরে
রাবণ, নাদিলা বলি হুহুংকার রবে;
নাদিলা সৌমিত্রি সুর নির্ভয় হৃদয়ে,
নাদে যথা মত্তকরী মত্তকরিনাদে।
(৭ম সর্গ, পঙ্‌ক্তি ৭০৪-৭০৭)

এমন কি ইন্দ্রজিতের দাহকার্যের সময় রামের নির্দেশ অনুযায়ী এক বিরাট বাহিনী নিয়ে বীরের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন অঙ্গদ। তাই মেঘনাদবধ কাব্য সাধারণ একটি রাক্ষস বা অসুরবধের উপাখ্যান নয়। এর ভুবন বড় মাপের। এতকাল সমালোচকবর্গ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের এই রূপটি প্রত্যক্ষ করতে চান নি। মধুসূদনের ঘৃণা ব্যক্তি বিদ্বেষ-জাত নয়, ধর্মদ্বেষীর ঘৃণা নয়। এ ঘৃণা প্রতিদ্বন্দ্বী মূল্যবোধের। বিরোধী জীবন-অনুরাগের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। আর ঘৃণাই তো সব নয়, সম্ভ্রমবোধও আছে।

"You shan't have to complain against the non-Hindu character of the poem."

অথচ এই অভিযোগই তাঁর বিরুদ্ধে বারবার উত্থাপিত হয়েছে। বন্ধু রাজনারায়ণকে তিনি লিখেছেন যে, যদিও খ্রীস্ট ধর্মকে 'Civilizing agency' বলে তিনি মনে করেন, "but my real feeling is Hindu"। এখানে হিন্দু শব্দটির অর্থ একটু বুঝে নিতে হবে।

তিনি কাব্য রচনা করেছেন হিন্দু পুরাণ অবলম্বন করে, লিখেছেন বাংলা ভাষায়, পাঠক সব বাঙালী। স্বজাতি পরিচয় লুকিয়ে রাখা বিধেয় নয়। রাবণ অধর্মচারী নয়, বরং হিন্দু আচার অনুষ্ঠান সর্বতোভাবে পালন করেছে। তার মধ্যে আবার বাঙালী আচার প্রধান। লংকায় গঙ্গাজল আমদানী করতে হয়েছে—প্রথমে দেখি মেঘনাদকে সৈনাপত্য ভার দেবার সময়ঃ

যথোবিধি লয়ে গঙ্গোদক, অভিষেক করিলা
কুমারে। (প্রথম সর্গ)

আবার কাব্যের উপসংহারে দেখি। মেঘনাদের প্রেতকৃত্য সমাপন হবে—সেখানে রাক্ষসেরা বহন করে নিয়ে চলেছে—

স্বর্ণ কুম্ভে পূত অম্বোরাশি
গাংগেয়। (৯ম সর্গ)

আবার দাহকার্য সম্পন্ন হলে

ধৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে।

দীর্ঘ আট বৎসর তিনি মাদ্রাজে ছিলেন; লংকা ও মদ্রভূমির মধ্যে যোগ আছে। কিন্তু লংকার গল্পের একটি উৎসব অনুষ্ঠানেও মাদ্রাজ উপস্থিত নেই, গণেশ পূজা, মুরুগা বা কার্তিকেয় পূজার প্রসংগ নেই। আছে শুধু বংগদেশীয় উৎসব অনুষ্ঠানের কথা। সেই তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে শচীর সহচরীরূপে পাচ্ছি কতিপয় দেবী, যারা সর্বতোভাবে বাংগালায় পূজ্য—ষষ্ঠী, মনসা, শীতলা। মেঘনাদবধ কাব্য সম্পূর্ণত বংগ প্রসংগে মুখর।

দুর্গোৎসব প্রসংগ বহুবার উল্লেখিত—

১. বিজয়া দশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতয়ে গৌড় গৃহে (১ম সর্গ)

২. সোনার প্রতিমা, যথা! বিমল সলিলে
ডুবে তলে জলরাশি উর্জলি স্ব-তেজে। (২য় সর্গ)

৩. কিম্বা দীপাবলী (অম্বিকার পীঠতলে শারদ পার্বণে)
হর্ষে মগ্ন যবে পাইয়া মায়েরে চিরবাঞ্ছা। (৫ম সর্গ)

৪. যথা মহানবমীর দিনে
শাক্ত ভক্ত গৃহে, শক্তি, তব পীঠতলে। (৯ম সর্গ, ৩৭৪-৭৫)

৫. প্রতিমা পঞ্জর, সখি, শূন্য কান্তি যথা
প্রতিমা বিহনে। (৯ম সর্গ)

৬. রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লংকার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে। (৯ম সর্গ, ৪৪১-৪২)

তা ছাড়াও নানা বিষয় বর্ণনায় বাঙালীর মাঙ্গলিক আচার অনুষ্ঠান তিনি গ্রাহ্য করেছেন। রাবণের রাজসভা বর্ণনা করেছেন ঃ

ভুতলে অতুল সভা স্ফটিকে গঠিত ;
তাহে শোভে রত্নরাজি মানস সরসে
সরস কমলকুল বিকশিত যথা।
শ্বেত রক্ত নীল পীত স্তম্ভ সারিসারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ— (১ম সর্গ, ৩৯-৪৪)

কিন্তু এ হেন সভার বর্ণনাতেও পল্লবের মালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন। বাঙলা দেশে আম্র পল্লবের মালা উৎসব-প্রাঙ্গন সজ্জার অবশ্য-উপকরণ। বাঙালী হিন্দুর গৃহ বর্ণনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল তুলসী মঞ্চ।

আহা মরি, সুবর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল উজলি
দশ দিশ। (৪র্থ সর্গ, ৯০-৯১)

বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনের অনেক উপকরণ তিনি তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন তাতে সর্ব ভারতীয় উপাখ্যানের চরিত্রহানি ঘটে নি। বরং ধর্মান্তরিত মধুসূদনকে যেন আরও প্রবলভাবে প্রমাণ করতে হয়েছে, "My real feeling is Hindu।"

চার

পিতৃদ্রোহী, স্বধর্মচ্যুত মধুসূদন—এ অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে নিরন্তর উত্থাপিত হয়েছে। অথচ এই মধুসূদনই রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ, মন্দোদরী ও প্রমীলা চরিত্র সৃষ্টি করেছেন।

রাবণ শুধু অমিত শক্তিধর সেনানায়ক নন, তিনি সুশাসক, প্রজানুরঞ্জক, পত্নীপ্রেমিক সুজন স্বামী, স্নেহাতুর পিতা। মাইকেলের ব্যক্তিজীবনে যে সব বৃত্তির অভাব সন্দেহ করে এ যাবৎ যত অভিযোগ উঠেছে, মেঘনাদবধ কাব্য যেন প্রত্যেকটি অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে। উনিশ শতকে হিন্দু কলেজের শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের বিদ্রোহের ধ্বংসাত্মক দিকটি সবাই তারস্বরে বলেছেন, তার সদর্থক দিকের প্রতি কারো নজর পড়ে নি। 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অটলই সবার কাছে সত্য হয়ে থাকল। অথচ মাত্র দুটি পাতা উলটালে 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটিকায় এলে ভক্তপ্রসাদের পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হত। আর সেই অভিজ্ঞতা হাজার গুণ সমৃদ্ধ হবে 'মেঘনাদবধ কাব্য' পড়লে। শুধু অস্বীকৃতি নয়, সাঙ্গীকরণ যে কত গভীর, প্রতি পৃষ্ঠায় সে সত্য মুদ্রিত হয়ে আছে। শুধু দেশপ্রেম নয়, আছে পূর্ণ মনুষ্যত্বের আয়োজন। রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, প্রমীলা ও মন্দোদরী আমাদের

নতুন পরিবার জীবনের আদর্শ চিত্র—সবটুকুই তখন আমরা আদায় করতে পেরেছি, তা হয়ত সত্য নয়। কিন্তু সেই তো আমাদের স্বপ্নসাধ, আমাদের ঈপ্সিত লক্ষ্য।

চিত্রাঙ্গদার ভর্ৎসনার জবাবে রাবণের এই উক্তি বারবার স্মরণীয়—

এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে,
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবানিশি। (১ম সর্গ)

প্রতিটি প্রজাই তো তাঁর পুত্রতুল্য! তাদের মৃত্যু অসহনীয়। পিতা যুদ্ধযাত্রা করছেন জেনে ইন্দ্রজিৎ স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করে রাজসভায় এসে দাঁড়াল:

থাকিতে দাস যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক পিতঃ! ঘুষিবে জগতে (১ম সর্গ)

পুত্রকে আলিঙ্গন করে মস্তক আঘ্রাণ করে রাবণ বলেছিলেন,

এ কাল সমরে
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার। (১ম সর্গ)

যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে স্বামী স্ত্রী এক সঙ্গে মন্দোদরীকে প্রণাম করতে গেছে,

শিবের মন্দিরে এবে রাণী মন্দোদরী
যুবরাজ! তোমার মঙ্গল হেতু তিনি
অনিদ্রায়, অনাহারে পূজেন মহেশে। (৫ম সর্গ)

শিবালয় হতে তিনি বেরিয়ে আসতে ও'রা তাঁকে প্রণাম করল:

হরষে দুজনে
কোলে করি শিরঃ চুম্বি, কাঁদিলা মহিষী।

পুত্র ইন্দ্রজিৎ অন্যায় রণে নিহত হয়েছে; রাবণ যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত। এমন সময় মন্দোদরী এসে রাজসভায় উপস্থিত হলেন। "রাজপদে পড়িলা মহিষী।" তখন রাবণের আচরণ ভদ্র মার্জিত সভ্য পরিবারের চিরকালের আচরণ:

যতনে সতীরে তুলি, কহিলা বিষাদে
রক্ষোরাজ, "বাম এবে রক্ষঃ কুলেন্দ্রাণি,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি। তবে যে বাঁচিছ
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার। যাও ফিরি শূন্য-ঘরে তুমি:
রণক্ষেত্রে যাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে?
বিলাপের কাল দেবি, চিরকাল পাবে! (৭ম সর্গ)

এই সেই রাবণ, যে রাবণ ভবিতব্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে নি। সংগ্রাম, শুধু সংগ্রাম করেছে। শুধু ব্যক্তি হিসাবে, পরিবারের মধ্যমণি হিসাবে নয়, রাষ্ট্র-অধিনায়করূপেও তাঁর মূর্তি অত্যন্ত মহিমাব্যঞ্জক।

বহুকালাবধি
পালিয়াছি পুত্রসম তোমা সবে আমি ;
জিজ্ঞাসহ ভূমণ্ডলে কোন বংশ খ্যাতি
রক্ষোবংশ খ্যাতিসম। (৭ম সর্গ)

রাষ্ট্র অধিনায়ক ও পিতা রাবণ প্রায় সমুচ্চারিত সম্মানে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর শেষ আক্ষেপ-উক্তি সর্বকালের শোকাহত পিতার উক্তি। কিন্তু বিশেষ করে উনিশ শতকের।

ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি, তোমার সম্মুখে ;
সঁপি রাজ্যভার পুত্র, তোমায় করিব
মহাযাত্রা। (৯ম সর্গ)

রাবণের সব ইচ্ছা উপহসিত হল ; শুধু ইন্দ্রজিতের ভাগ্যরবি নয়, সমগ্র লঙ্কাবাসীর ভাগ্যরবি রাহুগ্রস্ত হল। রাবণের পারিবারিক বিপর্যয়ের কাহিনী জাতীয় বেদনার আখ্যায়িকায় রূপান্তর লাভ করেছে। মেঘনাদবধ কাব্যে শুধু মেঘনাদের মৃত্যু বর্ণিত হয় নি। আর এ শোকও শুধু রাবণ বা মন্দোদরীর নয়। সীমিত বেষ্টনীর মধ্যে বিরত বা নিষ্পিষ্ট না হয়ে এক উদার ব্যাপ্তি লাভ করেছে এ কাহিনী।

পাঁচ

পদ্মিনী উপাখ্যানের কবি পদ্মিনীর উপাখ্যানই বলেছেন ; সে উপাখ্যান সমকালের উপাখ্যান হয় নি। সাধারণ ভাষায় তিনি বলেছেন, স্বাধীনতা হীনতায় জীবন-যাপন আকাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। আর এই সত্য রাবণ উনিশ শতকের বিশিষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন :

১. যে শয্যায় আজ তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে
সদা।

২. রিপুদলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে ?
যে ডরে, ভীরু, সে মূঢ়, শত ধিক্ তারে।

৩. দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে, বীরমাতা তুমি ;
বীরকর্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত
ক্রন্দন ?

রাবণ দেশরক্ষায় ব্রতী ; বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করার সংগ্রামে অনমনীয় মনোভাব নিয়েছেন ঃ

শত প্রসরণে
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণলঙ্কাপুরী।

অতএব যুদ্ধ ব্যতীত উপায় নেই। বিকল্প পথ নেই। ইন্দ্রজিৎ রাবণের এই মনোভাবকেই পুষ্ট করেছেন। ইন্দ্রজিৎ রাবণেরই পুত্র। তবে রাবণের সম্পূর্ণতা ইন্দ্রজিতের জীবনে নয়, তার মৃত্যুতে। এখানে পিতৃত্ব প্রজননে নয়, মননে ও প্রাণনে সার্থক ঃ

ধিক মোরে, কহিলা গম্ভীরে
কুমার, "হা ধিক মোরে ! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে ? (১ম সর্গ)

মাতা মন্দোদরী যখন শঙ্কা প্রকাশ করেছেন, তখন ইন্দ্রজিৎ বলছে—

কি সুখ ভুঞ্জিব ;
যতদিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে !
আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে ?

স্ত্রী প্রমিলাকে অশ্রু মোচন করতে দেখে বলেছে—

সৃজিলা কি বিধি, সাধ্বি, ও কমল আঁখি
কাঁদিতে ?

সব উক্তিই সমকালের অবুঝ ব্যক্তিদের উদ্দেশে।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ চোরের মত প্রবেশ করেছে, তাকে পথ দেখিয়ে এনেছে খুল্লতাত বিভীষণ। এখানে ইন্দ্রজিতের প্রতিটি উক্তি সমকালের ভারতবর্ষের ধুলোমাটি-মাখা। যা তার মধ্যে সদর্পে দাঁড়িয়ে আছে ভারতের সদ্য রক্ত-ঝরা ইতিহাস ঃ

১. নগর তোরণে অরি ; কি সুখ ভুঞ্জিব
যতদিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে ? (৫ম সর্গ)

২. নিজ গৃহ পথ তাত, দেখাও তস্করে ?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে ? (৬ষ্ঠ সর্গ)

৩. কোন ধর্মমতে, কহ দাসে শুনি
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা। (৬ষ্ঠ সর্গ)

বিশ্বাসঘাতক সম্পর্কে মধুসূদন যে মূল্যায়ন করেছেন, তার পিছনে সমকালের ইশারা না থাকলে তার আবেদন এমন মর্মভেদী হত না।

১.   তোর পূর্ব কর্মফলে
সুপ্রসন্ন.তোর প্রতি অমর ; পাইবি
শূন্য রাজ সিংহাসন, ছত্রদণ্ডসহ
তুই।   (৬ষ্ঠ সর্গ)

২.   এবে
পাপপূর্ণ লংকাপুরী ; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লংকা এ কাল-সলিলে !
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি। পরদোষে কে চাহে মরিতে ? (৬ষ্ঠ সর্গ)

অন্যায় যুদ্ধকারী, পররাজ্যলোলুপ সৈনিক কোন মূল্যবোধ স্বীকার করে না—লক্ষ্মণের উক্তিতে তা স্পষ্ট হল—

জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর ; ক্ষাত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু
পালিব তোর সঙ্গে ? মারি অরি
পারি যে কৌশলে।

হতভাগ্য বাহাদুর শাহের নিরস্ত্র পুত্রকে মসজিদের মধ্যেই গুলি করে হত্যা করতে সংকোচ কি ?

ছয়

মেঘনাদবধের কবি রামপক্ষীয়দের প্রবল ভর্ৎসনা করেও সীতা প্রসঙ্গে সর্বদা দুর্বল। কাব্যে সীতার জন্য চতুর্থ সর্গে যতখানি স্থান ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, কাব্যের প্রয়োজনে তা অহেতুক। কাব্য থেকেও কবির ব্যক্তিরুচি বড়। জাতিবিদ্বেষ সৃষ্টি করা তাঁর কাজ নয় ; তিনি জানেন, মাতৃভূমির স্বার্থরক্ষা আর জাতি-বিদ্বেষ প্রচার এক ধর্ম নয়। তাই সীতার মুখ থেকে তিনি যখন এই প্রকার উক্তির প্রকাশ ঘটান তখন বিমূঢ় হই না।

"রক্ষঃ কুল দুঃখে বুক ফাটে, মা, আমার !" (৪র্থ সর্গ)

সীতা ও সরমা—দুইটি চরিত্রের মধ্যে তুলনা করলে কবির বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে ক্ষেত্রে সীতা রাক্ষস-নিধনে ব্যথিত, সরমা প্রসন্নচিত্তে সেই বিবরণ পরিবেশন করছে। বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীর যোগ্য সহধর্মিনীই বটে !

দেখ চেয়ে, সাগরের কূলে,
শবাহারী জন্তুপুঞ্জ ভুঞ্জিছে উল্লাসে
শব রাশি ! কান দিয়া শুন, ঘরে ঘরে
কাঁদিছে বিধবা বধূ ! আশু পোহাইবে
এ দুঃখ-শর্বরী তব।   (৪র্থ সর্গ)

এই সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর বন্ধুকে পরামর্শ দিয়েছিলেন,—'If you want your boy to get in, send him here while he is young enough to be Europeanised." (26 October, 1864)

এই সেই ব্যক্তি যিনি লিখেছেন, "I should scorn the pretensions of that man to be called 'educated' who is not master of his own language." (20 January, 1861)

মীওনাইডস বহুকাল মৃত ; যিনি টিকে আছেন, তিনি সাগরদাঁড়ির রাজনারায়ণ দত্ত ও জাহ্নবী দেবীর সন্তান। যাঁরা মধুসূদনের কাব্য ব্যাখ্যায় নেমে মধু-চরিত্রের মধ্যে প্রবল স্ববিরোধিতা প্রত্যক্ষ করেন, তাঁরা মধুসূদনের এই মীমাংসার মাটিতে পা ফেলতে চান না। অবশ্যই মধুসূদনের কবি-জীবন আর ব্যক্তি জীবন একে অপরের প্রতিবিম্ব নয়। যেখানে এক নয়, সেখানকার সব যন্ত্রণা তিনি একাই বহন করেছেন।

ধনীর দুলাল মধুসূদন টাকা গুণে খরচ করতেন না, এমন কি তাঁর ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানকেও গুণে টাকা দিতেন না। ঐশ্বর্য তাঁকে সম্পদবানদের সমর্থক তৈরী করে নি। প্রথম বাংলা কাব্য তিলোত্তমাসম্ভবে লিখবেন,

"রাজেন্দ্রদ্বারে যথা দরিদ্র, প্রহরী-বেত্র
আঘাতে শরীর জর জর।" —(১ম সর্গ)

কলকাতার ধনীর দরজায় এ দৃশ্য তিনি কতবার দেখেছেন !

খ্রীস্টীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত তিনি ; সেখানে বিধবা কন্যার বিবাহ স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু তিনিই এমন একটি দীর্ঘনিশ্বাসতপ্ত পঙক্তি লিখলেন,

'বিধবা দুহিতা যেন জনকের গৃহে।' (৩য় সর্গ)

স্ববিরোধিতার সকল যন্ত্রণা মধুসূদন একাই বহন করেছেন। উন্মুখ-দেশবাসীর জন্য তিনি যা দিয়ে গেছেন—তা ব্যক্তি-সংকটের গরল নয়, সুসমঞ্জস ব্যক্তির হৃদয়-সুধা ! তাই বিষাদ নয়, আনন্দই তাঁর কাব্যপাঠের শেষ নিষ্পত্তি।

চিঠিপত্রের আলোকে মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা

ক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল

॥ এক ॥

ছোট-বড় নিয়ে মধুসূদনের মোট ১৪৫ খানি চিঠি পাওয়া গেছে।* এর মধ্যে দু'খানি মাত্র বাংলায় লেখা, বাকি সবগুলিই ইংরাজিতে। মধুসূদনের উনপঞ্চাশ বছরের (১৮২৪-৭৩) জীবনকে সচরাচর কয়েকটি পর্বে ভাগ করা হয়। প্রাপ্ত চিঠিগুলিকে ঐ পর্ব অনুসারে সাজালে যে ছকটি চোখে পড়ে, তা হল ঃ

১ম পর্ব বা প্রাক্ হিন্দুকলেজ পর্ব, (১৮২৪-৩৭) = চিঠিপত্রের সংখ্যা ঃ শূন্য
২য় „ „ হিন্দুকলেজের ছাত্রজীবন, (১৮৩৭-৪৩) = „ „ একুশ
৩য় „ „ খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ ও বিশপ্‌স্ কলেজে অবস্থান (১৮৪৩-৪৭) = „ চৌদ্দ
৪র্থ „ „ মাদ্রাজ পর্ব (১৮৪৭-৫৬) = „ নয়
৫ম „ „ কলকাতায় প্রত্যাবর্তন ও বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিতে আত্মনিয়োগ (১৮৫৬-৬২) = „ পঁয়তাল্লিশ
৬ষ্ঠ „ বা য়ুরোপ প্রবাস পর্ব (১৮৬২ ৬৬) = „ ছত্রিশ
৭ম „ „ ব্যারিস্টারি জীবন ও অন্তিমপর্ব (১৮৬৭-৭৩) = „ কুড়ি

দেখা যাবে যে, সংকলিত পত্রগুচ্ছের মধ্যে ৫ম পর্বের চিঠির সংখ্যাই সর্বাধিক এবং এগুলির অধিকাংশই তাঁর তৎকালে সৃষ্ট ও সৃজ্যমান বাংলা সাহিত্যকর্ম-বিষয়ক। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্বে প্রায় সব চিঠির উদ্দিষ্টই হলেন তাঁর হিন্দুকলেজের সহপাঠী ও একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু গৌরদাস বসাক। অন্যান্য পর্বেও যে গৌরদাস অনুদিষ্ট তা নয়, তবে একমাত্র বা মুখ্য পত্রপ্রাপক ন'ন। ৫ম পর্বে রাজনারায়ণ-বসুর সঙ্গে পত্রালাপই মুখ্য হয়ে উঠেছে এবং ৬ষ্ঠ—বিদ্যাসাগরকে লেখা পত্রগুচ্ছ।

পত্রলেখায় মধুর কোন আলস্য বা অনীহা ছিল বলে মনে হয় না। তাঁর লেখনী ছিল সদা অক্লিষ্টগতি ও স্বতঃস্ফূর্ত। সে হিসেবে সাকুল্যে ১৪৫টি মাত্র চিঠি—যা এযাবৎ সংগৃহীত—সংখ্যায় কমই বলতে হবে। মনে হয় অনেক চিঠিপত্র হারিয়ে গেছে বা এখনো সন্ধান পাওয়া যায় নি। পাওয়া গেলে মধুসূদনের জীবনের অনেক অন্ধকার পরিচ্ছেদ আলোকিত হতে পারত। যেমন, মধুর পিতা-

* হরফ প্রকাশনীর মধুসূদন-রচনাবলী দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধে চিঠির ক্রমিক সংখ্যায় এবং চিঠিপত্রের উদ্ধৃতিতে উক্ত গ্রন্থের পাঠই অনুসৃত হয়েছে।—লেখক।

মাতার কাছে লেখা কোন চিঠি আমরা পাই নি। বিশপ্‌স্‌ কলেজ থেকে কেন তিনি সহসা মাদ্রাজ চলে গেলেন, কেন পিতা রাজনারায়ণ তাঁর মাসিক ভাতা বন্ধ করলেন, তাঁদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন পত্রালাপ হয়েছিল কি না, এর কোন হদিশ আমরা পাই না। এমন কি, প্রথমা পত্নী রেবেকার সঙ্গে, কিংবা দ্বিতীয়া পত্নী হেনরিয়েটার সঙ্গে কোন পত্রালাপের সামান্যতম নিদর্শনও আমাদের হাতে আসে নি। মধু-র প্রণয়ী-জীবনের বা দাম্পত্য জীবনের কোন লিপি-নিদর্শনই মেলে না। কেবল মাদ্রাজ থেকে গৌরদাস ও ভূদেবকে লেখা এক আধখানা চিঠিতে রেবেকার উপস্থিতির আভাস পাই। রেবেকা মধুসূদনের চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে চিঠিখানা পড়ছেন ও মন্তব্য করছেন। তেমনি ফ্রান্সের ভার্সাই থেকে বিদ্যাসাগরকে লেখা চিঠিতে হেনরিয়েটার দুই এক স্থলে উল্লেখ আছে ; যেমন, মধু নিজে শয্যাগত বলে হেনরিয়েটা পত্রের অনুলেখকের কাজ করছেন, কিংবা নিয়ত উপবাসক্লিষ্টা হেনরিয়েটাকে মধু আশ্বাস দিচ্ছেন যে, কলকাতায় ফিরে গিয়ে তাঁরা বিদ্যাসাগরের বাড়িতে পেট ভরে ভাত খেতে পারবেন।

বিলেত থেকে মহাদেব চাটুজ্জে বা দিগম্বর মিত্রকে যে সব চিঠি তিনি লিখেছিলেন তাঁদের প্রতিশ্রুত অর্থ যথাসময়ে না পাওয়ার অনুযোগে—বিদ্যাসাগরকে লেখা চিঠিতে যার উল্লেখ আছে—তার নিদর্শনও হারিয়ে গেছে। এ ছাড়া, তাঁর জীবনের শেষ চার বছরেরও কোন চিঠিপত্র আমরা পাই নি। ভগ্নস্বাস্থ্য, রোগজীর্ণ, ঋণ-ভারাক্রান্ত, নৈরাশ্য-পীড়িত এই শেষ বছরগুলিতেও মধুসূদনের সৃষ্টিক্ষমতা ও কার্যক্ষমতা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নি। ১৮৭১-এ তাঁর ‘হেকটরবধ কাব্য’ প্রকাশিত হয় এবং ১৮৭২-এর ডিসেম্বরে তিনি ‘বেঙ্গল থিয়েটারে’র জন্য ‘মায়াকানন’ নাটিকাটি রচনা করেন। কাজেই চিঠিপত্র লেখার মত মনের অবস্থা তাঁর তখন ছিল না এটা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু এ সময়ের কোন চিঠিপত্রই মেলে নি।

মাঝে মাঝে দীর্ঘকালব্যাপী এমনি চিঠি-শূন্যতা আরও আছে। যেমন, বিশপ্‌স্‌ কলেজ থেকে লেখা মধুর শেষ চিঠি (১৯শে মে, ১৮৪৭) আর মাদ্রাজ থেকে লেখা প্রথম চিঠি (১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৮৪৯)—এর মধ্যে প্রায় দু'বছরের ছেদ। আবার আগস্ট ১৮৪৯ থেকে ২০শে ডিসেম্বর ১৮৫৫, মাদ্রাজ প্রবাস কালে এমনই আরেক পত্রহীন ঊষরতা, যার বিস্তার ছয় বছরেরও বেশী। ৫-ম পর্বে কলকাতায় ফেরার পরেও, ১৮৫৬-৫৮-র মধ্যে বছর দুয়েকের একটি ছেদ চোখে পড়ে—যার মধ্যে চিঠিপত্রের সেতুবন্ধন নাই। এ সবই রহস্যময়। এই কালখণ্ডগুলিতে তিনি যে কোন চিঠিপত্রই লেখেন নি, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু সে-সব চিঠির উদ্দিষ্ট কারা ছিলেন এবং সেগুলি কোথায় হারিয়ে গেল কোন চিহ্নমাত্র না রেখে—এ জিজ্ঞাসার কোন উত্তর নেই। মধুসূদনের জীবনের অনেকগুলি অধ্যায় চিঠিপত্রে উদ্ভাসিত বৈশদ্যের অভাবে আজও অনুজ্জ্বল ও রহস্যে আবিল। পরবর্তী কালে

যদি নব-আবিষ্কৃত চিঠিপত্রে এই সব শূন্যতা ভরে ওঠে, মধু-জীবনীর অনেক রহস্যের নিরসন হবে, অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর মিলবে।

তবু যে-চিঠিগুলি আমাদের হাতে এসেছে তার মূল্যও কম নয়, কারণ মধুসূদনের চরিত্র ও প্রতিভার দীপ্তিতে সেগুলি সমুজ্জ্বল।

॥ দুই ॥

মধুর জীবনের প্রথম ষোল বছরের কোন চিঠি আবিষ্কৃত হয় নি। তাঁর লেখা প্রথম যে-চিঠিগুলি পাই তখন তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র, সীনিয়র ক্লাসে সবে উঠেছেন, সতেরো বছরের তরুণ। তরুণ বয়সের এই চিঠিগুলি থেকেই মধু-চরিত্রের অনেক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। এই সদ্য-উত্তীর্ণ-কৈশোর নবীন যুবকের সব চিঠিতেই পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সুর। পত্রের উদ্দিষ্ট গৌরদাস যেন সে তুলনায় বালক। তার অভিমান ও সৌকুমার্য যেন মধু'র সস্নেহ প্রশ্রয়-প্রত্যাশী। মধু'র কণ্ঠে সেই প্রশ্রয় আশ্বাস যেমন ধ্বনিত তেমনি অপরিমেয় বন্ধুপ্রীতির উৎসার। কোন দ্বিধা দৌর্বল্য নাই, আপন ক্ষমতার প্রতি পূর্ণ আস্থায় সমাসীন এক সপ্রতিভ পূর্ণপরিণত মানুষ। আবেগের উচ্ছ্বাস আছে, প্রগল্‌ভতাও আছে, কিন্তু দুর্বলতার লেশমাত্র নাই। সহকারী প্রধান শিক্ষক মিঃ কার (Kerr)-এর ব্যবহারে তার আত্মমর্যাদা আহত, তাই সে কার-এর ক্লাসে আর যাবে না। কলেজেই আর সে যাবে না, যেহেতু কার এখন অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত। মায়ের অসুখে ব্যাকুলিত, আত্মীয়ের অসুখেও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, অত্যন্ত হৃদয়বান এই যুবক।

গভীর আত্মবিশ্বাস—সে একদিন জগতের অন্যতম মহাকবিরূপে বিখ্যাত হবে। হবেই, যদি সে ইংলণ্ডে যেতে পারে। তার প্রিয় কবি বায়রনের মতই বিখ্যাত। বন্ধু গৌরদাস কি টম মুরের মত তার জীবনী লিখতে পারবে না? হাঁ, সে এখনই একটা বড় কবিতায় হাত দিয়েছে। "By the bye, I am writing a long poem"। একগুচ্ছ কবিতা কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে উৎসর্গ করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। উৎসর্গের ভাষা ও ভঙ্গি অত্যন্ত সংযত ও মার্জিত, কোন ভুলুণ্ঠিত অতি বিনয় নেই। "To Wm. Wordsworth, the poet, from an admirer......the author." ওয়ার্ডসওয়ার্থ গ্রহণ করবেন কি না তাই নিয়ে সামান্য উত্তেজনা। Bentley's Miscellany-তেও কবিতা পাঠাচ্ছেন। সঙ্গে যে সবিনয় আত্ম-পরিচায়ক পত্রটি দিয়েছেন, তার ভাষাও অত্যন্ত সাবলীল—বিনম্র ও সশ্রদ্ধ, কিন্তু আতিশয্য-বর্জিত। অষ্টাদশশতকী কেতাদুরস্ত শিষ্ট বাচনভঙ্গি, কিন্তু কোন ন্যাকামি নেই, ছিবলেমি নেই। পরিণতমনা, আত্মবিশ্বাসী এক তরুণ কবি।

গৌরদাস তাঁর প্রাণপ্রতিম বন্ধু সন্দেহ নাই, সে ঘোষণা বারংবার উচ্চারিত, কিন্তু অন্যান্য সহপাঠী ও বন্ধুবান্ধবের প্রতিও তিনি উদাসীন নন,—বন্ধু ভূদেব,

মতি, মাধব, সকলের জন্যই প্রীতিপূর্ণ আমন্ত্রণ। সকলকে নিয়েই তাঁর 'মণ্ডলী'— যে সৌরমণ্ডলের তিনি কেন্দ্রবর্তী সূর্য।

এই যে নিজেকে একটুও হাতে না রেখে, এমন পরিপূর্ণ ভাবে, আমোদে প্রমোদে, কাব্যসৃষ্টিতে, সাহিত্যচর্চায়, নানাদিকে নিজেকে উৎসারিত করা—এটাই মধুর স্বভাব। যেমন জীবনের আনন্দে সমুচ্ছল, তেমনি সেই সঙ্গে সুগভীর আত্মবিশ্বাস এবং আপন প্রতিভার দায়িত্ব-চেতনায় স্থির।

পিতার প্রতি মান্যতার অভাব নেই। তাঁর আদেশে সাগরদাঁড়িতে নির্বাসন কিংবা শাস্তি হিসেবে তমলুকে কয়েক সপ্তাহ কাটানো, এ-সবই অপ্রতিবাদে করেন। কিন্তু তাই বলে দশমবর্ষীয়া বালিকার সঙ্গে বিবাহে সম্মতি দান, কিংবা সে প্রস্তাব অপ্রতিবাদে মেনে নেওয়া! সে অসম্ভব। কী যন্ত্রণাকর পরিস্থিতি! এর চেয়ে মৃত্যুও ভালো ছিল। "I wish (Oh, I really wish) that somebody would hang me!"—লিখছেন গৌরদাসকে। তা ছাড়া বিলেত যে আমায় যেতেই হবে, সে সংকল্পের নড়চড় হতে পারে না। দু-এক বছরের মধ্যেই আমি বিলেত যাব, অন্যথায় প্রাণত্যাগ করবো। এসব কথা আর কাউকে বলি নি ভাই গৌর, তোমাকেও বলি নি এতদিন। জানি তুমি কাউকে বলবে না—"you are a gentleman." কিন্তু তুমি একথা কেন লিখেছ যে, "I will act the part of a friend"? আমি তো এর অর্থ কিছুই বুঝতে পারছি না।—এর আগে এক চিঠিতে গৌরদাসকে লিখেছিলেন,—"To follow poetry" (says A. Pope) "one must leave father and mother."—একটা সংঘর্ষ ও সংকল্পের আভাস এখানে উচ্চারিত। মনে হয়, অনেকদিন ধরেই কোন কোন বিষয়ে পিতার জবরদস্তি মধুসূদনের মনে একটা বিদ্রোহের ভাব জাগিয়ে তুলছিল।

কিন্তু এই দশমবর্ষীয়াকে বিবাহের অনুজ্ঞা মধুসূদনের পূর্বসংকল্পকে দুর্নিবার বেগসম্পন্ন করলো। প্রচণ্ড বিদ্রোহে ঘর ছেড়ে, স্ব-সমাজ ছেড়ে সে বেরিয়ে গেল। ধর্মান্তর গ্রহণ করলো, খ্রীস্টীয় সমাজে গিয়ে যোগ দিল। কী দুঃসাহস! মাত্র আঠারো বছরের তরুণ, কিন্তু এই বিপুল শক্তিমান হিন্দু সমাজকে অস্বীকার করতে একটুও কুণ্ঠা নেই, শঙ্কা নেই! নবজাত গরুড়ের মতই বিশালবক্ষ সাহস তার এবং নবজাত গরুড়ের মতই সে অমৃতের অভিলাষী!

॥ তিন ॥

মধুর ধর্মান্তর-পরবর্তী পর্বের মোট চৌদ্দখানি চিঠি পাওয়া গেছে। এবং সবগুলিই গৌরদাসকে লেখা। কী পাই সেখানে? কোন আত্মগ্লানি কিংবা অনুশোচনা? হঠকারিতার জন্য কোন দুঃখ, অবিমৃষ্যকারিতার কোন স্বীকৃতি?

বিন্দুমাত্রও না। বন্ধু গৌরদাস যে তাকে ভুলে গেল, আর কোন খোঁজখবরই নেয় না, সেই অনুযোগই ধ্বনিত হয়েছে প্রথম চিঠিখানিতে। চিঠির সূচনায় ইংরাজী অক্ষরে লেখা বাংলায় এবং তার নীচে, ব্র্যাকেটের মধ্যে, খোদ বাংলাতেই লেখা অনুযোগ—"ও গৌর, দুদিন চারদিনেতেই এত ! ! !"—মধুর অদম্য রহস্যপ্রিয়তারও আভাস দেয়। অরপর বন্ধুকে মাথার দিব্যি দিয়ে ওল্ডচার্চ মিশন রো-তে তাঁকে দেখতে আসতে অনুরোধ করছেন। পালকী করেই সে আসুক, মধুই সে-খরচ দেবে, কুছ পরোয়া নেই। আবার, পরিহাস-বিজল্পিত দুই চরণ পদ্যেও সেই একই অনুরোধ পুনরুচ্চারিত—সেই চিরপ্রাণোচ্ছল মধু!

"Come, brightest Gour Dass, on a hired Palkee,
And see thy anxious friend M. S. D."

আর একটি চিঠিতে গৌরকে অনুযোগ দিচ্ছেন, কেন সে চিঠির ঠিকানায় "To Christian M S. Dutt" লেখে?—এটা তাঁর পক্ষে মোটেই রুচিকর নয়। আর একটি চিঠিতে বলছেন, তোমরা পাক্কা হিন্দুস্থানী 'Mirza-like' পোশাক পরে এসো। য়ুরোপীয়দের অনুষ্ঠানে যাব কাজেই নিজেদের স্বজাতীয় ভদ্র পোশাকেই সেখানে যেতে হবে। অন্যত্র আর এক পত্রে বলছেন, "Come in your *proper* dress": ঘরে কিছু অভ্যাগত থাকবেন, তাঁদের সঙ্গে তোমাদের পরিচিত করে দেব। য়ুরোপীয়দের সঙ্গে সমমর্যাদায় দাঁড়াতে হবে, কাজেই পোশাক-আশাকে স্বাজাত্য সুচিহ্নিত করতে হবে। খ্রীস্টান হয়েছেন মধু, কিন্তু জাতীয় আত্মসম্মানবোধ খোয়ান নি। বরং তা এখন প্রখরতর। এই পর্বের শেষ চিঠিখানিতে নানা ঝঞ্ঝাট ও অশান্তির আভাস পাই—"I have been almost half-dead with all manner of trouble". এর পরই সহসা মাদ্রাজ প্রয়াণ এবং প্রায় দুই বছরের নীরবতা। সন্দেহ নাই যে, ঐ "all manner of trouble"-এর মধ্যে পৈত্রিক সাহায্যের মাসিক বরাদ্দ বন্ধ হয়ে যাওয়াই প্রধান, যার ফলে তাঁর বিশপ্‌স্‌ কলেজে অবস্থান অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু মধুসূদনের পৌরুষ কখনো পরাভব মানতে রাজী নয়। দক্ষিণী খ্রীস্টান বন্ধুদের সঙ্গে তিনি মাদ্রাজ চলে এলেন, এখানে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ প্রশস্ততর হবে এই বিবেচনায়। গৌরদাস প্রভৃতি কলকাতার বন্ধুদের পূর্বে কিছুই জানালেন না, পাছে পরিচিত সমাজ তাঁর দুর্দশায় আত্মপ্রসাদ লাভ করে—যেমন কর্ম তেমন ফল, খ্রীস্টান হতে গেছেন, এখন মরুন নাস্তানাবুদ হয়ে।

॥ চার ॥

মাদ্রাজ থেকেও প্রথমে কোন চিঠি দেন নি কাউকে। গৌরদাস সন্ধান নিয়ে তাঁর সঙ্গে পত্র-সংযোগ স্থাপন করেন। কাল ব্যবধান প্রায় দুই বছর। মাদ্রাজ

থেকে তাঁর প্রথম চিঠিতে মধু লিখছেন--কাউকেই খবর দিয়ে বা কারো কাছেই বিদায় নিয়ে আসা হয় নি। সেই সময় নানা দুশ্চিন্তায় ও অশান্তিতে মন ছিল বিক্ষুব্ধ। এখানে এসেও নিজের জন্য দাঁড়াবার একটু স্থান করে নিতেও অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। নির্বান্ধব দেশে সেটা করা যে সহজ হয় নি, তা বলাই বাহুল্য। তবে এখন অবস্থার কিছু সুরাহা হয়েছে, এখন আমি তুফান-পেরোনো নাবিকের মত বন্দরে এসে পৌঁছেচি। হ্যাঁ, এ-উপমাটা কেমন হোল?—"Here's a simile for you, my boy!"

তারপর বলছেন: হ্যাঁ, আমার বিবাহ সম্বন্ধে যে সংবাদ তুমি পেয়েছ তা ভুল নয়। আমার স্ত্রী ইংরেজ বংশোদ্ভূতা। তাঁর পিতা এই প্রেসিডেন্সীর একজন নীলকর ছিলেন।—"I had great trouble in getting her. Her friends, as you may imagine were very much against the match. However all is well that ends well."—ইংরেজ দুহিতার পাণিগ্রহণ সহজ হয় নি, তার আত্মীয়স্বজন বাধা দিয়েছিল: তবে সব ভালো যার শেষ ভালো।—তোমরা জেনে অবাক হবে যে, এত বিপত্তির মধ্যেও আমি একখানি কাব্য প্রকাশের আয়োজন সম্পূর্ণ করেছি।—"This will be my first regular effort as an author."—দুই সর্গের একটি কাব্য, নাম 'Captive Ladie' এবং এ ছাড়া ২/১টি খণ্ড-কবিতাও থাকবে বইটিতে। বারো'শ octosyllabic (আট মাত্রার) লাইনের এই কাব্য এবং বিশ্বাস করো, তিন সপ্তাহের মধ্যে লিখেছি। লিখেছিলাম একটি স্থানীয় সাময়িক পত্রের জন্য। অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাঁদেরই অনুরোধে এটি আমি বই আকারে প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি। কিছু আগাম ক্রেতা জোগাড় করে দিতে পারো?—"Can't you get me a few subscribers?"—আমার পুরনো সহপাঠীদের কাছেই তো চল্লিশ কপি বিক্রী হয়ে যাবে, কি বলো?···

তারপর আরেক কথা মনে পড়ে গেছে।—"I say, old Gour Dass Bysack! Can't you send me a copy of the Mahabharat by Cassidoss, as well as a ditto of the Ramayana,—Serampore edition. Won't you oblige me, old friend, old Gour Dass Bysack?"—একখানি কাশীদাসী মহাভারত আর একখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠিয়ে দিও ভাই গৌরদাস। বাংলা যে ভুলে যাচ্ছি ভাই!

কী কঠিন সংকট অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে, বিদেশে বিভুঁয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে কাব্য রচনায়—আপন প্রতিভা-নির্দিষ্ট, বিধাতা-নির্দিষ্ট কর্মে—নিজেকে নিয়োজিত করেছেন মধুসূদন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিও যথেষ্ট মমতা বিদ্যমান। চর্চা অভাবে মাতৃভাষা পাছে ভুলে যান তাই বাল্যে অধীত সেই রামায়ণ আর মহাভারত হাতের কাছে রাখতে চান।

এখানেও মধু'র কোন চিঠিতেই হতাশার সুর নাই, পরাজয়ের শংকা নাই,—

নিজের প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং প্রত্যয়। ইংলণ্ড যাত্রার কোন কথা অবশ্য এখন আর শ্রুত হয় না। বাস্তবের কঠোর আঘাতে সে সব স্বপ্ন হয়তো এখন দিগন্তবিলীন। কিন্তু পথ কঠিন হয়েছে বলে বীর হৃদয় কখনো নিরুৎসাহ হয় না, মধুরও হয় নি। সুদূর মাদ্রাজে আত্মীয় বান্ধবহীন সমাজে, এক ইংরেজ ললনাকে বিবাহ করে, পুরো-দস্তুর এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বনে গিয়েও সে তার জীবনের আসল লক্ষ্য, আজন্মপোষিত অমৃত-পিপাসা বিসর্জন দেয় নি। সে কাব্য রচনা করে চলেছে, কবি হিসাবে কিছু প্রতিষ্ঠাও অর্জন করেছে ইতিমধ্যে। আরো যশখ্যাতি প্রতিষ্ঠার পথে সে অক্লান্ত উৎসাহে অগ্রসর।

মাদ্রাজ থেকে গৌরদাসকে লেখা দ্বিতীয় পত্রখানিতে [৩৭ সংখ্যক পত্র] সামান্য কিছু নিজের বৈষয়িক সংবাদ আর বাকি সবটাই তাঁর নতুন কাব্য সম্পর্কে। 'Captive Ladie-র ভূমিকায় স্ত্রীকে উদ্দিষ্ট করে যে স্তবকগুলি লিখেছেন, তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করে বন্ধুকে পাঠাচ্ছেন।—কেমন লাগলো বন্ধু, জানাবে। মন্দ হয়নি বোধ হয়, কী বলো ?

এ-গ্রন্থটি সমাদৃত হলে সে আরেকখানি শীঘ্রই প্রকাশ করবে। সাধারণের কৌতূহল এবং নিজের উৎসাহ যাতে ঝিমিয়ে না যায়।

তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়েছে—গৌর, ভূদেবের মা-কে দেখেছ তুমি কখনো ? তাঁর রাণীর মত মহিমা আমি আজও ভুলতে পারি নি। যখনই কোন ভারতীয় রাজকুমারীকে কল্পনা করি, ওঁর এবং আমার এক স্বর্গতা পিসীমার চেহারা আমার মনে ভাসে। বাঙালী মহিলাদের মধ্যে ওঁদেরকেই আমি সুন্দরীতমা মনে করি। এঁদের স্মৃতি আমি আমার পরবর্তী নায়িকার মধ্যে রূপায়িত করবো।

মনের কী বিচিত্র তরঙ্গ ! শুদ্ধান্তঃপুরিকা বর্ষীয়সী মহিলাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ রূপ ও সম্রাজ্ঞীসুলভ মহিমা যে দেখেছিলেন সে কথা মনে পড়লো,—এই টঁ্যাস ফিরিঙ্গি-বনে যাওয়া, ইংরেজ মেম বিয়ে-করা যুবকের ! সে আবার বাংলা রামায়ণ মহাভারত পড়তেও ভালোবাসে ! একই কালে স্ব-সমাজকে ত্যাগ ও স্বীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সুদৃঢ় অঙ্গীকার—এই অদ্ভুত ঘটনা দেখি আমরা।

মাদ্রাজ থেকে পরবর্তী সব ক'খানি চিঠিই ঐ কাব্য সম্পর্কিত কথাবার্তায় ভরা। 'ক্যাপটিভ লেডী' কাকে কাকে দেওয়া হয়েছে ও হবে, কে কি বলছে না বলছে, এই সবই এখন মধুর মন জুড়ে আছে। এক স্থানে বলছেন,—'হরকরা' ক্যাপটিভের নিন্দা করেছে ? কী এসে যায় তা'তে ? অনেক প্রশংসা পেয়েছি, সামান্য কিছু নিন্দা অসহ্য ঠেকবে না। মানব জীবনের চরম পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান অর্জনে আমি দৃঢ় সংকল্পিত এবং সে প্রয়াসে বদ্ধপরিকর।

আবার আরেকখানি পত্রে [৪১] লিখছেন,—বুঝেছি 'ক্যাপটিভ' পড়ে তুমি হতাশ হয়েছ। কিন্তু মন খারাপ কোর না। আমি তো খ্যাতির জন্যে লিখি নি। এর দ্বারা কিছু বিদ্বজ্জনের সঙ্গে পরিচিতি ঘটলো, এ্যাডভোকেট জেনারেল মিঃ নর্টন

আমার অন্যতম পরম বান্ধব ও পৃষ্ঠপোষক হয়েছেন, এ সবই আমার লাভ। মিঃ নর্টনের সাহায্যে একটা কলেজ অধ্যক্ষ বা স্কুল-ইন্‌স্পেক্টরের পদ পাওয়ার সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল হয়েছে। এদিকে প্রেস তার পাওনার জন্য তাগাদা করছে। তোমাদের ওদিককার পাওনা টাকাগুলি শীগ্‌গির করে পাঠিয়ে দিও।...আর দ্যাখো, মিঃ বেথুনকে এক কপি 'ক্যাপটিভ' দিও, সঙ্গে আমার এই চিঠিখানি।...কিন্তু গৌরদাস, আমার মায়ের কথা তুলে আমায় তিরস্কার করা তোমার উচিত নয়। আমাদের প্রত্যেককে নিজের জীবনের পথ নিজেই করে নিতে হবে। মা'র আঁচল ধরে তো আর আমি চিরকাল চলতে পারি না।—"I tell you, in this world we have all to cut our paths for ourselves. How can you expect a fellow to be in his mother's apron ?"

পৌরুষের দৃঢ় উচ্চারণ : আমার জীবনের পথ আমায় করে নিতে দাও। পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে—মানুষ হবার সেইটাই তো পথ। সেই পথের সন্ধান এবং পৌরুষের সেই আদর্শ তিনি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও জীবনদর্শন থেকে লাভ করেছেন। তাঁকে ঘরের আঙ্গিনায় ধরবে কেন?—ঐ পত্রেই শেষ দুই ছত্রে আবার অভ্যস্ত আনন্দ-সংবাদী সুরে ফিরে এসেছেন,—"Do you know that I expect to be a father soon ? Heigh ho ! My stars are brightening."

এর পরের পত্রেই [৪২] দেখি গৌরদাসকে উচ্ছ্বসিত ধন্যবাদ দিচ্ছেন, সে অত্যন্ত সময়োপযোগী কিছু টাকা পাঠিয়েছে বলে। তাঁর আর্থিক বিষয়ে গৌরদাসের সস্নেহ জিজ্ঞাসা তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করেছে।—লিখছেন,—সত্যিকার ভ্রাতৃসুলভ তোমার এই উদ্বেগ। তবে এখন নয়, পরে অন্য কোন সময়ে, বিস্তারিত জানাবো তোমায়। তবে হ্যাঁ, "I am badly off and have hardly anything to jingle in my pocket...My wants, at present, are of such a nature as philosophy cannot justify."—অভিমানী মধু'র পক্ষে এ স্বীকৃতিটুকুও অনেকখানি।

নিদারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যে দিন কাটছে, তার মধ্যে এল সন্তান। ওদিকে বইয়ের জন্য দেনা। তবে আপন দায়িত্ব সম্পর্কে খুবই সচেতন। বলছেন,—জানো আমার সময় কীভাবে নিয়োজিত ? স্কুলের ছাত্রের চেয়েও আমি বেশী পড়াশুনো করি। আমার রুটিন শোনো—সকাল ছ'টা থেকে ৮টা হিব্রু ; ৮ থেকে বারোটা স্কুল ; ১২টা থেকে ২টা গ্রীক ; ২টা থেকে ৫টা তেলেগু ও সংস্কৃত ; ৫টা থেকে ৭টা ল্যাটিন ; ৭টা থেকে ১০টা ইংরাজি।—"Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers ?—" ইতিমধ্যে মিঃ বেথুনের উপদেশ পেয়েছেন, মাতৃভাষায় কাব্য রচনার পরামর্শ। তারই প্রেরণায় বলছেন এ কথা।

ঠিক এর পরের চিঠিতেই [৪৩] রাগ করে লিখছেন : তোমরা কি সব মরে গেছ ? কিংবা আমি কোন অনিচ্ছাকৃত অপরাধ করেছি তোমাদের কাছে যে জন্য গত তিনমাস তোমার অথবা ভূদেবের একখানাও চিঠি পাইনি ?—"Et tu Brute", হায়রে, তুমিও শেষে এই আঘাত দিলে ! এ চিঠিতে আমি নিজের সম্বন্ধে কিছুই লিখবো না। কি জানি, তোমরা জীবিত অথবা কবরের মধ্যে গেছ। এ চিঠি শেষে কার হাতে পড়বে জানি না। যদি বেঁচে থাকো তো লিখে জানাও এবং আর একটু কর্মিষ্ঠতার পরিচয় দাও। ইতি ভবদীয় ক্রোধিত মধু। পুনশ্চ : শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখুজ্জে একটি humbug, শ্রীযুক্ত স্বরূপ বাঁড়ুজ্জেও তাই। তোমরা সকলেই তাই। "Bad luck to ye !"—অভিমানের মধ্যেও হাসির বিচ্ছুরণ দেখা যাচ্ছে। বন্ধুদের প্রতি অভিমান ও কপট ক্রোধ।

আশ্চর্য, এই অভিমানী চিঠির পরে ছয় বৎসর কাল আর কোন চিঠিই নেই মধুর। সত্যিই কি তিনি রাগ করে চিঠি লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন কলকাতার বন্ধু-বান্ধবদের ? কিম্বা কিছু একটা ঘটেছিল তাঁর জীবনে যার ফলে নিজেকে শামুকের মত গুটিয়ে নিয়েছিলেন ? ছয় বৎসর পরে একজন লোক মারফত গৌরদাস পুনরায় তাঁর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন এবং পত্র দেন। ইতিমধ্যে মধুর পিতৃবিয়োগ হয়েছে। পিতার সম্পত্তি মধুরই প্রাপ্য কিন্তু জ্ঞাতিবর্গ তাঁকে বঞ্চিত করে তা গ্রাস করতে উদ্যত। মধুর মা তো পূর্বেই গত হয়েছিলেন। মধুকে কেউ সংবাদই দেয় নি। গৌরদাস মধুকে সত্বর কলকাতায় এসে পৈতৃক সম্পত্তি অধিকারের জন্য সচেষ্ট হতে আহ্বান করলেন। এরই ফলশ্রুতি হল, মধুর মাদ্রাজ ত্যাগ ও কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। কলকাতায় ফিরে সম্পত্তি উদ্ধারের আয়াস-প্রয়াসের মধ্যেই এবং একটা সরকারী চাকরির দশটা-পাঁচটা অফিস-হাজিরা দিয়েও, মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের আসরে যোগ দিলেন।

॥ পাঁচ ॥

বন্ধু গৌরদাসের মাধ্যমে কলকাতার বিদগ্ধ সমাজে তাঁর প্রবেশ ও পরিচিতি ঘটলো। পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনীত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরাজী অনুবাদের ভার পড়লো তাঁর উপর। ইংরেজী অনুবাদ চাই ইংরেজ দর্শকবৃন্দের জন্য। মধুর অনুবাদ উচ্চ প্রশংসিত হল। কিন্তু মধু স্থির করলেন নিজেই বাংলা নাটক লিখবেন—যে সব নাটক অভিনীত হচ্ছে তার চেয়ে উৎকৃষ্টতর নাটক। লিখলেন 'শর্মিষ্ঠা' নাটক—বাংলায় সর্বপ্রথম যথার্থ সাহিত্য-গুণসম্পন্ন নাটক। এ নাটকের সর্ব-সমাদৃত অভিনয় হল বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে। এরপর লিখলেন 'পদ্মাবতী' নাটক। সে-নাটকও বিদগ্ধ সমাজে বিপুলভাবে

অভিনন্দিত হল। রাজাদের অনুরোধে মধুসূদন দুটি প্রহসনও রচনা করলেন—খুবই উপভোগ্য প্রহসন, কিন্তু তীব্রব্যঙ্গ-বিচ্ছুরিত বলে রাজারা তার অভিনয়ে সাহসী হলেন না। তবে প্রহসন দুটি মুদ্রিত হল।

ইতিমধ্যে মধুসূদন বাজি রেখে বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা করেছেন এবং সকলেই স্তম্ভিত বিস্ময়ে সেই কৃতিত্ব নিরীক্ষণ করেছেন, যার নাম 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য'। যেমন অপূর্ব ছন্দ তেমনি অপরূপ কাব্য। মধুসূদন নব্যবঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবিরূপেও স্বীকৃতি পেলেন। তখন তিনি হাত দিলেন তাঁর *magnum opus*-এ, তাঁর প্রধান সাহিত্যকৃতি 'মেঘনাদবধ' রচনায়—য়ুরোপীয় 'এপিক'-এর অনুসরণে বাংলায় অমিত্র-ছন্দে রচিত মহাকাব্য।

'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনা একই সঙ্গে চলতে থাকে। 'মেঘনাদবধ' দুই খণ্ডে প্রকাশিত হলে মধুসূদন বঙ্গের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও দিগ্বিজয়ী কবিরূপে স্বীকৃত হলেন। ইতিমধ্যে 'ব্রজাঙ্গনা' গীতিকবিতাগুচ্ছও প্রকাশিত হয়েছিল। পরে 'বীরাঙ্গনা' পত্রকাব্যও প্রকাশিত হল। প্রতিটি সৃষ্টিই তৎকালীন বঙ্গ সাহিত্যে যুগান্তরের পদক্ষেপ। 'বীরাঙ্গনা-তে এসেই কবি-জীবনের এই সর্বাধিক সফল ঋতুর অবসান ঘটে।

মধু-জীবনের এই অধ্যায়টির চুম্বক এখানে দেওয়ার উদ্দেশ্য এই পর্বের মূল্যবান চিঠিপত্রগুলির তাৎপর্য আলোচনা কালে এই পশ্চাৎপটটি সর্বদা স্মরণে রাখা। ১৮৫৮-৬২ এই পাঁচ বছরের চিঠিপত্র মধুসূদনের সাহিত্য-ভাবনার মূল্যবান দলিল। পত্র সাহিত্য হিসাবেও এগুলি অমূল্য। একটা জিনিস লক্ষণীয় যে, মধুর জীবনে যেন এক সৃষ্টির জোয়ার এসেছিল এই সময়। কী এক দুর্বার আবেগে তিনি সৃষ্টি করে চলেছেন। নাটক, মহাকাব্য, গীতিকাব্য, খণ্ডকাব্য সংই যেন সমধারে উৎসারিত হচ্ছে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গভীর আগ্রহসহকারে আপন সৃষ্টিকর্ম নিয়ে আলোচনা করছেন, আপন সাহিত্যাদর্শ বিবৃত করছেন, তাঁদের অভিমত ও সমালোচনাও আহ্বান করছেন, বিবেচনা করছেন। একটা sense of urgency, একটা ব্যগ্রতা, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলার তাড়া যেন রয়েছে মধুর মনে। অনেক কিছুই করতে হবে এবং সব কিছুই একসঙ্গে। মধুসূদন যে জাত-সাহিত্যিক তার নিদর্শন মেলে এই চিঠিগুলির ছত্রে ছত্রে। কারো কারো কাছে যেমন 'কানু ছাড়া গীত নেই' তেমনি জাত-সাহিত্যিকের কাছে নিজের সৃষ্টির বিষয়ে আলোচনা ছাড়া আর কিছুই রোচনীয় নয়।

রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁর 'শর্মিষ্ঠা'র ব্যাকরণের ভুলচুল সুধরে দেবেন কথা ছিল, কিন্তু কী স্পর্ধা সেই পণ্ডিতের, সে তাঁর ভাষা ও স্টাইলের উপরই কলম চালায়! স্টাইলের মধ্যেই তো লেখকের যথার্থ আত্মপ্রকাশ, স্টাইল তার ব্যক্তিত্বের মুকুর। সেই স্টাইলকে বিকৃত করার ধৃষ্টতা! গৌরদাসকে লিখছেন মধু [৫৩]

"you know a man's style is the reflection of his mind, and I am afraid, there is but little congeniality between our friend and my poor self···I shan't have him. He has made my poor girls talk d-d cold prose."—উনি আমার নাটকের পাত্রীদের মুখে নিরুত্তাপ কেঠো ভাষা চাপিয়ে দিয়েছেন! ও'র সাহায্য আমার চাই নে।

আবার বলছেন,—আমার নাটকে একটু বিদেশী ভাব থাকবে জানি। কিন্তু তাতে কী? যদি ভাষা শুদ্ধ না হয়, আর অনুভবে থাকে উত্তাপ আর উজ্জ্বলতা, প্লট হয় চিত্তাকর্ষক, এবং চরিত্রগুলি যথাযথ চিত্রিত—কী আসে যায় বল, যদি তার মধ্যে বিদেশী ভাব থাকে? তুমি কি মুরের কবিতা অপছন্দ কর, তা প্রাচ্যভাবাপন্ন বলে? কিম্বা বায়রনের কাব্য, তাদের এশীয় আবহের জন্য? কিংবা কার্লাইলের গদ্য, তা জার্মান-ঘেঁষা বলে'? তা ছাড়া, আমি যাদের জন্য লিখছি তাঁরা আমার সেই সব দেশবাসী যাঁরা আমার মতই ভাবেন, যাঁদের মন পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা ও চিন্তারীতিতে বিরঞ্জিত। তা ছাড়া আমি যা কিছু সংস্কৃত তার অন্ধ অনুকরণের দাসত্ব-শৃঙ্খল ভাঙ্গতেও চাই।

সাহিত্য-মর্মজ্ঞের সত্য-উপলব্ধির কথাই বলছেন মধু। বিদেশী গন্ধ আছে বলেই শিল্প সাহিত্য অপাংক্তেয় হয় না। তবে প্রাকৃত জনের রুচিও তিনি পরখ করে দেখেছেন, তাদেরও ভালো লেগেছে। তাই গৌরদাসকে আশ্বাস দিচ্ছেন—'আমার এসব দুঃসাহসিক কথাবার্তায় তুমি ভয় পেয়ো না। আমার নাটকের দ্বিতীয় অংকটা এমন দু'চার জনকে দেখিয়েছি যারা ইংরেজীতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বিশ্বাস কর, তারা এমন মুগ্ধ ভাষায় প্রশংসা করল যে তারা সত্যি কথা বলছে কিনা সেই সন্দেহই হয়েছিল প্রথমে। কিন্তু তারা আমায় চাটু করছে, একথা ভাববারও কোন কারণ নেই।'

"In matters literary, old boy, I am too proud to stand before the world in borrowed clothes. I may borrow a necktie or even a waist-coat, but not the whole suit."—সাহিত্যের আসরে ধার করা পোশাকে নামতে আমার মর্যাদায় বাধে। একটা নেকটাই কিম্বা ওয়েস্টকোট বড়জোর ধার করতে পারি কিন্তু একটা গোটা স্যুট! নৈব নৈব চ।

"Don't let thy soul be perturbed, old cock, for I promise you a play that will astonish the old rascals, in the shape of Pandits"—'হ্যাঁ রাজাদের সঙ্গে দেখা হলে আমার এই নাটকখানার খুব তারিফ করবে। জিনিসের বাজার দর বাড়াতে হলে ওর চেয়ে কার্যকর আর কিছু নেই। একটু আধটু অদল বদল আমি মেনে নিতে রাজী আছি। কিন্তু তাই বলে আমার সব বাক্যগুলিই ঢেলে সাজা নো! আস্পর্ধা! লেখা বরং পুড়িয়ে ফেলবো সেও ভালো।'

কত কথা, সাহিত্যের আদর্শ রূপ ও রীতি, ভাষা ও ছন্দ, স্টাইল, অনুপ্রেরণা, শিল্পসিদ্ধি—নানা বিষয় মধুসূদনের চিঠিপত্রে ভিড় করে আসছে। তিনি যেন আবার তাঁর তারুণ্য ফিরে পেয়েছেন, এমনি স্ফূর্তি। তিনি যে মাতৃভাষায় অনাস্বাদিতপূর্ব রস সৃষ্টি করছেন, নবভগীরথের মত পাশ্চাত্য সাহিত্যের শিখর থেকে নবসাহিত্য মন্দাকিনীকে বাংলার শ্যামল প্রান্তরে প্রবাহিত করছেন, এই আনন্দ-সম্বিৎ তাঁর চিত্তকে এখন উচ্ছলিত করছে।

কী সদম্ভ ও প্রত্যয়ভুয়িষ্ঠ ঘোষণা!—আমি নিজের কাপড় চোপড়েই জগৎ সমক্ষে দাঁড়াতে চাই, ধার করা পোশাকে নয়। সংস্কৃত সাহিত্যের কাছে বাংলা সাহিত্যের দাসত্ব আমি ঘোচাবো। আমাদের সাহিত্য স্বাধীনভাবে অঙ্গসঞ্চালন করুক, স্বাভাবিক ঢঙ্গে কথা বলুক, চিন্তা করুক। চিরদিন সংস্কৃতের আঁচল ধরে অনুশাসন মেনে চলবে নাকি!

পরের একটি চিঠিতে [৫৫] গৌরদাসকে লিখছেন—'শর্মিষ্ঠা'র খ্যাতি তাঁকে বাঙালী লেখকদের পুরোভাগে স্থাপন করেছে। লোকে এর কাব্যগুণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছে। তারপর, "Now that I have got the taste of blood, I am at it again. I am now writing another play."—"বাঘ রক্তের স্বাদ পেয়েছে, আর কি ছাড়ে? আরেকখানা নাটক সুরু করেছি। প্লটটির একটি চুম্বক রাজাদের পাঠিয়েছিলাম, তাঁরা একেবারে মুগ্ধ। যদি বাংলায় লিখে খ্যাতি লাভ করতে পারি, তাই করাই তো উচিত।"

বছর খানেক পরে বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর রচনা এবং সেই ছন্দে 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য সৃষ্টি যখন সারা দেশে আলোড়ন তুলেছে, বিদগ্ধ সমাজ মুগ্ধ, বিস্মিত এবং প্রশংসায় পঞ্চমুখ, সেই কালে সে-যুগের অগ্রগণ্য মনীষী রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে মধুসূদনের পত্রালাপ শুরু হয়। রাজনারায়ণের প্রশংসার মূল্য সমধিক। রাজনারায়ণ নিজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে 'তিলোত্তমা' সম্পর্কে উচ্চপ্রশংসা করে পত্র দিয়েছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কাছে। সে চিঠি রাজেন্দ্রলালের কাছে মধু দেখেন। তারপর তিনিও সেই সূত্রে ধন্যবাদ দিয়ে রাজনারায়ণকে পত্র দেন। সুরু হয় উভয়ের মধ্যে পত্রালাপ। দুজনেই হিন্দু কলেজের সহাধ্যায়ী, যদিও ভিন্ন শ্রেণীতে পড়তেন। আগে পত্রালাপের অন্তরঙ্গতা ছিল না, এখন সাহিত্যের মাধ্যমে উভয়ের পত্রালাপ শুরু হল: একজন সাহিত্যস্রষ্টা অন্যজন সমালোচক, দুজনেই পরস্পরের গুণমুগ্ধ।

প্রথম চিঠিতে মধুসূদন রাজনারায়ণকে উচ্চসম্মান দিলেন, তাঁকে 'One of the Representative men of the day' বলে। তবে ঐ এমারসনীয় অভিধার গৌরব যোগ্য পাত্রেই ন্যস্ত হয়েছিল। রাজনারায়ণ সে যুগের প্রকৃতই একজন Representative man—যুগ-প্রতিনিধি। মধু লিখলেন: "you deserve my

warmest thanks for encouraging me, for you are decidedly one of the Representative men of the day, and your opinion may be looked upon as an earnest of the future. Forgive my vanity if I believe that the approbation of such scholars as yourself and about half a dozen more in the city, is a sure guarantee of the future fame of the poem."—প্রসংশার উত্তরে ধন্যবাদের অনুষঙ্গে শিষ্টাচারসম্মত বিনয়সৌজন্যের নিদর্শনরূপে এই সুনৃতবচন মোটেই চাটুবাদী নয়। এর অনবদ্য উপস্থাপনটি আমাদের মুগ্ধ করে, সন্দেহ নেই যে রাজনারায়ণকেও করেছিল।

'তিলোত্তমা শীঘ্রই বই হয়ে বেরোবে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরই মুদ্রণব্যয় বহন করছেন ("for I am as poor as a good poet ought to be!")। তাঁর মতে চতুর্থ সর্গটিই সর্বোত্তম। তবে তুমি নিজেই সত্বর এর সত্যতা যাচাই করতে পারবে। বই তো বেরোবে কিন্তু ভাবছি কয় জনে পড়বে। কী আফশোষ। তুমি এখন কলকাতায় নও। থাকলে তোমাকে দিয়ে এ কাব্যের উপরে আমি বক্তৃতা দেওয়াতাম। তার ফলে কিছু পাঠক অবশ্যই জুটতো এ কাব্যের। মনে হল, তুমি এ কাব্যের ভাষা একটু কঠিন মনে করো। কিন্তু সত্যি বলছি আমি কখনো আড়ম্বর-পূর্ণ স্টাইলে লেখার প্রয়াস করি না—যেমন আজকাল অনেক অপদার্থ কলমচি করে থাকে। আমার লেখার শব্দগুলো যেন স্রোতের টানে ভেসে আসে, হয়তো যাকে বলে অনুপ্রেরণা তারই স্রোতে। তবে "Good blank verse should be sonorous and the best writer of Blank verse in English is the toughest of poets—I mean John Milton! And Virgil and Homer are anything but easy."

রাজনারায়ণ বোধ হয় শব্দের ঘনঘটার উল্লেখ করে থাকবেন, তাই মধু আত্মপক্ষে সাফাই গাইছেন—মিলটন হোমার ভার্জিলের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়ে দিয়ে। তারপর সুরটা লঘু ক'রে বলছেন, 'আরে, এ তো আমার প্রথম কাব্য—কিছু দোষ-ত্রুটি তো থাকবেই। আর আমি তো ঠাট্টাচ্ছলেই এটা লিখতে শুরু করি। কিন্তু পরে দেখি যা করে ফেলেছি তা আমাদের জাতীয় সাহিত্যকে বেশ খানিকটা উন্নীত করবে। অন্তত আমার এই কাব্য ভবিষ্যতের বাঙালী কবিদের সামনে একটা মডেল হয়ে সেই কৃষ্ণনাগরিক কবির চেয়ে ভিন্নতর ছাঁদে লিখতে উদ্বুদ্ধ করবে।

"আমার প্রহসন দুটি তোমার ভালো লেগেছে জেনেও গর্ব হচ্ছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমার একটু অনুশোচনাই হয় যে আমি এ দু'টি প্রকাশ করেছি।" "You know that as yet we have not established a National Theatre, I mean we have not as yet got a body of sound classical Dramas to regulate the national taste and therefore we ought not to have farces."—আমাদের এখনো জাতীয় নাট্যশালাই নেই, ধ্রুপদী ঐতিহ্যের কিছু

নাট্যসম্পদ এখন সঞ্চিত হয় নি। কাজেই এখনই আমাদের প্রহসন থাকা উচিত নয়। —'জানি না তুমি আমার শর্মিষ্ঠা নাটকটি দেখেছ কি না এবং দেখে থাকলে সে সম্বন্ধে তোমার মত কী? আমার আরেকটি নাটকও শীঘ্রই এক সৌখীন সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত হবে। এটিও ধ্রুপদী রীতিতেই লিখেছি।'—"If I am spared I intend to write 3 or 4 more plays of the classical kind, just to give our countrymen a taste for that species of the drama and then take up historical and other subjects."

'তুমি একটি জাতীয় মহাকাব্যের জন্য যে-বিষয়বস্তুর উল্লেখ করেছ তা ভালো, সত্যিই খুবই ভালো। কিন্তু আমার মনে হয় না যে আমার এতটা অধিকার জন্মেছে যে এ বিষয়ে উপযুক্ত কাব্য সৃষ্টি করতে পারবো।'—"In the meantine I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit. Do not be frightened, my dear fellow, I dont trouble my readers with *vira ras*, (বীররস) Let me write a few epiclings and thus acquire a pucca fist." সত্যিকার মহাকাব্য রচনার আগে কয়েকখানি ক্ষুদ্রমহাকাব্য রচনা করে আমাকে আমার হাতটা তৈরী করতে হবে।

মধুসূদনের স্বদেশপ্রেম, জাতীয় গৌরববোধ এবং প্রখর দায়িত্ববোধ লক্ষণীয়। জাতীয় নাট্যসম্পদ সৃষ্টি করতে হবে নচেৎ দেশবাসীর নাট্যচেতনা পরিণতি লাভ করবে না। জাতীয় মহাকাব্য রচনা করতে হবে, সেজন্য প্রস্তুতি চাই, নিজের ক্ষমতাকে সুপরিণত করতে হবে। 'মেঘনাদবধ' লেখার পরিকল্পনাও ক্ষুদ্র মহাকাব্য লিখে হাত পাকা করার জন্যে।

পরের চিঠিতেই রাজনারায়ণকে লিখছেন: "What a vast field does our country now present for our literary enterprise! I wish to God, I had time. Peotry, the Drama, Criticism, Romance—a man would leave a name behind him, 'above all Greek, above all Roman fame'. I wish you would take up the subject of Criticism. Aristotle, Longinus, Quintilian, the Sahitya-Darpan, Burke, Kames, Alison, Addison, Dryden and a host of others, not forgetting old Blair's lectures or the German Schlegel."—সমালোচনা সাহিত্যেও মধুসূদনের জ্ঞানের পরিধি এবং তাঁর মহৎ দায়িত্ববোধ আমাদের অভিভূত করে। কোন কিছুই যেমন-তেমন দায়সারা গোছের করলে হবে না। পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায় সুমহান দায়িত্বের অঙ্গীকার।

একদা তিনি বায়রনের কবিতার উপাসক ছিলেন, এখন সে মোহ অপগত। 'বেচারা রঙ্গলাল এখনো বায়রনের অনুসরণ করছে, কী আফশোষ!' "Byron, Moore and Scott form the highest heaven of poetry in his

estimation. I wish he would travel further. He would then find what 'hills peep over hills'—what 'Alps on' 'Alps arise!' As for me, I never read any poetry except that of Valmiki, Homer, Vyasa, Virgil, Kalidas, Dante (in translation), Tasso in translation and Milton. These কবিকুলগুরু's ought to make a fellow a first rate poet —if Nature has been gracious to him,"—এখন রুচির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে তাঁর। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 'ক্লাসিক' কবিরাই এখন তাঁর অভিনিবেশের বিষয়।

রাজনারায়ণ মধুকে তাঁর মুদ্রিত ধর্মোপদেশ (sermon) পড়তে দিয়েছেন। মধু লিখছেন [৬০], 'আমি যদি ধর্মবিষয়ে তেমন আগ্রহী হতাম তা হলে তোমার এই 'সারমন'গুলি আমার দিনরাত্রের সঙ্গী হত।' "But you know I am 'smit with the sacred love of song.' There never was a fellow more madly after the Muses than your poor friend! Night and day I am at them. So you must not lay aside Meghnad. If you do I shall begin to rave. 'The Muses before everything is my motto."' —কাব্যলক্ষ্মীই আমার একমাত্র আরাধ্য, তাঁর আরাধনাতেই আমার দিন রাত্রি উৎসর্গিত। 'কাব্যই সর্বাগ্রে' এই আমার অভীষ্ট মন্ত্র।

কিছুদিন পরেই যখন তিনি কাব্যলক্ষ্মীকে ছেড়ে ধনলক্ষ্মীর আরাধনার উদ্দেশ্যে বিলেত পাড়ি দেবেন তখন এই কথাগুলির প্রতিধ্বনি হয় তো বিদ্রূপের মতই শোনাবে।

'মেঘনাদ'-এর সূচনা অংশটি রাজনারায়ণের অভিমতের জন্য পাঠাচ্ছেন। যথার্থ heroic style বা মহাকাব্যোচিত উদাত্ত সুর হয়েছে কি না তিনি যেন জানান। বলছেন, "Besides my position as a tremendous literary rebel demands the consolation of the encouraging sympathy of friendship. I have thrown down the gauntlet and proudly denounced those whom our countrymen have worshipped for years as impostors and unworthy of the honours heaped upon them! I ought to rise higher with each poem If you think the Meghnad destitute of merit, why! I shall burn it without a single sigh of regret."—মধু সচেতন যে কবিতার ক্ষেত্রে সে এক মহাবিদ্রোহী এবং পুরাতন বিগ্রহদের সে টেনে নামাবে এই তার পণ। প্রতিটি সৃষ্টিদ্বারা মহত্তর কীর্তি তাকে অর্জন করতে হবে। কাজেই 'মেঘনাদ' যদি রাজনারায়ণের কাছে মূল্যহীন প্রতীয়মান হয়, সে যেন জানাতে দ্বিধা না করে। মধু নির্মোহ চিত্তে তাকে অগ্নিসাৎ করবে!

মেঘনাদবধ রচনা এগিয়ে চলেছে। মধু লিখছেন, 'আমি যে অন্যের চেয়ে বেশী পরিশ্রমী তা নয়। মাঝে মাঝে আমি কুঁড়ের বেহদ্দ।' "I am at times as

lazy a dog as ever walked on two legs, but I have fits of enthusiasm that come on me occasionally and then I go like a mountain torrent."—যখন অনুপ্রেরণা আসে, আমি পাগলা ঝোরার মত ছুটে চলি।—মধুর চিত্রধর্মী ভাষা যেন ছবিতে কথা বলে।

'না, না, কাব্যরচনা কালে আমি কোন নেশা ভাং করি না।' "Talking about wine and all vicious indulgences, though by no means a saint and teetotal prude, I *never* drink when engaged in writing poetry : for if I do, I can never manage to put two ideas together ! There is not a line in the Tilottama written under the inspiration of even such a mild thing as a glass of rosy sherry or beer."—মধুসূদনের পানাসক্তির কথা সে যুগে সর্বজনবিদিত ছিল, হিন্দুকলেজের সহাধ্যায়ী রাজনারায়ণের কাছে তো ছিলই। সে যুগে তা দোষের বলেও গণ্য হত না। তাই রাজনারায়ণ বোধ হয় পরিহাসিত ইঙ্গিত করে থাকবেন মধুর কাব্যের অনুপ্রেরণার পেছনে মদিরার প্রেরণার উপস্থিতি অনুমান করে। মধু সে সন্দেহ নিরসন করলেন। মদ খেলে মাথা এমন গুলিয়ে যায় যে, ভাবনা হয়ে পড়ে এলোমেলো। 'তিলোত্তমা'র একটি লাইনও মদিরা প্রভাবিত নয়, এমন কি শেরী বা বীয়ারের মত লঘু পানীয়েরও প্রভাব এতে নেই।

মেঘনাদের এক সর্গ রাজনারায়ণকে পাঠিয়েছেন। বলছেন, রাবণকে কেমন লাগলো তোমার জানাবে। "He was a noble fellow and but for that scoundrel Bivishan would have kicked the monkey army into the sea." কী আফশোষ! আদিকবি রামকে দিলেন বানর সৈন্যদল! যদি মনুষ্যজাতীয় সৈন্যসামন্ত দিতেন আমি মেঘনাদবধকে একেবারে খাঁটি 'ইলিয়াড' করে তুলতাম। কিন্তু বানরযুথের সঙ্গে কী লড়াই দেখাবো? "As it is, you must not expect any battle scenes. A great pity !" পরের চিঠিতে [৬১] বলছেন, 'গ্রীক পুরাণের অনুপম সৌন্দর্য এই কাব্যের মধ্যে গেঁথে দিতে চাই। সোজাসুজি গ্রীক পুরাণের কাহিনী সংযুক্ত করে নয়, গ্রীকদের অনুরূপ সৌন্দর্য ও কল্পনা-দৃষ্টি দ্বারা ভারতীয় পৌরাণিক চরিত্র ও কাহিনী রূপান্তরিত করে।' "It is my ambition to engraft the exqusite graces of Greek mythology on our own ; in the present poems, I mean to give free scope to my inventing powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you. You shan't have to complain again of the un-Hindu character of the Poem. I shall not borrow Greek stories, but write, rather try to write as a

Greek would have done."—রাজনারায়ণ বোধ হয় 'তিলোত্তমা'র অ-হিন্দু চরিত্র নিয়ে পূর্বে কিছু লিখেছিলেন, তাই তাঁকে এইভাবে আশ্বস্ত করছেন।

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গের কেউ কেউ ভাসাভাসা প্রশংসা করছেন। তবে এও বলছেন যে, মিত্রাক্ষরে লেখা হলে এ কাব্য বেশী জনপ্রিয় হত। এই সব অরসিক পণ্ডিত-মূর্খের মন্তব্যে মধুর কবি-অভিমান উদ্দীপ্ত হয়েছে। রাজনারায়ণকে লিখছেন, "These men, my dear Raj, little understand the heart of a proud, silent lonely man of song! They regret his want of popularity, while perhaps, his heart swells within him in visions of glory, such as they can form no conception of. But hang the inscets of a day!"—কবির অন্তরজোড়া ভাবীকাল-বিস্তারী বিপুল খ্যাতির স্বপ্নের কী সন্ধান পাবে ঐসব মূঢ়েরা!

তবে রাজনারায়ণের মত বিদগ্ধ সমালোচকের অকরুণ সমালোচনাও তিনি মাথা পেতে নেবেন। "I am not one of those touchy fools who do not like to have their faults pointed out to them. By Jove, I court such candid and friendly criticism. Go to work without any misgiving old boy Whether you placed the brightest laurel crown on his head (the brightest of all crowns yet worn in Bengal) or kick him out of the holy temple of fame as an impudent intruder, you will find your humble friend a very submissive dog." [৬২]

॥ ছয় ॥

মধুর অধিকাংশ চিঠিতেই তারিখ নেই। এর ফলে চিঠিগুলিকে ক্রমসজ্জিত করা বেশ কঠিন। তবে পত্রের বিষয়বস্তু ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সাক্ষ্যে মোটামুটি সময়ক্রমটা ধরা যায়। দু একখানি চিঠিতে তারিখ থাকাতেও হিসাবে সুবিধা হয়।

৭২ সংখ্যক চিঠিতে রাজনারায়ণকে লিখছেন যে, মাঝে কিছুদিন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। পুরো দস্তুর ট্রাজেডি হবে এটি। টডের রাজস্থান কাহিনী থেকে প্লটটি নেওয়া। শুধু একটি অঙ্ক এখনো বাকী। মেঘনাদ রচনা স্থগিত আছে; তার ২য় সর্গটি নকল করিয়ে রাজনারায়ণকে পাঠাচ্ছেন। নকলের মধ্যে অনেক বানান ভুল থাকবে, আগের দিন হলে—যখন শিব লিখতে 'ষিব' লিখলেও কেউ অবাক হত না—এটা ধর্তব্যই ছিল না। কিন্তু এখন লোকের ভাষাজ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে।—"Really what rapid advances our language (I feel half-tempted to use the words of Alfieri and say

'Nostra Divina Lingua') is making towards perfection and how it is shaking its sleep of ages."—অবজ্ঞাত বঙ্গভাষাকে এখন our divine language বলতে ইচ্ছে হয় তাঁর।

মেঘনাদ লিখতে লিখতে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে যে এটি অনেক উৎকৃষ্টতর ও মহত্বপূর্ণ কাব্য হবে।* রাজনারায়ণকে লিখছেন, 'তোমার কাছে আমি কিছুই গোপন করতে ভালবাসি না, তাই আমাকে অহংকারী মনে করো না যদি বলি ক্রমশ আমার বিশ্বাস হচ্ছে যে, এই 'মেঘনাদ' একটি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য হয়ে উঠছে—"This Meghnad is growing up to be a splendid poem. I fancy the versification more melodious and Virgilian and the language easy and soft."—এর ভাষা ও ছন্দ ভার্জিলের কাব্যের মত ললিত ও মধুর হয়ে উঠছে বলেই আমার ধারণা।

হ্যাঁ, প্রাচীনপন্থী সোমপ্রকাশও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রশংসা করেছে। আর ভয় নেই, রঞ্জিত সিং যেমন বলেছিলেন 'সব লাল হো যায়গা' আমিও তেমনি বলি 'সব ব্ল্যাঙ্ক ভার্স হো যায়গা' !

'তবে ভাই রাজনারায়ণ, একটা পরামর্শ দাও তো। নাটকে আমি অমিত্র-ছন্দ প্রবর্তন করতে চাই, এ বিষয়ে তুমি কী বলো ? আমার প্রাণে একেবারেই সয় না যে আমায় গদ্যে লিখতে হচ্ছে। কিন্তু নাটক আমি এই ছন্দে লিখি তা কেউই চায় না। তুমি ভাই যদি আমায় যুক্তি দিয়ে convince করতে পারো যে গদ্যই নাটকের ভাষা হওয়া উচিত, আমি তা মেনে নেবো এবং স্বস্তি পাবো।'

পরের চিঠিতে [৭৯] নিজের ৬/৭ দিন জ্বর ভোগের সংবাদ দিচ্ছেন খুব রঙ্গরস সহকারে।—"It was a struggle whether Meghnad will finish me or I finish him Thank Heaven, I have triumphed. He is dead, that is to say. I have finished the VI Book in about 750 lines. It cost me many a tear to kill him."—যমের সঙ্গে লড়াই—কে যায় আমি না মেঘনাদ। শেষ পর্যন্ত আমি গেলাম বেঁচে, আর তাই মেঘনাদকে যেতে হল যমালয়ে। ৬ষ্ঠ সর্গ লিখে শেষ করলাম। ঐ সর্গে তার মৃত্যু দৃশ্যের বর্ণনা দিতে আমায় অনেক চোখের জল ফেলতে হয়েছে।

'লোকে মেঘনাদের খুব সুখ্যাতি করছে। কেউ কেউ তো বলছে মিল্টনকেও ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু সেটা বাজে কথা। মিল্টনের চেয়ে ভালো লেখা সম্ভবই নয়। অনেকে বলছে এটা কালিদাসের চেয়েও ভালো হয়েছে। তাতে আমার আপত্তি নেই। ভার্জিল, কালিদাস, টাসো, এঁদের সমকক্ষ হওয়া আমি অসম্ভব মনে করি না। যদিও মহৎ তবু তাঁরা মর্ত্য কবি। মিল্টন দিব্য জগতের।'—পরে একটি চিঠিতে দেখি, মিল্টন সম্পর্কে মধুর এই অতিজাগতিক শ্রদ্ধা একটু যেন ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

সেখানে তিনি মিল্টনেরও কিছু কিছু ত্রুটির উল্লেখ করছেন। তবে সে সম্বন্ধে পরে আসছি।

প্রশংসা শুনলে মধু'র আনন্দ ধরে না। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি বলেছেন মধু'র সম্পর্কে—আর কেউ এঁর সমকক্ষ নয়। রাজনারায়ণকে লিখছেন, "Your friend Baboo Debendra Nath Tagore is quite taken up with it. S— told me the other day that he (Baboo D) is of opinion that few Hindu authors can stand near this man, meaning your fat friend of No. 6, Lower Chitpore Road, and that his imagination goes as far as imagination can go."

৮২ সংখ্যক পত্রে রাজনারায়ণকে লিখছেন, 'মেঘনাদের ২য় খণ্ড তোমার বেশী ভালো লাগবে, অন্তত আমি নিজে বেশী যত্ন নিয়ে এটি শেষ করছি। তোমার কাছে গোপন করবো না, এর কিছু কিছু অংশ আমার নিজের কাছেই অত্যন্ত প্রশংসনীয় মনে হচ্ছে।—"I had no idea, my dear fellow, that our mother tongue would place at my disposal such exhaustless materials, and you know I am not a good scholar. The thought and images bring out words with themselves-words that I never thought I knew. Here is a mystery for you."—আমাদের মাতৃভাষার কী অতুল ঐশ্বর্য? মনে ভাব ও রূপকল্পের উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শব্দসম্ভারেরও আবির্ভাব ঘটে—এক যেন অপরকে ডেকে আনে! আর এমন শব্দ, যা আমি কখনো জানতাম বলেও ভাবি নি। এ একটা মহা রহস্য।—রহস্য তো বটেই, এবং সব সৎকবিই সে-রহস্যের আভাস পান। রবীন্দ্রনাথ ও বলেছেন—

'আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি
রহস্যে নিমগন,
এ যে সঙ্গীত কোথা হতে উঠে
এ যে লাবণ্য কোথা হতে ফুটে
এ যে ক্রন্দন কোথা হতে টুটে
অন্তর বিদারণ।'

পরের চিঠিতে [৮৩] রাজনারায়ণের কোন উক্তির অনুষঙ্গে বলছেন, ইংলণ্ডে কি ভার্জিল, টাসো, কিংবা কালিদাসের মত কোন কবি আছে না কি? তাদের আছে এক মিলটন—যিনি মহত্তর সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি আপন সৃষ্ট শয়তানের মতই অনেক সমুচ্চ চিন্তায় ভরপুর সত্য কিন্তু মোটেই হৃদ্য নন। "He elevates the mind of the readers to a most astonishing height but he never touches the heart."—তিনি আমাদের হৃদয় স্পর্শ করেন না। "He is Satan himself. We acknowledge him to belong to a far superior order of

beings but we never feel for him. We hear the sound of his etherial voice with awe and trembling. He is the deep roar of a lion in the silent solitude of the forest."—অপূর্ব উপমা ও উৎপ্রেক্ষায় মধুসূদন এখানে মিল্টনের কবি স্বরূপটি আভাসিত করেছেন। আপন প্রতিভার স্বভাবের সঙ্গে মিল্টনের স্বাতন্ত্র্যও চমৎকার ব্যঞ্জিত করেছেন।

একটু পরেই আবার বলছেন, আমার এই কাহিনীতে যুদ্ধবিগ্রহের অবকাশ কম। "Homer is nothing but battles. I have like Milton, only one." যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনার সুযোগ কম বলে প্রথমে যে আফশোষ হয়েছিল কাব্য শেষ করার কালে সেটা আর অনুশোচনীয় মনে হচ্ছে না। 'হোমার তো কেবল যুদ্ধসর্বস্ব, আমার কাব্যে মিল্টনের অনুরূপে একটি মাত্র যুদ্ধ রেখেছি।'

এর পরের চিঠিতে [৮৪] বেশ একটু আত্মপ্রসাদের সুর।—"How you are, old boy, a Tragedy, a volume of Odes, and one half of a real Epic poem ! All in the course of one year and that year only half old ! If I deserve credit for nothing else you must allow that I am at least an *industrious* dog."—কৃষ্ণকুমারী নাটক, ব্রজাঙ্গনা কাব্য এবং মেঘনাদবধের শেষার্ধ ছয় মাসের মধ্যে সারা করেছি—আমি যে কত পরিশ্রমী সেজন্য অবশ্যই তারিফ করবে।

তারপর বলে উঠছেন, এবার গদ্যে সমালোচনামূলক লেখা লিখবেন এবং যত রাজ্যের আত্মম্ভরী বাবু-লিখিয়েদের একেবারে নস্যাৎ করে দেবেন। "I am thinking of blazing out in prose to reduce to cinders the impudent pretensions of the 'mob of gentle-men' who pass for great authors ! Great authors. great *fiddlesticks* !···You may take my word for it, friend Raj, that I shall come out like a tremendous comet and no mistake."

এ সব বাবুলিখিয়েরা কারা ? মধুসূদন হঠাৎ কেন ক্ষেপে উঠলেন এদের উপর ? এদের 'Hang the insects of a day' বলে কেন তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন না ? মনে হয় এরা কেউ কেউ ভারিক্কি চালে ও'র লেখার প্রতি উন্নাসিক অবজ্ঞা প্রকাশ করে থাকবেন। তাই মধুর উষ্মা, ঐ মূর্খদের একটু শিক্ষা দেবেন।

৮৬ সংখ্যক চিঠিতে দেখি নতুন কোন কাব্য লিখবেন বলে ভাবছেন। রাজনারায়ণের দেওয়া বিষয় 'সিংহল বিজয়' তাঁর কল্পনাকে আকর্ষণ করে। সিংহল বিজয়ের আখ্যানটা তিনি ভুলে গেছেন ; ভাই রাজনারায়ণ, সেটা তুমি আবার পাঠিয়ে দিও।

'ব্রজাঙ্গনা মনে হয় তোমার ভালো লাগে নি। বেচারা তুমি। কবিতা পড়ার সময় তোমার ধর্মীয় প্রবণতা দূরে সরিয়ে রাখবে। তা ছাড়া রাধার প্রতি তোমার

বিরূপতা আছে। কিন্তু এ মহিলা তত মন্দ নন। যদি প্রথম থেকে তোমার এই বন্ধুর মত কবি তিনি পেতেন তা হলে তাঁর এত দুর্নাম হত না।'

এর পরের চিঠিতে [৮৭] 'বীরাঙ্গনা' পত্রকাব্যগুচ্ছের কথা পাই। পরিকল্পিত একুশটির মধ্যে এগারোটি লিখেছেন এবং তা-ই এখন ছাপা হতে চলেছে।

'ভাই রাজ, মেঘনাদ সম্পর্কে তোমার সমালোচনা আমাদের বন্ধুরা সবাই পড়েছে এবং অনেকে রুষ্টও হয়েছে। নরক বর্ণনাকে তুমি যে অপৌরাণিক বলেছ এতেই অনেকের আপত্তি। তারা নাকি প্রমাণ করবে যে, এটা অত্যন্ত পুরাণসঙ্গত। কিন্তু যারা পড়েছে তারা সকলেই তোমার এই কথাটার প্রতিধ্বনি করছে যে, মেঘনাদ বাংলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য।.

'তবে ভাই, আমার poetical career বোধ হয় সাঙ্গ হতে চলেছে। আমি বিলেত যাচ্ছি ব্যারিস্টারি পড়তে এবং তাই "must bid adieu to the Muse." "No more Modhu দ্বি কবি, old fellow, but Michael M. S. Dutt Esquire of the Inner Temple, Barister at Law! Ha! Ha! Isn't that grand?"—এ অট্টহাস্য এখন প্রায় বিদ্রূপের মতই শোনায়। অদৃষ্টও বোধ হয় হেসেছিল সেই সঙ্গে।

বিলাত যাত্রার আগে শেষ চিঠিখানি [৮৯] লিখেছিলেন রাজনারায়ণকে। তার শেষে মধুসূদনের বিখ্যাত 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটি পাই। বলছেন, "Being a poetaster, I would not think of bolting away without rhyming, and I enclose the result—and I hope the thing is—if not good—at least respectable."—

কবিতাটি দিয়ে শেষে লিখছেন: "Here you are, old Raj—all that I can say is—

মধুহীন কোরো না গো তব মনঃ কোকনদে।"

হঠাৎ কী ঘটলো যাতে মধু'র এই মতিপরিবর্তন? বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি যেখানে তাঁর হৃদয় জুড়ে ছিল, জাতীয় মহাকাব্য রচনার জন্য যিনি নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন, পরিকল্পিতভাবে জাতীয় নাট্যসম্পদ সৃষ্টিও যাঁর অর্ধপথে অসমাপ্ত, ottava rima ছন্দে টাসোর অনুসরণে কিছু রোমান্টিক কাহিনী-কাব্য রচনার সংকল্পও তখনো কল্পনানিবদ্ধ, বাবু-লিখিয়েদের বিরুদ্ধে গদ্য অভিযানও তখনো অনারব্ধ—তা হলে এমন কী ঘটলো যে মধুসূদন সহসা স্থির করে ফেললেন যে, তাঁকে বিলেত যেতেই হবে, ব্যারিস্টার হয়ে আসতেই হবে, আর বিলম্ব করা চলবে না? তাঁর চিঠিপত্রে এবিষয়ে কোন আলোকপাত নেই। তবে রাজনারায়ণকে যে চিঠিখানিতে 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতা উপহার দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন [৮৯], সেই চিঠিতেই লিখছেন: "You must not fancy old boy, that I am a traitor to the cause of our native Muse. If it hadn't been

for the extraordinary success the new verse has met with, I should have certainly delayed my departure. Or not gone at all. I should have stood at my post manfully. But an early triumph is ours, and I may well leave the rest to younger hands, not ceasing to direct their movements from my distant retreat."—নতুন কাব্য আন্দোলনের অতি ত্বরিত সাফল্যই তাঁকে বিলেত যেতে প্রবর্তিত করেছে। সে সাফল্য বিলম্বিত হলে তিনি প্রয়োজন বোধে আরও দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে যেতেন। এখন তরুণতর কবিদের হাতে এই নব সাহিত্যের ভার তিনি দিয়ে যাবেন, দূর থেকে তাদের পথ নির্দেশের সংকল্পও রইলো।

কিন্তু এটা কি তাঁর যাওয়ার পক্ষে যথার্থ যুক্তি? 'বীরাঙ্গনা' কাব্য অর্ধসমাপ্ত রেখে, নাটক রচনাও অভীষ্টের এক ভগ্নাংশ মাত্র সম্পন্ন করে, সাহিত্যের নানা বিভাগে আপন প্রতিভার স্পর্শ সঞ্চারিত না করেই মহৎ দায়িত্বশীল কবির পক্ষে এই যে স্বক্ষেত্র ও স্বধর্ম ত্যাগ, বৈষয়িক সমৃদ্ধির কুহকে কাব্যলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করা কোন যুক্তি দিয়েই একে সমর্থন করা যায় না। "The Muss above all is my motto" তিনিই তো বলেছিলেন; এবং "I am as poor as a good poet ought to be"?

যে চিঠিতে প্রথম রাজনারায়ণকে বিলেত যাত্রা সম্বন্ধে আভাস দিয়েছেন [৮৭] সেখানে আরেকটা খবর আছে। স্বয়ং বিদ্যাসাগর তাঁর অনুরাগীদের হয়ে এই বিলাত যাত্রার পরিকল্পনা সফল করার জন্য মধুর সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে কুড়ি হাজার টাকার সংস্থান করে দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। কিন্তু এই সংকল্পের অংকুর কীভাবে ও কখন তাঁর মনে উদ্‌গত হল, লালিত হল, পল্লবিত হল এবং ক্রমে তা সম্পত্তি বন্ধকের ঝুঁকি অঙ্গীকারেও অগ্রসর হল—এ সবই অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আমরা কেবল নানারূপ অনুমান করতে পারি।

॥ সাত ॥

পঞ্চম পর্বে আরও কিছু চিঠিপত্র আছে যার উল্লেখ করা হয়নি। এদের সংখ্যা বারো এবং উদ্দিষ্ট কেশব গঙ্গোপাধ্যায় নামে একজন প্রতিভাবান অভিনেতা ও নাট্য নির্দেশক। তিনি পাইকপাড়ার রাজাদের পৃষ্ঠপোষিত সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁর বৈদগ্ধ্য ও নাটক সম্বন্ধে বিস্তৃত-জ্ঞান মধুসূদনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। নিজের নাটক রচনাকালে মধু এঁর সঙ্গে নাট্যব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতেন এবং কেশবের অভিমত শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনা করতেন। এই নাট্যবিষয়ক চিঠিগুলিতে মধুসূদনের নাট্যাদর্শ, নাট্যরস ও ডায়ালগের আদর্শ, প্লটের বিন্যাস,

চরিত্র চিত্রণ প্রভৃতি নানা নাটকীয় চিন্তাভাবনা বিধৃত। এদিক দিয়ে এদের মূল্য যথেষ্ট। পত্রসাহিত্য হিসাবেও এগুলি উৎকৃষ্ট। এই পত্রালাপে মধুর আনন্দময় ভাবটি যেন আরও স্বপ্রকাশ। উভয়েই নাট্যরসিক ও নাট্যপ্রেমী, নাটকরচনা ও অভিনয়েও পরস্পরের সহযোগী—এই কারণেই কেশবের সঙ্গে মধুর চিঠিপত্রে এমন একটি বিশেষ স্ফূর্তির সুর উচ্ছলিত।

কেশবকে লেখা প্রথম যে চিঠিখানি সংগৃহীত হয়েছে [৬৩] সেখানে মধু বলেছেন যে 'সুভদ্রা' নাটকের প্রথম অংকের পর এবার তিনি দ্বিতীয় অংকটি কেশবকে পাঠাচ্ছেন। এ উক্তিটি দুর্বোধ্য, কারণ ইংরেজী অথবা বাংলায় মধুর এই নামের কোন নাটক পাওয়া যায় নি। মধু আরও বলেছেন যে, এটি ঠিক মঞ্চযোগ্য নাটক নয়, এটা—"simply a Dramatic Poem" কিন্তু সেরূপ নাট্যকাব্যও তো পাওয়া যায় নি। 'বীরাঙ্গনা'য় অবশ্য 'সুভদ্রা' পত্রকাব্য আছে—কিন্তু তাকে তো আর নাটক বা নাট্যকাব্য বলা চলে না এবং তাতে অংক ভাগও নেই। এই 'সুভদ্রা' নাট্যকাব্য নাকি অমিত্রাক্ষরে রচিত, তাই মধু নাটকে অমিত্র ছন্দের প্রয়োজনীয়তা ও ভবিষ্যৎ নিয়েও এ পত্রে আলোচনা করেছেন। বলছেন, "Take my word for it that Blank verse will do splendidly in Bengali and in course of time like the modern Europeans we too shall equal if not surpass our classics. What we want at present are men of zeal, of diligence, of energy, of enthusiasm, of liberal views to give our language a jolly lift.···My motto is 'Fire away my boys !' the Namby-pamby-wallahs —the imitators of Bharut chandra···may frown or laugh at us, but I say—'Be hanged' to them !"

"How are you getting on with 'Sharmistha',—my Garrick ? Have you seen my 'Padmavati' ? Will it do as Sharmistha's successor ?"

এর পরের চিঠিতে [৬৪] 'কৃষ্ণকুমারী'র প্লটের আভাস দিচ্ছেন। কয়টি পুরুষ চরিত্র, কয়টি স্ত্রী চরিত্র লাগবে এই সব জ্ঞাতব্যও।—কী দুঃখের কথা, রাজারা বেলগাছিয়া নাট্যশালা বন্ধ রেখেছেন—নতুন নাটক অভিনয় করাতে উৎসাহ নেই! —"I wish you would stir them up, সখে মাধব্য ! It is a downright shame that such a Theatre as that of Belgachia should be the abode of Bats, or what is tantamount to it, the gaze of Bat-like men !"

আবার বলছেন—"I must be met half-way. ধীমা তেতালা is not the তাল for me."—আমার সমান তালে উৎসাহ দেখাতে হবে তাঁদেরও, তবেই আমি নতুন নাটক লিখে উপহার দেব।—মেঘনাদবধ লেখার প্রচণ্ড চাপের মধ্যেও নাটক রচনার নেশা মাথায় চেপেছে। সবই একসঙ্গে করবেন। এবং তাও ঝড়ের গতিতে। কিন্তু ও পক্ষকেও ধীমা তেতালায় এগোলে চলবে না।

এর পরের চিঠিতে লিখছেন, আপনি প্রশংসা করেছেন, খুশী হলুম। কিন্তু রাজারা নাটকটি অভিনয়ে যে আগ্রহী সে রকম তো কিছু লেখেন নি? অভিনয় হবে কি না তার ঠিক নেই, নাটক লিখে কী হবে? তবে ছোটরাজা যদি আবার থিয়েটার খোলেন তবে "I am his man!" যদি তিনি একটি নতুন নাটক চান তবে আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আপনার কৃষ্ণকুমারীকে পাবেন।

'হ্যাঁ, আপনি একটি under-plot-এর পরামর্শ দিয়েছেন। ভালো পরামর্শ। "What can be bad that comes from you, O thou *avatar* of the Roman Roscius and the English Garrick!" তবে নাটককে দীর্ঘায়িত না করে একটা প্রহসন লিখে দেওয়াই আমার বেশী পছন্দ। "But Master's Hookum is my motto." আপনি যখন under-plot-এর কথা বলেছেন তখন তাই হবে।'

এর পরের চিঠিতে লিখছেন—'যতীন্দ্রবাবু যে নাটকটি মুদ্রণে আগ্রহী, সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ।' কিন্তু আমি তো নাটক ছাপাতে তেমন উৎসুক নই—সেটা গৌণ ব্যাপার। আমি চাই নাটকটি অভিনীত হোক এবং Acted by such an actor as your noble self. The play would be an experiment and unless well supported by great histrionic talent could not be expected to create any great sensations.—নতুন ধরনের নাটক হবে এটা, কাজেই সু-অভিনীত না হলে লোকের মনে দাগ কাটবে না।

'এই নাটকেই আমি কঠোর বাস্তবের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখছি। এবং এমন সব চরিত্র সৃষ্টি করবো যারা স্বাভাবিক সুরে কথা বলবে, কবিতা আওড়াবে না। এ নাটকের ভাষা হবে সহজ স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ—শেক্স্‌পীয়রের মত।'

"If this tragedy be a success it must remain as the foundation stone of our National Theatre." কৃষ্ণকুমারীর নাট্যোৎকর্ষ সম্বন্ধে মধুসূদনের অনেক আশা ছিল এবং এটাই যে বাংলায় আধুনিক ট্র্যাজেডি-নাট্যের, এবং অসীম সম্ভাবনাময় ভাবী নাট্য-সাহিত্যের গোড়াপত্তন করবে এ বিশ্বাসেও তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। কেশবের সঙ্গে প্রায় সব চিঠিতেই ঐ কৃষ্ণকুমারী নিয়ে আলোচনা। কিছুতেই যখন এ নাটক মঞ্চস্থ করতে পারলেন না, তখন বলছেন, আর নাটক লিখবো না, লিখে কী হবে? মঞ্চ আছে অভিনয় নেই, এ তো দেবী সরস্বতীর প্রতি অপমান! বেলগাছিয়ার রাজভ্রাতারা কি তাই করছেন না? ভাবী কালের কাছে কী জবাবদিহি করবেন তাঁরা? মধু'র নিজের তো তবু কাব্যলক্ষ্মীর সাধনা আছে, কিন্তু তাঁদের—?

এই অভিমানে ও ক্ষোভে কৃষ্ণকুমারীর পরে আর নাটকই লিখলেন না মধুসূদন। মৃত্যুর আগের বছর অবশ্য বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য 'মায়াকানন' লিখেছিলেন। কিন্তু সেটা সীরিয়াস নাট্যপ্রয়াস নয়, নাটকের আকারে রোমান্স-বিলাস। মধুসূদনের নাটক লেখার ইচ্ছাই চলে যায় কৃষ্ণকুমারী নাটক মঞ্চস্থ না হওয়ার ফলে। মধুর স্বদেশ মধুর নাট্যপ্রতিভার যথার্থ সদ্ব্যবহার করতে পারলো না।

॥ আট ॥

ষষ্ঠ পর্বের চিঠি পত্রগুলি সবই য়ুরোপ থেকে লেখা—একটি কেবল বিলেতের পথে জাহাজ থেকে লেখা। এ চিঠিগুলির অধিকাংশই লেখা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। এবং বিদ্যাসাগরকে লেখা চিঠিগুলি প্রায় সবই যাকে বলে S.O.S —চরম বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য আকুল আবেদন। এগুলি এক আশ্চর্য দলিল।

মধু বিলেত যাওয়ার আগে তাঁর সম্পত্তির পত্তনিদার মহাদেব চাটুজ্যের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিলেন যে, সে পত্তনির খাজনা ও সম্পত্তির আয় বাবদ টাকা মধুর হিতৈষী ও পৃষ্ঠপোষক দিগম্বর মিত্রের হাতে কিস্তিতে কিস্তিতে জমা দেবে এবং মিত্র মশাই তা মধুকে তার বিলেতের ঠিকানায় পাঠাবেন। এবং সেটা করে কিছু অংশ মধুর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকেও তাদের ভরণপোষণার্থে কলকাতাস্থ বাসায় দেবেন। কিন্তু বছর খানেক না যেতেই সব স্বীকৃত বন্দোবস্ত বানচাল হয়ে গেল। মধুর স্ত্রী হেনরিয়েটা পুত্র কন্যাসহ অর্থাভাবে চরম সংকটে পড়লেন এবং অবশেষে কোন মতে বিলেতে স্বামীর কাছে গিয়ে পেঁছুলেন, তাতে যদি সংকটমোচন হয়। মধু'র ব্যারিস্টারি পাঠ তখন অর্ধেকও সাঙ্গ হয় নি, দিগম্বর মিত্রের টাকাও অনিয়মিত হয়ে পড়েছে, এর মধ্যে ঐ ব্যয়বহুল লণ্ডন শহরে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার আবির্ভাব। মধু ব্যারিস্টারি পাঠ মুলতবী রেখে, লণ্ডন ছেড়ে সবাইকে নিয়ে এসে পড়লেন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের উপকণ্ঠে ভার্সাই উপনগরীর প্রত্যন্তে, লণ্ডন অপেক্ষা ওখানে জীবনযাত্রা অনেক সস্তা বলে। কিন্তু যত সস্তাই হোক যদি দেশ থেকে টাকা আসা বন্ধ হয়ে যায়, তবে ধার দেনা করে সেই বিদেশেও কী করে অনশন ঠেকানো যায়? এদিকে দিগম্বর মিত্র যে শুধু টাকাই পাঠাচ্ছেন না তা নয়, চিঠিপত্রও দিচ্ছেন না। নিরুপায় মধুসূদন একেবারে চরম সর্বনাশের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। তখন তাঁর মনে হল এই মহা সর্বনাশ থেকে তাঁকে বাঁচাতে পারে একমাত্র করুণাসাগর বিদ্যাসাগরের অভয় হস্ত। ২রা জুন ১৮৬৪ তারিখে বিদ্যাসাগরকে সব কথা জানিয়ে, এবং তাঁদের মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা কর'র জন্য করুণ ব্যাকুল আবেদন সহ প্রথম চিঠি দিলেন মধু। এর সাতদিন পরে দিলেন দ্বিতীয় পত্র এবং তার নয়দিন পরে তৃতীয় পত্র। এবং এরও পরে দশ পনেরো দিন অন্তর অন্তর আরো তিনখানি পত্রও দিলেন, ঐ আগের চিঠির অনুবৃত্তি রূপে। ঐ প্রথম চিঠির প্রায় তিন মাস পরে.(২রা সেপ্টেম্বরের চিঠিতে দেখি) বিদ্যাসাগরের উত্তর ও দেড় হাজার টাকার ব্যাংকড্রাফট এসে পেঁছুলো। এতই দূর বিদেশ যে চিঠির উত্তর পেতেই তখন কমপক্ষে আড়াই মাস লাগতো।

প্রথম চিঠিতে মধু লিখছেন: "You will be startled, I am sure grieved

to learn, that I am at this moment the wreck of the strong and hearty man who bade you adieu two years ago with a bounding heart···"—যাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম তাদের দুর্বোধ্য নিষ্ঠুর আচরণে আজ আমি অতীতের জীর্ণ ভগ্নাবশেষে পরিণত হয়েছি।

"I am goirg to a French jail and my poor wife and children must seek shelter in a charitable institution···"—এক বছরের বেশী সময় দেশ থেকে এক কপর্দকও আসে নি, কাজেই এখন জেলখানা ও আতুরাশ্রম ছাড়া আমাদের আর গতি নাই।

বিদ্যাসাগরকে লিখলেন, তাঁর (মধুর) সম্পত্তি যেন কলকাতার ল্যাণ্ড মরগেজ ব্যাংকে বন্ধক দিয়ে হাজার পনেরো টাকার মত তিনি তাঁদের পাঠিয়ে দেন। দিগম্বর মিত্রের কাছে সব কাগজপত্র আছে, তাঁকে ক্ষমতাও দিয়ে আসা হয়েছে, বিদ্যাসাগরের পক্ষে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়।

কিন্তু কোন কিছুই সহজে হবে তা কি সম্ভব? বিদ্যাসাগরকে অনেক গলদ-ঘর্ম হয়ে ও অনেক ছুটোছুটি করে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, অনেক সময় ও শক্তি ব্যয় করে, তবে মধুর সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে টাকা তুলতে হয়। এবং বিদ্যাসাগর বলেই তা পেরেছিলেন, আর কেউ পারতোও না, করতোও না, মধু-কে বাঁচানোও সম্ভব হত না।

দ্বিতীয় চিঠিতে লিখছেন যে, জেলের হাত থেকে সাময়িক বেঁচেছেন এক দয়াবতী ফরাসী মহিলার করুণায়। কিন্তু এভাবে ক'দিন বাঁচবেন? অস্থাবর যা ছিল সব বন্ধক দিয়ে খেয়েছেন। এখন লোকের করুণার দান ভিক্ষা ছাড়া অনশন নিবারণের কোন উপায় নেই। এবং আরো ভয়ংকর বিপদ, এই সংকটের মধ্যে স্ত্রী হেনরিয়েটা আবার আসন্নপ্রসবা!

সেই শয়তান মহাদেব চাটুজ্জে তার দেয় কিস্তির টাকা বন্ধ করেছে, বাবু দিগম্বর মিত্রও নীরব ও নিষ্ক্রিয়। পাঁচ সাতখানা চিঠির একটা উত্তরও দিচ্ছেন না। অন্তত চিঠি পেলেও উদ্বেগ অনেকখানি কমতো। ল্যাণ্ড মরগেজ ব্যাংকের থেকে টাকাটা ঋণ হিসাবে নেওয়ার সময় ঐ মহাদেবকে স্বীকার করিয়ে নেবেন সে যেন ঐ ঋণের সুদটা আবার খাজনা থেকে নিয়মিত মিটিয়ে দেয়।

এত দুঃখ দুর্দশার মধ্যেও মধুর জ্ঞানার্জন স্পৃহায় ভাটা পড়ে নি। ঐ চিঠিতেই লিখছেন: "Though I have been very unhappy and full of anxiety here, I have very nearly mastered French. I speak it well and write it better. I have commenced Italian and mean to add German to my stock of languages—if not Spanish and Portugese, before I leave Europe."

সেই দুর্দিনের অন্ধকারের মধ্যেও তাঁর অতুলনীয় বিদ্যানুরাগ এক আশ্চর্য মশালের মতই প্রজ্বলন্ত।

আবার বলছেন, ফরাসীরা পরভাষা সম্পর্কে অনীহ, কিন্তু তবু সংস্কৃতের বিষয়ে কৌতূহলী। ফরাসী ভাষায় লিখিত একটি ভালো সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ তিনি এখানে দেখেছেন এবং একজন লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে যিনি মনুসংহিতার বিষয়েও জানেন শোনেন।

তৃতীয় পত্রেও [৯৬] ঐ মহাদেব চাটুজ্জের কাছে পাওনা টাকার হিসেব দেওয়া হয়েছে। এবং ল্যাণ্ড মরগেজ ব্যাংক থেকে কীভাবে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে এবং কীভাবে সে টাকা পাঠাতে হবে তার নির্দেশ। মহাদেব চাটুজ্জেরা সব বোধহয় ষড়যন্ত্র করেছে তাঁদের মেরে ফেলবার। কিন্তু, "If we perish, I hope our blood will cry to God for vengeance against our murderers. If I hadn't little helpless children and my wife with me, I should kill myself, for, there is nothing in the instrument of misery and humiliation, however base and low, which I have not sounded ! God has given me a brave and proud heart, or it would have broken long ago." হতাশা ও অপমানে সংক্ষুব্ধ মধুসূদনের কণ্ঠে এ এক মর্মভেদী আর্তনাদ !

প্রায় তিনমাস পরে বিদ্যাসাগরের চিঠি ও দেড়হাজার টাকা এসে পেঁছিলো এবং নিরাশ্বাস মধুসূদনের মনে হল, আর ভয় নেই, তাঁরা বিদ্যাসাগরের আশ্রয় পেয়েছেন। সেই চিঠিখানি বড় মধুর। মধু লিখেছেন যে, সেইদিন সকালেই তিনি রুদ্যমানা হেনরিয়েটাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে আজকের ডাকেই বিদ্যাসাগরের চিঠি নিশ্চয়ই আসবে, কারণ তিনি, বিদ্যাসাগর, প্রজ্ঞায় ও প্রতিভায় প্রাচীন ঋষিতুল্য, আবার উদ্যমে তিনি ইংরেজ, এবং মমতায় বাঙালী মায়ের মত। তাঁর কাছে আবেদন কখনোই নিষ্ফল হতে পারে না। এবং সত্য সত্যই সেইদিন চিঠিও এল টাকাও এল। —"The mail will be in today and I am sure to receive news, for the man to whom I have appealed, has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother !···I was right ; an hour afterwards I received your letter and the 1500 Rs. you have sent me."

তারপর বলছেন, এখানে আমার অনেক দেনা হয়ে পড়েছে। সে সব মিটিয়ে যদি আমায় লণ্ডনে গিয়ে আবার ব্যারিস্টারি পড়া সুরু করতে হয়, এবং সেজন্যই তো আসা—ইতিমধ্যেই মহাদেব চাটুজ্জে ও দিগম্বর মিত্রের নিষ্ঠুর উপেক্ষার জন্য এক বছরের উপর নষ্ট হয়ে গেছে—তাহলে অনেক টাকা লাগবে এবং সেজন্য সম্পত্তি মরগেজ ছাড়া গত্যন্তর নেই। আপনি সেই মতই চেষ্টা করুন।

কিন্তু কোন কাজই সহজে হবার নয়, পদে পদে বাধা। প্রচণ্ড উদ্যমী বিদ্যাসাগরের পক্ষেও আরও এক বছর সময় লাগবে সম্পত্তি বাঁধা দিয়ে মোটা ঋণ সংগ্রহ করতে। অল্পস্বল্প টাকা এলে তা মধুর বকেয়া দেনা সুধতেই যায়, হাতে কিছুই থাকে না। যাক, শেষপর্যন্ত প্রচুর অর্থের ব্যবস্থাই হল এবং মধুও তার অর্ধ-সমাপ্ত ব্যারিস্টারী পাঠ শেষ করতে পারলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর দু'বছর সময় নষ্ট হল ; দু'বছর আগেই তিনি ব্যারিস্টার হয়ে ফিরতে পারতেন। এই যে টাকা অভাবে তাঁর আইন পাঠ ও দেশে ফেরা দুইই অনর্থক দীর্ঘবিলম্বিত হচ্ছে এই অনুতাপ তাঁর প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই ব্যক্ত। টার্মের পর টার্ম চলে যাচ্ছে—'মাইকেল' 'হিলারী' 'ইস্টার' 'ট্রিনিটি' অথচ মধু নিরুপায় হয়ে ভার্সাইয়ে পড়ে আছে। ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরতে কত দেরী হয়ে যাবে কে জানে! এই খেদোক্তি প্রায় প্রতি চিঠিতেই নিঃশ্বসিত।

॥ নয় ॥

আশ্চর্য যে বিদ্যাসাগরের কাছে চিঠিতে নিজের দুরবস্থার মর্মন্তুদ নিষ্ঠুর বাস্তব চেহারা উদ্ঘাটিত করলেও, বন্ধু গৌরদাস ও মনমোহন ঘোষের কাছে লেখা এই সময়ের চিঠিতে এই করাল ছবির কোন আভাস নেই,—সেখানে মধু সেই চির-দিনকার খোশমেজাজী মধু ; রহস্যপ্রিয়, বিদ্যানুরাগী, কল্পনাপ্রবণ।

গৌরদাস বোধহয় কিছু উদ্বেগজনক খবর পেয়েছিলেন, তাই বন্ধুর কুশল সন্দেশ জিজ্ঞাসা করে ও উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করে পত্র দিয়েছিল। উত্তরে [১০৪] মধু লিখছেন ; 'তোমার চিঠি পড়ে খুব আমোদ হল। এ সব আজগুবি খবর যে রটনা করেছে তার কল্পনাশক্তির তারিফ করতে হয়। আমি এই চিঠি লিখছি কোন অন্ধকার জেলখানায় বসে নয়, কিংবা আধুনিক কোন 'বাস্তিল' থেকেও নয় ;—য়ুরোপীয় সভ্যতার সমস্ত আরামের উপকরণে সজ্জিত আমার এই ঘর, যেখান থেকে তোমায় লিখছি।…যে ব্যক্তি এইসব মিথ্যা রটনা করেছে, সে আমার মন্দই চায় তাই রটনা করেছে।…তবে তুমি অবশ্যই জিজ্ঞাসা করতে পারো আমি কেন এখন ফ্রান্সে রয়েছি। আসল কথা কি জানো, কোথায় লণ্ডন আর কোথায় ফ্রান্স,—লণ্ডন ফ্রান্সের কাছে দাঁড়াতেই পারে না। তা ছাড়া লণ্ডনের বিশ্রী জল হাওয়া আমার স্ত্রীর একেবারেই সহ্য হয় না। তা ছাড়া এখানে আমি ফরাসী আর ইটালিয়ান ভাষা শেখবার কত সুবিধে পাচ্ছি। এ দুটি ভাষাতে আমি এখন স্বচ্ছন্দে লিখতে পড়তে পারি এবং এর সঙ্গে জার্মানও যোগ করতে চাই। এর পরে যখন আবার দেখা হবে তখন দেখবে যে আমার পাণ্ডিত্যের পুঁজি আগের চেয়ে আরেকটু ভারী হয়েছে। না, আইন পাঠ আমি ছাড়ি নি। কয়েকটা টার্ম একটু অবহেলা করেছি বটে, যেহেতু আমায় আরও কিছুদিন য়ুরোপেই থাকতে হবে। তবে সেটা মোটেই আফশোষের কিছু নয়।

"I wish I could live here all the days of my life with means to take occasional runs to India to see my friends...This is unquestionably the best quarters of the globe. I have better dinners for a few Francs than the Raja of Burdwan ever dreams of ! I can for a few Francs enjoy pleasures that it would cost him half his enormous wealth to command...this is the অমরাবতী of our ancestral creed. Come here and you will soon forget that you spring from a degraded and subject race. Here you are the master of your masters !......."

মনমোহন ঘোষকে লিখছেন [১০৫] এরই চারদিন পরে : তুমি চলে যাবার পরে আমি "inflammation of the bowels" হয়ে শয্যাগত ছিলাম। মনে হল বুঝি comedy-টা এখানেই সাঙ্গ হয়, আর যবনিকা পতন ঘটে। কিন্তু আমার ভূমিকা এখনো শেষ হয় নি দেখছি। ঈনিয়াস যেমন স্ফীড্রাকে বলেছিল, "The torch lasts still."

"As for my German studies I can say without flattering myself that I have been successful. I have already opened the door. What a pleasure my boy ! Fancy ! I am going to read Goethe, Schiller and Webber and other authors whose good fame has filled the world. Do you know the song by Dryden ?

'None but the brave,
None but the brave,
None but the brave
Deserves the fair.'

It is a fine and charming language, a little hard, perhaps, but rich and full of energy. An Amazon, my friend, is the most worthy lover of Theseus and not a little dwarf.'

আবার ছোটছেলের মত, ফরাসী সম্রাটকে দেখে যে সোৎকণ্ঠ অভিবাদন জানিয়েছিলেন "Viue l' Empereur" বলে সে কথাও বলছেন।

আগের চিঠির তিনমাস পরে, ২৬শে জানুয়ারি ১৮৬৫-তে যখন আবার লিখছেন গৌরদাসকে [১১২] তখনও সেই সদানন্দময় বন্ধুরই কণ্ঠস্বর শুনি। "You can scarcely conceive how Europe has changed me in my habits, in my tastes, in my notions of things in general, and even in my appearance. ...I am no longer the same careless, impulsive, thoughtless sort of fellow ; but a bearded scholar, a man that can correspond with his friends in six European languages and several

Asiatic ones. Yon cannot imagine what a jolly beard and moustacle I have grown."

'তুমি জানতে চাও কবে ফিরবো দেশে ? যদি মহাদেব চাটুজ্জে ও দিগম্বর মিত্র আমার প্রতি এমন নির্মম অবহেলা না করতো, তা হলে আমি এমাসের মধ্যেই ব্যারিস্টার হয়ে ফিরতে পারতুম। কিন্তু যা পরিস্থিতি, তাতে বোধ আরও এক বৎসর কি তারও বেশীই দেরী হয়ে যাবে।

'আমার মাননীয় বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমার সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। তাঁর কাছেই জানতে পারবে আমার প্রতি কী জঘন্য ব্যবহার করা হয়েছে। মাসের পর মাস একটা নিশ্চল জাহাজের মত আমি ফ্রান্সে আটকে আছি। তবে ভগবানের আশীর্বাদে আমার মনের জোর আছে তাই এই দুর্ভাগ্যকেও সব চেয়ে ফলোপধায়ী সাধনে নিয়োজিত করেছি। তিনটে শ্রেষ্ঠ য়ুরোপীয় ভাষা আয়ত্ত করেছি আমি—ইটালীয়, জার্মান ও ফরাসী: যে ভাষাগুলি তাদের সাহিত্যসম্পদের জন্য অবশ্য পঠনীয় "you know, my Gour, that the knowledge of a great language is like the acquisition of a vast and well-culti-vated state—intellectual of course."—যদি বেঁচে থাকি ও দেশে ফিরি অবশ্যই আমার দেশবাসীকে এই সব ভাষা সম্পদের সঙ্গে পরিচিত করবো, বলা বাহুল্য আমার মাতৃভাষার মাধ্যমে।......ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে, মিল্টনের নিজ মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করার যে উচ্চাভিলাষ ছিল, তাই যেন আমাদের প্রত্যেক প্রতিভাবানকে অনুপ্রাণিত করে। যদি কেউ মরণোত্তর খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা করে, পশুর মত অবলুপ্তি নয়, সে যেন মাতৃভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করে। "That is his legitimate sphere, his proper element. ...When we speak to the world, let us speak in our own language. The gents who fancy they are swarthy Macaulays and Carlyles and Thackerays.. are nothing of the sort. I should scorn the pretensions of that man to be callcd 'educated' who is not master of his language ."···

তুমি যে বাগেরহাট থেকে চিঠি লিখেছ সে কি আমার জন্মস্থানের পার্শ্বপ্রবাহিনী কপোতাক্ষ নদীর তীরবর্তী বাগেরহাট ? আমি ইতালীর মহাকবি পেত্রার্কার অনুসরণে কয়েকটি সনেট লিখছি। একটি সনেট লিখেছি ওই কপোতাক্ষ নদের উপর। এই সঙ্গে সেটি ও আরেকটি সনেট পাঠালাম। তুমি এগুলি নকল করে যতীন্দ্র ও রাজনারায়ণকে ও রাজেন্দ্রলালকে পাঠিও। তাঁরা কী বলেন আমায় জানিও। আর একটি লিখেছি কবি ভারতচন্দ্র রায়ের উপরে। সেটিও দিলাম। আমার তো মনে হয়, তাঁর মৃত্যুর পর এযাবৎ ভারতচন্দ্র এমন প্রশংসা আর পান নি। আমার এইসব সনেটের একটি সংকলন প্রকাশ করার ইচ্ছে আছে। "Believe me, my dear fellow, our Bengali is a very beautiful language, it wants men of genius to

polish it up"—যারা আমাদের মত ভ্রান্ত শিক্ষানীতির ফলে এই ভাষা শিখি কি বরং অবজ্ঞাই করতে শিখেছি, তারা নিতান্তই হতভাগ্য। "It is, or rather, it has the elements of a great language in it."

প্রবাসে গিয়ে এবং নানা সমৃদ্ধ বিদেশী ভাষার চর্চা করে মধুসূদনের মাতৃভাষা-প্রীতি এখন দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে। বলছেন :

"I wish I could devote myself to its cultivation, but as you know I have not sufficient means to lead a literary life and do nothing in the shape of real work for a living. I am too poor, perhaps, too proud to be a poor man always."—শুধু সাহিত্যসেবা নিয়ে থাকবো, রোজগারের কোন চিন্তা নেই, তেমন অবস্থা তো আমার নয়। আমি গরীব হলেও, চিরদিন গরীব থাকতে আমার অহংকারে বাধে। কিন্তু আমাদের দেশে যাদের টাকা আছে তারাই বড়মানুষ, টাকা না থাকলে কেউ কিছু নয়।—"If you have money, you are বড় মানুষ, if not, nobody cares for you! We are still a degraded people. Who are 'বড়মানুষ' among us? The *nobodies* of Chorebagan and Barrabazar! Make money my boy, make money!"

এর পরই তিক্ততম সুরটি ধ্বনিত হচ্ছে।—"If I haven't done something in the literary line, if I do possess talents I have not the means of cultivating them to their utmost content and our nation must be satisfied with what I have done"—আমার যে কিছু প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তার সার্থকতম ও পূর্ণতম সদ্ব্যবহার করতে পারলাম না, সে তো আমার অর্থাভাবের জন্যই, এবং যেটুকু পেরেছি তাই নিয়েই আমার দেশবাসী সন্তুষ্ট থাকুন।

মধুসূদন যে কোন গভীর অপমানের ক্ষত নিয়ে—সাহিত্যসেবা অর্ধসমাপ্ত রেখে—ব্যারিস্টারী পড়তে গিয়েছিলেন, দারিদ্র্যের অপমান মুছে ফেলবেন বলে, সেই রকম একটা আভাস যেন এই পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে উচ্চারিত।

একটি চিঠি এই সময় মধু লিখেছিলেন [১১৪] ইতালীর সম্রাট ভিক্টর ইম্যানুয়েলকে—মহাকবি দান্তের ৬ষ্ঠ জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে, একটি সনেট-অর্ঘ্যসহ। সেই অনবদ্য সনেটটি মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে সকলেই পড়েছেন।

বিলেত থেকে ফেরার পরবর্তী চিঠিগুলিতেও পাশাপাশি দুটি ভিন্ন সুর। বিদ্যাসাগরকে লেখা এ পর্বের চিঠিতেও নানা সাংসারিক ও আর্থিক উদ্বেগের কথাই প্রধান, ঋণ সংগ্রহ ও পরিশোধের নানা উপায় নিয়ে ব্যাকুল পরামর্শ। এবং পুনুর্বাসিংহ বিদ্যাসাগরই যে মধুর একমাত্র আশ্রয় ও নির্ভরস্থল সেই সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি। অন্যদিকে বন্ধু গৌরদাসের কাছে লেখা যে বারোখানি চিঠি এ পর্বেও সংগৃহীত হয়েছে তার মধ্যে কোথাও কোন দুশ্চিন্তার ছায়াপাত নেই, সেখানে কেবল তাঁর আনন্দময় সত্তারই

প্রকাশ দেখি। তবে আগের চেয়ে এখন তিনি একটু বেশী ব্যস্ত, চিঠি লেখার সময় কম পান; কিন্তু তেমনি প্রাণখোলা ও হাসিখুশি ভাব।

রাজনারায়ণ কিংবা অন্য কোন বন্ধুবান্ধবের কাছে লেখা এ সময়কার কোন চিঠিপত্রের নিদর্শন আমরা পাই না। সাহিত্য আলোচনাও আর প্রভৃত নয়। জীবনযুদ্ধ ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে বলে সম্ভবত বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন তিনি। কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত গৌরদাসকে লেখা চিঠিগুলিতে দুর্যোগের কোন আভাস নেই! মক্কেল, পসার ও কর্মব্যস্ততার কথাই সেখানে শুনি। এবং বন্ধুর প্রতি অফুরন্ত প্রীতি ও ভালবাসা।

শেষ জীবনে বাঙ্গালীচরিত্রের নীচতা ও শঠতা দেখে-দেখে মধু যেন তিক্তজর্জর হয়ে পড়েছিলেন। য়ুরোপ থেকে বিদ্যাসাগরকে লেখা চিঠিপত্রেও তাঁর তিক্ত ক্ষোভ মাঝে মাঝেই ফেটে পড়েছে। য়ুরোপের অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফেরার পর, অত্যন্ত নিকট থেকে সেই দেশবাসীকে আর যেন সহ্য করতে পারছেন না। এই কাপুরুষ সমাজে একমাত্র বিদ্যাসাগরই বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। তাই দেখি, চরম তিক্ততায় বলছেন, [১২৭] "...But though a Bengali you are a man, and I believe you would risk anything to help a friend in such distress as I am!" আবার, "If you were a vulgar fellow, I should (I repeat) hesitate to write to you in this strain, for you would say—'Bah, he has been doing the aristocrat, let him suffer for his folly!' But you are one of Nature's noblemen, tho' a Beng; you will (unless I am greatly mistaken) feel for me and sympathise with me."

১৮৬৯-এর জুলাইয়ের পরে লেখা মধুর আর কোন চিঠিপত্র যে পাওয়া যায় নি, সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তাঁর জীবনের শেষ তিন বছর ক্রমবর্ধমান হতাশা ও দুর্গতির কাল। ঋণভারে জর্জর, জীর্ণভগ্নস্বাস্থ্য, অভাবে অনটনে তিনি তখন ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছেন। বন্ধুবান্ধবের কাছে চিঠি লেখার মেজাজ হয়তো আর খুঁজে পান নি। সম্ভবত নিতান্ত বৈষয়িক কাজে ছাড়া কোন চিঠিই আর লেখেন নি সে সময়। কিন্তু সে সব বৈষয়িক চিঠিও পাচ্ছি না আমরা। মধু-জীবনের শেষ ৩।৪ বছর সম্পূর্ণ পত্রহীন ও স্তব্ধ। সর্বনাশ-কে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখে তিনি যেন মৌন অবলম্বন করে স্থির দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে আছেন।

॥ দশ ॥

চিঠিপত্রে মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব সর্বত্র স্বয়ম্প্রকাশ—'নাড়লে হীরক যথা ঠিকরায় আলো।' মধুচরিত্রে জটিলতা অল্প বলেই হয়তো তার প্রকাশ এত স্বচ্ছ। তাঁর

মধ্যে আত্মসচেতন, আত্মবিশ্লেষণী মনের সাক্ষাৎ পাই না। মনস্তত্ত্বে যাকে বলে introvert বা অন্তর্মুখী তিনি তা ন'ন। মুখ্যত তিনি বহির্মুখী বা extrovert। যে-কোন পরিস্থিতিতে তিনি তাঁর সমগ্র সত্তা দিয়ে অনুভব করেছেন ও সাড়া দিয়েছেন। মানসিক কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব জিজ্ঞাসার আবর্তে বাধাগ্রস্ত হন নি। কোন অনিশ্চয়তা, আত্মবিরোধ বা আত্মখণ্ডন তাঁকে দুর্বল করেছে দেখা যায় না। ভাবনার দ্বারা তিনি জীর্ণ ন'ন। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রধান উপাদান হৃদয়। ব্যগ্র ভাবোদ্বেল অনুরাগপ্রবণ, আশাবাদী, প্রাণপ্রবল তাঁর প্রকৃতি। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিও ঐ একই প্রকার full blooded, virile ও passionate—তেজস্বী, বীর্যবান ও আবেগচালিত। 'মেঘনাদবধ'-এ দুই সুমেরু শীর্ষের উচ্চতা নিয়ে যেমন রয়েছেন রাবণ ও মেঘনাদ চরিত্র। তুলনায় রামচন্দ্র ও তাঁর বান্ধবেরা হীনপ্রভ, সহানুভূতিবঞ্চিত। সহানুভূতির পথে কেবল বানরযূথই প্রতিবন্ধক নয়, মধুসূদনের প্রতিভা ও হৃদয়েই প্রতিকূলতা। "I despise Ram and his rabble" লিখেছিলেন রাজনারায়ণকে। যা নিবৃত্তিমূলক ও দৈবসহায় এবং নীতিনিষ্ঠ, যা হৃদয়ের প্রবর্তনা অপেক্ষা নীতিশাস্ত্রের নির্দেশকে বেশী মান্য করে, তার প্রতি মধুর স্বাভাবিক বিরূপতা ছিল। য়ুরোপীয় রেনেসাঁস-বন্দিত humanism বা প্রবৃত্তিমূলক মানবতাবাদ, যা জীবনকে ষোল আনা আগ্রহণ ও স্বীকরণের পথেই সার্থকতা অন্বেষণ করে, তা-ই তাঁরও জীবনধর্ম ছিল। আধ্যাত্মিক বোধির দিক বা আত্মশাসন ও কৃচ্ছ্রসাধনের পথে মহত্তর মঙ্গলের সাধনা—ত্যাগ তিতিক্ষা ও আত্মবিসর্জনের ক্ষুরধার পথে মনুষ্যত্বের পরিচয় অন্বেষণ—এ সব আদর্শ মধুসূদনকে আকৃষ্ট করে নি। না-ধর্মী বা negative বলেই করে নি। তাঁর স্বভাব ছিল প্রবলভাবে হাঁ-ধর্মী।

তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং প্রকাশের গুণে মধুসূদনের চিঠিগুলি পরম উপাদেয় পত্রসাহিত্য হয়ে উঠেছে। এর পদে পদে wit-এর চমক, পদে পদে হাস্যরোল। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতিভাস প্রতি ছত্রে। এমন প্রাণপ্রাচুর্য, হৃদয়ের এমন রক্তিম উত্তাপ, এমন সজীবতা আর কারো পত্রধারায় এমন পরিপূর্ণভাবে ধরা পড়েছে কি না সন্দেহ। অন্তত বাংলা সাহিত্যে এর নজির নেই।—(যদিও ইংরাজিতে লেখা, তবু মধুর পত্রসাহিত্য বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত বলেই গণ্য করা সঙ্গত মনে করি।)

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রেও তাঁর ব্যক্তিত্বের অনেকখানিই ধরা পড়ে কিন্তু তবু যেন কিছুটা অন্তরালে থাকে। হয়তো সে অন্তরাল মৃত্তিকাগন্ধী মানুষী অস্তিত্বের। মোহিতলালের চিঠিপত্রে তাঁর ক্লিষ্ট উদ্বিগ্ন অশান্ত বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিত্ব ক্ষণে ক্ষণে বিচ্ছুরিত। কিন্তু তাতে কোথাও হো-হো হাসির ঝড় নেই। কোমল শান্ত ললিত সুরও শ্রুতিগম্য নয়। মধুসূদনে কিন্তু মৃত্তিকার কাছের নিরাবরণ মানুষটিকে বারে বারেই চোখে পড়ে, যেমন শুনি থেকে থেকে তাঁর প্রাণখোলা হাস্যরোল।

যখন তিনি বলেন, "But hang the insects of a day!" কিংবা "My motto is 'Fire away my boys!' The Namby—Pamby-Wallahs...may

frown or laugh at us, but I say-'Be hanged' to them !" অথবা, "I am about the most docile dog that ever wagged a literary tail" কিংবা "Pray, how do you know the Rev. D. Vyasa did not march into beef and sip his brandy-pawny ?"—আমরা তাঁর হাস্যনিনাদিত কণ্ঠস্বরও যেন শুনতে পাই। তাঁর লেখনী এমন সতেজ ও নমনীয় যে, তাঁর কণ্ঠের সব স্বরবৈচিত্র্যই শ্রুত হয়, গোটা মানুষটাই তাঁর সব হাবভাব ব্যঞ্জনা নিয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠেন।

এইটেই মধুসূদনের পত্রালাপের স্টাইলের উৎকর্ষ। স্টাইল অবশ্যই ব্যক্তিত্বের মুকুর, কিন্তু আরও কিছু বেশীও বটে। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে প্রকাশের উৎকর্ষ সংযুক্ত হলে তবেই স্টাইলের সাক্ষাৎ মেলে। যেখানে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে প্রকাশের চরমোৎকর্ষের সংযোগ ঘটে সেখানেই স্টাইলের অনবদ্য পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়। মধুসূদনের চিঠিপত্রে শুধু তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বই স্বচ্ছ-প্রতিভাত নয়, তাঁর প্রকাশসিদ্ধিও আমাদের নিরন্তর আনন্দিত করে। চিঠিপত্রের মধ্যে মধুসূদন যখনই যা বলছেন, তা-ই যেন সেই বক্তব্যের চূড়ান্ত উচ্চারণ—বক্তার অন্তরের কেবল নিখুঁত প্রতিচ্ছবিই তা নয়, উচ্চারণের গুণে বাচ্যকে অতিক্রম করে বচন হয়েছে বাণী, চির কালের বাণী। সে উচ্চারণে এক বিশাল কণ্ঠস্বরেরও ব্যঞ্জনা শ্রুত হয়—ইংরেজ কবিকে অনুসরণ করে যাকে বলা চলে—"that large utterance of the early gods"। মধুর রেনেসাঁসধর্মী চরিত্রের এই প্রাণবৈপুল্য, কণ্ঠস্বরের এই সাগরকল্লোল। কবি কীট্‌স্ তাঁর একটি চিঠিতে বলেছেন, "the indescribable gusto of the Elizabethan voice"—এলিজাবেথীয় কণ্ঠস্বরের অপরিমেয় প্রাণবত্তার কথা। মধুর চিঠিপত্রে সেই এলিজাবেথীর যুগের রেনেসাঁস-সুলভ 'gusto' সর্বত্র ধ্বনিত। তাঁর বিদ্যানুশীলনে, ভাষাচর্চায়, কাব্যসৃষ্টিতে, নাট্যরচনায়, চিঠিপত্রে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই বিপুল প্রাণদীপ্ত আগ্রহসংবেগ লক্ষিত হয়। বাংলা পত্রসাহিত্যে এর তুলনা নাই।

সাহিত্যতাত্ত্বিক শ্রীমধুসূদন

বিমল মুখোপাধ্যায়

প্রচলে আস্থাহীনতা ও প্রবল অসহিষ্ণুতা যাঁর ব্যক্তিমানস ও শিল্পীচিত্তকে দুরন্ত বেগবান করে তুলেছিল, স্থির প্রত্যয়ভূমি থেকে তত্ত্বোচ্চারণ তাঁর স্বভাবধর্ম নয়। তত্ত্ব গড়ে উঠে সংহত মূর্তি নেয় ক্রমে। সুস্থির মানসিকতা ও প্রজ্ঞাই তত্ত্বের জন্ম দেয়। তাই বিস্ময় মানতে হয় যখন চোখে পড়ে এই সত্য যে, মধুসূদনের মত অস্থির ও চঞ্চল কবির মধ্যে বাস করতেন সংযত কলাবিদ্ গুণী এবং তাঁর শিল্পী-মনের গভীর গোপনে বিরাজ করতেন এক প্রজ্ঞাবান বিচারক। শিল্পতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে নিয়মিত প্রবন্ধ একটিও লেখেন নি সত্য, কিন্তু বন্ধুদের কাছে লেখা তাঁর চিঠি-পত্রগুলি গভীরতায় ও বৈচিত্র্যে কীট্‌স-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শেলি-র 'ডিফেন্স' বা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'লিরিকাল ব্যালাডস'-এর মুখবন্ধের সমতুল কোনও প্রবন্ধ কীট্‌স লেখেন নি, কিন্তু জর্জ ও জর্জিয়ানো কীট্‌স-এর কাছে, রেনল্ডস-এর কাছে, টেলর-এর কাছে অথবা বেইলি-এর কাছে লেখা পত্রগুলিতে অকপট আত্মোমোচন ঘটেছে সচেতন শিল্প-তাত্ত্বিক কীট্‌স-এর। মধুসূদনও কাব্য এবং নাটক সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছেন বন্ধু গৌরদাস বসাক, রাজনারায়ণ বসু এবং কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। চিঠি ছাড়া অন্তত তিনটি সনেট লিখেছিলেন মধুসূদন যা কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান 'কবি', 'কবিতা', 'কল্পনা'।

কে কবি? 'শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন' সেই কি কবি? উত্তরে 'কবি' সনেটটিতে মধুসূদন 'কল্পনা' শক্তির মাহাত্ম্য স্বীকার করে বললেন 'সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী/যার মনঃ কমলেতে পাতেন আসন'। 'কল্পনা' আর একটি সনেটের শিরোনাম। এখানে 'কল্পনা'র মহিমা প্রসঙ্গে মধুসূদনের বক্তব্য,—'কি স্বর্গে, কি মরতে, অতল পাতালে/নাহি স্থল যথা, দেবী নহে তব গতি' অবশ্যই স্মরণ-করিয়ে দেয় শেক্সপীয়রের 'A Midsummer Night's Dream'-এর থিসিউস-এর বিখ্যাত উক্তি 'As imagination bodies forth/The forms of things unknown; the poet's pen/Turns them to shapes, and gives to airy nothing/A local habitation and a name.' 'মনের-উদ্যান মাঝে কুসুমের সার' যে 'কবিতা-কুসুম রত্ন' সেই কবিতা গড়ে ওঠে যে 'কল্পনা সুন্দরীর সহায়তায়, মধুসূদনের মতে, সেইই তো বাগ্দেবীর প্রিয়সখী ('কবিতা')।'······এই তিনটি সনেট ছাড়া আরও চারটি সনেটে ভারতীয় আলংকারিকদের দ্বারা বিশ্লেষিত রসের জ্ঞানগম্য বাস্তবরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন বর্ণনার দ্বারা—'করুণ-রস', 'বীর-রস', 'শৃঙ্গার-রস' ও 'রৌদ্র-রস'। সুতরাং

ভারতীয় রসবাদী আলংকারিকগণ এবং তাঁদের অভিমত মধুসূদনের অপরিচিত ছিল না। অথচ এই সব সনেট জন্মের পূর্বেই ১৮৬০-এর ১৫ই মে-এর চিঠিতে মধুসূদন তাঁর সুহৃদ রাজনারায়ণ বসুকে জানিয়েছেন, বিশ্বনাথের 'সাহিত্য দর্পণ'-এর নির্দেশে চালিত হবেন না তিনি। কিন্তু এই সত্যও অনস্বীকার্য যে, উক্ত পত্রের শেষের দিকে তিনি লিখছেন, 'I wish you would take up the subject of Criticism.' Criticism বা সমালোচনার জগতে খ্যাতিমান যাঁদের উল্লেখ মধুসূদন করেছেন, তাঁরা হলেন, অ্যারিস্টটল, লঞ্জাইনাস, কুইণ্টিলিঅন, বার্ক, কেমস, এ্যালসন, এডিসন, ড্রাইডেন, শ্লেগেল, ব্লেয়ার ও সাহিত্য দর্পণের বিশ্বনাথ। প্রয়োজন মত সংস্কৃত পণ্ডিতদের সাহায্য নিতেও বললেন। একই চিঠিতে বিশ্বনাথের নির্দেশ সম্পর্কে বৈরাগ্য কিন্তু 'সাহিত্য দর্পণ'-এর প্রতি আগ্রহ বিস্মিত করে না কি! এর সঙ্গে প্রশ্ন জাগে, বিদেশী যে সব কাব্যতত্ত্বজ্ঞদের উল্লেখ তিনি করলেন, তাঁরা কি তাঁর স্মরণলোকে আবির্ভূত হলেন আকস্মিক ভাবে? না কি কবি-অন্তরের প্রসাদে দীর্ঘদিন পুষ্ট এঁদের স্মৃতি? অ্যারিস্টটলের 'Poetics', লঞ্জাইনাসের 'Peri Hupsous', কুইণ্টিলিঅনের 'Institutio Oratoria,' এডিসনের 'On the pleasures of the Imagination' কেমসের, 'Elements of Criticism' এবং ড্রাইডেনের 'Essay on Dramatic Poesy' মধুসূদন কতটুকু মনোযোগ দিয়ে পড়েছিলেন, এই চিঠিতে বা অন্যত্র তার প্রমাণ নেই। কিন্তু কাব্যে নাটকে এবং সমালোচনায় তিনি নিজের জন্য এমন একজন মানুষের জীবন কামনা করেছিলেন যাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হবে গ্রীক ও রোমানদের তুল্য। মধুসূদনের যশোলিপ্সার ক্ষেত্র সমালোচনার দিগন্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছিল, ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

শ্রেষ্ঠ কবিই সেরা সমালোচক, শুধু অস্কার ওয়াইল্ড নন, এমন কথা বলেছেন অনেকেই। কোলরিজ-এলিঅট-ভালেরি-রবীন্দ্রনাথের মত অনেক কবির ক্ষেত্রেই সফল কবি এবং নিপুণ সমালোচক একাঙ্গ হয়েছেন, এ ঘটনাও আমাদের অজ্ঞাত নয়। তথাপি কবি ও সমালোচকের বাস দুই ভিন্ন মেরুতে। ক্রুদ্ধ তলস্তয় তো একদা মন্তব্য করেছিলেন, সমালোচক হচ্ছেন পাঠকের সাহিত্যোপলব্ধির পথের প্রধান অন্তরায়। তলস্তয়ের মন্তব্য হয়তো সর্বাংশে সত্য নয়, কিন্তু রসস্রষ্টা ও রসভোক্তার মধ্যে গুণগত পার্থক্য কিছু আছেই। সৃষ্টি ও বিচার মুহূর্তে একই ব্যক্তির সত্তা (লেখকই যদি বিচারক হন) যদি দ্বিধাবিভক্ত না হয়, তাহলে বিচার যথাযথ হয় না। মধুসূদনের প্রতিভা অন্তত এই কারণেও বিস্ময়কর যে, তাঁর ক্ষেত্রে স্রষ্টা ও বিচারকের দ্বৈত সত্তার বাঞ্ছিত সুষম মিলন হয়েছিল। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রথম সর্গ রাজনারায়ণ বসু-র কাছে পাঠিয়ে যখন তিনি লেখেন, 'you must weigh every thought, every image, every expression, every line' অথবা 'সুভদ্রা'র ২য় অঙ্ক কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে পাঠিয়ে জানান, 'In reading over my poem, you must look 1st to the imagery, 2nd to the language in which those images and thoughts

are expressed ; 3rd to the individual flow of each verse. Do not care for the general effect,' তখন কি সমালোচনার জগতে একজন analytical পন্থতির সমর্থক স্পষ্ট হয়ে ওঠেন না ? Synthesis অপেক্ষা analysis-এ বিশ্বাসী ছিলেন বলেই কাব্য বিচারে প্রতিটি শব্দ, চিত্র, ভাষা সম্পর্কে মধুসূদন তাঁর বন্ধুকে সজাগ থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু কি লিখতে হবে জানলেই চলে না, কেমন করে লিখতে হবে, কবি বা নাট্যকারকে তাও জানতে হবে, এই অ্যারিস্টটলীয় নির্দেশ না মানলে এবং সাহিত্য বিচারে ক্লাসিকপন্থীদের মত রোমান্টিকপন্থীদের রচনার সঙ্গেও পরিচিত না থাকলে রাজনারায়ণ বা কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে মধুসূদন ঐ পথের নির্দেশ দিতেন না।

॥ দুই ॥

'শর্মিষ্ঠা'-র পান্ডুলিপি রামনারায়ণের কাছ থেকে ফিরে পেয়ে ক্ষুব্ধ কবি, বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখেছিলেন, 'a man's style is the reflection of his mind', সুতরাং পণ্ডিত রামনারায়ণের কাছ থেকে ব্যকরণের ভ্রম সংশোধন ছাড়া মধুসূদন অন্য কিছু কামনা করেন নি। 'স্টাইল' বা রচনারীতির গুরুত্ব সম্পর্কে প্রসঙ্গত যে মন্তব্য মধুসূদন করলেন, তা বুফ* (Style is the man himself), কার্লাইল (Style is the skin, not the coat), এমন কি ওয়াল্টার পেটার বা উত্তরকালের মিডলটন মারে-র মুখেও বেমানান হত না। 'Style'-এর গুরুত্ব জানতেন বলেই অপরের সাহায্যে যে-কোন লেখক বড় হতে পারেন না, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস এবং সেই কারণেই বাঙলা লেখায় তখনও সুদক্ষ না হয়েও স্পষ্টই জানিয়েছেন, ' I shall withstand or fall by myself' আবার 'Style' সম্পর্কে সচেতনতার জন্যই বিদেশী সাহিত্যের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ সম্পর্কেও তিনি সতর্ক ছিলেন। বিদেশী প্রভাব যে-কোন কবির ক্ষেত্রেই কখনও দুষ্য নয়, আবার অপরের দ্বারা প্রভাবিত রচনা শিল্পীর স্বাতন্ত্র্যহীন হওয়াও অনুচিত। মধুসূদন প্রশ্ন রেখেছিলেন যে তাঁর লেখা যদি বিদেশী সাহিত্য বা সাহিত্যিকদের স্মরণ করিয়ে দেয় তবে তা কি অপরাধ ? মুরের 'Orientalism' বায়রণের 'Asiatic air', অথবা কার্লাইলের 'Germanism' যদি এঁদের পাঠকদের ক্ষোভ সৃষ্টি না করে, তাহলে মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা'য় বিদেশী প্রভাব নিয়ে পাঠকেরা কেন ক্ষুব্ধ হবেন ? অপরের কাছে ঋণী হলেও সাহিত্যিক জীবিত থাকেন তাঁর নিজস্ব রচনাকৌশলের মধ্যে যেখানে তিনি একক এবং সম্রাট। এই বিশ্বাস ছিল বলেই বলিষ্ঠ প্রতিপক্ষীয়দের আক্রমণ সম্পর্কে সচেতন হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনে বিদেশী মহাজনদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন বন্ধুদের কাছে। গৌরদাসের কাছে চিঠির ছলে এ যেন কবির কৈফিয়ত।

এ রকম কৈফিয়ত একদা রবীন্দ্রনাথকেও দিতে হয়েছিল বিদেশী সাহিত্যের স্পর্শকে ঘুমন্ত রাজকন্যার অঙ্গে সাগরপারের রাজপুত্রের সোনার কাঠির স্পর্শের সঙ্গে উপমিত করার জন্য। মধুসূদন-বঙ্কিমের পরে আবির্ভূত, গুণমুগ্ধ সশস্ত্র ভক্তদের দ্বারা পরিবেষ্টিত রবীন্দ্রনাথ যে কথা আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিলেন, মধুসূদনের সে সুযোগ কোথায়? তাই প্রথমে প্রতিবাদে উচ্চকণ্ঠ হয়েও শেষে যেন কৈফিয়তের ঢঙে নম্র হলেন, 'I may borrow a neck-tie or even a waist coat, but not the whole suit.' বিদেশী সাহিত্যের কাছে এই ঋণ 'old school' সহ্য করবেন না, 'new school' পারবে না তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে, তা জেনেও হোমর বা মিল্টনের কাছে তিনি সচেতন ঋণী এবং ঋণ স্বীকারে বিদগ্ধ বন্ধুদের কাছে অকপট। ঋণের বোঝা যে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ম্লান করবে না, হোমরের কাব্য-সৌন্দর্য ও বাল্মীকির কাব্যসুধা যে এক পাত্রে পরিবেশন করা সম্ভব এ কথা উনিশ শতকের প্রতিকূল পরিবেশে উপলব্ধি নিঃসন্দেহে বিদ্রোহী শিল্পী ও প্রজ্ঞাবান তাত্ত্বিকের সুসমঞ্জস মিলন ঘোষণা করে। শিল্পীর সচেতনতা আরও স্পষ্ট হয় যখন শুনি বাল্মীকির কাছ থেকে যথাসম্ভব স্বল্প গ্রহণ করে নিজ প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশের সুযোগ নেবেন যেমন, তেমান যুদ্ধ বিগ্রহপূর্ণ হোমরের কাব্যকাহিনীও সর্বদা অনুসরণ বা অনুকরণ করবেন না। মধুসূদনের এই অভিমতে তাঁর যে বিচারবোধ কাজ করেছে, তা হ'ল ঔচিত্যবোধের দ্বারাই কোন সাহিত্যিককে পরিচালিত হতে হয়। প্রাচ্যের অনভ্যস্ত পাঠকেরা হোমরীয় যুদ্ধ বিগ্রহের দৃশ্যে আকৃষ্ট না হতে পারেন, আবার অন্যদিকে প্রাচ্যের বাল্মীকির অন্ধ অনুসরণও উনিশ শতকের বাঙালী পাঠকদের আস্বাদ্য না হতে পারে। পাঠকরুচি গঠন করা যেমন পথিকৃৎ শিল্পীর এক অলিখিত দায়িত্ব, তেমনি নব্যতার প্রলোভনে পথিকদের চেতনাকে আঘাত না করাও তাঁর অবশ্য-কর্তব্য। স্রষ্টা মধুসূদনের অন্তরে যদি সমালোচক মধুসূদনের সক্রিয় অস্তিত্ব সত্য না হত তাহ'লে এই বোধের দ্বারা তিনি কদাপি পরিচালিত হতেন না।

॥ তিন ॥

মধুসূদনের অন্ধ অনুরাগ ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল মিল্টনের প্রতি। এই অনুরাগ-বশেই তিনি বলেছিলেন: [ক. ভার্জিল, তাসো বা কালিদাস মহৎ কবি কিন্তু তাঁরা mortal, আর মিল্টন স্বর্গীয়; [খ. মিল্টনের কবিতা নির্জন নিস্তব্ধ অরণ্যে সিংহের গম্ভীর গর্জন; [গ. তাঁর 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর শয়তানের মত মিল্টনও 'full of the loftiest thoughts, but has little or nothing that may be called amiable. He elevates the mind of the readers to a most astonishing

height, but he never touches the heart.' ফলে তাঁর কবিতা শুধু স্পর্শ বা আবিষ্ট করে না, কাব্য পাঠকের মনকেও বিস্ময়কর সমুন্নতি দান করে। মিল্টনের কাব্যবিচারে মধুসূদনের এই মন্তব্যে লঞ্জাইনাসের পাঠকের সন্ধান পাওয়া যায়। মিল্টন বা তাঁর কাব্য সম্পর্কে মধুসূদনের এই মন্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয় লঞ্জাইনাসের 'সাব্লাইম' তত্ত্ব—'For by some innate power the true sublime uplifts our souls ; we are filled with a proud exultation and a sense of vaunting joy, just as though we had ourselves produced what we had read.' মধুসূদনের শেষ বাক্যটি এবং লঞ্জাইনাসের বাক্যের প্রথমাংশ বক্তব্যের দিক থেকে অত্যন্ত কাছাকাছি। মিল্টন সম্পর্কে তাঁর বিচার চমকিত করে যখন শুনি 'He is Satan himself.' সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার অন্তরের ঐক্যানুসন্ধান, শিল্পে শিল্পীর 'পার্সোন্যালিটি'র সূত্রান্বেষণ, এ তো অ্যারিস্টটলীয় ধারণায় সীমাবদ্ধ নয়। এই ধারণার বিস্তার ঘটেছে একালে। ওয়াল্টার র‍্যালে (No man can walk abroad save on his own shadow) অথবা হার্বার্ট রীড-এর মুখে (What we may really expect in a work of art is a certain personal element) একালে এই ধরনের তত্ত্ব আমরা উচ্চারিত হতে শুনেছি। মধুসূদনের এই তত্ত্ব-ভাবনা তাঁর নিজের সৃষ্টি সম্পর্কেও প্রয়োগ করা সম্ভব। ইন্দ্রজিতের হত্যাদৃশ্য বর্ণনা করে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে মধুসূদন যখন জানান, ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করতে গিয়ে প্রচুর অশ্রুমোচন করতে হয়েছে তাঁকে, তখন রাবণের পিতৃ হৃদয়ের সঙ্গে লেখকের হৃদয়ের আবিচ্ছিন্নতা চোখে পড়ে না কি ? কিন্তু কোন চরিত্রের মৃত্যুদৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে মহাকাব্যের স্রষ্টার এই অশ্রুবর্ষণ তাঁর 'ক্লাসিক' স্বভাবকে বিনষ্ট করে। আসলে ১৮৬৫-এর ২৬শে জানুয়ারি তারিখে গৌরদাস বসাকের কাছে লেখা চিঠিতে মধুসূদনের আত্মস্বরূপ-উন্মোচনটি ছিল যথার্থ— 'Of course I am still romantic, for that you know is my nature'। এই রোমান্টিকতাই কি মিল্টনের ভাবশিষ্যকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিল ? (১৮৪২-এর ৭ই অক্টোবর গৌরদাস বসাকের কাছে লেখা চিঠি দ্রষ্টব্য)।

॥ চার ॥

শিল্প-সাহিত্যবিচারে মধুসূদন লেখকের ব্যক্তিত্বের উপর যেমন আলোকপাত করেছেন, তেমনি রচনাকাল ও রচয়িতার মধ্যেও সম্পর্কসূত্র অন্বেষণ করেছেন। এই সূত্রেই তিনি উনিশ শতকের মধ্যভাগে আমাদের জাতীয় জীবনে নাটকের সম্ভাবনা খুঁজে পান নি '···this is not the age for the drama to flourish.' কিন্তু কোন্ কালে কোন্ পরিবেশে নাটকের জন্ম সম্ভব তা বলেন নি। তবে মনে হয়,

বস্তুসচেতনতার বিকাশলগ্ন নাটক জন্মের যোগ্য পটভূমি, এই রকম একটা ধারণা ছিল তাঁর। নতুবা বলতেন না, আমাদের নাটকগুলি যথার্থ নাটক নয়, এগুলি সবই 'dramatic poems' বা নাট্যকাব্য। অন্যদিকে য়ুরোপের সার্থক নাটকগুলিতে আছে 'Stern realities of life,' 'lofty passions' এবং 'heroism of sentiment'। কিন্তু বস্তুজীবন নির্ভরতা, তীব্র Passion ও Sentiment যেহেতু নেই আমাদের জীবনে, যেহেতু ইহজগৎকে বিস্মৃত হয়ে কল্পলোকবিহারী হওয়াই আমাদের আন্তরিক বাসনা, তাই নাটকের পূর্ণবিকাশ ঘটে নি এদেশে। যে দেশে নাটক জন্মের পরিবেশগত সম্ভাবনা বিকাশ পায় নি, সে দেশের একজন নাট্যকারকে শেক্সপীয়রের পাশে বসিয়ে তুলনামূলক বিচারের চেষ্টা যে কতটা ভ্রান্ত, সচেতন সমালোচকের মত মধুসূদন তা ঠিকভাবেই লক্ষ্য করেছিলেন। উত্তরকালের বাঙালী নাট্যসমালোচকেরা উনিশ শতকের বাঙালী নাট্যকারদের কারুর কারুর সঙ্গে যখন শেক্সপীয়রের প্রতি তুলনায় আগ্রহ বোধ করেছেন, এমন কি নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের মত কেউ কেউ শেক্সপীয়রকে তাঁর আদর্শ বলে ঘোষণা করে গৌরব বোধ করেছেন, তখন প্রাজ্ঞ মধুসূদনের সিদ্ধান্ত কেউ স্মরণে রাখেন নি। এ দেশের জল-হাওয়ায় শেক্সপীয়রের জন্ম যে সম্ভব নয়, তাঁর কালে বাস করে মধুসূদন সেই সত্য ঠিকই বুঝেছিলেন। শিল্পী বিশেষত নাট্যকার অনেকটাই দেশ ও কালের সন্তান। সুতরাং তিনি স্বদেশ ও সমকালকে গণ্য করতে বাধ্য, মধুসূদনের মনের মধ্যে এই তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত স্থির বিশ্বাসরূপে বাস করেছিল। অতএব শেক্সপীয়রের নাটক বিচারের সূত্র উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ অনুচিত, একথা সহজে বলতে পেরেছিলেন তিনি। দেশ ও কাল তো শুধু নাট্যসৃষ্টিকে প্রভাবিত করে না, নাটক তথা সাহিত্য-সমালোচনার পদ্ধতিকেও তা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। সৃষ্টি এবং সমালোচনার ধারার পরিবর্তন স্থান-কাল-পরিবেশ-নিরপেক্ষ নয়, সুতরাং পাঠক বা সমালোচক সম্পর্কে মনোযোগী কোন স্রষ্টাই পারেন না দেশ-কালকে উপেক্ষা করতে। সতর্ক এব স্রষ্টার অন্তরে যে একজন প্রজ্ঞাবান বিচারক বাস করেন মধুসূদনের অন্তরস্থ সেই প্রাজ্ঞ বিচারক কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে জানালেন, 'It would shock the audience if I were to introduce a female (a virtuous one) discoursing with a man, unless that man be her husband, brother or father. This describes a circle round me, beyond the line of which I cannot stop' সমকালীন সমাজ-বিশ্বাসের গণ্ডিরেখা অতিক্রম করতে পারছেন না মধুসূদনের মত বিদ্রোহী, একটি বিস্ময়কর উক্তি। কিন্তু শিল্পী যত প্রচণ্ড বিপ্লবীই হোন না কেন, যখন তিনি সমকালীন রসিকের সমর্থন পিয়াসী তখন তাঁকে বলতেই হয়, "আমার পাঠকদের আমি বীররস আস্বাদনের ক্লেশ ভোগ করতে দেব না' অথবা, 'ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে অনুপযোগী হলেও সাধারণ পাঠকের কানকে প্রবঞ্চিত করার জন্যই অনিচ্ছাসত্ত্বেও অধিক 'অনুপ্রাস' ও 'যমক' ব্যবহার করেছি।" সত্যি

বলতে কি, এমন শিল্পী কি কেউ আছেন যিনি আগামী দিনের রসিকের প্রত্যাশায় বর্তমানকে উপেক্ষা করতে পারেন? যে দেশের পাঠক ব্ল্যাংক ভার্সে নিজেদের কান প্রস্তুত করতে পারেন নি, সেই দেশের পাঠকদের চিত্তুষ্টির জন্য ব্ল্যাংক ভার্সেও বাধ্য হয়ে অলংকারের অবাঞ্ছিত বাহুল্য যোজনা করতে হয় কবিকে, যেহেতু যশঃপ্রার্থী কবিমাত্রই কমবেশী সমকালের অনুমোদনকামী। মিল কবিতা পাঠে অভ্যস্ত 'ব্ল্যাংক ভার্স'-বিমুখ সমকালীনদের বিরুদ্ধে কবির প্রত্যয়পূর্ণ ঘোষণা: 'A true poet will always succeed best in Blank Verse as a bad one in Rhyme' অথবা, 'Blank verse and its melody and power astonish me'—যতই বলিষ্ঠ শোনাক না কেন, যে পাঠক বা শ্রোতাদের কাছে লেখক তাঁর কাব্য বা নাটক উপস্থিত করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রবীণেরা এমন কোন কিছুকে কবিতা বলতে অসম্মত যা সংস্কৃতের প্রতিধ্বনি নয় এবং নবীনেরা বাঙলা ভাষায় ততটা দক্ষতা অর্জন করেন নি যাতে তাঁরা যা পড়েন তা-ই বোঝেন। এঁদের উপেক্ষা করার কতটা ক্ষমতা রাখেন একজন কবি, তা অবশ্যই চিন্তার বিষয়। আসল 'প্রমিথিউস' যত বজ্রকণ্ঠই হোন না কেন, তিনি তো আসলে কালের জিউর হাতে বন্দী। তাই আগামী সত্যযুগের স্বপ্নেই তাকে বিভোর থাকতে হয় যে দিন 'Sub Blank Verse ho jaga'—সবই ব্ল্যাংক ভার্স হয়ে যাবে।

॥ পাঁচ ॥

কবি মধুসূদন যুগস্রষ্টা, নাট্যকার মধুসূদনও তাই। অমিত্রাক্ষর ছন্দের আদর্শ যদি সংস্কৃত কাব্য থেকে তিনি পেয়েও থাকেন, বাঙলা ভাষায় তার সার্থক ব্যবহার নিঃসন্দেহে অসাধ্য সাধন। কিন্তু মনে হয়, দূরূহতর শিল্প-সাধনায় তাঁর সিদ্ধিলাভ ঘটেছে নাটকের ক্ষেত্রে। শর্মিষ্ঠা-পদ্মাবতীতে পুরাণ কাহিনীর আধুনিক নাট্যসম্মত রূপদান, ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে 'কৃষ্ণকুমারী' রচনা অথবা 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'একেই কি বলে সভ্যতা?'-য় প্রাচীন ও আধুনিকদের ভণ্ডামিকে বিদ্রূপ বিচিত্রের এষণায় তৎপর স্রষ্টা-ব্যক্তিত্বের অসাধারণত্বের পরিচয়বাহী। 'কৃষ্ণকুমারী'র রচনাকাল থেকে চিঠিপত্রে নাট্যতত্ত্বের স্বরূপ-সচেতন মধুসূদন আত্মপ্রকাশ করলেন। 'কৃষ্ণকুমারী'র কাহিনী মধুসূদন সংগ্রহ করলেন ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে। কিন্তু ইতিহাসের কাহিনীর প্রতি লেখকের আনুগত্য ততটুকুই স্বীকার্য, যতটুকুতে নাট্যসম্ভাবনা বিকশিত হতে পারে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে শেক্সপীয়রও তাঁর বিখ্যাত ট্রাজেডিগুলির উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু তিনি নাটকের প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন কাহিনী ও পাত্র-পাত্রী। ইতিহাস ও কাব্যের পার্থক্য, অ্যারিস্টটল বলেছেন, শুধু প্রকাশকৌশলগত নয়; এই পার্থক্যের

মূলে সূত্র সত্যের উপস্থাপনার মধ্যে। ইতিহাসের সত্য, তাঁর মতে ব্যক্তিক, আর কাব্যের সত্য বৈশ্বিক। সুতরাং ইতিহাসের ঘটনা যথাসম্ভব অবিকৃত রেখে মানবজীবন-সত্যের সঙ্গে ইতিহাসের ঘটনাকে যুক্ত করে দেবেন লেখক, এটাই কাম্য। মধুসূদনও তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' তে যথাসম্ভব গ্রহণ-বর্জনের দ্বারা ইতিহাস-কাহিনী থেকে নাটকের 'প্লট' গড়ে নিয়েছেন। কিন্তু পাঠক বিশেষ কৌতূহল বোধ করেন নাট্যরচনা মুহূর্তে কতকগুলি বিষয়ে মধুসূদনের অন্তরস্থ সচেতন শিল্পবিচারকের সতর্কতা। তাঁর ঘোষণা ঃ [ক] কাব্যের অনুরোধে তিনি মাঝে মাঝে বাস্তবকে বিস্মৃত হয়েছেন, কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী'র ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে বিচলিত হতে দেবেন না; পাত্র পাত্রীর মুখ দিয়ে বাস্তবানুগ সংলাপই ব্যবহার করবেন, কবিতা নয়। [খ] নাটকে স্থানগত ও কালগত ঐক্য যথাসম্ভব বজায় রাখবেন। [গ] যেহেতু নাটকখানি ট্রাজেডি, অতএব কোন দৃশ্যকে তিনি পরিহাস-তরল করে তুলবেন না। তবে বৈচিত্র্যের জন্য কোন অনিবার্য কৌতুককর দৃশ্য যথোচিত ব্যবহার করবেন; শেক্সপীয়রও তাই করতেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলিই ট্রাজেডি ও কমেডি-র সমন্বয়। এই তিন সূত্রের প্রথম সূত্র একান্তই আত্মসমালোচনা। আপন স্বভাব সম্পর্কে কবি-নাট্যকারের স্বীকারোক্তি। নাটকে 'emotion'-এর চেয়ে action এর দাবি অগ্রগণ্য, এই সত্য জানতেন বলেই বাঙালীর জীবনে নাট্যসৃষ্টির সম্ভাবনা যথেষ্ট বিকাশ হয় নি, একথা যেমন বলেছেন, তেমনি কাব্যগুণান্বিত সংলাপ ব্যবহারের দ্বারা যে তিনি নিজে উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েন, এ বিষয়ে সচেতনতা প্রকাশ করে ঐতিহাসিক ট্রাজেডিতে মুখের কথাকেই নাটকে প্রাপ্য মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় সূত্রে স্থান ও কালগত যে ঐক্যের কথা বলা হয়েছে তার গুরুত্ব নিও-ক্লাসিক তাত্ত্বিক কস্তেলভেত্রোর-র কাল থেকে প্রতিষ্ঠিত। এ তত্ত্ব অ্যারিস্টটলীয় নয়, যদিও ত্রয়ী ঐক্যের তত্ত্ব তাঁর উপর আরোপিত হয়েছে দীর্ঘকাল থেকে। পাশ্চাত্য নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কে মধুসূদনের সচেতনতা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তৃতীয় সূত্রে ট্রাজেডি ও কমেডি-র মৌলিক পার্থক্য বিষয়ে মধুসূদনের তত্ত্বজ্ঞান শ্রদ্ধাকর্ষী। ভীতি ও করুণা উদ্রেককারী 'ট্রাজেডি' এবং হাস্যকর ঘটনার অনুকরণ 'কমেডি'র মিশ্রণ যে নাট্যরস সৃষ্টির পরিপন্থী তা শ্রেষ্ঠ নাট্যকারেরা জানতেন, তাত্ত্বিকেরা বলেছেন এবং এখানে মধুসূদনও বলছেন। কিন্তু মধুসূদন এই সত্য কদাপি বিস্মৃত হন নি যে, তা সত্ত্বেও শেক্সপীয়রের নাটকে Serious ঘটনার সঙ্গে কৌতুকের মাঝে মাঝেই মিশ্রণ ঘটেছে। শেক্সপীয়রের ট্রাজেডিতে দু'জাতের হাস্যকর চরিত্র আছে। এক ধরনের চরিত্রে ঘটেছে হালকা-মনের অবাধ প্রকাশ। যেমন রোমিও-জুলিয়েট নাটকের নার্স চরিত্রে। কিন্তু 'ম্যাকবেথ নাটকের' 'Porter' এবং 'হ্যামলেট' নাটকের 'Grave-diggers' বা অ্যান্টনি-ক্লিওপেট্রা' নাটকের 'clown' তাদের আপাত হাস্যকর ব্যবহারের অন্তরালে অশ্রুর লবণাম্বুরাশি গোপন করে রেখেছে; তাই হাসি সেখানে শ্লেষ-জড়িত এবং ট্রাজিক বেদনায় ভারাক্রান্ত। আসলে শেক্সপীয়র ট্রাজেডি রচনায় যত পরিণতি লাভ করেছেন ততই

তরল হাস্যরস প্রকাশে তাঁর অনিচ্ছা ফুটে উঠেছে। বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য মধুসূদনও 'কৃষ্ণকুমারী'তে ধনদাস ও মদনিকা এই দুটি কাল্পনিক চরিত্রে হাস্যরস ফুটিয়ে তুলেছেন, কিন্তু এই হাসি অশ্রুসিক্ত। 'কৃষ্ণকুমারী'র ট্রাজেডি-তে মদনিকার দায়িত্ব কম নয়, যদিও চরিত্রটির মাধ্যমে হাস্যরস ফুটিয়ে তোলাই ছিল নাট্যকারের প্রধান উদ্দেশ্য। ট্রাজেডি ও কমেডি-র মিশ্রণকালে মধুসূদনের শেক্সপীয়র-স্মরণ তাঁর সচেতন শিল্পীব্যক্তিত্বের মাত্রাবোধেরই পরিচয় দেয়। উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালী নাট্যরসিকদের কাছে তুলনামূলকভাবে গ্রীক নাটকের চেয়ে শেক্সপীয়রের নাটক অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। মধুসূদন কাব্যে 'three-fourths Greek'-ভাবনা সৃষ্টি করতে চাইলেও নাটকের ক্ষেত্রে একাধিকবার তিনি শেকসপীয়রকে স্মরণ করেছেন এবং তাঁর প্রভাব স্বীকার করেছেন। ভীম সিংহ চরিত্রে যদি রাজা লীয়র বা বলেন্দ্র সিংহের চরিত্রে 'King John' নাটকের 'Philips the bastard'-এর প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে বিস্ময়ের কিছু নেই, যেহেতু লেখক নিজেই সচেতন ভাবে এই প্রভাব গ্রহণ করেছেন।

॥ ছয় ॥

প্রতিকূল পরিবেশ, বিমুখ পাঠকদের যন্ত্রণাদায়ক উপস্থিতি মধুসূদনকে মাঝে মাঝে বিচলিত করলেও তাঁর শিল্প বিচারক-মন আত্মসমালোচনায় তৎপর রেখেছিল তাঁকে। শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে সমগ্র একটি প্রবন্ধ রচনা না করেও সৃষ্টি, স্রষ্টা ও কালের ভিতর সম্পর্ক-সূত্রান্বেষণে, সাহিত্যে বিজাতীয় প্রভাবের গুরুত্ব বিচার প্রসঙ্গে, ব্ল্যাংক ভার্স-এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা প্রকাশে, ঐতিহাসিক ট্রাজেডির সাফল্যসূত্র সন্ধানে মধুসূদনের তাত্ত্বিক স্বভাব যেভাবে ক্ষণমাত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তা কোন প্রতিষ্ঠিত তাত্ত্বিকের পক্ষে অশোভন হত না। নন্দনতত্ত্বের ঘূর্ণাবর্ত থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে চেয়েছেন অথবা বিশ্বনাথের নির্দেশ অস্বস্তিকর মনে হয়েছে তাঁর; কিন্তু তা সত্ত্বেও মধুসূদনের আবেগপ্রবণ কবিমনের সঙ্গে কঠোর নিস্পৃহ তত্ত্বজ্ঞানী বিচারকের অসাধারণ সমন্বয় উনিশ শতকের প্রাক-বঙ্কিম পর্বের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে আশ্চর্যজনক নয় কি!

অমিত্রাক্ষর ঃ মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে

নীলরতন সেন

একশো পঁচিশ বছর হয়ে গেল বাংলায় অমিত্রাক্ষর প্রবর্তিত হয়েছে। এ কথায় বোধ করি আজ আর কারও সংশয় নেই, মধুসূদন যে অমিত্রাক্ষর প্রবর্তনে প্রয়াসী হয়েছিলেন, সেটা একমাত্র তাঁর পক্ষেই রচনা করা সম্ভবপর হয়েছিল। পরবর্তী অনুকারীরা তা ঠিকমত আয়ত্তও করতে পারেন নি। বস্তুত সেই মানসিকতাও তাঁদের ছিল না। ফলে, অমিত্রাক্ষর রচনার ক্ষেত্রে তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারীর সন্ধান মেলে নি। তবে একথা স্বীকার্য, অমিত্রাক্ষরকে পরিবর্তিত রূপে বাংলায় যিনি প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। উনিশ ও বিশ শতকের প্রতিনিধিস্থানীয় এই দুই কবির হাতে অমিত্রাক্ষর কি রূপ লাভ করেছে তার কিছুটা তুলনাত্মক আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের অভীষ্ট।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র ৯৭ সংখ্যক 'মিত্রাক্ষর' সনেটটিতে মধুসূদন তৎকাল প্রচলিত মিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছিলেন,

> বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
> লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
> মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ি ! কত ব্যথা লাগে
> পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
> স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে !
> ছিল না কি ভাবধন, কহ, লো ললনে,
> মনের ভাণ্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে
> ভুলাতে তোমারে দিল এ কুচ্ছ ভূষণে ?
> ...   .
> প্রকৃত কবিতা-রূপী প্রকৃতির বলে,—
> চীন-নারী-সম পদ কেন লৌহ ফাঁসে ?

বাংলা কাব্যে দীর্ঘকাল প্রচলিত মিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে কবি তাঁর বিরূপ মনোভাব স্পষ্ট ও জোরালো ভাষায় এ কবিতায় প্রকাশ করেছেন। তিনি মিত্রাক্ষর পয়ারের পায়ের বেড়ি খুলে, অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট আট-ছয় মাত্রার ভাবযতি ও ছন্দযতির বন্ধন মুক্ত করে, কাব্যের ভাব-প্রবাহকে স্বচ্ছন্দ গতি দিতে চেয়েছেন। বাংলা কাব্যের এই নতুন ছন্দমুক্তি-প্রয়াসে তাঁর মুখ্য আদর্শ ছিলেন মিলটন। অমিত্রাক্ষর পয়ারে 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য লেখার পর, কি ভাবে এ-ছন্দ পড়তে হবে সেটা অনভ্যস্ত নবীন পাঠকদের বোঝাতে গিয়ে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন,

If your friends know English, let them read the 'Paradise Lost', and they will find how the verse, in which the Bengali poetaster writes, is constructed.

[মধুস্মৃতি, ২য় সং, পৃ ৬০১-০২]

দীর্ঘকালের মিত্রাক্ষর পয়ার পঠনে অভ্যস্ত শিক্ষিত বাঙালী পাঠক এই নবরীতির অমিত্রাক্ষর পয়ার পড়তে গিয়ে অবশ্যই অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। তাঁদের প্রতি কবির পরামর্শ ছিল,

Let your friends guide their voices by the pause (as in English Blank-Verse) and they will soon swear that this is the noblest measure in the language. My advice is, Read, Read, Read. Teach your ears the new tune and then you will find at what it is. [ঐ]

এ ছন্দের যতি সংস্থাপন সম্পর্কে, আরও স্পষ্ট করে আর একটি চিঠিতে রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন,

So many fellows have, of late, been at me to explain them the structure of the new verse that I have been obliged to think on the subject and the result is that I find that the যতি instead of being I confined to the 8th syllable, naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 10th and 12th. [ঐ, পৃ ৬১০-১১]

সিলেব্‌ল্‌ বলতে কবি অবশ্য অক্ষরবৃত্ত ছন্দরীতির মাত্রাকেই বুঝিয়েছেন। তিনি জোড়-বিজোড় নির্বিশেষে ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ১০ এবং ১২ মাত্রার যতি লক্ষ করেছেন। খুঁটিয়ে দেখলে, তাঁর হিসেবেই, ১১ মাত্রার পরও যতি দেখতে পেতেন।[১] আর কৃত্রিম লাইন ধরে না এগিয়ে, ভাবযতির বাক্‌পর্বিক হিসেবে দেখলে ৫, ৯ বা আরও বেশি সংখ্যক মাত্রাতেও যতি লক্ষ করতেন। মধুসূদন অক্ষরবৃত্ত পয়ারের কাঠামোতে অমিত্রাক্ষর লিখতে গিয়ে ভাবযতিকে ছন্দযতির বন্ধন থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। —সে জন্যেই জোড় বা বিজোড় যে কোন মাত্রাসংখ্যায় ভাবযতি দিতে দ্বিধা করেন নি। তবে সেই সঙ্গে তিনি অবশ্য পয়ারের ৮/৬ মাত্রার ছন্দযতির চালটাও পাশাপাশি রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। সে যুগের এক শ্রেণীর পাঠক ও সমালোচক অক্ষরবৃত্তে এই

১. যেমন, দেবীর কমল-পদ-পরিমল-আশে,
সুস্বনে। কুসুমরাশি শোভিছে চৌদিকে,
ধনদের হৈমাগারে রত্নরাজী যথা। [মেঘনাদবধ কাব্য, ১।৪৯৩-৯৫]

বিজোড় মাত্রায় ভাবযতির ব্যবহার পছন্দ করেন নি।[২] বোধ হয়, এই অপছন্দের পিছনে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের কবির সনাতন সংস্কার-বিরোধী ভাবধারা পরিবেশনাও পরোক্ষ ইন্ধন যুগিয়েছিল। রামগতি ন্যায়রত্ন বা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনার মধ্যে এই অপ্রসন্নতার সাক্ষ্য রয়েছে।

মধুসূদন উপলব্ধি করেছিলেন, বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের লঘু-গুরু উচ্চারণের ওঠানামা বা ইংরাজী accent-ধর্মী উচ্চারণের তরঙ্গভঙ্গ নেই। তবে জননী সংস্কৃতের যুক্তবর্ণবহুল শব্দভাণ্ডারের দ্বারস্থ হয়ে বাংলাকেও মহাকাব্য রচনার উপযোগী ওজঃধ্বনি-ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করে তোলা অসম্ভব নয়।

> The Bengali is born of the Sanskrit than which a more copious and elaborate language does not exist.
>
> [তি. স. কা. সা. প. সং. ভূমিকা]

মিল্টন যদি গ্রীক ও ল্যাটিনের কাছে হাত পাততে পারেন, তিনিই বা কেন সংস্কৃতের দ্বারস্থ হতে পারবেন না? তাই কিছুটা দুঃসাহসিকতার সঙ্গেই লিখলেন,

> হেরিলা সভয়ে বলী সর্বভুক্‌রূপী
> বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ প্রক্ষেড়নধারী
> সুবর্ণ স্যন্দনারূঢ় ; তালবৃক্ষাকৃতি
> দীর্ঘ তালজঙ্ঘাশূর-গদাধর যথা
> মুর-অরি ; গজপৃষ্ঠে কালনেমি, বলে
> রিপুকুলকাল বলী ; বিশারদ রণে,
> রণপ্রিয়, বীরমদে প্রমত্ত সতত
> প্রমত্ত ; চিক্ষুর-রক্ষঃ যক্ষপতিসম ;— [মে. কা. ৬।৩২২-২৯]

যুক্তবর্ণবহুল, অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দগুলি নিস্তরঙ্গ বাংলা ভাষাকে কিছুটা ঊর্মি-বিক্ষুব্ধ অবশ্যই করে তুলেছে। তবে এত বেশি অচলিত তৎসম শব্দ যে বাংলা ভাষার পক্ষে বেমানান সেটা তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন। তাই সমগ্র 'মেঘনাদবধ কাব্যে' এমন দুরূহ শব্দ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত বেশি মিলবে না। লক্ষণীয়, কবি এখানে শুধু যুক্তবর্ণের তরঙ্গভঙ্গ নয়, শ্রবণ সুখকর শব্দানুপ্রাসের দিকেও সচেতন দৃষ্টি রেখেছেন। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে এক পত্রে এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> I have used more অনুপ্রাস and যমক than I like, but I have done so to deceive the ear, as yet unfamiliar with the Blank verse. [ঐ, পৃ ৬২৫]

---

২. প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, অক্ষরবৃত্তে জোড়মাত্রার (৮, ৬, ১০) পদ গঠন স্বাভাবিক রীতি। মধ্যযুগের কবিরা অবশ্য মাঝেমধ্যে বৈচিত্র্যের নিদর্শন হিসেবে ৭।৭।৯-মাত্রার ত্রিপদী বা ৭।৭-মাত্রার দ্বিপদী ব্যবহার করতেন।

ভারতচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা মিত্রাক্ষর পয়ারে যে 'jingling monotony'-র আফিঙ্ফেন-নেশা জমে উঠেছিল বাঙালী পাঠককে সেই মৌতাত থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে মধুসূদন একদিকে যেমন পয়ারের প্রচলিত ছন্দযতি ও ভাবযতির গাটছড়া খুলে দিলেন, তেমনি দ্বিপঙ্‌ক্তিক মিলও তুলে দিলেন। প্রত্যাশিত মিলের নেশা থেকে বাঙালী পাঠককে উদ্ধার করতে গিয়ে তাদের বিদ্রোহী শ্রবণযুগলকে কিঞ্চিৎ পরোক্ষ ঘুষ দিতে হল। শব্দের মাঝে মাঝে অনুপ্রাস-যমকের বাহুল্য তারই সাক্ষ্য বহন করছে। মধুসূদন যদি আর কিছুকাল অমিত্রাক্ষর চর্চার সুযোগ পেতেন, বোধহয়, এই বাহুল্যের কৃত্রিমতা কাটিয়ে উঠতেন। তার সাক্ষ্য 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে এবং 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে পাওয়া যায়।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর বাক্‌রীতির অপর কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল ঃ

(১) ইংরেজি বাক্যগঠনভঙ্গির আদর্শে কবি অনেক সময় Parenthesis-এর ব্যবহার করেছেন। মূল বাক্যের মাঝে, কখনো হাইফেন, কখনো কমাচিহ্ন, কখনো বা বন্ধনীর সাহায্যে নতুন বাক্যাংশ সংযোজন করেছেন। যেমন,

(ক) সম্মুখ-সমরে পড়ি বীর-চূড়ামণি,
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি, অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ? কি কৌশলে, রাক্ষস-ভরসা
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
ঊর্মিলা-বিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা ?

[মে. কা ১।১-৮]

(খ) প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) "ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখী-কুল। [মে. কা. ৫।৩৭৩-৭৯]

লক্ষ্য করলে এমন বিজাতীয় বাক্‌রীতির বহু দৃষ্টান্ত তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলিতে পাওয়া যাবে। এটা তিনি নিস্তরঙ্গ বাংলা বাক্‌রীতিতে কিছুটা তরঙ্গভঙ্গ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই করেছিলেন, অনুমিত হয়।

(২) অপ্রচলিত ধ্বনিগম্ভীর যুক্তবর্ণবহুল তৎসম শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করেছি। পাশাপাশি আটপৌরে গ্রাম্য শব্দের ব্যবহারেও তিনি নিঃশঙ্ক

ছিলেন। ধ্বন্যাত্মক মড়মড়ে, ঝন্‌ঝনি, ঝক্‌ঝক্‌ ঝকি, চোক্‌ চোক্‌, কড়মড়ি, ঘনঘন, হড়-হড়-হড়ে ইত্যাদি শব্দাবলী বা খেদাইছে, ভাঁড়াইল জাতীয় ক্রিয়াপদ, অথবা হ্যাদে, লো জাতীয় মেয়েলি সম্বোধনপদ কিছুটা গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট এবং মহাকাব্যের ভাষার পক্ষে অনুপযোগী বলে সমালোচকগণ মনে করেছেন। কবি সম্ভবত পাঠকের ভাষা বিষয়ক পূর্বসংস্কার ভাঙবার উদ্দেশ্যেই প্রথম দিকে কিছুটা বেশি পরিমাণেই এ-ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। পরে স্বাভাবিকভাবেই সেটা কমে এসেছিল।

(৩) ভাষাকে সংহত করবার উদ্দেশ্যেই নামধাতুর বা সংক্ষেপিত বিশেষণপদের ব্যবহার মধ্যযুগের কবিরাও কিছু কিছু না করেছেন এমন নয়। তবে মধুসূদনের হাতে এ ধরনের শব্দাবলীর বহুল ব্যবহার সেকালের এক শ্রেণীর রক্ষণশীল পাঠক এবং সমালোচক পছন্দ করতে পারেন নি। আবার মধুভক্ত সমালোচকগণ ভাষা-সংহতির বিচারে এগুলির উপযোগিতা স্বীকার করেছেন। আক্ষেপিছে, আদেশ (আদেশ কর), নির্বীরিবে (বীরশূন্য করবে), নাদিলা, ছট্‌ফটি, নীরবিলা, ভুষেণ (ভূষিত করেন), সাঙ্গিল (সাঙ্গ করল) ইত্যাদি ক্রিয়াপদ বা তেঁই, শোকী (শোকগ্রস্তা), দণ্ডী, সমলা ইত্যাদি সর্বনাম ও বিশেষণপদ তাঁর কাব্যে কিছুটা বেশি পরিমাণেই ব্যবহৃত হয়েছে।

(৪) বর্ণনাকে অলংকৃত করতে দীর্ঘ সমাসবহুল, ধ্বনি-অনুপ্রাস-সমৃদ্ধ বিশেষণের ব্যবহারেও তাঁর কিছুটা মাত্রাতিরিক্ত ঝোঁক লক্ষ করা যায়। যেমন,—

(i) দেবকুল-লোচন-আনন্দময়ী দেবী। [তি. কা. ১]
(ii) সুবর্ণ-কুসুম-লতা-মণ্ডিত মুকুট ; [„]
(iii) মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি ; [মে. কা. ৪/১১]
(iv) দ্বিরদ-রদ-নির্মিত দুয়ারে দুয়ারে দ্বিরদ ; [বী.কা. দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা]
(v) দেব-দৈত্য-নরাতঙ্ক-রক্ষেন্দ্র-নন্দনে ; [চ. ক. উপক্রম]
(vi) কবিতা-পংকজ-রবি, শ্রীকবিকংকণ [চ. ক. কমলে কামিনী]

(৫) মধুসূদনের কবি-ভাষার আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, সংলাপ বা dialogue-এর বহুল ব্যবহার। পাত্র-পাত্রীকে দিয়েই আখ্যায়িকার অধিকাংশ কথা বলিয়ে নিয়েছেন। তার ফলে, একদিকে যেমন চরিত্রগুলির মনোভঙ্গি চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে ভাষা ও ছন্দ নিস্তরঙ্গতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। দুটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি।—

(ক) অশোকবনে বন্দিনী সীতা সরমাকে বলছেন,

কতক্ষণ এ দশায় ছিনু যে, স্বজনি,
নাহি জানি ; জাগাইলা পরশি দাসীরে
রঘুশ্রেষ্ঠ। মৃদু স্বরে, (হায় লো, যেমতি

স্বনে মন্দ সমীরণ কুসুম-কাননে
বসন্তে !) কহিল কান্ত ; 'উঠ, প্রাণেশ্বরি,
রঘুনন্দনের ধন ! রঘু-রাজগৃহ-
আনন্দ ! এই কি শয্যা সাজে হে, তোমার
হেমাঙ্গি ।' [মে. কা. ৪/২৫১-৫৮]

(খ) মেঘনাদবধ কাব্যে সখী বাসন্তীর সঙ্গে প্রমীলার সংলাপ,—

কহিলা বাসন্তী সখী ; "কেমনে পশিবে
লংকাপুরে আজি তুমি ? অলংঘ্য সাগর-
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে !
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ-অরি ফিরিছে চৌদিকে
অস্ত্রপাণি, দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা ।"
রুষিলা দানব-বালা প্রমীলা রূপসী !
"কি কহিলি, বাসন্তি ? পর্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?
দানবনন্দিনী আমি ; রক্ষঃ-কুল-বধূ ;
রাবণ শ্বশুর মম ; মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ?
পশিব লংকায় আজ নিজ ভুজ-বলে ;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি ?" [মে. কা. ৩/৬৯-৮২]

এর পাশাপাশি মেঘনাদবধ কাব্যের প্রমীলার চিতারোহণ দৃশ্যের (৯ম সর্গ) সংলাপ-অংশটুকুও তুলনীয়।[৩] অমিত্রাক্ষরে গদ্য ভাষার আমেজ সৃষ্টিতে এমন বাক্‌পর্বিক সংলাপ ব্যবহারের উপযোগিতা পাঠক অবশ্যই উপলব্ধি করবেন।

(৬) মধুসূদন অক্ষরবৃত্ত পয়ার-কাঠামোর মধ্যে অমিত্রাক্ষরের বাক্‌পর্ব ব্যবহার করতে গিয়ে প্রথম দিকে শব্দ-গ্রন্থনায় কিছু দুর্বলতা দেখিয়েছেন। অক্ষরবৃত্তের আট/দশ মাত্রার পদ গঠনে বিজোড় মাত্রক শব্দের পর বিজোড় মাত্রক শব্দ এবং জোড় মাত্রক শব্দের পর জোড় মাত্রক শব্দ গ্রন্থনার প্রত্যাশিত রীতি মাঝে মাঝে লঙ্ঘন করেছেন। 'যেমন,

পাবক-শিখা-রূপিণী	(মে. কা. ১/১০৩)
অদূরে ঘোর তিমির	(তি. কা. ১/২০)
দ্বিরদ-রদ-নির্মিত	(বী. কা. দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা)

ইত্যাদি।

---

৩. লক্ষ করবার বিষয়, বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রকাশিত এগারোটি কাহিনীর সবগুলিই সংলাপী পত্রাকারে কবি রচনা করেছেন। পরিকল্পিত বাকি দশটি কাহিনীও একই অমিত্রাক্ষর রচনাঙ্গিকে তাঁর লেখার ইচ্ছা ছিল।

গদ্য ভাষায় এমন শব্দ বিন্যাস-ক্রম চলতে পারে, কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দবন্ধের চলনে এটা শ্রুতিকটু লাগে। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরে ক্রমান্বয়ে এ-ধরনের শব্দবিন্যাস-গত দুর্বলতা কমে এসেছে। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের সঙ্গে মেঘনাদবধ কাব্য, এবং বীরাঙ্গনা কাব্য বা চতুর্দশপদী কবিতাবলীর তুলনা করলেই সেটা ধরা পড়ে। লক্ষ করবার বিষয়, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের গঠনগত এই প্রাথমিক দুর্বলতার দিকটি বিরূপ সমালোচকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও স্বয়ং কবি কিন্তু সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের যে অংশটুকু পুনর্লিখনের সুযোগ পেয়েছিলেন সেখানে এই ধরনের ত্রুটি পুরোপুরি সংশোধন করেছিলেন দেখা যায়।

(৭) অক্ষরবৃত্তের পয়ার-কাঠামোকে অক্ষুণ্ন রেখেই যে মধুসূদন তার মধ্যে অমিত্রাক্ষরের ভাবমুক্তি আনতে চেয়েছিলেন তার স্বপক্ষে দুটি পরোক্ষ প্রমাণ তাঁর রচনায় মেলে। তিনি অনেক সময়েই লাইন ডিঙিয়ে পরের লাইনে বিজোড় মাত্রায় বাক্‌পর্ব টেনে এনে ভাবযতি দিয়েছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ছন্দযতির কথা মনে রেখে, এই বাক্‌পর্বের পর ৩+২ বা ৩+৪ মাত্রার শব্দগ্রন্থি এনে পয়ারের আট বা দশমাত্রার পদযতি রক্ষা করেছেন। যেমন,—

(i) বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি, কহিলা সুরথী
লঙ্কেশ ; বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে ?

[মে. কা. ৯/২৮-২৯]

(ii) গুরুপত্নী আমি
তোমার, পুরুষরত্ন ; কিন্তু ভাগ্যদোষে,
ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সেবি পা দুখানি !

[বী. কা. সোমের প্রতি তারা]

এমন অনেক দৃষ্টান্তই পাঠক মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর থেকে খুঁজে বার করতে পারবেন।

দ্বিতীয় পরোক্ষ প্রমাণ হল, অমিত্রাক্ষর পয়ারে ১৪ মাত্রার লাইনের শেষে সর্বত্রই কবি স্বরান্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন। স্বরান্ত শব্দ পাঠ করতে গেলে, যত হ্রস্বই হোক, একটি যতি সেখানে আসবেই ;—এই যতি পয়ারের ছন্দযতি। কবি তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে চেয়েছেন বলেই হলন্ত শব্দে লাইন শেষ করেন নি।

অমিত্রাক্ষর স্রষ্টা মধুসূদনের এই রচনাবৈশিষ্ট্যগুলি মনে রেখে এবারে রবীন্দ্রনাথের হাতে সে ছন্দ কেমন রূপান্তর লাভ করেছে সংক্ষেপে তার পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। লক্ষ করবার বিষয়, বঙ্গাব্দ ১২৮৪ এবং ১২৮৯-তে, মাত্র ১৭ এবং ২২ বছর বয়সে 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথ 'মেঘনাদবধ-কাব্য' সম্পর্কে যে বিশদ সমালোচনা করেছিলেন, সেখানে এ কাব্যের বহুবিধ ত্রুটির উল্লেখ করলেও, নব-নির্মিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে, পক্ষে বা বিপক্ষে কোন মন্তব্য করেন নি। ভাষা

সম্পর্কে প্রশংসাসূচক এবং অপ্রশংসাসূচক দুটি মন্তব্য রয়েছে। প্রশংসাসূচক মন্তব্যে লিখেছেন,

মুরলা আসিয়া লক্ষ্মীকে যুদ্ধের বার্তা জিজ্ঞাসা করিলে লক্ষ্মী কহিলেন,

হায় লো স্বজনি !
দিন দিন হীনবীর্য রাবণ দুর্মতি,
যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে।

শেষ ছত্রটিতে ভাবের অনুযায়ী কথা বসিয়াছে, ঠিক বোধ হইতেছে যেন তরঙ্গ বারবার আসিয়া তটভাগে আঘাত করিতেছে। [মেঘনাদবধ কাব্য (১)][৪]

প্রাসঙ্গিক কাব্যাংশটি সম্পর্কে অনুরূপ প্রশংসাসূচক অভিমত পরেও একাধিক বার প্রকাশ করেছেন।

বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে লিখেছিলেন,

> ভাষাকে কৃত্রিম ও দুরূহ করিবার জন্য যত প্রকার পরিশ্রম করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত তাহা তিনি করিয়াছেন। একবার বাল্মীকির ভাষা পড়িয়া দেখ দেখি, বুঝিতে পারিবে মহাকবির ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, হৃদয়ের সহজ ভাষা কাহাকে বলে? যিনি পাঁচ জায়গা হইতে সংগ্রহ করিয়া, অভিধান খুলিয়া, মহাকাব্যের কাঠাম প্রস্তুত করিয়া, মহাকাব্য লিখিতে বসেন, যিনি সহজভাবে উদ্দীপ্ত না হইয়া সহজ ভাষায় ভাব প্রকাশ না করিয়া, পরের পদচিহ্ন ধরিয়া কাব্য রচনায় অগ্রসর হন—তাঁহার রচিত কাব্য লোকে কৌতূহলবশতঃ পড়িতে পারে, বাঙ্গালা ভাষায় অনন্যপূর্ব বলিয়া পড়িতে পারে, বিদেশী ভাবের প্রথম আমদানি বলিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু মহাকাব্য ভ্রমে পড়িবে কয়দিন? [মেঘনাদবধ কাব্য (২)]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৩১৮-বঙ্গাব্দে 'জীবনস্মৃতি' লিখতে গিয়ে সেখানে তিনি এই দুটি রচনার মধ্যে 'উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতা'র জন্য দুঃখ ও লজ্জা প্রকাশ করেছেন।

বারো বছর বাদে (আষাঢ়, ১৩০১) মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর সম্পর্কে তাঁর বিরূপতা অনেকাংশেই কেটে গেছে দেখতে পাই। তখন একটি প্রবন্ধে লিখেছেন,—

> বাংলা যে-ছন্দে যুক্ত অক্ষরের স্থান হয় না সে ছন্দ আদরণীয় নহে। কারণ, ছন্দের ঝংকার এবং ধ্বনিবৈচিত্র্য যুক্ত অক্ষরের উপরেই অধিক নির্ভর করে। একে বাংলা ছন্দে স্বরের দীর্ঘ-হ্রস্বতা নাই, তার উপর যদি যুক্ত অক্ষর বাদ

৪. 'মেঘনাদবধ কাব্য' নামে প্রথম প্রবন্ধটি 'ভারতী' পত্রে ১২৮৪ শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ এবং ফাল্গুন—এই ছয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'মেঘনাদবধ কাব্য' নামে স্বল্পায়তন দ্বিতীয় প্রবন্ধটি 'ভারতী'তে ১২৮৯, ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৩৪৮ অগ্রহায়ণে প্রকাশিত 'রবীন্দ্র রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ'; দ্বিতীয় খণ্ডে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছে। বোধ হয়, কবির অনুমোদন না থাকায় প্রথম প্রবন্ধটি সেখানে ছাপা হয় নি। কৌতূহলী পাঠক সে প্রবন্ধটি বর্তমান লেখক-সম্পাদিত 'রবীন্দ্র বীক্ষা' গ্রন্থে (১৯৬১) দেখতে পারেন।

পড়ে তবে ছন্দ নিতান্তই অস্থিবিহীন সুললিত শব্দপিণ্ড হইয়া পড়ে। তাহা শীঘ্রই শ্রান্তিজনক, তন্দ্রাকর্ষক হইয়া উঠে এবং হৃদয়কে আঘাত পূর্বক ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। সংস্কৃত ছন্দে যে বিচিত্র সংগীত তরঙ্গিত হইতে থাকে তাহার প্রধান কারণ স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা এবং যুক্ত অক্ষরের বাহুল্য। মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অবগত ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি এবং তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।

[আধুনিক সাহিত্য, বিহারীলাল]

বাইশ বছর বয়সে লিখিত প্রবন্ধে মেঘনাদবধ কাব্যে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। তেত্রিশ বছর বয়সে এবারে দেখা গেল, বাংলা উচ্চারণে যে যুক্তবর্ণের ধ্বনি-ঐশ্বর্যের অভাব রয়েছে, এবং তার ফলে কাব্যছন্দ যে অনেকাংশে মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়ে সে বিষয়ে তিনি সচেতন হয়েছেন। এই পরিণত নব দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরে রচিত কবিতার যুক্তবর্ণ-সমৃদ্ধিকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করেছেন।

আরও চব্বিশ বছর বাদে, ১৩২৪-এ মধুসূদনের লাইন-ডিঙানো অমিত্রাক্ষরের ভাবমুক্তি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখলেন,

> পয়ার আট পায়ে চলে বলে তাকে যে কত রকমে চালানো যায় মেঘনাদবধ কাব্যে তার প্রমাণ আছে। তার অবতারণাটি পরখ করে দেখা যাক। এর প্রত্যেক ভাগে কবি ইচ্ছামতো ছোটো বড়ো নানা ওজনের নানা সুর বাজিয়েছেন ; কোন জায়গাতেই পয়ারকে তার প্রচলিত আড্ডায় থামতে দেন নি। প্রথম আরম্ভেই বীরবাহুর বীর মর্যাদা সুগম্ভীর হয়ে বাজল—'সম্মুখসমরে পড়ি বীরচূড়ামণি বীরবাহু', তারপরে অকালমৃত্যুর সংবাদটি যেন ভাঙা রণপতাকার মতো ভাঙা ছন্দে ভেঙে পড়ল—'চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে' ; তার পরে ছন্দ নত হয়ে নমস্কার করলে—'কহ, হে দেবি, অমৃতভাষিণি' ; তার পরে আসল কথাটা, যেটা সবচেয়ে বড়ো কথা, সমস্ত কাব্যের ঘোর পরিণামের যেটা সূচনা, সেটা যেন আসন্ন ঝটিকার সুদীর্ঘ মেঘগর্জনের মতো এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে উদ্‌ঘোষিত হল—'কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে / পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি।'
>
> [ছন্দ, দ্বিতীয় সং, ১৩৬২, ছন্দের অর্থ]

এখানে রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদনের ভাষা-ছন্দ যে তাঁর বক্তব্যের যথার্থ অনুগামী হয়েছে, সপ্রশংসভাবে তা উল্লেখ করেছেন। অথচ ১৩৩৯, জ্যৈষ্ঠে, ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে কিছুটা ভিন্ন সুরেই মন্তব্য করেছিলেন,

> সমমাত্রার ছন্দের অর্থাৎ পয়ারজাতীয় ছন্দের বিশেষত্বই হচ্ছে এই যে, এ ছন্দে দুই চার ছয় আটদশ প্রভৃতি দুয়ের multiple-এর পর ইচ্ছামতো যতি স্থাপন করা যায়। এখানেই এ ছন্দের শক্তি। আর এ জন্যেই এ জাতীয় ছন্দে

আজারিয়া ([illegible]) [illegible] ...যেখানেই দুয়ের multiple পাওয়া যায় সেখানেই থামতে পারা যায় বলেই প্রবহমাণ পয়ার রচনা করা সম্ভব হয়েছে। এ ছন্দে অযুগ্ম সংখ্যার পর যতি দেওয়া চলে না। মধুসূদন অবশ্য 'অকালে'র পর যতি দিয়েছেন। এটাকে অবশ্য একরকম করে সমর্থনও করা যায়। কিন্তু তথাপি বলতে হয় যে, এ ছন্দে অযুগ্ম unit-এর পর যতি না দেওয়াই রীতি।' [ঐ, ছন্দবিচার]

বস্তুত এই মনোভাবই রবীন্দ্রনাথের ১৭ থেকে ২০ বছরের মধ্যে রচিত কাব্য-কাহিনীধর্মী রচনাগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে সমিল বা মিলহীন অমিত্র পয়ারের যে পরীক্ষা করেছেন, তাতে বিজোড় মাত্রায় ভাবযতি কদাচিত ব্যবহার করেছেন। এমন কি, লাইন ডিঙানো ভাবের প্রবহমানতাও তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। যেমন,—

'কবি-কাহিনী'তে (১৮৭৭) যেন কিছু দ্বিধান্বিত ভাবেই প্রথম যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখতে শুরু করলেন,

শুন কলপনা বালা, ছিল কোন কবি
বিজন কুটির-তলে। ছেলেবেলা হোতে
তোমার অমৃত-পানে আছিল মজিয়া।
তোমার বীণার ধ্বনি ঘুমায়ে ঘুমায়ে
শুনিত, দেখিত কত সুখের স্বপন। [কবি-কাহিনী, ১ সর্গ]

পরে অবশ্য যুক্তবর্ণের ধ্বনি ঐশ্বর্য উপলব্ধি করে নির্দ্বিধায় লিখলেন,—

কত দেশ দেশান্তরে ভ্রমিল সে কবি!
তুষারস্তম্ভিত গিরি করিল লঙ্ঘন,
সুতীক্ষ্ন কণ্টকময় অরণ্যের বুক
মাড়াইয়া গেল চলি রক্তময় পদে। [ঐ, ৩ সর্গ]

এ-যুগের নাট্য-সংলাপে ব্যবহৃত মিলহীন অমিত্রাক্ষরের ক্ষেত্রেও দেখা গেল, কবি বিজোড় মাত্রায় ভাবযতি যথাসম্ভব এড়িয়ে গেছেন। লাইনগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অমিল মিত্রাক্ষর পয়ারে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন 'রুদ্রচণ্ডে' (১৮৮১) লিখলেন,

রুদ্র। কি বলিলি দূত! তোর মহম্মদ ঘোরী
পৃথ্বীরাজে আক্রমিতে আসিতেছে হেথা!
দূত। এ বনে ত লোক নাই? ধীরে কথা কও।
রুদ্র। ধীরে ক'ব! যাব আমি নগরে নগরে
ঊর্ধ্ব কণ্ঠে কব আমি রাজপথে গিয়া,
ম্লেচ্ছ সেনাপতি এক মহম্মদ ঘোরী
তস্করের মত আসে আক্রমিতে দেশ। [রুদ্রচণ্ড, ৭ দৃশ্য]

অপেক্ষাকৃত পরিণত রচনায়, কাব্যে ও নাটকে, লাইন ডিঙানো প্রবহমাণতা বেশ

স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গেই রক্ষা করেছেন ; তবে কোথাও মধুসূদনের মত বিজোড়মাত্রার অনুমতি দেন নি। যুক্তবর্ণ-সমন্বিত শব্দের ব্যবহারে তিনি বরাবরই বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু অচলিত সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগে কখনো মাত্রাতিরিক্ত আতিশয্য দেখান নি। এবারে কবির আরও পরিণত বয়সের রচনা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলছি।—

১৮৮৯-তে প্রকাশিত 'রাজা ও রানী' নাটকের মিলহীন পয়ার সংলাপ—

সুমিত্রা। নিতান্ত তোমারি আমি
সদা মনে রেখো এ বিশ্বাস। থাকি যবে
গৃহকাজে, জেনো নাথ, তোমারি সে গৃহ,
তোমারি সে কাজ।

বিক্রমদেব। থাক্ গৃহ, গৃহকাজ।
সংসারের কেহ নহ' অন্তরের তুমি।
অন্তরে তোমার গৃহ। আর গৃহ নাই—
বাহিরে কাঁদুক পড়ে, বাহিরের কাজ। [রাজা ও রানী, ১৩]

১৮৯৪-তে প্রকাশিত কবিতায়, সমিল প্রবহমাণ পয়ার ছন্দে লিখলেন,—

দুই পক্ষে মিলে একেবারে আত্মহারা
অবোধ অজ্ঞান। সৌন্দর্যের দস্যু তারা
লুটে পুটে নিতে চায় সব। এত গীতি,
এত ছন্দ, এত ভাবে উচ্ছ্বসিত প্রীতি,
এত মধুরতা দ্বারের সম্মুখ দিয়া
বহে যায়—তাই তারা পড়েছে আসিয়া
সবে মিলি কলরবে সেই সুধাস্রোতে।

[সোনার তরী, বৈষ্ণব কবিতা]

১৯৩৭-এ প্রকাশিত মিলহীন মহাপয়ারে প্রবহমাণতা এনে লিখলেন,

একদা পরমমূল্য জন্মক্ষণ দিয়েছে তোমায়
আগন্তুক। রূপের দুর্লভ সত্তা লভিয়া বসেছ
সূর্যনক্ষত্রের সাথে। দূর আকাশের ছায়াপথে
যে আলোক আসে নামি ধরণীর শ্যামল ললাটে
সে তোমার চক্ষু চুম্বি তোমারে বেঁধেছে অনুক্ষণ
সখ্যডোরে দ্যুলোকের সাথে, দূর যুগান্তর হতে
মহাকালযাত্রী মহাবাণী পুণ্য মুহূর্তেরে তব
শুভক্ষণে দিয়েছে সম্মান ; তোমার সম্মুখ দিকে
আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে,
সেথা তুমি একা যাত্রী অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়।

[প্রান্তিক, ১৩নং কবিতা]

একথা স্বীকার্য, অমিত্রাক্ষরের পয়ার বা মহাপয়ার কাঠামো ভেঙে কবি ও নাট্যকারেরা যখন মুক্তকের ব্যবহার সুরু করলেন, সেখানে অক্ষরবৃত্তের চলন ফোটাতে গিয়ে জোড়মাত্রায় ভাবযতি ও ছন্দযতির গাঁটছড়া বাঁধাটাই সহজ হল। ভাব অনুসারে মুক্তকের লাইনগুলি ছোট-বড়ো মাপে সাজানো সুরু হলে দেখা গেল, অক্ষরবৃত্তের জোড়মাত্রক পদযতিই কবিরা মেনে চলেছেন। কারণ, বিজোড়মাত্রায় যতি দিয়ে অক্ষরবৃত্তের চলন কানে বেসুরো লাগে। সম্ভবত সে কারণেই মধুসূদন ভাবযতি বিজোড়মাত্রায় দিলেও, পাশাপাশি জোড়মাত্রায় ছন্দযতির চাল ফিরিয়ে এনে ছন্দসমতা রক্ষা করতেন। এবারে যখন কবিরা (এবং নাট্যকারেরা) অমিত্রাক্ষরে ১৪ বা ১৮ মাত্রার লাইনগত সমতা রক্ষাটা কৃত্রিম প্রয়াস বলে গণ্য করলেন, ভাব অনুসারে লাইনগুলি ছোট-বড়ো মাপে বিন্যাস করতে গিয়ে বাক্‌পর্বগুলি জোড়মাত্রায় সাজানোটাই স্বাভাবিক মনে হল। সেদিক থেকে বিচারে, রবীন্দ্র অমিত্রাক্ষর ভেঙে মুক্তক রচনাই সহজতর হল। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ভেঙে মুক্তক রচনা এতটা স্বাভাবিক হত না। তবে একথাও ঠিক, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরে যতটা ছন্দমুক্তি ঘটেছিল রবীন্দ্র অমিত্রাক্ষরে সেটা অংশত খর্ব হয়ে গেল। বোধ হয়, দীর্ঘ পাঁচশত বছর ধরে 'মিত্রাক্ষর' পঠনে অভ্যস্ত বাঙালী পাঠক মধুসূদনের ভাব-ভাষা-ছন্দের দিক থেকে আমূল পরিবর্তিত, বিপ্লবী ঢঙের অমিত্রাক্ষর পড়তে যে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলেন তারই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই পরিবর্তন প্রত্যাশিত ছিল। প্রচলিত ছন্দবন্ধন থেকে মধুসূদনের এতটা বিদ্রোহাত্মক ভাবমুক্তির প্রয়াসকে সে যুগের পাঠক প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে না পারার জন্যেই মিত্রাক্ষর অক্ষরবৃত্তের সঙ্গে কিঞ্চিৎ আপোষরফা করে অপেক্ষাকৃত নমনীয় ভঙ্গির অমিত্রাক্ষর ও মুক্তক রচনায় কবি ও নাট্যকারেরা প্রয়াসী হলেন। এ কাজ হেমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র,[৫] নবীনচন্দ্র ও রাজকৃষ্ণ ইতিপূর্বেই সুরু করেছিলেন. রবীন্দ্রনাথ এসে তাকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দিলেন।

অমিত্রাক্ষরের গঠনরীতির ক্ষেত্রে উভয় কবির মিল ও অমিল বিচারে দেখা যায়, (১) মধুসূদনের আদর্শে অক্ষরবৃত্ত পয়ার রীতিতে রচিত অমিত্রাক্ষরের লাইন-ডিঙানো প্রবহমাণতা রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করেছেন; তবে মধুসূদন ভাবযতির ক্ষেত্রে যতটা স্বাধীনতা নিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ অক্ষরবৃত্তের চলনের খাতিরে ততটা মুক্তি, অর্থাৎ বিজোড় মাত্রাতে ভাবযতি পছন্দ করেন নি। (২) উভয় কবিই বাংলা ভাষায় সংস্কৃত বা ইংরেজি ভাষার তুলনায় ধ্বনি তরঙ্গের অভাব উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই নিস্তরঙ্গতা কাটিয়ে উঠবার জন্যে যুক্তবর্ণবহুল শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তবে, মধুসূদন যুক্তবর্ণসমৃদ্ধ অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ যত বেশি ব্যবহার করেছেন, রবীন্দ্রনাথের কাছে সেটা কৃত্রিম এবং কাব্যের রসগ্রহণের পক্ষে

৫. মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যকে গিরিশচন্দ্র যখন নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করেছিলেন (১৮৭৭) সেখানে তিনি কবির মহাকাব্যের ভাষা ও ছন্দ যথাসম্ভব রক্ষা করেছিলেন। সুতরাং বাক্‌পর্বের বিজোড়মাত্রক ভাবযতি সেখানে রক্ষিত হয়েছিল। তবে স্বাধীনভাবে লেখা নাটকগুলিতে অমিত্রাক্ষর বা মুক্তক সংলাপে তিনি বিজোড়মাত্রক বাক্‌পর্ব পুরোপুরিই পরিহার করেছেন।

প্রতিবন্ধকস্বরূপ মনে হয়েছে। (৩) মধুসূদন কবি ভাষার শব্দ-গ্রন্থনায়, বাক্য নির্মাণে যতটা ইংরেজি ভাষাভঙ্গির, parenthesis ব্যবহারের পরীক্ষা করেছেন, রবীন্দ্রনাথের কাছে সেটা বাংলা বাক্‌রীতির পক্ষে কৃত্রিম ও দুরান্বিত বলে মনে হয়েছে। (৪) মধুসূদন পাঠকের মিত্রাক্ষর (অক্ষরবৃত্ত পয়ার) পঠনের দীর্ঘকালীন অভ্যাস পরিবর্তনের জন্যে অমিত্রাক্ষর পয়ারে লাইন-শেষের মিল তুলে দিয়ে, তার পরিবর্তে অনেক বেশি অন্তর্মিল ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তী কালে যখন অমিত্রাক্ষর সম্পর্কে পাঠক কিছুটা অবহিত হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ অন্তঃমিলের এই বাহুল্য অনাবশ্যক মনে করেছেন। লাইন শেষে মিল রেখেও যে অমিত্রাক্ষরের প্রবহমাণতা সৃষ্টি করা চলে সেটাও তাঁর রচনায় দেখিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য মধুসূদনের মিল-বিন্যস্ত সনেটগুলিও অমিত্রাক্ষর ছন্দেই রচিত হয়েছিল। (৫) মধুসূদনের কবি-ভাষায় (বিশেষ করে প্রথম দিকের রচনায়) উপমার এবং বিশেষণের প্রয়োগে যতটা আতিশয্য লক্ষিত হয়, রবীন্দ্র কবি ভাষায় স্বাভাবিক কারণেই সেই কৃত্রিমতা কখনো প্রকাশ পায় নি। তার কারণ, মধুসূদনকে তাঁর নতুন কাব্যরীতির উপযোগী ভাষা ও ছন্দের নব আঙ্গিক উদ্ভাবন করতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে পথিকৃতের দুরূহ ভূমিকায় নামতে হয় নি ; তিনি মধুসূদন-উদ্ভাবিত কবি-ভাষার পরিমার্জনার সুযোগ লাভ করেছিলেন। (৬) মধুসূদন কেবলমাত্র অক্ষরবৃত্ত পয়ারে প্রবহমাণতার পরীক্ষা করেছিলেন। তখনো আধুনিক মাত্রাবৃত্ত উদ্ভাবিত হয় নি। আর স্বরবৃত্ত (দলবৃত্ত) বাংলা কাব্যে কৌলীন্য লাভ করে নি। রবীন্দ্রনাথ অক্ষরবৃত্ত মহাপয়ারে প্রবহমাণতা এনেছেন। আধুনিক মাত্রাবৃত্তের তিনিই উদ্ভাবক। এ-ছন্দে এবং স্বরবৃত্তে প্রবহমাণতা সৃষ্টিরও অল্পস্বল্প পরীক্ষা করেছেন। উভয় ছন্দরীতিতে মুক্তকও লিখেছেন। তাঁর স্বরবৃত্ত মুক্তক অক্ষরবৃত্ত মুক্তকের মতই জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন, মধুসূদন মাত্র চার-পাঁচ বছর বাংলা সাহিত্য চর্চার সুযোগ পেয়েছিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে নব-উদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষর কবি-ভাষার বেশ কিছুটা সংস্কারও করেছিলেন। বীরাঙ্গনা কাব্যে এবং সনেটগুলিতে তিনি প্রায় সর্বপ্রকার প্রাথমিক দুর্বলতা এবং mannerism কাটিয়ে উঠেছিলেন। তবে নিজের প্রতিভার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই সবিনয়ে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন,

'What we want at present are men of zeal, of diligence, of energy, of enthusiasm, of liberal view to give our language a jolly lift··· · My motto is, 'Fire away, my boys'

[মধুস্মৃতি, ২য় সং, পৃ ৬২৬]

বাংলা সাহিত্যের, বিশেষ করে কাব্য ও নাটকের কিছুটা স্থূল ও বিকৃত রুচির আশু পরিবর্তন তাঁর কাছে সব চেয়ে জরুরী মনে হয়েছিল। নব দৃষ্টিভঙ্গি, অনন্য

সুলভ সৃজনী-প্রতিভা এবং অদম্য উদ্দীপনা ও সংকল্প নিয়ে সে কালে তিনি দুঃসাহসিক ভাবেই এগিয়ে এসেছিলেন। এ কথা স্বীকার্য, বাংলা ভাষায় চর্চায় তিনি অনভ্যস্ত ছিলেন। তবে পাশ্চাত্য উন্নতমানের সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ ছিল। তাছাড়া, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ক্লাসিক সাহিত্যেও (সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন) তাঁর বেশ পড়াশুনা ছিল। বাংলায় উন্নত রুচির মানবীয় মহিমাব্যঞ্জক কাব্য রচনার ব্যাপারে এবং সেই কাব্যের উপযোগী ছন্দ ও ভাষা সৃষ্টির ব্যাপারে একদিকে তাঁর যেমন উৎসাহ ও সংকল্প প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি এই কবি-ভাষা ও ছন্দ গড়বার সামর্থ্য বিচারে নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে কুণ্ঠাও বন্ধুদের কাছে লেখা চিঠিতে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এদিক থেকে অনেক সুবিধাজনক পরিবেশে সাহিত্য চর্চার সুযোগ পেয়েছিলেন। আবাল্য বঙ্গবাণীর চর্চার ফলে কবি-ভাষা নির্মাণের কাজটি তাঁর কাছে কখনো কঠিন মনে হয় নি। তাছাড়া, পূর্বসূরী হিসেবে মধুসূদন নব কবি ভাষার একটা আদর্শ গড়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং মধুকবির রুচিগত পরিচ্ছন্নতা, উন্নত মানবিক ব্যক্তিত্ববোধ, যুক্তবর্ণসমৃদ্ধ ভাষার দৃঢ়বদ্ধতা, ভাবের ছন্দ-ডিঙানো প্রবহমাণতা,—এই বিশেষ গুণগুলি রবীন্দ্রনাথ নিজের মত করেই সাঙ্গীকরণ করে নিতে পেরেছিলেন।

আলোচনা শেষে এবারে সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে, মধুসূদন পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রভাবিত নব্যরীতির কাব্য লিখতে গিয়ে ভাষা ও ছন্দের যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন, সেই প্রয়াস কার্যত তাঁর নিজের রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। পরবর্তী কবি ও নাট্যকারেরা অনেকেই এই নতুন অমিত্রাক্ষর শৈলীর বিপুল সম্ভাবনাশক্তি উপলব্ধি করতে পারলেও উপযুক্ত মানসিকতার অভাবে যথাযথভাবে তার অনুসরণ করতে পারেন নি ; এবং সম্ভবত, পুরোপুরি অনুসরণ করাটা বাংলা কাব্যের পক্ষে অভিপ্রেত বলেও তাঁরা মনে করেন নি। ফলে, মধুসূদনের কবি-ভাষা হেম-নবীন প্রমুখ অব্যবহিত পরবর্তী কবিদের হাতেই পরিবর্তিত হতে সুরু করেছে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় সেই রূপান্তরিত অমিত্রাক্ষর আবার এক নব স্থায়িত্ব লাভ করেছে। এই পরিবর্তিত, অনেকাংশে নমনীয় অমিত্রাক্ষর ভেঙেই, ছন্দমুক্তির আরো এক ধাপ এগিয়ে, মুক্তক বা Free verse রচিত হয়েছে। নাট্য সংলাপী গৈরিশ মুক্তকের কথা মনে রেখেও বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথই বাংলা কাব্যে মুক্তকের প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। অক্ষরবৃত্তের গণ্ডী থেকে মুক্তি দিয়ে এ-ছন্দকে স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তেও সঞ্চারিত করেছেন। কাব্যে ছন্দমুক্তির যে বিপ্লবী সূচনা মধুসূদনের হাতে সুরু হয়েছিল, তাকে আরও প্রসারিত করে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত গদ্য কবিতার ছন্দে, সব রকম আঙ্কিক মাত্রার হিসেব পেরিয়ে, সত্যিকারের কৃত্রিম ছন্দশৃঙ্খলমুক্তির পরীক্ষার পর্যায়ে নিয়ে এসেছিলেন। বেশ কিছু উৎকৃষ্ট গদ্য কবিতাও লিখেছিলেন। তবে আজন্ম ছন্দ-বন্ধনের বিচিত্র খেলায় মেতে থাকার পর এতটা বন্ধনমুক্তি তাঁকে স্বস্তি দেয় নি, মনে হয়। তাই একেবারে অন্তিম পর্বে পৌঁছে পুনর্বার মিত্রাক্ষর, অমিত্রাক্ষর এবং মুক্তকের এলাকায় ফিরে এসেই যেন তাঁর কবিমন আবার স্বস্থ হতে পেরেছিল।

পরিশিষ্ট

মধুসূদনের জীবনের কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী

১৮২৪, জানুয়ারি ২৫—যশোরের সাগরদাঁড়িতে জন্ম।

১৮৩৩— কলিকাতার হিন্দু কলেজের জুনিয়র স্কুল বিভাগের ছাত্র।

১৮৩৪— ঐ স্কুলে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় শেক্সপীয়র থেকে আবৃত্তির জন্য পুরস্কার লাভ।

১৮৪১— জুনিয়র বৃত্তি পেয়ে হিন্দু কলেজের সিনিয়র বিভাগে ভর্তি।

১৮৪২— 'স্ত্রী-শিক্ষা' সম্বন্ধে ইংরেজীতে প্রবন্ধ লিখে স্বর্ণপদক লাভ।

১৮৪৩, ফেব্রুয়ারি ৯—কলিকাতা ওল্ড মিশন গির্জায় খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ।

১৮৪৪, নবেম্বর— বিশপস্ কলেজে প্রবেশ,—গ্রীক, লাটিন ও সংস্কৃত শিক্ষা।

১৮৪৭— বিশপস্ কলেজ ত্যাগ।

১৮৪৮— মাদ্রাজে গমন এবং ব্ল্যাক টাউনের অ্যাসাইলাম স্কুলে ইংরেজীর শিক্ষক। মেরী রেবেকা ম্যাকটাভিসকে বিবাহ। Timothy Penpoem ছদ্মনামে Madras Circulator-এ কবিতা প্রকাশ। Madras Circular and General Chronicle, Athenaeum এবং Spectator-এর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ। Athenaeum পত্রিকা সম্পাদনা।

১৮৪৯, এপ্রিল—The Captive Ladie কাব্য প্রকাশ। বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা। কলকাতার বন্ধুবান্ধব এবং বেথুন সাহেবের নিকট 'ক্যাপটিভ লেডি' প্রেরিত।

১৮৫১— 'হিন্দু ক্রনিক্যাল' নামক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা। মাতার মৃত্যু। কলিকাতায় আগমন এবং গোপনে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৮৫২— মাদ্রাজ য়ুনিভার্সিটি হাই স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত।

১৮৫৪— দৈনিক 'স্পেক্টেটর'-এর সহ-সম্পাদক নিযুক্ত। 'The Anglo-Saxon and the Hindu' বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত।

১৮৫৫, ১৬ জানুয়ারি—পিতার মৃত্যু।

চারিটি সন্তানের জননী রেবেকার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ।

১৮৫৬— এমিলিয়া হেনরিয়েটা সোফিয়াকে বিবাহ।

২ ফেব্রুয়ারি—কলিকাতায় আগমন এবং জুনিয়র পুলিশ মেজিস্ট্রেটের আদালতে কেরানী নিযুক্ত।

১৮৫৭— পুলিশ আদালতে দোভাষীর পদে নিযুক্ত।

১৮৫৮— 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের সূত্রপাত এবং সমাপ্তির পর নাট্যজগতে প্রবেশ। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও প্রতাপচন্দ্র সিংহের আনুকূল্য লাভ।

১৮৫৯— সদর আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি।

জানুয়ারি—'শর্মিষ্ঠা' নাটক পুস্তকাকারে প্রকাশিত।

সেপ্টেম্বর—'শর্মিষ্ঠা' নাটক বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চে অভিনীত। আরো নাটক রচনায় মনোনিবেশ।

১৮৬০— এপ্রিল—'পদ্মাবতী' নাটক প্রকাশিত।

মে—'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' প্রকাশিত।

১৮৬১— জানুয়ারি—'মেঘনাদবধ কাব্য', প্রথম খণ্ড প্রকাশিত।

১২ ফেব্রুয়ারি—অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের জন্য কালীপ্রসন্ন সিংহের গৃহে সম্বর্ধিত।

মার্চ—পাদ্রী লঙ্-এর ভূমিকা সহ By A Native ছদ্মনামে নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ।

জুলাই—'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশিত। মেঘনাদবধ কাব্য ২য় খণ্ড এবং 'আত্মবিলাপ' প্রকাশিত।

আগস্ট—'কৃষ্ণকুমারী নাটক' প্রকাশিত।

১৮৬২— 'বীরাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশিত।

কিছুকালের জন্য 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা সম্পাদনা।

৪ জুন—'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতা রচনা।

৯ জুন—ইংলণ্ড যাত্রা।

জুলাই—ইংলণ্ডে উপনীত এবং গ্রেজ ইন-এ ব্যারিস্টারি শিক্ষার জন্য প্রবেশ।

১৮৬৩— ২মে—পুত্রকন্যা সহ হেনারিয়েটার লণ্ডন আগমন।

জুন—ভের্সাই গমন, চরম আর্থিক সংকট এবং বিদ্যাসাগর-কর্তৃক সে সংকট মোচন।

১৮৬৫—জানুয়ারি—বন্ধুর নিকট কতগুলি সনেট প্রেরণ।

মে—ইতালীয় কবি দান্তের ষষ্ঠ শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে ইতালির সম্রাটের নিকট দান্তের উদ্দেশে বাংলায় লিখিত সনেট (ইতালি ও ফরাসী ভাষায় অনুবাদ সহ) প্রেরণ। আইন পড়া সমাপ্ত করবার জন্য লণ্ডনে পুনরাগমন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার সাম্মানিক অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্য থিয়োডোর গোল্ডস্টুকারের আমন্ত্রণ পেয়েও প্রত্যাখ্যান।

১৮৬৬— আগস্ট—'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' প্রকাশিত।

১৭ নভেম্বর—ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৮৬৭— জানুয়ারী—স্ত্রী-সন্তানদের ফ্রান্সে রেখে মার্সেই বন্দর থেকে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা।

ফেব্রুয়ারী—কলিকাতা পেঁছে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন।

৩মে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করবার অনুমতি লাভ এবং ব্যয়বহুল অভিজাত স্পেনসাস হোটেলে অবস্থান।

সন্তানদের নিয়ে হেনরিয়েটার কলিকাতায় আগমনের পর হোটেল ছেড়ে লাউডন স্ট্রীটের প্রশস্ত বাড়িতে রাজকীয় সমারোহে বসবাস।

১৮৭০— জুন —প্র্যাকটিস ছেড়ে প্রিভি কাউন্সিলের অনুবাদ বিভাগে পরীক্ষকের পদ গ্রহণ।

১৮৭১— সেপ্টেম্বর—'হেক্টর বধ' প্রকাশ। হাইকোর্টের চাকরী ত্যাগ।

১৮৭২— জানুয়ারি—ঢাকাবাসীর অভিনন্দন লাভ।

পুরুলিয়ায় অভিনন্দন লাভ।

পঞ্চকোট রাজার আইন উপদেষ্টা নিযুক্ত।

সেপ্টেম্বর—পুনরায় আইন ব্যবসায়ে প্রত্যাবর্তন।

ডিসেম্বর—বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য অর্থের বিনিময়ে 'মায়াকানন' রচনা। অসমাপ্ত 'বিষ না ধনুর্গুণ' রচনা।

১৮৭৩— এপ্রিল—গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় কিছুকালের জন্য উত্তরপাড়া লাইব্রেরীতে অবস্থান।

জুন—প্রথমে বেনেপুকুরের বাসায় প্রত্যাবর্তন ও পরে প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত।

২৬জুন—বেনেপুকুরের বাসায় হেনরিয়েটার মৃত্যু।

২৯ জুন—রবিবার অপরাহ্ণ দুইটায় হাসপাতালে মৃত্যু। ধর্মযাজকদের আপত্তিতে কিছুকাল যাবৎ শবদেহ মর্গে রাখা হয়।

৩০ জুন—সেন্ট জেমস চার্চ-এর ধর্মযাজকের (Chaplain) উদ্যোগে খ্রীস্টীয় রীতি অনুসারে লোয়ার সার্কুলার রোড সমাধি ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে মরদেহ পূর্ণ মর্যাদায় সমাহিত।

মধুসূদন রচনাবলী

[প্রকাশিত-অপ্রকাশিত, সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ রচনাবলীর তালিকা]

(ক) প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ঃ

১। শর্মিষ্ঠা (নাটক) (১৮৫৯) ২। একেই কি বলে সভ্যতা ?—১৮৬০ ৩। বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০) ৪। পদ্মাবতী নাটক (১৮৬০) ৫। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০)। ৬। মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১) ৭। ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১) ৮। কৃষ্ণকুমারী নাটক (১৮৬১) ৯। বীরাঙ্গনা কাব্য (১৯৬২)। ১০। চতুর্দশপদী কবিতাবলী ১৮৬৬) ১১। হেক্টরবধ (১৮৭১) ১২। মায়াকানন (মৃত্যুর পরে ১৮৭৪)।

(খ) অসম্পূর্ণ বাংলা রচনাবলী ঃ

১ বীরাঙ্গনা কাব্য (২য় ভাগ) ২। ব্রজাঙ্গনা কাব্য (২য় ভাগ) ৩। সিংহল বিজয় কাব্য ৪। পাণ্ডব বিজয় কাব্য ৫। সুভদ্রাহরণ কাব্য ৬। দ্রৌপদী স্বয়ম্বর কাব্য ৭। মৎস্যগন্ধা (কাব্য) ৮। বিষ না ধনুর্গুণ (নাটক) ৯। নীতিমূলক কবিতাবলী ১০। রিজিয়া (নাট্যকাব্য) ১১। বিবিধ কবিতাবলী।

(গ) সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ইংরেজী রচনাবলী ঃ

১। Captive Ladie (Poetry) and Visions of the Past (Poetry) (1849) ২। Rizia : Empress of Inde (Drama)-(1849) ৩। The Anglo-Saxon and the Hindu। (1854) ৪। Ratnavali (1 58) (Drama : translated from the Bengali) ৫। Sermistha (1859) (Drama : Author's translation of his Sarmistha) ৬। Tilottoma (Poem, Incomplete) ৭। Queen Sita (poem, Incomplete) ৮। Upsori (Poem, Incomplete) ৯। Miscellaneous Poems ১০। Letters. ১১। Nil Durpan,/

or/The Indigo Planting Mirror /A Drama Translated from the Bengali/By A Native with Introduction by Rev. J. Long (1861)P । 102.*

* নীলদর্পণ-এর ইংরেজী অনুবাদ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন : '......ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়াছিলেন, এবং শুনিয়াছি, শেষে তাঁহার জীবন-নির্বাহের উপায় সুপ্রিম কোর্টের চাকরী পর্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।'—

দ্রষ্টব্য : বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী, বিবিধ পৃঃ ৭৮

মধুসূদন যে নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদক—এই তথ্য প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন কুঞ্জবিহারী বসু নীলদর্পণ-এর দ্বিতীয় মুদ্রণের ভূমিকায় ১৯০৩ খৃীষ্টাব্দে। শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতনু লাহিড়ীও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' (১৯০৪)-এর ২২৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : 'যতদূর স্মরণ হয়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই গ্রন্থ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।' সতীশচন্দ্র মিত্র 'যশোর খুলনার ইতিহাস' (প্রকাশকাল ১৩২৯ বঙ্গাব্দ)-এ লিখেছেন : 'যখন এই নাটক পাদরী লঙ সাহেবের তত্ত্বাবধানে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের নিপুণ লেখনীর সাহায্যে ইংরেজীতে ভাষান্তরিত হইল তখন নীলকরমহলে হুলস্থূল পড়িয়া গেল।'

বঙ্কিম-পরবর্তী আরও কোন কোন প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বিখ্যাত গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য—'দীনবন্ধু ও মধুসূদন উভয়ে রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই কারণে বোধ হয়, মূল নাটকে বা তাহার ইংরেজি অনুবাদে গ্রন্থকার বা অনুবাদক কেহই নিজ নাম প্রকাশ করেন নাই।'—দ্রঃ, মধুসূদন দত্ত ॥ সাহিত্য সাধক চরিত্রমালা, ২য় খণ্ড ॥ পৃঃ ৬০।

মধুসূদন যে নীলদর্পণের দেশীয় (Native) ইংরেজী অনুবাদক নন—এই বিষয়ে প্রথম লিখিতভাবে সন্দেহ প্রকাশ করেন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও গবেষক মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর 'নীলদর্পণের ইংরেজি অনুবাদক কে?' শীর্ষক ক্ষুদ্র নিবন্ধটিতে (দ্রষ্টব্য : প্রবাসী, মাঘ, ১৩৬৩)। বঙ্কিমের উক্তি সম্পর্কে উক্ত নিবন্ধে তিনি মন্তব্য করেন :

'মোকদ্দমার সময় যাঁহার নাম প্রকাশ পাইল না, সুপ্রিম কোর্ট কি গোয়েন্দা লাগাইয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং বাহির করিয়া প্রকাশ্যে নহে, গোপনে তিরস্কার করিলেন? বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় উচ্চপদস্থ কর্মচারীর পক্ষে এরূপ লেখা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। আমরা দীনবন্ধুর পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকট এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিলে তিনি বলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় নিম্নরেখ অংশ ছিল না, পরে কোন অজ্ঞাত হস্তে উহা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার নিকট পাণ্ডুলিপি ছিল, কিন্তু পরে সন্ধান করিলে বর্তমান লেখক উহা দেখিতে পান নাই। তাঁহার অনুমান উহা বঙ্কিমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের দ্বারা সন্নিবেশিত।'

A Native-ছদ্মনামের আড়ালে প্রচ্ছন্ন থেকে যিনি নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কিনা—এই প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক কালে তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন ডঃ তপোবিজয় ঘোষ—শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী সম্পাদিত এবং বৈশাখ, ১৩৮০-তে প্রকাশিত 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায় 'নীলদর্পণ-এর ইংরেজী অনুবাদ ও মাইকেল মধুসূদন' প্রবন্ধটিতে। এ প্রবন্ধে তিনি যুক্তি দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, বাইরের তথ্যাবলী এবং আভ্যন্তরীণ ভাষা-রীতি—উভয় দিক থেকে মধুসূদন যে নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদক নন—এটা অনুমান করবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। তাঁর ঐকান্তিক বিশ্বাস, নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ সর্বস্তরের বাংলা ভাষার সঙ্গে অপরিচিত এবং অনভিজ্ঞ কোন বিদেশী ইংরেজের,—যেহেতু অনুবাদের অনেক স্থলে মূলের অর্থ বিকৃত ঘটানো হয়েছে। মধুসূদনের মত আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে পরিচিত এবং শক্তিমান ইংরেজী লেখকের পক্ষে অনুবাদে এত মারাত্মক ভুল করা সম্ভব নয়। এই মূল্যবান প্রবন্ধটি কৌতূহলী পাঠকের অবশ্য-পাঠ্য।

—সম্পাদক

মধুসূদন রচিত গ্রন্থ ও গ্রন্থাবলীর পুরাতন ও নতুন সংস্করণ

শর্মিষ্ঠা— ১৮৫৯ জানুয়ারি, ৩য় সংস্করণ, ১২৭৬ বঙ্গাব্দ। প্রথম মুদ্রণে পৃষ্ঠাসংখ্যা—৮৪

পদ্মাবতী— প্রথম প্রকাশ-১৮৬০/১২৬৭ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা সংখ্যায় ৭৮/ ৩য় সংস্করণ, ১২৮৬ বঙ্গাব্দ।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য—প্রথম প্রকাশ ১৮৬০ মে। পৃষ্ঠাসংখ্যা—১০৪। ৩য় সংস্করণ ১৮৭০।

একেই কি বলে সভ্যতা ? …পৃষ্ঠাসংখ্যা—৩৪-২য় সংস্করণ ১২৬৯
প্রথম প্রকাশ, ১৮৬০ ৩য় „ ১৮৭৪

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ …পৃষ্ঠাসংখ্যা—৩২-২য় সংস্করণ ১২৬৯
৩য় সংস্করণ ১২৮২

মেঘনাদবধ কাব্য- ১ম খণ্ড (১-৫ সর্গ)-১৮৬১ জানুয়ারি-২২ পৌষ, ১২৬৭। ২য় খণ্ড (৬-৯ সর্গ)-১৮৬১-এর প্রথমার্ধে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে)

পৃষ্ঠাসংখ্যা—১ম সংস্করণে ১ম খণ্ডের—১৩১

„ „ „ „ ২ খণ্ডের—১০৭

ষষ্ঠ সংস্করণ—দুই খণ্ড একত্রে প্রকাশিত ১৮৬৯ (২০ জুলাই) পৃষ্ঠাসংখ্যা—৩২০

উমেশচন্দ্র সেন কৃত মেঘনাদবধ-এর ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় The Fall of Meghanad নামে ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য- প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৮৬১। পৃষ্ঠাসংখ্যা—৪৬। মধুসূদনের জীবদ্দশায় ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে।

৫ম সংস্করণ—১২৮২ পৃঃ ৩০

সংস্করণের উল্লেখ নেই—১২৮৪ পৃঃ ৩০

৭ম সংস্করণ—১২৮৭ পৃঃ ৩০

কৃষ্ণকুমারী নাটক— ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের শেষ ভাগে প্রথম প্রকাশ। পৃষ্ঠা-সংখ্যা—১১৫। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১২৭২। ৩য় সংস্করণ ১২৭৬

বীরাঙ্গনা কাব্য— প্রথম প্রকাশ, ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দ। পৃষ্ঠাসংখ্যা—৭০

দ্বিতীয় সংস্করণ—১২৭৩ বঙ্গাব্দ/১৮৬৬
তৃতীয় সংস্করণ—১২৭৫ " /১৮৬৯
ষষ্ঠ সংস্করণ—১২৯২ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠাসংখ্যা—৯৩

চতুর্দশপদী কবিতাবলী—প্রথম প্রকাশ, ১৮৬৬। পৃষ্ঠাসংখ্যা—১+১২২
দ্বিতীয় সংস্করণ—১৮৬৯

হেক্টরবধ— প্রথম প্রকাশ—১৮৭১। পৃষ্ঠাসংখ্যা—১০৫
[কবির জীবদ্দশায় একটি মাত্র সংস্করণ প্রকাশিত হয়]

মায়াকানন— প্রথম প্রকাশ—১৮৭৪ [কবির তিরোধানের পর]
পৃষ্ঠাসংখ্যা—১১৭।

বিষ না ধনুর্গুণ— অসম্পূর্ণ

গ্রন্থভুক্ত হয় নি এমন কবিতাবলী

বর্ষাকাল ও হিমঋতু—হিন্দু কলেজে পাঠকালে বাল্যাবস্থায় মধুসূদনের প্রথম রচনা। প্রথম কবিতাটি বন্ধু গৌরদাস বসাকের উদ্দেশে রচিত একটি acrostic। তারিখের উল্লেখ নেই।

আত্মবিলাপ— ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রকাশিত।

বঙ্গভূমির প্রতি— ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে ৪ঠা জুন বিলাত যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে লিখিত।

নীতিগর্ভ কবিতা— ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সে অবস্থান কালে 'ময়ূর ও গৌরী', 'কাক ও শৃগালী', 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা' নামক নীতি-কবিতাগুলি লেখেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে মধুসূদন 'মেঘ ও চাতক', 'সূর্য ও মৈনাক', 'দেবদৃষ্টি', 'গদা ও সদা' প্রভৃতি ছাত্র-পাঠ্য কবিতা রচনা করেন।

পুরুলিয়া মণ্ডলীর প্রতি—এই চতুর্দশপদী কবিতা ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে 'জ্যোতিরিঙ্গণ' নামক খ্রীস্টীয় মাসিকপত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়।

পরেশনাথ গিরি— পুরুলিয়া বাস কালে ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়।

কবির ধর্মপুত্র— ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে 'জ্যোতিরিঙ্গণ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত।

পঞ্চকোট গিরি, পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী, পঞ্চকোট গিরি বিদায় সঙ্গীত—১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে পঞ্চকোট থেকে বিদায় গ্রহণের পূর্বে এই তিনটি কবিতা রচিত হয়।

হতাশা-পীড়িত হৃদয়ের দুঃখধ্বনি—১৮৭২-৭৩-এর মধ্যে রচিত এবং ১২৯১ সনে 'আর্য্যদর্শন' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত।

দেবদানবীয়ম্—রচনাকাল আনুমানিক—১৮৬৯। সংস্কৃতে রচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের সমালোচনাত্মক কবিতার উত্তরে লিখিত ব্যঙ্গাত্মক কবিতা।

জীবিতাবস্থায় অনাদৃত কবিগণের সম্বন্ধে—'দেবদাননীয়ম', 'ভারতবৃত্তান্ত' পাঁচটি কবিতার সঙ্গে ১৩১১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যার (১৯০৪) প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদকীয়তে প্রবাসী সম্পাদক জানিয়েছিলেন, এই কবিতাগুলির কোন কোনটি দুষ্প্রাপ্য 'সাধারণী'তে প্রকাশিত হয়ে থাকতে পারে।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—সম্ভবত ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর-ডিসেম্বরের মধ্যে রচিত এবং বিদ্যাসাগরের অসুস্থতার খবর পেয়ে তাঁর নিকট প্রেরিত হয়েছিল। ১৩১১-এর ভাদ্র, প্রবাসীতে 'পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে লক্ষ্য করিয়া'—এই শিরোনামে কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল।

ঢাকাবাসীদের অভিনন্দনের উত্তরে—১৮৭২-এ ঢাকার নাগরিকবৃন্দের অভ্যর্থনার উত্তরে কবিতাটি রচিত হয়। এই কবিতায় ভগ্নস্বাস্থ্য অভিমানী কবি প্রকারান্তরে ঢাকাবাসীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন।*

মাইকেল মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী—রাজকিশোর দে—১৮৭৪

মধুসূদন গ্রন্থাবলী—বঙ্গবাসী সংস্করণ—১৩১১

মাইকেল গ্রন্থাবলী—মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বসুমতী-সংস্করণ, ১৯০০, পৃঃ ৩৫৬

মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী
প্রথম খণ্ড—কাব্য
দ্বিতীয় খণ্ড—বিবিধ } —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রকাশিত—১৩৫০

মাইকেল রচনা সম্ভার—প্রমথ বিশী সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ, ৩য় মুদ্রণ, ১৩৭১

মসুসূদন গ্রন্থাবলী—ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৫

মধুসূদন রচনাবলী—প্রধান সম্পাদক ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩

মধুসূদন রচনাবলী—ডঃ সুরেশ মৈত্র সম্পাদিত, মডেল পাবলিশিং হাউস, কলি-৭৩

*মধুসূদনের গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয় নি—এমন পর্যায়ের কবিতার বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্যঃ ডঃ শিবদাস চক্রবর্তী সংকলিত গ্রন্থ-পরিচয়/মধুসূদন রচনাবলী/হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩

গ্রন্থপঞ্জী

[মধুসূদনের জীবনী, সাহিত্য সমালোচনা এবং বিভিন্ন গ্রন্থে, অভিভাষণে ও প্রবন্ধে মধুসূদন সম্পর্কীয় আলোচনা]

(ক) জীবনী :

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ— মাইকেল ও হেমচন্দ্রের জীবন বৃত্তান্ত, পৃঃ ২০ [সনের উল্লেখ নেই]

যোগীন্দ্রনাথ বসু— মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত-১৩০০/১৮৯৩ [ঐ পঞ্চম সং, কলি, ১৯১৫/২০, ৬৮২ পৃষ্ঠা]

রজনীকান্ত গুপ্ত— মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কলি-১৯১৮/প্রতিভা/১৪,১৬২ পৃঃ

দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য— মধুসূদন (২য় সংস্করণ) ১৯২০, পৃঃ ৩২

নগেন্দ্রনাথ সোম— মধুস্মৃতি (১৩২৭/১৯২০) এম. সি. সান্ন্যাল এণ্ড কোং কলি, পৃঃ ২০, ৭৯৭, বিদ্যোদয় সং

বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়—মাইকেল [১৩২৯/১৯২২]-পৃঃ ৫০ ৩য় সংস্করণ, কলি-১৯৩০, পৃঃ ৫০

বিজয়াশিস বন্দ্যোপাধ্যায়—আমাদের মাইকেল মধুসূদন (শিশুপাঠ্য) তারিখ উল্লেখ নেই (কলিকাতা পুস্তকালয়)

শশাঙ্কমোহন সেন— মধুসূদন : অন্তর্জীবন ও প্রতিভা, কলি, ১৯২১/১৯৫৯, পৃঃ ১০, ১৮৮

নীহার দাশগুপ্তা— মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ১৯৪২, পৃঃ ৪, ৮০/কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস/ইংরেজীতে লিখিত এবং Journal of the Deptt of Letters, Vol. 33 থেকে পুনর্মুদ্রিত।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মধুসূদন দত্ত, ১৯৪২, ৪র্থ সং ১৩৬২/১৯৫৫ [সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ২০ নং গ্রন্থ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ]

মণি বাগচী— মাইকেল, জিজ্ঞাসা, ১৯৫৯, পৃঃ ৪,১৮৩।

বাণী রায়— মধুজীবনীর নূতন ব্যাখ্যা, গ্রন্থম্, কলি, ১৯৬১

ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ— মাইকেল জীবনীর আদি পর্ব, ১৯৬২, মর্ডান, কলি-১২

প্রমথনাথ বিশী— মাইকেল মধুসূদন (জীবনভাষ্য) ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, ১৩৮১/১৯৭৪

ঋষি দাস— মাইকেল মধুসূদন, ১৯৭৩

অমলেন্দু বসু— Michael Madhusudan Dutt, ১৯৮১ [Sahitya Academi]

সুরেশচন্দ্র মৈত্র— মাইকেল মধুসূদন দত্ত : জীবন ও সাহিত্য, পুঁথিপত্র, কলি-৯, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৫

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়—শ্রীমধুসূদন (জীবনী নাটক), ডি. এম. লাইব্রেরী, কলি-৯ ১৯৩৯ পৃঃ ২, ১৮৪।

মহেন্দ্র গুপ্ত— মাইকেল (জীবনী নাটক), কলি, ১৯৪২, পৃঃ ১১৬

Rev.K.M.Bannerjee—Recollections of Michael M. S. Dutt

Kishori Lal Haldar— Life of Michael Madhusudan Dutt.

জন এলিয়ট ড্রিংকওয়াটার বেথুন স্মারক গ্রন্থ, বেথুন কলেজ, ১৯৭৬-এ প্রকাশিত গ্রন্থে প্রাসঙ্গিক তথ্য।

(খ) বিভিন্ন গ্রন্থে/প্রবন্ধে/অভিভাষণে মধুসূদনের জীবন/সাহিত্য সম্পর্কীয় আলোচনা

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—মেঘনাদবধ-এর ভূমিকা, ১৮৬৯

কালীপ্রসন্ন রায়— মেঘনাদবধ সমালোচনা, ১২৭৭/১৮৭০, পৃঃ ৬৫

দেবপ্রসাদ চৌধুরী— মাইকেল স্মৃতিসভায় অভিভাষণ, ১৮৭৩, পৃঃ ৩৯

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব, ১৮৭৩

রাজনারায়ণ বসু— ১। বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড, ১২৮৯, ১৮৮২
২। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা
৩। আত্মচরিত

যোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণি—Essays on Meghanad Badh of Madhusudan Dutt, কলি, ১৮৮৭, পৃঃ ৮৮/৩৩
[আখ্যাপত্রে বইটির নাম ইংরেজী হলেও বইটি বাংলায় রচিত]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী— সাবিত্রী লাইব্রেরীতে বাংলা সাহিত্য বিষয়ক পঠিত ভাষণে (১২৮৭/১৮৮০) মধুসূদন প্রতিভা বিষয়ে আলোচনা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—Bengali Literature, Calcutta Review, ১৮৮১

রমেশচন্দ্র দত্ত— Literature of Bengal—Stanhope Press, Cal. (তারিখ নেই)।

শিবনাথ শাস্ত্রী— রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ১৯০৪

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ— মেঘনাদবধ ৪র্থ সর্গের সমালোচনা, কলিকাতা University Institute-এ পঠিত, ১৯০৪, পৃঃ ২২

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল— ১। New Essays in Criticism (১৯০৩)
২। New Romantic Movement in Bengali Literature (1890-91)

দীননাথ সান্যাল— মেঘনাদবধ (সম্পাদনা), ১৩০৩/১৯০৬
তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য-সম্পাদনা
মেঘনাদবধ কাব্যে সীতা ও সরমা
ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস— মেঘনাদবধ কাব্য (সটীক), ১৯১০
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— ১. সাহিত্য (১ম নং, ১৩৪১)
২. সাহিত্যের পথে গ্রন্থের 'সাহিত্য সৃষ্টি' প্রবন্ধ
৩ আধুনিক সাহিত্যের 'বিহারীলাল' প্রবন্ধ
৪. পঞ্চভুত।
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—সাহিত্য কথা।
প্রমথ চৌধুরী— সনেট পঞ্চাশত ও অন্যান্য কবিতা (১৯১০)
অহিভুষণ রায়— কাব্যজগতে মাইকেল মধুসূদন ও মহেন্দ্রনাথ
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—জাতীয় সাহিত্য, ১৯৩২, পৃঃ ১৪৬
চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী—মাইকেল মধুসূদন, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৩৪
দীনেশচন্দ্র সেন— বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৭ম সংস্করণ, পৃঃ ৪৪১
[মধুসূদনের ওপর চন্দ্রাবতীর রামায়ণের প্রভাব-বিষয়ক আলোচনা]
প্রিয়রঞ্জন সেন— Western Influence on Bengali Literature. 1947
হরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত— Western Influence on Bengali Poetry
J. C. Ghosh— Bengali Literature (Oxford University Press), 1948
সুশীলকুমার দে— নানা নিবন্ধ ('মহাকাব্য ও বাংলা সাহিত্য' প্রবন্ধ) (মিত্র ও ঘোষ)।
সুকুমার সেন— বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৩৭০
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যে বিকাশের ধারা, ১৯৬৭
প্রমথনাথ বিশী— মাইকেল রচনা সম্ভার, ভূমিকা (মিত্র ও ঘোষ), মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ, বাংলার কবি
শশিভূষণ দাশগুপ্ত— বাংলা সাহিত্যে নবযুগ (৭ম সংস্করণ), ১৩৮৩। উপমা কালিদাসস্য
মোহিতলাল মজুমদার—কবি শ্রীমধুসূদন ; আধুনিক বাংলা সাহিত্য
সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত— মধুসূদন : কবি ও নাট্যকার, ১৩৬৬
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য (বুক ল্যান্ড)
বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ১৯৬৬
বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা, ১৯৮৩

বৈদ্যনাথ শীল— বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা, ১৩৩৭

বিষ্ণু দে— মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা, ১৩৭৪

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত— স্বগত (ছন্দমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ)

বুদ্ধদেব বসু— সাহিত্যচর্চা (মাইকেল)

নীরেন্দ্রনাথ রায়— সাহিত্যবীক্ষা

ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় -মধুসূদন ও উত্তরকাল (সম্পাদনা)

R. K. Das Gupta—Michael Madhusudan Dutt (সম্পাদনা, ... বিশ্ববিদ্যালয়)

শীতাংশু মৈত্র— যুগন্ধর মধুসূদন, ১ম সংস্করণ—১৯৫৮, ২য় সংস্করণ পুনর্বিবেচনা (শৈব্যা), ১৯৭৯

আশুতোষ ভট্টাচার্য— গীতিকবি মধুসূদন, ১৯৭৪
মহাকবি মধুসূদন, ১৯৬৪, ১৯৭০
নাট্যকার মধুসূদন, ১৯৬৯

জগদীশ ভট্টাচার্য— সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, ১৩৬৪

কনক বন্দ্যোপাধ্যায়— কাব্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন, ১৩৫২ (১৯৪৫)

সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য- মধুসূদন সাহিত্য পরিক্রমা, ১৯৬৫

জীবেন্দ্র সিংহরায়— মধুসূদনের কাব্যবৃত্ত, ১৯৫৮, ১৯৮০

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য— মেঘনাদবধ কাব্য, জিজ্ঞাসা, ১৩৮২/১৯৭৫
মধুসূদনের কাব্যালংকার ও কবিমানস, ১৩৬৯/১৯৬২

নীতিশকুমার বসু— মধুসূদন হইতে শ্রীমধুসূদন

জগন্নাথ চক্রবর্তী— মেঘনাদবধ কাব্যে চিত্রকল্প, ১৯৭৮

শিশিরকুমার দাশ— মধুসূদনের কবি-মানস, পৃঃ ৮, ১১৪

ক্ষেত্র গুপ্ত— মধু বিচিত্রা
মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্য শিল্প, ১৯৭০, ১৯৭৫
কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী (সম্পাদনা) ১৩৭০/১৯৬৫
নাট্যকার মধুসূদন

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার—বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব, ১৩৭৫

সুশীলকুমার গুপ্ত— ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নব জাগরণ

সৈয়দ আলী আহসান—(বাংলাদেশ)—মধুসূদনের কবিকৃতি ও কাব্যাদর্শ (মুক্তধারা)

মোবাশ্বের আলী (বাংলাদেশ)—মধুসূদন ও নবজাগৃতি, ৩য় সং, ১৯৮১ (মুক্তধারা)

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—বাংলা ছন্দের মূলসূত্র (৭ম সং)

প্রবোধচন্দ্র সেন—　　ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ, ১৯৪৫
৭ জন ছান্দসিক—
ঐ　　বাংলা ছন্দ সমীক্ষা, ১৯৭৭ (জিজ্ঞাসা)
দিলীপকুমার রায়—　　ছান্দসিকী
মোহিতলাল মজুমদার—বাংলা কবিতার ছন্দ
তারাপদ ভট্টাচার্য—　　ছন্দবিজ্ঞান, ১৯৪৮। ছন্দোমীমাংসা
আবদুল কাদির (বাংলাদেশ)—ছন্দ সমীক্ষণ, ১৯৩০, ১৯৭৯
শাজাহান ঠাকুর (বাংলাদেশ)—বাংলা ছন্দ বিজ্ঞান (বাংলা অকাদেমি, ঢাকা)
নীলরতন সেন—　　আধুনিক বাংলা ছন্দ, ১৯৬২, ১৯৭৯-৮০। বাংলা ছন্দ, বিবর্তনের ধারা, ১৯৮৩
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়—দুই মধুসূদন, ১৩৮১
দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য—　　মাইকেল সমীক্ষা, অপূর্বা, কাল-১২, ১৩৭৯
জি. পরমশ্বরণ পিল্লাই—Representative Indians (জর্জ রুটলেজ এণ্ড সনস লণ্ডন, ১৯১৭), ২২-৩২০, ৪, ৪ পৃষ্ঠা। মধুসূদন সম্পর্কে আলোচনা, ৬৯-৭৩ পৃষ্ঠা।
গৌরাঙ্গ পণ্ডিত—　　মধুসূদনের Upsori-র বঙ্গানুবাদ, ১৯৬৬
অতুলচন্দ্র ঘোষ—　　অবরুদ্ধা—Captive Ladie-র বঙ্গানুবাদ, ১৩৩৩
সুশীল রায়—　　মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্রাবলী (সম্পাদনা)
সুলতানা রিজিয়া ও পুরুরাজ (অনুবাদ)

(গ) মধুসূদন-কাব্যের অনুকৃতি, নাট্যরূপ ও ব্যঙ্গাত্মক কাব্য

দীননাথ ধর—　　কংসবিনাস কাব্য, ১৮৬১
হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী—দশাননবধ কাব্য [মেঘনাদবধ কাব্যের পরিশিষ্ট] ১৩১০, পৃষ্ঠা ৪০০
অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—অভিমন্যুবধ কাব্য, ১৮৬৮
মহেশচন্দ্র শর্মা—　　নিবাত কবচ কাব্য, ১২৯৩, পৃঃ ১২০
হরিশচন্দ্র মিত্র—　　কীচকবধ কাব্য, ১৮৬৯
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়— শক্তিসম্ভব কাব্য, ১৮৭০
অনাথবন্ধু রায়—　　বৈদেহী বৈধব্য কাব্য, ১৮৭৩
অম্বিকা দত্ত ব্যাস—　　কংসবধ কাব্য (হিন্দী)
গুরুনাথ সেনগুপ্ত—　　বীরোত্তর কাব্য [বীরাঙ্গনা কাব্যে লিখিত পত্রিকাসমূহের উত্তর], ১২৯০, পৃঃ ৭৮
জগদ্বন্ধু ভদ্র—　　ছুছুন্দরীবধ কাব্য [মেঘনাদবধ-এর অনুকরণে লিখিত ব্যঙ্গ কাব্য]

রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায়— রাধা বিলাপ, ১৮৭২
ঐ বঙ্গাঙ্গনা, ১৮৭৬
নফরচন্দ্র দত্ত— মেঘনাদবধ নাটক, পৃঃ ৮৯
গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক
নাট্যীকৃত— মেঘনাদবধ, ১৯২১, পৃঃ ১০৪

(ঘ) মধুসূদন-সাহিত্য আলোচনা-গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি

প্রাচ্য :

রত্নাবলী নাটিকা (শ্রীহর্ষ)— অনুবাদ ও সম্পাদনা : পঞ্চানন তর্করত্ন, ১৩০২
বাল্মীকি রামায়ণম্ ঃ অনুবাদ ; হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৮৬৯-১৮৮৪
ভারবি সংস্করণ ঃ প্রথম খণ্ড, ১৯৭৫
দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৭৬
সারানুবাদ ঃ রাজশেখর বসু।
কম্বন রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড ঃ
ইংরেজি অনুবাদ ঃ চক্রবর্তী রাজাগোপালআচারি,
সাহিত্য অকাদমি, ১৯৭০, ১৯৮১
জৈন রামায়ণ—হেমচন্দ্র
তুলসীদাসী রামায়ণ
চন্দ্রাবতীর রামায়ণ
কৃত্তিবাসী রামায়ণ, শ্রীরামপুর সংস্করণ
ঐ ঐ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
জগদ্রামী রামপ্রসাদী— অদ্ভুত রামায়ণ, ৩য় সংস্করণ, ১৩০৭
পদাংক দূত— শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম, ১২৫৯।
বিশ্বনাথ কবিরাজ-কৃত— সাহিত্য দর্পণম্
ব্যাসদেব— মহাভারতম্—সারানুবাদ, রাজশেখর বসু
মহাভারত – কাশীরাম দাস, শ্রীরামপুর সংস্করণ, ১৮৩৬
মহাভারতম্—হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ১৯৫২
মহাভারত—কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত—বসুমতী ও হিতবাদী। নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি।
K. Chellappan Pillai—Similies of Kalidas.
কালিদাসের গ্রন্থাবলী— বসুমতী সাহিত্য মন্দির ও বঙ্গবাসী সংস্করণ
জয়দেবের গীতগোবিন্দ—
শ্রীশ্রীচণ্ডী— স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত

ভবভূতির নাটক—

Thomas, P— Epics, Mhyths and Legends of India.

arace Hayman Wilson—Vishnu Purana, a system of Hindu Mythology and Tradition.

ভাগবতের ব্রজলীলা প্রসঙ্গ,/বৈষ্ণব পদাবলী

শতপথ ব্রাহ্মণ/দেবী ভাগবত—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, কলি, ১৩৩১

বিভিন্ন পুরাণ- যেমন, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ, ভাগবত পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, পদ্মপুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, শিবপুরাণ, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি

উমেশচন্দ্র বটব্যাল— অষ্টাদশ পুরাণ

অমরকোষ— অভিধান

নগেন্দ্রনাথ বসু- বিশ্বকোষ

সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত—পৌরাণিক অভিধান, ৫ম সং, ১৩৯২

Dowson— Classical Ditcionary of Hindu Mythology

A. B. Keith, History of Sanskrit Literature, 1950

পাশ্চাত্ত্য

Homer- The Iliad—Translated by Samuel Butler, 1966
The Odyssey, Do Do, 1966
(The Loeb Classical Library)

Virgil— Virgil's works (Aeneid)—Tr J. W. Mackail, 1950
T. W. Clark—'Meghanadbadhkavya' Canto VIII, Descensus Averno'. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. XXX, Part 2, 1967

Dante— Divina Commedia (Temple Classic ed.), Inferno, 1. 22 28
The Divine Comedy—1. Hell. 2. Purgatory, 3. Paradise, Tr. by Dorothy L. Sayers and Barbara Reynolds (Penguin classics) 1967.

Tasso— Gerusalemme Liberata, দ্রঃ Roberts Weiss, ed. Jerusalem Delivered, 1962

Ariosto, — Orlando Furioso, Ed. G. A. Cornacchia, Tr. A. Gilberr, 1954

Petrarch— The Rhyms of Petrarch, Compiled by T. G. Bergin, 1955.

Love Rimes of Petrach, Tr. by M. Bishop, 1932

Ovid— English Versions of the Epistles (i. e. Heroides) by John Dryden and others including Pope and Congreve, 1680

Milton's English Poems, - 2 vols. Ed. by R. C. Browne, (Oxford University Press)

Scrimgeour— Tr. Paradise Lost, Book I & II.

Verity— Tr. Paradise Lost, Book III, IV, IX, X

Verity— Tr. Paradise Regained.

W. C. Green— The Similies of Homer's Iliad.

(ঙ) দেশ-কাল-সমাজ-সংস্কৃতি-সম্পর্কীয় তথ্যের জন্য পঠিতব্য •

সতীশচন্দ্র মিত্র— যশোহর খুলনার ইতিহাস (চক্রবর্তী চ্যাটার্জি)

হরিহর শেঠ— প্রাচীন কলিকাতা পরিচয় (ওরিয়েণ্ট)

অনাথনাথ বসু সম্পাদিত—Wm. Adam's Report on Education (Cal. University.)

A. C. Gupta and Jagannath Chakravorty, Ed.— Studies in the Bengal Renaissance, (Rev. Ed.) 1977.

Sushobhan Sarkar—Notes on the Bengal Renaissance, Papyrus, 1979.

Nemaisadhan Bose—Indian Awakening and Bengal, 1976,

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সংবাদপত্রে সেকাল, ২য় খণ্ড (সাহিত্য পরিষদ্)

শিবনাথ শাস্ত্রী— রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (এস. কে. লাহিড়ী)

বিনয় ঘোষ— সংবাদপত্রে বাঙালী সমাজ (বেঙ্গল)

ঐ— বাংলার নবজাগৃতি (ইণ্টারন্যাশানেল)।

যোগেশচন্দ্র বাগল— কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র (শ্রীগুরু)

গোপাল হালদার— বাংলার সংস্কৃতি প্রসঙ্গ
রাজনারায়ণ বসু— আত্মচরিত
দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত—বাঙালীর গান (বঙ্গবাসী প্রেস)
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা কমলালয়
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত— কবিতাবলী (বসুমতী)
অরবিন্দ পোদ্দার— Renaissance in Bengal : Search for Identity (1977)
জীবেন্দ্র সিংহরায়— সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ (ক্যালকাটা)

(চ) বিভিন্ন সাময়িক ও সংবাদপত্রে মধুসূদনের জীবন, প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত—সোমপ্রকাশ, ৬ আগস্ট, ১৮৬০
২৩ শ্রাবণ, ১২৬৭
রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত—১। বিবিধার্থ সংগ্রহ—অগ্রহায়ণ, ১৮৭২ শক/১৮৬০ খৃীঃ (৬ষ্ঠ পর্ব, ৬৮ খণ্ড)
২। রহস্য সন্দর্ভ ১৯২১ সং, ২য় পর্ব, পৃঃ ১৩৬
৩য় পর্ব, ৩৪ খণ্ড, পৃঃ ১৩০
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০/১৮৭৩
" সম্পাদিত বঙ্গদর্শন, ১২৮৮
—Calcutta Review, ১৮৭১-তে Bengali Literature প্রবন্ধ (নাম অনুল্লেখিত)।
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সম্পাদিত—ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩২০/১৯১৩
ভারতবর্ষ, ১৩২১-১৩২৪ ['মধুস্মৃতি' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত]
ঐ চৈত্র, ১৩২১-'রিজিয়া' নাটক সম্পর্কে আলোচনা।
ঐ ২য় খণ্ড. ৬ষ্ঠ সংখ্যা—মধুসূদনের পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রীর দলিল প্রকাশিত
K. L. Haldar— National Magazine 1892, p. 95-96.
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—সাহিত্য, বৈশাখ, ১৩২৩ [মহাকবি মধুসূদন]
ঐ ১৩২৩-১৩২৪ [বঙ্কিমচন্দ্রের Bengali Literature-এর মন্মথনাথ ঘোষ-কৃত অনুবাদ]
ঐ বৈশাখ, ১৩০০-মাইকেল মধুসূদন দত্তের শেষ জীবন।
ঐ আষাঢ়, ১৩০০ ঐ
অমৃতবাজার পত্রিকা, ৩.৯.১৮৭৪-মধুসূদনের গ্রন্থস্বত্ব নীলামের নোটিশ

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—* ভারতী ১ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১২৮৪-পৃঃ ৭-১৭

"	"	ভাদ্র,	"	পৃঃ ৬৫-৬৯
"	"	আশ্বিন	"	পৃঃ ১০৩-১১
"	"	কার্তিক	"	পৃঃ ১৬১-৬৪
"	"	পৌষ	"	পৃঃ ২৬৮-৭৪
"	"	ফাল্গুন	"	পৃঃ ৩৬৬-৭০
"	৬ষ্ঠ	ভাদ্র ১২৮৯		পৃঃ ২৩৪-৪০

* মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা।
শেষেরটি বাদে "ভ" ছদ্ম নামে লিখিত।
ভারতী, ৪১ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ—মেঘনাদবধ সমালোচনা।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—প্রবাসী, মাঘ, ১৩৬৩—মন্মথনাথ ঘোষ লিখিত—
সম্পাদিত— 'নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদক কে'?

— ঐ, ১৩৩১, ৩য় সংখ্যা—দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—
—মধুসূদন ও ফরাসী সাহিত্য।

প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত—সবুজ পত্র, ১৩২১,—মেঘনাদবধ কাব্য সমালোচনা।
('পরগাছার ফুল')।

নারায়ণ, ১৯১৭—সারদাচরণ মিত্র—মেঘনাদবধ-এর বিরূপ
সমালোচনা।

কালি ও কলম, ১৩৭৮,

পৃঃ ৬-৭— 'রিজিয়া' সম্পর্কে আলোচনা,

... . The Sunday Hindustan Standard, March, 22, 1959 } ...রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত লিখিত "Our Divine Language—Michael's Achievement in verse.

... ... বিশ্বভারতী পত্রিকা,

দান্তে শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৬৫, জগন্নাথ চক্রবর্তী—
'দান্তে ও আধুনিক মন।ন

... ... যুগান্তর, ৬.২.১৯৬৪—পল্লব সেনগুপ্ত—'মধুসূদনে'
একটি হারিয়ে-যাওয়া চিঠি।

... ... শনিবারের চিঠি,

২৯ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৬৩—শীতাংশু মৈত্র—
'মধুসূদন কি বাংলা জানিতেন?'

প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত—শনিবারের চিঠি, ২৯ বর্ষ,
৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন,
১৩৬৩—রথীন্দ্রনাথ রায়—'মধুসূদনের প্রহসন'
... ... বেতার জগৎ,
শারদীয়া, ১৯৭১—জনার্দন চক্রবর্তী—পিতৃণ নমস্যে
... ... পূর্বাশা, ১৩৭১—প্রবোধচন্দ্র সেন—'পয়ার পরিচয়'
শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী-সম্পাদিত, চতুষ্কোণ,
বৈশাখ, ১৩৭০—জগন্নাথ চক্রবর্তী—মহাকাব্যে জিজ্ঞাসা, ১ম পর্ব
ঐ, শ্রাবণ, ১৩৭০— ঐ —মহাকাব্যে জিজ্ঞাসা, ২য় পর্ব
ঐ, মে, ১৯৭৩—সুরেশপ্রসাদ নিয়োগী—নূতন তথ্যের আলোকে মধুসূদন
ঐ, ঐ, ঐ—তপোবিজয় ঘোষ—'নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ ও মধুসূদন'
... .. সমকালীন, জানুয়ারি, ১৯৭১—সুরেশপ্রসাদ নিয়োগী—মাইকেল মধুসূদন দত্তের মায়াকানন।
সঞ্জীবকুমার বসু সম্পাদিত—সাহিত্য ও সংস্কৃতি
১১ বর্ষ, সংখ্যা ৪,
মাঘ-চৈত্র, ১৩৮২—উজ্জ্বলকুমার মজুমদার—ফরাসী ও বাংলা সাহিত্যে—মাইকেল থেকে রবীন্দ্রনাথ
ঐ ... ... ঐ ষষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৭—জগন্নাথ চক্রবর্তী—মেঘনাদবধের পঞ্চম সর্গ—ব্যঞ্জনা ও চিত্রকল্প
ঐ ... ... ঐ ঐ ঐ —তারকনাথ ঘোষ—এই শতাব্দীর প্রথম কবিদের প্রসঙ্গে
ঐ ... ... ঐ ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা
শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৮—ক্ষেত্র গুপ্ত—হোমর ও মধুসূদন, প্রথম প্রস্তাব, হেক্টরবধ
ঐ .. ... ঐ ৫ম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা
শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮৪—সুকুমার দাস—মধুসূদনের শিল্পচেতনা
ঐ ... ... ঐ কার্তিক-পৌষ,
১৩৭৩/১৯৬৬—মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—মধুসূদনের নাটক ও কালিদাসের অনুকৃতি

সঞ্জীবকুমার বসু সম্পাদিত—সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ঐ ... ... ঐ...বর্ষ, ১১, সংখ্যা-২

শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮২—বারিদবরণ ঘোষ—গৌরদাস বসাক ও মধুসূদন দত্তকে লেখা পত্রাবলী

ঐ ... ... ঐ...এপ্রিল-জুন, ১৯৬৭—সুখময় মুখোপাধ্যায়—মধুসূদন ও কৃষ্ণমোহন

ঐ ... ... ঐ...শ্রাবণ-আশ্বিন,

১৩৮৯/১৯৮২—গার্গী দত্ত—মধুসূদনের সংস্কৃত চর্চা

ঐ ... ... ঐ...১৪শ বর্ষ, সংখ্যা ৩/৪

কার্তিক-চৈত্র, ১৩৮৫—স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা কবিতায় পুরাণ

ঐ ... ... ঐ...১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা,

বৈশাখ-আষাঢ় . ১৩৮৭—ভবতোষ দত্ত—মেঘনাদবধের কাল নির্ণয়

... ... রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা

জানুয়ারি-জুন, ১৯৮২—গার্গী দত্ত—মধুসূদন ও কালিদাস

সমরেশ বসু সম্পাদিত—মহানগর, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪—গার্গী দত্ত—মধুসূদনের দেবদেবী

অরুণ ভট্টাচার্য „ —উত্তরসূরী ১৯৮১

সংখ্যা ?—গার্গী দত্ত—মেঘনাদবধ কাব্যে ভৌগোলিক বিন্যাস।

বিমল কর সম্পাদিত—শিলাদিত্য, ১৭-৩১ বৈশাখ, ১৩৯০
১-১৫ মে, ১৯৮৩ } অরুণ-মিত্র—বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন ও আধুনিক কবিতা

[বাংলা কাব্য-বিবর্তনে মধুসূদনের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা]

ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষাল সম্পাদিত—আলেখ্য—১৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

মাঘ-চৈত্র, ১৩৮৯
১৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৯০
১৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৯০ } দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ—মধুসূদন প্রতিভার মূল্যায়ন

মিহির আচার্য সম্পাদিত—লেখক সমাবেশ—

প্রথম পক্ষ, এপ্রিল, ১৩৮৫-দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ—স্বদেশ-প্রেমিক মধুসূদন

ঐ শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৯১—দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ—কালজয়ী মধুসূদন

মধুসূদন-সম্পর্কীয় তথ্যের জন্য নিম্নলিখিত পুরাতন পত্র-পত্রিকা, দলিল, এবং শতবার্ষিকী সংখ্যা আলোচনা করা যেতে পারে ঃ

1. Unpublished Records of the Hindoo College, 1847-48
2. Bengal Herald, 1842-43.
3. Bengal Hurkaru, 1842.
4. Friend of India, 1843, 1845, 1851.
5. The Christian Herald, 1843.
6. Englishman, 1845.
7. High Court at Calcutta—Centenary Souvenir, 1862-1962. Calcutta, 1962

* বলা বাহুল্য, পত্র-পত্রিকার এই তালিকা অসম্পূর্ণ। —সম্পাদক।

লেখক পরিচিতি

অরবিন্দ ঘোষ— (১৮৭২-১৯৫০)। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সংগঠক, কবি-দার্শনিক ও যোগী। 'The Life Divine', 'Essays on Gita', 'Savitri', 'Mother India', 'Song of Myrtilla and Other Poems', 'A System of National Education', 'The Renaissance of India', 'কারাকাহিনী' 'ধর্ম ও জাতীয়তা' প্রভৃতি ৩৮ খানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের লেখক।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত— জন্ম ১৯১০। সুপরিচিত সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও সুবক্তা। তাঁর লেখনী সাহিত্যের নানা বিভাগে স্বচ্ছন্দে বিচরণশীল। 'বস্তুবাদীর ভারত-জিজ্ঞাসা', 'কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথ ও সাম্যচিন্তা', 'বিশ্বসাহিত্যের ভূমিকা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের লেখক।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ— (১৮১৯-১৮৮৬)। বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ' এবং পরে 'কল্পদ্রুম' পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর নির্ভীক সমালোচনা বিশুদ্ধ রাজনীতি এবং সুস্থ সাহিত্যের আদর্শ স্থাপনে সহায়ক হয়েছিল। 'গ্রীসের ইতিহাস', 'রোমের ইতিহাস' ছাড়াও তিনি কতগুলি 'ছাত্র-পাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র— (১৮২২-১৮৯১)। বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ, বহুভাষাবিদ পণ্ডিত, সমালোচক এবং উৎকৃষ্ট প্রাবন্ধিক। 'বিবিধার্থ-

সংগ্রহ' এবং 'রহস্যসন্দর্ভে'র সম্পাদনা ছাড়াও তাঁর যোগ্য সম্পাদনায় বহু মূল্যবান সংস্কৃত গ্রন্থ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। ৯টি বাংলা এবং ২১টি ইংরেজী গ্রন্থে তাঁর বহুমুখী জ্ঞানস্পৃহার পরিচয় নিহিত। গভীর পাণ্ডিত্য ও মনীষার জন্য ইনি দেশ-বিদেশের পণ্ডিত সমাজ-কর্তৃক সম্মানিত হন।

রাজনারায়ণ বসু— (১৮২৬-১৮৯৯)। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদের প্রচারক এই মনীষী ছিলেন মাইকেল মধুসূদনের শ্রদ্ধেয় বন্ধু। 'আত্মচরিত', 'সেকাল ও একাল', 'হিন্দু বা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত', 'সায়েন্স অফ রিলিজিঅন', 'রিলিজিঅন অফ লাভ', 'উপনিষদের অনুবাদ', 'ব্রাহ্মধর্ম' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের প্রণেতা।

রামগতি ন্যায়রত্ন— (১৮৩১-১৮৯৪)। সংস্কৃতে সুপণ্ডিত, বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবী। 'বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', 'অন্ধকুপ হত্যার ইতিহাস' (অনুবাদ), 'বাঙ্গালা ইতিহাস', 'ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'ও গোষ্ঠীকথা', 'রোমাবতী' ও 'ইলছোবা' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— (১৮৩৮-১৮৯৪)। গদ্য সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তক। তাঁর ১৪ খানি মৌলিক উপন্যাস এবং মননশীল প্রবন্ধাবলী বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' বাঙালীর জাতীয় জীবনে গভীরমূল প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাস ছিল অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের জীবনবেদ।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়— (১৮৩৮-১৯০৩)। কাব্য-কবিতায় ভারতীয় জাতীয় সংস্কৃতির প্রবক্তারূপে তিনি দেশবাসীর শ্রদ্ধা লাভ করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থঃ 'বৃত্রসংহার' (২ খণ্ড) 'ভারতবিলাপ', 'কালচক্র', 'বীরবাহু কাব্য', 'ভারতের নিদ্রাভঙ্গ', 'চিন্তাতরঙ্গিনী', 'আশা কানন', 'ছায়াময়ী', 'দশমহাবিদ্যা', 'কবিতাবলী' প্রভৃতি।

শিবনাথ শাস্ত্রী— (১৮৪৭-১৯১৯)। শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবক ও সাহিত্যিক। ভারতব্যাপী সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাম্যের বাণী প্রচার করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ 'আত্মচরিত', 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', 'নির্বাসিতের বিলাপ',

'মেজবৌ', 'রামমোহন রায়', 'ধর্মজীবন', 'History of Brahmo Samaj', 'Men I have Seen'—প্রভৃতি।

রমেশচন্দ্রদত্ত— (১৮৪৮-১৯০৯)। সৃজনশীল সাহিত্য স্রষ্টা, অর্থনীতিবিদ, কৃষক ও প্রজাদরদী স্বদেশপ্রেমিক। সমাজচিন্তায় প্রগতিশীল। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'England and India—A Record of Progress during hundred years 1785-1885', 'Famines and Law Assessment in India', 'Economic History of British India', 'The Peasantry of Bengal', 'বঙ্গবিজেতা', 'মাধবীকঙ্কন', 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত', 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা', 'সংসার', 'সমাজ' প্রভৃতি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর— (১৮৪৯-১৯২৫)। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ষষ্ঠ সন্তান। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, সংগঠক ও স্বদেশপ্রেমিক। ফরাসী ও সংস্কৃতের অনুবাদে প্রশংসনীয় কৃতিত্বের অধিকারী। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'পুরুবিক্রম', 'স্বপ্নময়ী', 'অশ্রুমতী', 'অলীক বাবু', 'এমন কর্ম আর করব না', 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রভৃতি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী— (১৮৫৩-১৯৩১)। বিখ্যাত গবেষক, দুষ্প্রাপ্য ও লুপ্তপ্রায় পুঁথিসংগ্রাহক, এবং ভারততত্ত্ববিদ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'বাল্মীকির জয়', 'মেঘদূত ব্যাখ্যা', 'কাঞ্চনমালা', 'বেনের মেয়ে', 'সচিত্র রামায়ণ', 'প্রাচীন বাংলার গৌরব', 'বৌদ্ধধর্ম', 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা' (সম্পাদনা), 'Magadhan Literature', 'Sanskrit Culture in Modern India', 'Discovery of Living Buddhism in Bengal' প্রভৃতি।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার- (১৮৬০-১৯০৮)। উৎকৃষ্ট গদ্য লেখক। কিছুকাল (১৮৮৩) বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার পরিচালক। রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতায় 'পদরত্নাবলী' সম্পাদনা করেন। রচিত গ্রন্থ: 'ফুলজানি', 'শক্তিকানন', 'কৃতজ্ঞতা', 'বিশ্বনাথ' 'রাজতপস্বিনী', প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— (১৮৬১-১৯৪১)। মৌলিক সাহিত্যস্রষ্টা, সঙ্গীত রচয়িতা ও সুরকার, নাট্যকার ও নাট্যপ্রযোজক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্মরণীয় ও বরণীয়। বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর সাংস্কৃতিক

জীবনে নবযুগের স্রষ্টা। 'জীবনস্মৃতি', 'গোরা', 'গীতাঞ্জলি', 'বলাকা', 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা', 'সভ্যতার সংকট', 'মানুষের ধর্ম' প্রভৃতি এই মহান স্রষ্টার বহু মূল্যবান গ্রন্থ ঘরে ঘরে সমাদৃত।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়— (১৮৬৩-১৯১৩)। বিশিষ্ট কবি ও নাট্যকার। নাটকে আবেগময় স্বদেশপ্রেমের উদ্বোধন ঘটান। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা তাঁর শেষ কীর্তি। তাঁর রচনার মধ্যে 'হাসির গান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সাজাহান,' 'মেবার পতন', 'প্রতাপ সিংহ' প্রভৃতি এখনও জনপ্রিয়।

শশাঙ্কমোহন সেন— (১৮৭২-১৯২৮)। কবি ও মননশীল সমালোচক। রচিত গ্রন্থ ঃ কাব্য—'সিন্ধু সঙ্গীত', 'শৈল সঙ্গীত', 'স্বর্গে ও মর্ত্যে', এবং 'বিমানিকা',। সমালোচনা গ্রন্থ ঃ 'বঙ্গবাণী', 'বাণীমন্দির', 'মধুসূদন—অন্তর্জীবন ও প্রতিভা' প্রভৃতি।

মোহিতলাল মজুমদার- (১৮৮৮-১৯৫২)। রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম মৌলিক প্রতিভাবান কবি এবং শক্তিমান সমালোচক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ 'স্বপন পসারী', 'বিস্মরণী', 'স্মরগরল'. 'হেমন্ত গোধূলি', 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', 'সাহিত্য বিতান,' 'সাহিত্য বিচার', 'কবি শ্রীমধুসূদন', 'বঙ্কিম বরণ', 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস', 'রবি প্রদক্ষিণ', 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য', (২ খণ্ড), 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র', 'বাংলার নবযুগ', 'বাংলা কবিতার ছন্দ' প্রভৃতি।

সুশীলকুমার দে— (১৮৯০-১৯৬৮)। ইংরেজী, সংস্কৃত এবং বাংলায় কৃতবিদ্য পণ্ডিত, কবি এবং যশস্বী গবেষক-অধ্যাপক। তাঁর গবেষণা-প্রবন্ধের সংখ্যা ১০০-রও বেশি। সংস্কৃত অলংকার সম্পর্কীয় গ্রন্থ লিখে আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ। ছয়টি কাব্যগ্রন্থসহ বাংলায় নয়টি, ইংরেজীতে ৫টি গ্রন্থের লেখক, সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা—আটটি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ 'History of Bengali Literature in the Nineteenth Century,' 'Sanskrit Poetics', 'Vaisnava Faith and Movement in Mediaeval Bengal', 'বাংলা প্রবাদ', 'নানা নিবন্ধ', 'দীনবন্ধু মিত্র' প্রভৃতি।

প্রবোধচন্দ্র সেন— জন্ম (১৮৯৭—১৯৮৬)। বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক ও ছান্দসিক। ছন্দ বিষয়ক শতাধিক প্রবন্ধের লেখক।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ', 'ছন্দ জিজ্ঞাসা', 'আধুনিক বাংলাছন্দ সাহিত্য', 'নূতন ছন্দ পরিক্রমা', 'বাংলা ছন্দচিন্তার ক্রমবিকাশ', 'বাংলা ছন্দের রূপকার রবীন্দ্রনাথ,' 'বাংলা ছন্দচিন্তার অগ্রগতি', 'ভারতাত্মা কবি কালিদাস', 'রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি', 'ধম্মপদ পরিচয়', 'বাংলার ইতিহাস সাধনা', 'ইচ্ছামন্ত্রের দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা', 'ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত' (বাংলা ও ইংরেজী) প্রভৃতি।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়— (১৮৯২-১৯৭০)। ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যের যশস্বী অধ্যাপক এবং মনস্বী সাহিত্য সমালোচক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে', 'রবীন্দ্র সৃষ্টি-সমীক্ষা', 'বাংলা সাহিত্যে বিকাশের ধারা' প্রভৃতি।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত— জন্ম ১৯০৩। ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান অধ্যাপক, মনস্বী সাহিত্য সমালোচক ও নন্দনতত্ত্ববিদ্। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'The Art of Bernard Shaw', 'Towards a Theory of Imagination', 'Shakespearian Comedy', 'The Whirligig of Time : The Problem of Duration in Shakespeare's Plays', 'An Introduction to Aristotle's Poetics,' 'Shakespeare's Historical Plays', Aspects of Shakespearian Tragedy', শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সমালোচনা সাহিত্য পরিচয়, ধ্বন্যালোক (অনুবাদ), হাস্যরসিক পরশুরাম, তেহি নো দিবসা, India Wrests Freedom, Vivekananda and Indian Nationalism প্রভৃতি। তাঁর শেক্সপীয়র-সমালোচনা পাশ্চাত্ত্য দেশেও সমাদৃত।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য—জন্ম—)। কলিকাতা ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। রবীন্দ্রসাহিত্য গবেষণায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বহু মূল্যবান প্রবন্ধের লেখক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'বাগর্থ', 'মালতি পুঁথি' (সম্পাদনা), 'সমীক্ষা' প্রভৃতি।

মোবাশ্বের আলী— জন্ম—১৯১৯। চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ) হাজী মুহম্মদ মহসীন কলেজের অধ্যক্ষ। 'সমকালীন' পত্রিকায় সাহিত্য-জীবনের

সূত্রপাত। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'মধুসূদন ও নবজাগৃতি', 'নজরুল প্রতিভা', 'বিশ্ব সাহিত্য', 'শিল্পীর ট্র্যাজেডি' প্রভৃতি।

শীতাংশু মৈত্র— (১৯১৯-১৯৮৬) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শেক্সপীয়র অধ্যাপক ও Visiting Professor ছিলেন। বাংলায় বহু ছোটগল্প, নাটক ও কবিতা রচনা করেছেন। গর্কি ও রুবেয়ারের গ্রন্থের অনুবাদক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্ত্য', 'যুগন্ধর মধুসূদন', 'Shakespeare's Comic Idea' প্রভৃতি।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—জন্ম ১৯২০। বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য', 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ৫ খণ্ড, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,' 'বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত', 'সমালোচনার কথা', 'বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা' প্রভৃতি।

গার্গী দত্ত— জন্ম ১৯৩০। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রীডার। মধুসূদন সম্পর্কে গবেষণা করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেছেন। এঁর কয়েকটি গবেষণাত্মক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য— জন্ম ১৯১৮। আন্নামালাই ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক। দক্ষিণ ভারতীয় বিভিন্ন ভাষা থেকে কয়েকটি গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভারতীয় ভক্তি সাহিত্য, ডক্টর শশিভুষণ দাশগুপ্তর 'ত্রয়ী'র হিন্দী অনুবাদ, কন্নড়, তামিল গল্পের বাংলায় অনুবাদ। 'জোনাকি', 'দুপুরের স্বপ্ন', 'ভারততীর্থ' প্রভৃতির লেখক।

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী—জন্ম ১৯৩১। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার রীডার। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'বিভূতিভূষণ: মন ও শিল্প', 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী বাংলা সাহিত্য' 'বাংলা কথা-সাহিত্য প্রসঙ্গ', 'রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণশিল্প' প্রভৃতি। এ ছাড়াও অনেকগুলি গবেষণাত্মক প্রবন্ধের লেখক।

অশ্রুকুমার সিকদার— জন্ম ১৯৩২। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও মননশীল প্রাবন্ধিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'রবীন্দ্র

নাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য', 'রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন', 'আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়', 'বাক্যের সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি।

শিশিরকুমার দাস— জন্ম ১৯৩৬। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক। কবি, গবেষক, ও প্রবন্ধকার। প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'Early Bengali Prose', 'বঙ্কিমচন্দ্র', 'অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্‌স', 'মধুসূদনের কবি-মানস', 'গদ্য-পদ্যের দ্বন্দ্ব' প্রভৃতি।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার—জন্ম ১৯৩৬। বিশ্বভারতী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, বর্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটির রবীন্দ্র অধ্যাপক। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'বাংলা ছন্দের ক্রমবিকাশ', 'বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব', 'রবীন্দ্র অন্বেষা', 'রবীন্দ্রোত্তর কাল', 'রবীন্দ্র-সঙ্গ', 'উপন্যাসে জীবন ও শিল্প', 'এ মণিহার', 'সাহিত্যে রূপ-রীতি' প্রভৃতি।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—জন্ম ১৯৩৩। রানীগঞ্জ টি. ডি. বি. কলেজের বাংলার অধ্যাপক। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: 'শালবন', 'নিহত প্রতিমাগুলি', 'ক্রুদ্ধ বুদ্ধের কবিতা'। মধুসূদন সম্পর্কে গবেষণারত।

বাণী রায়— জন্ম ১৯২১। ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা—চারুচন্দ্র কলেজ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। 'The Eastern Post', 'Womens' Digest' এবং 'উদয়াচলে'র প্রাক্তন সম্পাদিকা। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, সমালোচনা, শিশুপাঠ্য এবং সমালোচনাত্মক বই নিয়ে তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৪০-এরও বেশি। এঁর কতগুলি গল্প, কবিতা, উপন্যাস কোন কোন ভারতীয় ভাষা এবং ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে।

সতীনাথ ভাদুড়ী— (১৯০৬-১৯৬৫)। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর প্রথমে ওকালতি, পরে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ-গ্রহণ, কয়েক বৎসর প্যারিস বাস, দেশে ফিরে সাহিত্যসেবায় মনোনিবেশ। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'জাগরী', 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী', 'ঢোড়াই চরিত মানস', 'অচিন রাগিণী', 'গণ-নায়ক', 'চিত্রগুপ্তের ফাইল', 'দিগ্‌ভ্রান্ত', 'পত্রলেখার বাবা', 'জলভ্রমি' প্রভৃতি।

দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়—জন্ম ১৯৪৪। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রীডার। প্রাবন্ধিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'মোহিতলালের কাব্য ও কবি মানস', 'রবীন্দ্র নাট্যসমীক্ষা', 'নাট্যতত্ত্ব-বিচার', 'কাব্যতত্ত্ববিচার' প্রভৃতি।

জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়— জন্ম ১৯৪৩। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষা বিভাগের রীডার। মধুসূদনের বাক্‌রীতি সম্পর্কে গবেষণা করে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। ভাষাতত্ত্বেও ডিগ্রী লাভ করেছেন। বর্তমানে জার্মান ভাষা অনুশীলনরতা।

মানস মজুমদার— জন্ম ১৯৪৪। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রীডার। প্রাবন্ধিক। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লোক-সংস্কৃতি পর্ষদের অন্যতম সদস্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'নাট্যকার তারাশঙ্কর', 'অক্ষয়কুমার বড়াল ও বাংলা সাহিত্য'।

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ— জন্ম ১৯১৫। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক ও সমালোচক। প্রাক্তন সম্পাদক, 'বাসন্তিকা', 'একতমা'। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য', 'সাহিত্য ও শিল্পলোক', দ্বারকানাথ ঠাকুর (অনুবাদ), 'মোহিতলালের কাব্যপরিক্রমা', 'সমবায়' (অনুবাদ), 'রবীন্দ্র মন ও রবীন্দ্র সাহিত্য', 'শিল্পের স্বরূপ' (অনুবাদ), 'সাহিত্যের আকাশ', 'মোহিতলাল মজুমদার: ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য প্রতিভা' (সম্পাদনা), 'বিবেকানন্দের সাধনা' প্রভৃতি।

নারায়ণ চৌধুরী— জন্ম ১৯১২। মননশীল প্রাবন্ধিক, সমালোচক এবং বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ। প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা অন্যূন ৫০খানি। উল্লেখ-যোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ: 'আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন', 'সমকালীন সাহিত্য', 'সাহিত্য ও সমাজপ্রবাহ', 'চতুরঙ্গ', 'টলস্টয়: জীবন ও সাহিত্য', 'শরৎচন্দ্র: জীবন ও সাহিত্য,' 'উত্তর-শরৎ বাংলা উপন্যাস', 'সাহিত্য: দেশী ও বিদেশী', 'সঙ্গীত পরিক্রমা', 'নজরুলের গান', 'আলাউদ্দীন ও অন্যান্য', 'Debendranath Tagore', 'Sarat Chandra Chatterjee', 'Iswar Chandra Gupta' প্রভৃতি।

সুরেশচন্দ্র মৈত্র— জন্ম ১৯২২। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রীডার। বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধের লেখক। বিশিষ্ট

মধুসূদন গবেষক। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'বাংলা কবিতার নবজন্ম', 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য', 'বাঙালীর মনীষা' প্রভৃতি।

ক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল— জন্ম ১৯১৮। ইংরেজী সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক। সাহিত্য-সংস্কৃতি-সমাজ-জিজ্ঞাসামূলক 'আলেখ্য' পত্রিকার সম্পাদক। কবি, প্রাবন্ধিক ও সমালোচক। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'কয়েকটি কবিতা', 'সময় কঠিন সূত্রধার',। কাব্যনাটক: 'যযাতি', 'দশরথ'।

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়—জন্ম ১৯৪২। রবীন্দ্রভারতী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। সাহিত্যতত্ত্ব মুখ্যত এঁর গবেষণার বিষয়। তাঁর 'অবয়ববাদ ও বলাকা' এবং 'মিথের নন্দনতত্ত্ব' প্রশংসিত প্রবন্ধ। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'সাহিত্য বিবেক', 'রবীন্দ্র নন্দনতত্ত্ব', 'সাহিত্যতত্ত্ব সমীক্ষা', 'সাহিত্যের মাত্রা: দ্বান্দ্বিক সূত্র' প্রভৃতি।'

নীলরতন সেন— জন্ম ১৯২৫। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। ছন্দ-বিজ্ঞান চর্চায় বিশিষ্টতা লাভ করেছেন। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়', 'Early Eastern N I. A. Versification', 'Caryagitikosa', 'চর্যাগীতির ছন্দ পরিচয়', 'চর্যাগীতিকোষ', 'আধুনিক বাংলা ছন্দ', (১ম ও ২য় পর্ব), 'বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গ' প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ: 'রবীন্দ্র-বীক্ষা', 'বাংলা প্রবন্ধ সংকলন' (১ম খণ্ড) প্রভৃতি।

———